সংসার-শর্ব্বরী

(ভব-সংসারের গুপ্তকথা !)

৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

শীল এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সপ্তম সংস্করণ।

শীল-প্রেস।

৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৪ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা

সংসার-সর্ব্বরী।

(ভব-সংসারের গুপ্তকথা!)

প্রথম চক্র।

আমি কোথায়?

আমি কোথায়? সর্ব্বদাই মনে হয়,—মনে মনে আপনা আপনি মনে হয়, আমি কোথায়? নিশীথে—অনন্ত নক্ষত্রখচিত আকাশের প্রতি যখন আপনা আপনি দৃষ্টি পড়ে,—অমাবস্যার নিবিড় আঁধার আকাশের প্রতি যখন উদাসদৃষ্টি পতিত হয়, প্রাবৃটের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি, হৃদয়ের মধ্যে কে যেন তখনি জিজ্ঞাসা করে,—আমি কোথায়? দিবসে নানাকার্য্যে বিব্রত থাকি,—আমোদে আহ্লাদে, হাস্যে পরিহাসেই কেটে যায়, তত মনে হয় না; কিন্তু রাত্রে সব কথাই মনে পড়ে। ভাবনা চিন্তাতে সমস্ত রাত কোথা দিয়ে চলে যায়, কিছুই ঠিক পাই না। কেবলই ভাবি,—আমি কোথায়? বাস্তবিকই আমি সে পরিচয় কিছু জানি না। সেই জন্যই আমার এই একমাত্র চিন্তা, একমাত্র ভাবনা,—আমি কোথায়?

আমি পাটনায়।—কেবল এইমাত্র জানি, আমি পাটনায়। আরও জানি যে, পাটনা আমার জন্মস্থান নয়। পাটনা পশ্চিমদেশ, এখানে হিন্দুস্থানীরাই বাস করে। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, আমার আশ্রয়দাতা পিতাও বাঙ্গালী। তবে পাটনায় জন্মস্থান কি কোরে হবে?—এখানে তাঁর বাসাবাড়ী। প্রকৃত বাড়ী যে কোথায়, সেটিও আমি জানি না। রায় মহাশয় সর্ব্বদাই বলেন,—আপনা হতেই আপনার মনেই বলেন, বাড়ীতে তাঁর অনেক বিষয়। কোনজন বাসায় এলেও নিজের প্রাধান্য দেখিয়ে—গর্ব্বিতভাবে প্রায়ই বোলে থাকেন,—দেশে তাঁর বিস্তর ধন,—বিস্তর টাকা,—বিস্তর বিষয়সম্পত্তি! এই সমস্ত আমি দেখে শুনে, আমি মনে এক রকম স্থির কোরেছি

রেখেছি; এখানে আমার জন্মস্থান নয়,—এটা বাসাবাড়ী। জন্মস্থান—জন্মভূমি অন্য কোন দেশে আছেই আছে।

বাড়ীর কর্ত্তার নাম গদাধর রায়। সাধারণের কাছে রায় মহাশয় নামেই ইনিই পরিচিত। অনেকে নাম জানে না,—কেমন রূপ, কেমন গুণ, তাও দেখে নাই,—তবুও দূর হতেই—উদ্দেশেই অনেকে জানে,—রায় মহাশয় বড় মহাশয় লোক।—আমীর লোক। বড় টাকার মানুষ। রায় মহাশয় এখানে মান্যগণ্য লোকের মধ্যেই গণ্য। সকল স্থানেই তাঁর বিশেষ খাতির যত্ন,—বিশেষ মানসম্ভ্রম আছে। মজ্‌লিসে সালিসিতে, যুক্তি পরামর্শে রায় মহাশয় বড় চৌকস্! সকলের সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাব।

রায় মহাশয় এখানে সপরিবারে আছেন। আমি তাঁদের আশ্রয়েই আছি। পরিবারের মধ্যে রায় মহাশয়ের ত্রিশ কি তারও দু-এক বছর অধিক বয়সের গৌরাঙ্গী এক পত্নী, আর এগার বছরের একমাত্র কন্যা—সরোজবাসিনী। সরোজ বালিকা।—সরলা বালিকা, কিন্তু তার বিবাহের বয়স হয়েছে। গিন্নী সর্ব্বদাই সরোজের বিবাহ দিবার কথা তুলচেন,—কত ধর্ম্মভয় দেখাচ্চেন,—আর অধিক দিন মেয়ের বিবাহ না দিলে, জাত যাবে বোলচেন,—কর্ত্তা তবুও তেমন গা মাখ্‌চেন না,—কেবল টাল দিয়েই দিন কাটাচ্চেন। সত্য সত্যই সরোজের বিবাহের বয়স হয়েছে। সরোজ সুন্দরী; কিন্তু যে সুন্দরীর নামে পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা পড়ে,—যে সুন্দরীর নামে বরকর্ত্তার ছুটাছুটি পড়ে যায়,—কত পাত্র, ঘটক-ঘটকীর অপেক্ষা না রেখে নিজের বিবাহের পাত্রী দেখ্‌তে ছুটে, সরোজ সেরূপ সুন্দরী নয়। ঘরে ও আত্মীয়স্বজনেরা আপনার জনের যেটুকু সৌন্দর্য্য দেখ্‌লে সুন্দরী বলেন, সরোজবাসিনী সেইরূপ সুন্দরী। সরোজ গৌরাঙ্গী, কিন্তু স্থূলাঙ্গী নয়। তবে সময়ের গুণে শরীরের লাবণ্য স্পষ্টই প্রকাশ পেয়েছে। সরোজের আওয়াজ একটু মোটা, গড়নটি বেশ মেয়েলী,—চুলগুলি একটু ছোট ছোট, চোক দুটি চেহারার মাপে ছোট,—হাঁ, মুখ কিছু বড়, স্বভাব চঞ্চল। একস্থানে অধিকক্ষণ স্থির থাকৃতে—কি কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে সরোজের বড়ই কষ্ট বোধ হয়।

গিন্নী আমাকে আপনার মেয়ের মত দেখেন। সেই রকম আদর-অপেক্ষা করেন, যত্ন করেন,—ভালবাসেন। সরোজও আমার খুব অনুগত। সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকৃতে, আমার অনুকরণ কোত্তে সে বড়ই ভালবাসে

আমিও তারে বোনের মত দেখি। গিন্নীকে মা বলি, কর্ত্তাকে কোন-কিছুই বলি না,—বড় কাছেও যাই না, বিশেষ প্রয়োজন হোলে ইসারায়—কৌশলে কার্য্য শেষ করি।

আছি বেশ। কোন কষ্ট নাই, কোন বিষয়ের অভাব নাই, আছি বেশ আছি বেশ,—লোকে দেখে—আছি বেশ, কিন্তু আমার মন তা বুঝে না। সর্ব্বদাই মনে হয়, সর্ব্বদাই মনে পড়ে, সেই এক পুরাতন কথা, আমি কোথায়?

কর্ত্তা এখানকার আদালতে কি কাজ করেন,—তাতে বেশ দশ টাকা পান। এ ছাড়া নগদ টাকার দেনা-পাওনার কারবার আছে। কর্ত্তার এখানে সেই খাতিরেই প্রতিপত্তি। আমি এ হেন কর্ত্তাগিন্নীর আশ্রিত, পালিত এবং এঁদের কাছেই—এঁদের স্নেহ-যত্নেই এত বড় হয়েছি। জ্ঞান হোয়ে পর্য্যন্ত,—সে কতদিন—তা ঠিক কোরে বোল্‌তে পারি না; লোকের যে বয়সে জ্ঞান হয়,—যে বয়সের কথা বেশ মনে থাকে, আমি সেই বয়স হতেই এই পাটনায়—এঁদের আশ্রয়েই আছি। লোকে, যারা তেমন অনুসন্ধান রাখে না,—যারা কোন ঘরের খবর জানে না, তারা জানে—কর্ত্তার দুই মেয়ে। সাধারণ লোকের কাছে আমি কর্ত্তার বড় মেয়ে বোলেই পরিচিত। আমারও এই বিশ্বাস অনেক দিন ছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত জানতেম, কর্ত্তাগিন্নীরই কন্যা আমি। এতদিনে আমার সে আশা দূর হয়েছে। যে দিন আমার এই মহাভ্রম দূর হয়, যে দিন আমার জীবন-তরুতে চিন্তাকীট প্রবেশ করে, সেই দিন—সেই মুহূর্ত্ত হতেই আমার প্রধান চিন্তা,—আমার প্রধান ভাবনা, আমি কে? আমি কোথায়?

একদিন বৈশাখ মাসে—রাত্রে শুয়ে আছি। সে দিন ভয়ানক গ্রীষ্ম, নিদ্রা হোচ্চে না।—বিছানায় পোড়ে এপাশ ওপাশ কোচ্চি;—ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে, বড়ই কষ্ট হোচ্চে,—রাত তখন প্রায় ১টা। কর্ত্তাগিন্নী সন্ধ্যা হোতে ছাতের উপরেই থাকেন। অনেক রাত হোলে,—শরীর শীতল হোলে ঘরে আসেন। আমি সে দিন ভাবলেম, কর্ত্তা হয় ত এতক্ষণ নেমে এসেছেন। এই স্থির কোরে ছাতে উঠচি, এমন সময় ছোট ছোট স্বর শুনতে পেলেম। একটি স্বর সরু—ছোট, অপরটি মোটা,—একটু কর্কশ। অনুভাবে বুঝলেম,—কর্ত্তাগিন্নীতে কথাবার্ত্তা হোচ্চে, এই অবসরে কর্ত্তার স্বভাব ও চেহারাটী না বোল্লে একটু অন্ধকার অন্ধকার বোধ হবে। কর্ত্তার বয়স প্রায় ষাট কি তার দু এক বছর এদিক ওদিক। বর্ণ তেমন উজ্জ্বল

নয়,—চোক দুটি বড় বড়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চাউনি দেখলে অনায়াসে বোঝা যায়, অনেক মৎলব—অনেক কৌশল—অনেক ফিকিরফন্দি সর্ব্বদাই যেন তাঁর মাথায় বিরাজ কোচ্চে। চুল ছোট ছোট, ঘাড়ের দিকটা অতি কষ্টে ঢেকে আছে। সাম্নের দিক হোতে কান দুটির চার আঙুল পর্য্যন্ত চুলের সম্পর্কও নাই, সাম্নের সমস্তটা প্রচুর চুল। বড় বড় খ্যাংরামুখো গোপ, সর্ব্বদাই খাড়া হয়ে আছে। দেহটি একটু মোটা সোটা, কিন্তু তাকে ভুঁড়ি বলা যায় না। দোহারার চেয়ে একটু যেন বেশী বেশী। গলায় সোণার দানা ও ছোট ছোট রুদ্রাক্ষ মিশানো তিন হালি মালা। হাতে তিন ভরি ওজনের পাকাসোণার একখানি ইষ্টকবচ। রায় মহাশয়ের স্বর গম্ভীর, কেমন ছেরা চেরা—ভাঙা ভাঙা ছেলে-ভয়-দেখানো কর্কশ স্বর!

গিন্নীর নাম কি, জানি না! কর্ত্তা ভিন্ন তিনি সকলেরই মা; সুতরাং তাঁর নামে বড় একটা দরকার হয় না। সকলেই তাঁকে মাতৃ সম্বোধন করেন। কর্ত্তা, গিন্নী বোলেই ডাকেন। গিন্নীর রং ফর্সা, দিব্যি টক্‌টক্ কোচ্চে। দেহ একটু লম্বা, শরীর শীর্ণ, তাতেই যেন কোলের দিকে একটু বাঁকা বোলে বোধ হয়। চুলগুলি ছোট কিন্তু বেশ কাল, কোকঁড়ান। সাম্নের চুল উঠে গেছে, তাতে মুখের চেহারা—একটু খারাপ দেখাচ্ছে। নাকটী লম্বা, দাঁতগুলি পরিষ্কার, চোক দুটি ডাগর, কিন্তু কোণে কালিপড়া। যেমন বয়স, চেহারা দেখলে তার চেয়ে একটু বেশী বোলে বিবেচনা হয়। মুখখানি সদাই হাসি হাসি,—স্বর বড় নরম। আমি এতদিন আছি, একদিনের জন্যেও গিন্নীকে রাগ কোত্তে দেখি নাই। চাকর-চাকরাণী, দাস-দাসী, সকলের সঙ্গেই গিন্নীর সমান ভাব।

কর্ত্তাগিন্নীতে কথোপকথন হোচ্চে। এক একবার বড় বড়, আবার এক একবার ছোট ছোট কথায় কথাবার্ত্তা হোচ্চে। মধ্যে মধ্যে আমার নামও কোচ্চেন। আওয়াজ শুনেই ভাবলেম, কর্ত্তা এখনো ঘরে যান নাই, ফিঁরে আসি। এইটুকু ভাবতে যে সময়টুকু লাগে, সেই সময়ের মধ্যে আমার নাম কানে গেল। মনে বড় সন্দেহ হলো, কৌতুক বাড়লো। এত রাত্রে আমার নাম কেন? কথাগুলি শোন্‌বার জন্য বড়ই ইচ্ছা হলো। পা টিপে টিপে গুটি গুটি যতদূর সম্ভব নিকটে গিয়ে আড়িপেতে রইলেম। সেখান হতে কথাগুলি বেশ শোনা যেতে লাগলো।

কর্ত্তা বোলছেন, "কোন চিন্তা নাই। তুমি যতটা ভাবচো—ততটা

ভাবনার কোন কারণ নাই। কে জানবে?—কে শুনবে?—সর্ব্বেশ্বর একাই সমস্ত কাজ শেষ কোর্ব্বে! আমরা ত কিছুরই মধ্যে নই—তবে অত ভাবনা কেন?" গিন্নী বোল্লেন, "ভাবনা নাই বা কেন?—যদি লোকে জানতে পারে,—তা হলে সকল দিক নষ্ট হবে। ধরা পোড়লে—সর্ব্বেশ্বর সব কথা প্রকাশ কোরে বোল্লে—তখন একেবারে জন্মের মত যেতে হবে। আমি বলি, অত লোভে দরকার কি? যার যা আছে, তাই যথেষ্ট বিবেচনা কোরে সন্তুষ্ট থাকাই ত উচিত? আহা! মা নাই, বাপ নাই, যারা আছে তাদেরও খোঁজ খবর নাই, একি কম কষ্ট গা!"

"তোমার ত ঐ এক কথা!" কর্ত্তা বড় বড় কোরে বোল্লেন, "তোমার ত ঐ এক কথা! কষ্ট নাই কার? আমরাই কি বড় সুখে আছি? কোথায় দেশ—সেই সাতসমুদ্র তের নদী পার হোয়ে এই পশ্চিমদেশে থাকা কেন? দু-পয়সা রোজগারের জন্যই ত? জগতে কষ্ট নাই কার? সকলের কষ্ট কি কখনো দূর হয়? ঈশ্বর যাকে কষ্ট দেন, তাকে কি কেহ রাখতে পারে? আমার পাওনা, নেয্য পাওনা, হাতের টাকা, আমি ছেড়ে দিব?—বল কি তুমি?" গিন্নী বোল্লেন, "টাকার দরকার সকলেরি তা জানি, কিন্তু এমন জীবহত্যা করা,—একজনের মুখের ভাত কেড়ে নেওয়া,—এ রকম রাহাজানীর টাকায় দরকার কি? যার যা নেয্য, তাকে তাতে বঞ্চিত কোল্লে কি কখন ধর্ম্মে সয়?"

"ধর্ম্মে না সয় নাই সইবে, কিন্তু এমন হাতের টাকা ত্যাগ করা আমার দ্বারা ত হবে না। আর টাকা নিয়ে কিছু আমি অপরকে দিব না, তোমারই থাকবে, তোমার ছেলেপুলেই সুখে-স্বচ্ছন্দে ভোগ কোর্ব্বে। আমি কেবল ধোবার মোট বইতে জন্মেচি বই ত নয়?" এই পর্য্যন্ত বোলে—কর্ত্তা একটু নরম সুরে—যেন একটু কাতর হোয়ে বোল্লেন, "তোমাকে না জানিয়ে ত কোন কাজ আমি করি না, তাই বোলছি,—তুমি এ কাজে আর বাধা দিও না। অনেক টাকা,—রোক পঞ্চাশ হাজার! বড় বড় তিনটে পুকুর, প্রকাণ্ড বাড়ী, পাঁচখানা বাগান, এ সব কি কখনো ছাড়া যায়?"

টাকার কথায়—বিষয়ের বর্ণনায় গিন্নীর মন যেন নরম হলো। আগে যে দৃঢ়তাটুকু ছিল, তা আর যেন রইল না। নরম হোয়ে গিন্নী বোল্লেন, "তা টাকার মায়া ত্যাগ কোত্তে না পার—যা হয় কর, কিন্তু হরিদাসীকে দেশছাড়া কোরে তোমার কি লাভ হবে? হরিদাসী কিছুই জানে না।

কার মেয়ে,—কোথায় ঘর—এখানেই বা কেন, কিছুই সে জানে না। তবে কেন আর ওকে দেশান্তরী কর? আছে—থাক; কোন ক্ষতি হবে না।"

"তুমি কি বোঝ?—গোয়েন্দা লেগেছে। জগা ব্যাটা সন্ধান কোরে বেড়াচ্চে। ব্যাটা ভয়ানক ফাঁইবাজ। একটু সূত্র পেলে একেবারে সর্ব্বনাশ কোর্ব্বে। সর্ব্বেশ্বর সমস্ত জানতে পেরেছে। জগা লোক দিয়ে অনুসন্ধান নিচ্চে। সেই লোকের কাছেই সর্ব্বেশ্বর স্বকর্ণে শুনে এসেছে। পেছুনে আরও লোক আছে, তুমি তাদের চেন না। চারিদিকেই শত্রু!—চারিদিকেই বিপদ! শত্রু নিপাত না কোল্লে এত বিষয় কে ভোগ কর্ব্বে? কার অদৃষ্টে ভোগ হবে? আমি মন্দ কাজ করি না। যে মৎলব এঁচেছি,—যে ফিকির ঠিক কোরেছি, তাই ঠিক। তাতেই কার্য্য সিদ্ধি হবে। বেবাক টাকা এক কথায় হাতে আস্‌বে। বারম্বার আর তুমি বাধা দিও না।"

গিন্নী এ কথায় কি উত্তর দিলেন, ভাল শুনতে পেলাম না। তবে বেশ বুঝলেম, এই সব কথা আমার সর্ব্বনাশের জন্যই উঠেছে। আমায় দেশান্তরী কর্ব্বার জন্যই এই মন্ত্রণা! সর্ব্বাঙ্গ তখন কাঁপ্‌ছে,—গলা শুকিয়ে গেছে, ভয়ে সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়েছ,—কাণের মধ্যে যেন তালা লেগে গেছে, কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছি না। গিন্নি কি বল্লেন, ভাল শুনতে পেলেম না। আর শোনবার বড় আবশ্যকও নাই। কর্ত্তাগিন্নি দুজনে আমার সর্ব্বনাশের যে সূত্রপাত কোরেছেন,—তাতে আমাকে অচিরেই যে পথের ভিখারিণী হোতে হবে, তা বেশ বুঝলেম। দুরাচার আমাকে যে কোন্ দেশে পাঠাবে, সেই ভাবনাতেই আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল। আর দাঁড়াতে পাল্লেম না, বোসে পোড়্‌লেম। অজ্ঞানে অজ্ঞানেই বোসে পোড়লেম।

কর্ত্তাগিন্নি দুজনেই উঠেছেন। নীচে নেমে এসে, আমার কাছেই দাঁড়িয়েছেন, আমাকে দেখেছেন, কিন্তু কখন যে এসেছেন, তা আমি জান্‌তেও পারি নাই। আমি আপনার মনে চিন্তাসাগরে ডুবে আছি। কর্ত্তা আমার পাশ কাটিয়ে সাঁ কোরে নেমে গেলেন। তাঁর পায়ের শব্দে আমার চমক্ ভাঙ্‌লো।—উঠে দাঁড়ালেম। কর্ত্তার চলন ভঙ্গিতে আমি বেশ বুঝতে পাল্লেম, তিনি যেন রাগে গর্ গর্ কোরে চোলে গেলেন। আমার মনে আরও ভয় হলো! ভেবেছিলেম, হাতে পায়ে ধোরে করুণা ভিক্ষা কর্ব্বো মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট কর্ব্বো,—এখন দেখছি, সে পথটিও বন্ধ হলো। মনে ভাবলেম, মা অবশ্য উপরে আছেন, তাঁর কাছে যাই,—দুঃখের কথা

জানাই,—যদি কোন উপায় হয়। মুহূর্ত্ত মধ্যে এইটি চিন্তা কোরে যেমন উপরে যাব, পেছুনেই দেখি গিন্নি! আরও লজ্জা হলো, বেশী বেশী সঙ্কুচিত হয়ে পোড়লেম। ভয়ে ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেম। কোন কথা কইতে পাল্লেম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেম।

আমি কোন কথা কইতে না কইতে গিন্নি আমাকে স্নেহমাখা কথায় বোল্লেন, "হরিদাসি! একলা এত রাত্রে এখানে কেন?—ভয় পেয়েছ? ভয় কি?—আমি এখানে আছি। এস,—উপরে এস।" এই বোলে আমার হাতখানি ধোরে ছাতের উপরে নিয়ে গেলেন। আমি লজ্জায়—ভয়ে জড়সড় হোয়ে মাথাটি নীচু কোরে ছাতে গিয়ে বোসলেম। গিন্নী আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "হরিদাসি! মনে কিছু কোরো না। আমাদের কথাবার্ত্তা কি কিছু শুনেছ? মায়ের কাছে মিথ্যা বোল্‌তে নাই। সত্য বল,—যেটুকু শুনেছ—সেইটুকুই বল, ভয় কি তোমার?"

এখন কি বলি। সত্য বলি কি মিথ্যা বলি, এই এক ভাবনা। অনেক ভেবে দেখলেম, মিথ্যা বলায় অনেক দোষ। কথাটা চাপা পোড়্‌লে আমার বিপদের কোন প্রতিকারই হবে না। কথাটা আপনা হতেই তুলতে হতো, তা না হয়ে গিন্নীই তুলেছেন। বেশ হয়েছে। সত্যই বলি। এই ভেবে ধীরে ধীরে বোল্লেম, "সব শুন্‌তে পাই নাই। কতক কতক শুনেছি।" গিন্নী হো হো কোরে হেসে—আমার পিঠে একটি আনন্দের চাপড় মেরে বোল্লেন, "কর্ত্তার ঐ এক রকম ভাব। ছেলে-মানুষ,—কিছু বোঝে না,—তার সঙ্গে তামাসা!—তাকে আবার ভয় দেখানো? ভয় কি তোমার? তুমি যখন উপরে এসে উকি দাও, তখনি আমরা তোমায় দেখ্‌তে পেয়েছিলেম। তাই তোমাকে ভয় দেখাবার জন্যে,—এত রাত্রে আর তুমি ছাতে না আস এই জন্যে কর্ত্তা কত ছোড়িভঙ্গ কথা বোল্লেন। ঠিক হয়েছে; তিনি যেমন তোমাকে ভয় দেখাতে এই সব পাঁচ রকম ভয়-দেখানো-কথা বোলেছিলেন, তুমিও তেমনি ভয় পেয়েছ। ভয় কি তোমার?" বারম্বার হেসে হেসে গিন্নী বারম্বারই বোলতে লাগলেন, "হরিদাসি! ভয় কি তোমার?"

এ বুঝানোতে আমার মন বুঝলো না। এ উত্তরে আমার ভয় দূর হোলো না। আমি স্পষ্টই বুঝতে পাল্লুম, আমাকে ভুলাবার জন্যেই গিন্নীর এই মনভুলানো বাজে কথা। কাজেই আমার ভয় দূর হলো না। আমি সকাতরে গিন্নীর পা দুখানি ধোরে কাঁদ কাঁদ স্বরে বোল্লেম, "মা!

আমাকে রক্ষা কর তুমি। আমাকে আর কোথাও পাঠিও না। আশ্রয় দিয়েছ,—যত্নে রেখেছ,—ভালবাসা দিয়েছ,—ভালবেসেছ, আর আমাকে এখন তাড়িও না। মা! তোমার পায়ে ধরে বলি, আমায় রক্ষা কর।" গিন্নী হেসে হেসে—পায়ের হাত সরিয়ে দিয়ে বোল্লেন, "ওমা! সে কি গা? হরিদাসি! তুই পাগল হলি নাকি? তুই কোথা যাবি? আমার সরোজ আর তুই কি ভিন্ন?—তুই কি আমার পর? আমার কিসের অভাব, কিসের দুঃখ যে তোকে তাড়িয়ে দিব? একি নূতন কথা বোলছিস?" গিন্নী আমার কথা যেন গায়ে মাখলেন না। আমি সবই ত শুনেছি, সকল কথা খুলে বলি, দেখি দয়া হয় কি না। মনে মনে কিন্তু রাগ আছে। কথাগুলো শুনে পর্য্যন্ত মনে মনে বড় রাগ হয়েছে; কিন্তু উপায় নাই। দয়া ভিক্ষা ভিন্ন—খোসামোদ ভিন্ন এ বিপদে উদ্ধার পাবার কোন সম্ভাবনাই নাই; কাজেই মনের ভাব গোপন কোরে—কেঁদে কেঁদে বোল্লেম, "মা! সত্য বল মা, আমার বাপ-মা আত্মীয়স্বজন কোথায়? তোমরা আমায় কেন রেখেছ? শুনলেম—"

"না না, সে সব কথা কিছুই নয়। ওসব ভয়-দেখানো কথা, মনগড়া কথা। তোমার কি ঘরবাড়ী ভিন্ন? কোন ভয় নাই।" গিন্নী কথার মাঝে কেবলই বোলছেন, "ভয় নাই" কিন্তু ভয় দূর হবার কোন উপায়ই কোচ্চেন না। আমি আবার পা দুখানি ধোরে বোল্লেম, "মা! যাই হোক, আমাকে ত্যাগ করো না। তোমাকে শপথ কোরে বোলতে হবে, আমাকে তুমি চিরদিন কাছে রাখবে?" গিন্নী এ কথায় কোন উত্তর না দিয়ে আপন মনেই বোল্লেন, "তোমার কোন ভয় নাই। কোথাও যেতে হবে না তোমাকে। আমার কাছেই আছ, আমার কাছেই থাকবে।"

আর একবার ভাল কোরে জিজ্ঞাসা কর্ব্বো ভাবছি, এমন সময় কর্ত্তা গিন্নীকে ডাকলেন। তিনি আর বোসতে পাল্লেন না। আমার হাতখানি ধোরে নীচে নেমে এলেন। যাবার সময় স্নেহের স্বরে বোল্লেন, "যাও মা, রাত অনেক হোয়েছে।" এই বোলে গিন্নী চোলে গেলেন। আমিও ঘরে এসে শয়ন কোল্লেম। সমস্ত রাত নিদ্রা হোলো না। ভয়ে ভয়ে—ভাবনা চিন্তায়—হা-হুতাশে সমস্ত রাত কেটে গেল। কিছুই স্থির কর্ত্তে পাল্লেম না।

আমার পিতামাতা আছেন কি না, ঘরবাড়ী আছে কি না, লজ্জার কথা, তবুও বলি, বিবাহ যদি হয়ে থাকে, তবে আমার স্বামীই বা কোথায়, এই

চিন্তাতেই হৃদয় ব্যাকুল হলো। কেবলই মনে হতে লাগলো, আমার আত্মীয়-স্বজন কি কেহ নাই? আছেন সব। বিষয়-সম্পত্তি আছে, ঘরবাড়ী আছে; তবে এখন আমি কোথায়? আমি ঘরবাড়ী ত্যাগ কোরে—পরের আশ্রয়ে তবে কেন আছি? এরাই বা আমাকে কেন রেখেছে? এদের উদ্দেশ্যই বা কি?—অভিপ্রায়ই বা কি?

অভিপ্রায় অবশ্যই মন্দ। মৎলব কু না হলে, পরের মেয়েকে এমন কোরে গোপনভাবে রাখবে কেন? রাত্রে স্ত্রীপুরুষে এমন মৎলব আঁটা আঁটিই বা কোর্ব্বে কেন? এই সব ভেবে—এই রকম পাঁচটা বিপদের চিন্তা কোরে আরও ভয় পেলেম, আরও অবসন্ন হলেম! কেবলই মনে হতে লাগলো, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে,—সহায়-সম্পত্তিতে বঞ্চিত হয়ে, তবে এখন—আমি কোথায়?

দ্বিতীয় চক্র।

দিনে ডাকাতি।

তিনমাস গত!—ভাবনাচিন্তাতেই তিনমাস গত! আমি এতদিন যে বিপদের আশঙ্কা কচ্ছি,—যে বিপদে পরিত্রাণ পাবার জন্য কত ভাবনাই ভাবছি,—তার কোন লক্ষণই এখনো দেখা যায় নাই। কাজেই আমার ভাবনা চিন্তাও অনেক পরিমাণে কম হয়ে এসেছে। এখন আবার মনে হচ্চে, গিন্নী সত্য কথাই বলেছেন!—সত্যসত্যই আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে কর্ত্তা সেই সব সাজান-কথা বলেছিলেন। এতদিন পরে আমার মনের সন্দেহ অনেকটা কমে গেল।

সন্দেহ অনেকটা কমেছে বটে, কিন্তু ধোঁকা যায় নাই। আমার বেশ বোধ হচ্চে, আমি এঁদের আশ্রিত—পালিত, কিন্তু আত্মীয় নই। এঁদের যে যত্ন, এঁদের যে স্নেহ, এঁদের যে ভালবাসা, সে কেবল মুখের; আন্তরিক নয়। তাই যদি হলো, এঁরা যদি আমার আত্মীয়ই না হলেন, তবে এঁরাই বা কে?

আমার আত্মীয়স্বজনেই বা কোথায়? তাই বল্‌ছিলেম,—বিপদের আর কোন ভয় নাই সত্য—কিন্তু সন্দেহও যায় নাই, চিন্তাও কমে নাই। আমি তবে এখন কি করি?

একদিন বেলা ১টার সময় কর্ত্তা তাড়াতাড়ি বাসায় এলেন। এমন সময়ে ত এক দিনও আসেন না, তবে এমন অসময়ে আসবারি কারণ কি? এই ভেবে আমরা তাড়াতাড়ি কর্ত্তার আগমনের কারণ জান্‌তে তাঁর বসবার ঘরে এলেম। তিনি আপিসের কাপড় চোপড় না ছেড়েই আগে চাকরদের হুকুম কল্লেন, "শীঘ্র, বৈঠকখানা পরিষ্কার কর। আজ রাত্রে জনকতক বন্ধুলোক আসবেন। এখনি পরিষ্কার চাই।" কর্ত্তার হুকুম পেয়ে তখনি চাকরেরা বৈঠকখানা পরিষ্কার কোত্তে আরম্ভ কোল্লে। মেঝে পরিষ্কার কোরে মেঝেসই সপ পাতা হলো, তার উপর সতরঞ্চি, আবার তার উপর ভাল জাজীম পাতা হলো, পরিষ্কার পরিষ্কার ধোপদস্ত ওয়াড় চড়ান তাকিয়া পোড়লো, দেওয়ালের দেওয়ালগিরি-গুলি পরিষ্কার কোরে আবার নূতন সরঞ্জামে সজ্জিত করা হলো। নূতন বাতি চড়ান হলো। অভ্যাগত বন্ধুদের খাতির যত্ন করবার জন্য দুজন খানসামা তামাক নিয়ে গুল ধরিয়ে হাজির রুজু রইল। দেখতে দেখতে বৈঠকখানা জমজমাট।

কর্ত্তা অন্দরে এসেই নানা রকম খাবার তৈয়ারির ফরমাস দিলেন। দুজন অতিরিক্ত চাকর রান্নার জিনিসপত্র আন্‌তে বাজারে ছুটলো। একজন সরকার খাবারের ফর্দ্দ নিয়ে তাদের সঙ্গে গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বাসাবাড়ী সরগরম!—হৈ হৈ ব্যাপার! বাবুর কাপড় ছাড়বার অবসর নাই, যেন চরকী ঘোরা ঘুরচেন। চারিদিকে তদারক করে বেড়াচ্ছেন। মহা গোল! দেখে কে?

সন্ধ্যা প্রায় হয়, সমস্তই প্রস্তুত, এখনো কারো দেখা নাই। কর্ত্তা ক্রমশই ব্যগ্র হচ্ছেন, লোক পাঠাচ্চেন, সকলেই ফিরে এসে বলচে, কারও দেখা নাই! ক্রমে ৭টা বেজে গেল, তখনো কেহ এলেন না। ৮টাও বাজে, তখনো কেহ না। এই সব দেখে শুনে কর্ত্তা বড়ই চিন্তিত হলেন।

রাত প্রায় ৯টার সময় গড়্‌গড়্‌ করে একখানা গাড়ী ফটকে এসে লাগলো। চাকর ছুটে এসে সদর দরজায় সেলাম করে দাঁড়ালো। কর্ত্তা স্বয়ং দরজা পর্য্যন্ত এসে সাদর সম্ভাষণ করে বন্ধু দুটির হাত ধরে বৈঠকখানায় এনে বসালেন! তখনি তামাক এলো, টানাপাখার হাওয়া হতে লাগলো,

একটা গোল পুড়ে গেল। চাকরদের সকলের মুখেই প্রতিধ্বনি হলো, "এসেছেন।"

আমরা জানালায় দাঁড়িয়ে আগন্তুক বাবু দুটিকে দেখলেম। বাবু দুটি বেশ। একটির বয়স প্রায় চল্লিশ। দিব্যি গৌরবর্ণ, মাথায় বাবরি, লম্বা লম্বা কাল কাল গোঁপ, বঁড় বড় জুল্‌পি, নাকটি একটু মোটা, চোক দুটি বসা, কান একটু ছোট, সামান্য গোচের একটি ভুঁড়ীও আছে। মাথায় পাগড়ী ছিল, খুলে রেখেছেন। এখনো কথা কন নাই, অনুভবে বুঝলেম, এ বাবুটি মাড়ওয়ারা।

দ্বিতীয় বাবুটি কথাবার্ত্তা কইচেন, সুতরাং বুঝতে পাল্লেম, তিনি বাঙ্গালী। এ বাবুটিকে কর্ত্তা "বাবু" বোলে সম্বোধন কচ্চেন, বাবুর মতই খাতির কচ্চেন, সসম্ভ্রমে আদব-কায়দা দেখাচ্চেন, কাজেই এ বাবুটিকে আমরাও বাবু বল্লেম। এ বাবুটির রং কাল, খুব গাঢ় কাল। দাঁত বড় বড়, প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী বেরিয়ে আছে। চোক ডাগর কিন্তু কোণ বসা, চাউনি চঞ্চল, নাকটি চ্যাপ্‌টা, ওষ্ঠ দুখানি খুব মোটা, কান দুটি হাতির কানের মত বেজায় লম্বা, বড় তাড়াতাড়ি কথা কন, না জানা থাকলে সকল কথা বোঝা যায় না! এ বাবুটির বয়স অনুমানে বোঝা গেল, ত্রিশ কি তার উপর দু-এক।

সাদর সম্ভাষণের পর কর্ত্তা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "শম্ভুজি! আপনার শুভাগমন হবে মনেও ছিল না। আজ বড় শুভদিন আমার! দেখুন, এ সবই আপনার, কোন ত্রুটি গ্রহণ কর্ব্বেন না।" অনুমান ঠিকই করেছিলেম। প্রথম বাবুটি প্রকৃতই মাড়ওয়ারী। শম্ভুজী প্রকাশ্যে কিছু বল্লেন না, ডান হাতখানি বাড়িয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন মাত্র। তার পর কর্ত্তা "তামাক দে রে" বোলে একটা হাঁক দিয়ে দ্বিতীয় বাবুটিকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "তবে মাষ্টারবাবু! আপনি ত ঘরের লোক, আপনাকে ত আর বেশী কিছু বোলতে হবে না; কেবল সদয়বাবু এলেন না, এতেই যা দুঃখ।" মাষ্টার বাবু কর্ত্তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তাড়াতাড়ি বোল্‌তে লাগলেন, "সে বিপদের কথা বলেন কেন মহাশয়? তাঁর আসার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। পরিবারেরা এখানে নাই, চাকরদের বুঝিয়ে বোলে কোয়ে, গাড়ি জুত্‌তে বল্লেন,—আমাদের বসিয়ে রাখলেন,—এমন সময় শুন্‌লেম, বাড়ীর মধ্যে একটা গোল! তাড়াতাড়ি চাকরদের জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, মস্ত

ব্যারাম ! জানেনি ত, কি ভয়ানক ব্যারাম ! তাতে পরিব্যরেরা কেহ নাই। বিষম বিপদ ! আমরা দুজনে অনেকক্ষণ দেখে,—একটু সুস্থ কোরে রেখে—না এলে নয়,—তাই এলেম। আমার বাড়ীতে গাড়ী পাঠাতেম, কেবল আস্‌তে নাই, এই প্রতিবন্ধকে পাঠান হলো না ! আহা ! বেচারী বড় কষ্ট পাচ্চে। অত টাকা, অমন লোক, দুদিন সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ কত্তেও পেলে না।" মাষ্টার বাবুটি কথা শেষ কোরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কল্লেন।

"বলেন কি মাষ্টার বাবু ?—সদয়বাবুর এমন পীড়া ? তা আমার বাসায় গাড়ী পাঠালেই ত হতো ?—তাঁর পরিবার আর আমার পরিবার কি ভিন্ন ? এ কেমন কথা ? কালই আমার পরিবার পাঠাব। তাঁর এই অসময়ে যদি না দেখলেম—এমন সময় যদি তত্ত্ব না নিলেম, তবে আর বন্ধুত্ব কিসের ? কি বলেন শম্ভুজী ?" শম্ভুজীর মুখে কথা নাই। হাবাবোকা শম্ভুজী ঘাড় নেড়েই সম্মতি জানালেন।

মাষ্টারবাবু যেন কৃতজ্ঞতার উচ্ছাস উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন, "তা আমি বেশ জানি। সদয়বাবুকে আপনি যে যথেষ্ট ভালবাসেন, তা আমি সে দিন বেশ জান্‌তে পেরেছি। এখন নিবেদন, যদি আজ রাত্রেই আপনারা পরিবার সঙ্গে কোরে যান, তা হলে বড়ই উপকার করা হয়। কি বলেন ?"

কর্ত্তা একটু চিন্তা করে বল্লেন,—"না হয় যে তা নয়, কিন্তু আপনারা বাড়ীতে এসেছেন, কখন শুভাগমন হয় না, আর আমি পরিবার নিয়ে চলে যাব, আপনাদের কে দেখবে ? যাই হোক, চাট্টি কিছু কিছু খেতে ত হবে ?"

"না না,—তাতে আর কাজ নাই। একজন রোগের জ্বালায় কষ্ট পাবে, আর আমরা এখানে সুখে আমোদ আহ্লাদ কর্ব্বো ?—তা হবে না। চলুন, আর খাওয়ায় কাজ নাই। বরং আর এক দিন আসা যাবে।—তিনজনেই একদিনে আস্‌বো। একসঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করা যাবে। কেমন ? সেই কথাই ভাল কথা।"

"তাও কি হয় ?" কর্ত্তা একটু হেসে বল্লেন, "তাও কি হয় ? তবে বরং সকাল সকাল আহারাদি সেরে সকলেই যাই চলুন।" সকলেরই এই যুক্ত হলো।

আহারের আয়োজন হলো। তিনজনেই আহার কোত্তে বস্‌লেন। পৃথক ঘরে আমাদেরও আহারের আয়োজন হলো। কর্ত্তা সকাল সকাল আমাদের আহারাদি সেরে নিতে বল্লেন। কেন বল্লেন, তা আমি বুঝলেম,

কর্ত্তা কিন্তু তখন কোন কথা প্রকাশ কল্লেন না। একসঙ্গেই প্রায় আহার শেষ হলো,—একসঙ্গেই আচমন সমাধা হলো, একসঙ্গেই সমস্ত শেষ।

কর্ত্তা অন্দরে এসে গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ কল্লেন। আমি দূরে ছিলেম, শুনতে পেলেম না। শোন্‌বার তত আবশ্যকও ছিল না। যে পরামর্শই হোক, এখনি জান্‌তে পারা যাবে। পরামর্শ শেষ কোরে কর্ত্তা বাইরে গেলেন। গিন্নী আমাকে ডেকে বল্লেন, "মা! কাপড় পর। গয়নার দরকার নাই, ভাল একখানি কাপড় পর। সদয়বাবুর কি ব্যারাম হয়েছে, আমরা তাঁকে দেখতে যাব। আহা! সদয়বাবু বেশ লোক। সেবার আমার জ্বর হলে কত সেবাই করেছিলেন। না খাওয়া—না শোওয়া,—কেবল দিনরাত কাছে থেকে দেখেছেন। তাঁর এ অসময়ে না যাওয়া কি ভাল হয় মা! তাঁর পরিবার এখানে নাই, একলা আছেন। কেহ দেখবার লোক নাই। চাকর দিয়ে কি ব্যারামের সেবা চলে? চল মা, আর দেরি করো না। রাত প্রায় ১১টা বাজে। আজ রাত্রেই আবার ফিরতে হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম, "সরোজও কি আমাদের সঙ্গে যাবে?"

"না।" ঘাড় নেড়ে বল্লেন, "না, ও ছেলেমানুষ, কি কত্তে যাবে? কোন কিছু করবার ক্ষমতা নাই, কেবল একটা গোল বৈ ত নয়, কাজ কি?—আমরা দুজনেই যাই চল। বেশী দেরী করো না।"

গিন্নী প্রস্তুত হলেন। আমিও প্রস্তুত।—আমাদের গাড়ীও প্রস্তুত। গাড়ী দুখানি। একখানিতে কর্ত্তা আর শম্ভুজী উঠলেন, অপরখানিতে গিন্নী আর আমি উঠলেম। মাষ্টার বাবু আমাদের গাড়ীর ছাদের উপর উঠলেন। গাড়ী উত্তরপশ্চিম মুখে দ্রুতবেগে ছুটলো। পথের মধ্যে গিন্নী আমার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বল্লেন, "এই টাকা পাঁচটি ভাল কোরে আঁচলে বেঁধে রাখ। কি জানি,—নিঃসম্বলে পথে চলা ভারি দোষ। যদি সদয় বাবুর হাতে টাকা না থাকে,—যদি কোন বিপদই হয়, টাকা অভাবে কষ্ট পাবেন। বেশ করে বাঁধো। সাবধান! যেন হারিয়ে ফেলো না।" আমি টাকা পাঁচটি আঁচলে বাঁধলেম।

প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ী চোল্‌ছে। গাড়ীর দ্বারের ফাঁক দিয়ে বেশ দেখছি। চারিদিকের ঘরবাড়ী বেশ দেখা যাচ্চে। দুখানি গাড়ীই সমান বেগে চোলেছে। খানিক গিয়ে আমাদের গাড়ী থাম্‌লো। গিন্নী বল্লেন, "মা! একটু দাঁড়াও। একবার সইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। অনেক

দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই। সময় প্রায়ই হয় না। যদি, এতদূর এলেম্‌, একবার দেখা কোরে যাই। কতটুকু বিলম্ব? এই যে—ঐ বাড়ী দেখা যাচ্চে।” গিন্নী একখানি দোতলা বাড়ী দেখালেন। আমি বল্লেম, “ফিরে আস্‌বার সময় ত দেখা কল্লেই হবে?” গিন্নী বল্লেন, “তাও কি হয় না! তত রাত্রে কি আর সাড়া পাওয়া যায়? কতটুকু দেরি? এই আমি এলেম।” গিন্নী গাড়ী হতে নেমে গেলেন। আমি তাঁর আশাপথ চেয়ে বসে রইলেম।

অনেক বিলম্ব হলো! আমি কেবল পথ চেয়ে চেয়ে সময় কাটাতে লাগলেম। দূরে ধর্ম্মঘড়ীতে টং কোরে ১টা বাজলো, তবুও গিন্নীর দেখা নাই। বড় ভাবনা হলো। দরজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলেম, সঙ্গের দ্বিতীয় গাড়ীখানি নাই! মনে বড় সন্দেহ হলো। আরও একটু মুখ বাড়িয়ে দেখলেম,—অনেক দূর পর্য্যন্ত নজর হলো, কর্ত্তার গাড়ী দেখতে পেলেম না। ভাবলেম, গাড়ী নিয়ে হয় ত গিন্নীকে আন্‌তে গেছেন। এই ভাবনাতে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। মাষ্টার বাবু ছাত হোতে নেমে এলেন। আমাকে বল্লেন, “হরিদাসি! ভাল হয়ে বসো। এ যায়গাটা বড় ভাল নয়। চারিদিকে বদ্‌মায়েসের আড্ডা। কি জানি, বলা ত যায় না? গাড়ীর দ্বারে চাবি বন্ধ করাই ভাল।” এই মাত্র বোলে—আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে, মাষ্টার বাবু গাড়ীর দুই দিকের দ্বারেই চাবি বন্ধ কল্লেন। আমি মহা ফাঁপরে পড়লেম। করি কি? মাষ্টার বাবুকে কিছু বোল্‌তেও সাহস হলো না।

মাষ্টার বাবু দ্বারবন্ধ করেই ছাদে গিয়ে বোস্‌লেন। বোসেই বল্লেন, “হাঁক।” গাড়ী পশ্চিমদিকে চল্লো। একি বিপদ! গিন্নী কোথায় গেলেন, কর্ত্তা কোথায় গেলেন,—সঙ্গের সে গাড়ীখানিই বা কোথায় গেল, কিছুই ঠিক পেলেম না! ব্যাপার দেখে স্পষ্টই বুঝলেম,—বিষম বিপদ! তখন সেই-দিনকার রাত্রের কথা মনে পোড়লো। বেশ বুঝলেম, এই আমার নির্ব্বাসন। আমি চীৎকার কোরে বল্লেম, “মাষ্টারবাবু! গাড়ী রাখুন, গাড়ী রাখুন, মা কোথায়? কোথায় নিয়ে যাচ্চেন?” মাষ্টার বাবু কোন উত্তর কল্লেন না, গাড়ীও থাম্‌লো না, আমার সেই কাতরতাও কেহ শুন্‌লে না। কত কাঁদলেম, মাষ্টারবাবুকে উদ্দেশ কোরে কত কাতরতা জানালেম, সব বিফল হলো। নরপশু মাষ্টার একবার ফিরেও চাইলে না।

গাড়ী সমান বেগেই চোলেছে। গাড়ীর সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখ্‌লেম, গাড়ী সহর ছাড়িয়ে মাঠে পোড়েছে। দুইদিকে বড় বড় গাছ, মধ্যে পাকা পাথরের রাস্তা। জনমানবের চিহ্ন নাই, গাড়ী সেই রাস্তা দিয়ে চোলেছে, সুতরাং চীৎকারেই বা লাভ কি? কেঁদেই বা আর ফল কি? আমি নীরবে কেবল অদৃষ্ট-চিন্তা কোচ্চি, আর সে দিনের ঘটনা মনে মনে তোলাপাড়া কোচ্চি।

এঁদের উদ্দেশ্য কি?—আমাকে এমন ভাবে বন্দী কোরে—নির্ব্বাসন দিয়ে এঁদের লাভই বা কি, তা কিছু ভেবে পেলেম না। কেন আমার এ শাস্তি, তাও কিছু বুঝ্‌লেম না। এঁদের প্রাণে কি মমতা নাই?—হৃদয়ে কি দয়া নাই? গিন্নী স্ত্রীলোক, এতদিন স্নেহ যত্ন কোরেছেন, এতদিন কোলে কোরে মানুষ কোরেছেন, তিনিও একদিনে সে সকল স্নেহমমতা ভুলে গেলেন? পাষণ্ড মাষ্টার, একে কখনো চিনি না, জানি না, আমার সঙ্গে কোন শত্রুতা নাই, এই বা আমাকে বন্দী কোল্লে কেন? কোথায় নিয়ে যাবে তারই বা স্থিরতা কি?

এমন ভাবে প্রতারণা, এমনতর প্রবঞ্চনা, আমি আর কখনো শুনি নাই। দিনে ডাকাতী আর কাকে বলে? এরই নাম,—দিনে ডাকাতী!

তৃতীয় চক্র।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

গাড়ী চোলেছে। সমান গতিতেই গাড়ী চোলেছে। চারিদিক ফর্সা হয়েছে, কাক কোকিল ডাকছে, প্রভাতের শীতল বাতাস বইচে, বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, রাত্রি প্রভাত! গাড়ী তখনো সমভাবে সমান বেগে চোলেছে। আমিও সেই পূর্ব্বের মত স্রোতে গা ঢেলে বোসে আছি, আর অদৃষ্টের পরিণাম চিন্তা কচ্চি।

গাড়ী থাম্‌লো। মাষ্টারবাবু নেমে এসে আমাকে কারামুক্ত কোল্লেন। গাড়ীর চাবি খুলে আমাকে বোল্লেন, "নেমে এস।" কোথায় যাব তার কিছুই স্থিরতা নাই, তবুও নাম্‌তে হলো। আমার জীবন মরণ কেবল মাষ্টারবাবুর হাতেই নির্ভর কোচ্চে। কাজেই তাঁর কথামত কাজ কোত্তে হলো।—নাম্‌লেম। গাড়ী হতে নেমে দেখ্‌লেম, সম্মুখে কয়েকখানি ছোট ছোট খোলার ঘর। ২ একখানি সামান্য দোকান, আর কতকগুলি পোড়ো খালি ঘর। সেখানকার লোকের মুখেই শুন্‌লেম, এরই নাম চটি। যখন গাড়ী হোতে নাম্‌লেম, যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই চেয়ে দেখ্‌লেম, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্রও নাই; কেবল সেই পাকা রাস্তাটি লম্বা পশ্চিমদিকে চোলে গেছে। দুই পাশের বড় বড় গাছগুলি পথিকদের ছায়া দান কর্ব্বার জন্যে সারি সারি দাড়িয়ে আছে। চটির দুই দিকের ৪।৫ ক্রোশের মধ্যে লোকালয় নাই, একথা কতকটা অনুসন্ধানে বুঝে নিলেম। মাঠের মধ্যে কেবল এই একমাত্র চটি।

চটিতে লোক বেশী নাই। বড় অধিক ৮।৯ জন মাত্র। মাষ্টারবাবু গাড়োয়ানকে বিদায় কোরে চটিতে উঠলেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে দোকানের পার্শ্বের একখানি ছোট—অতি অপরিষ্কার খোলার ঘরে প্রবেশ কল্লেন। সেখানে একখানি সামান্য মাজুরী বিছানো ছিল মাত্র সেই মাজুরিতেই বোসলেম। দোকানদারেরা আড়াল হতে উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।—আমি লজ্জায় ফিরে বোস্‌লেম। মাষ্টারবাবু মহা হাঁক ডাক আরম্ভ কোল্লেন। মাষ্টারবাবু দোকানদারের কাছে তাঁর বড়মানুষী পরিচয় দিলেন। পরিবার নিয়ে এলাহাবাদ যাচ্চেন। সেখানকার তিনি হাকিম। মাসে মাসে ৮শত টাকা বেতন পান। এইরূপ পরিচয় পেয়ে দোকানদারেরা মহা শঙ্কিত হলো। সকলেই তটস্থ,—সকলেই আজ্ঞাকারী। তখনি আহারাদির আয়োজন হলো, একজন ঠিকা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ রসুই কোল্লেন। বেলা ১০টার মধ্যেই আমাদের আহারাদি শেষ হলো। একে বিষম মানসিক চিন্তা, তাতে গাড়ীর ভয়ানক কষ্ট, আমি যা পাল্লেম, তাই আহার কোল্লেম। আহার কি করা যায়? এমন বিপদে কি আহারে রুচি থাকে? তবু যা পাল্লেম, আহার কোরে সেই মাজুরীতেই শয়ন কোল্লেম, তখনি নিদ্রা! এত দুঃখ—এত কষ্ট,—এত ভাবনা, ভাব্‌তে ভাব্‌তেই আমার নিদ্রাকর্ষণ হলো! অদৃষ্টে কি আছে,—কোথায় নিয়ে যাচ্চে,—জীবনের পরিণাম

কি হবে, একি সামান্য ভাবনা! এত ভাবনার মধ্যেও আমার আবার নিদ্রাকর্ষণ হলো, ঘুমালেম।

কতক্ষণ ঘুমালেম, জানি না। কতক্ষণ আরো ঘুমাতেম, তাও জানি না। মাষ্টারবাবুর একটি সুদীর্ঘ হুঙ্কারে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বোস্‌লেম। মাষ্টারবাবু বেশ পরিবর্ত্তন কোল্লেন। সঙ্গেই বড় ব্যাগ ছিল, কখন্ এ ব্যাগ গাড়ীতে তুলেছেন তা জানি না, নাম্‌বার সময় এই ব্যাগের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। মাষ্টারবাবু সেই ব্যাগের ভিতর হতে কাপড় নিয়ে বেশ পরিবর্ত্তন কোল্লেন। বাঙালী ছিলেন, হিন্দুস্থানী হোলেন। দিব্যি পায়জামা পোরলেন, গায়ে চিলে লিলুর চাপ্‌কান দিলেন, চাপকানের নীচে একটি হাতকাটা মেরজাই পোরলেন, মাথায় তাজ দিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নির্জ্জল বাঙালী মাষ্টারবাবু একজন বড়দরের হিন্দুস্থানী সম্ভ্রান্ত লোক সাজ্‌লেন। রাস্তার অনেক বিপদ!—রাস্তায় লোকজনের গতিবিধি কম। পথের মধ্যে বদমায়েস লোকেরা সুযোগ বুঝে ডাকাতী কোত্তে ছাড়ে না। এ কথা আমাকে বুঝিয়ে বোলে, মাষ্টারবাবু একটি বার মুখওয়ালা ছোট বন্দুক গলায় ঝুলালেন। মাষ্টারবাবুর মুখে ডাকাতের কথা শুনে মনে মনে হাসলেম। ডাকাতেরা যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়, বিশেষ বাধা না পেলে জীবহত্যা করে না, তারা অর্থের জন্যেই—টাকার লোভেই ডাকাতী করে, কিন্তু তারা মানুষ চুরি—এমন দিনে ডাকাতী কখনই করে না। তারা যে ধরণের ডাকাত, মাষ্টারবাবু তার চেয়ে অনেক বড়দরের ডাকাত। এমন টেক্কা ডাকাতের মুখে ডাকাতের ভয় শুনেই মনে মনে হাসলেম।

মাষ্টারবাবু নিজের বেশ পরিবর্ত্তন কোরে বোল্লেন, "হরিদাসি! তুমিও কাপড় ছাড়। এই নাও—এই পায়জামা পর, আগে এই চোস্ত জামাটি পর, তার উপর এই চাপকান, আর তার উপর এই মোটা রুমালখানি গলায় বাঁধ; দুই কোণ যেন সামনের পেট পর্য্যন্ত ঝুলে থাকে। খারাপ দেশ, স্ত্রীলোক দেখলে আরও বিপদ! তাই তোমাকে পুরুষ সাজালেম। তুমি যেন আমার ছোট ভাই। আপন ভাই নও—জ্ঞাতি ভাই। তুমি ত আর হিন্দি জান না, কাজেই তুমি যেন বোবা।—কথা কইতে পার না। সাবধান! খুব সাবধান! প্রাণান্তেও কোন কথা বোলো না। যা জিজ্ঞাসা করি, ঘাড় নেড়ে—ইসারায় উত্তর করো। লোকের কাছেও ঐ রকম।—খুব সাবধান! পোষাকের দিকেও যেন নজর থাকে। কোনমতে কেহ

জানতে না পারে যে, তুমি স্ত্রীলোক।" এই রকম উপদেশ দিয়ে মাষ্টারবাবু বেরিয়ে গেলেন। করি কি? কাজেই মাষ্টারবাবুর উপদেশ মত কাজ কোত্তে হলো। উঃ! কি ভয়ানক ফেরাবী! এই যে রূপ পরিবর্ত্তন, কথা পরিবর্ত্তন, হাবা বোবা সাজা, এর মধ্যে অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে, কিন্তু সে কারণ জানায় আমার অধিকার কি? এখন আমি পরের, নিতান্ত পরের আজ্ঞাকারী, পরের অধীন। অদৃষ্টের উপর নির্ভর কোরে কাপড় ছাড়লেম। স্ত্রীলোক ছিলেম, হিন্দুস্থানী বালক সাজলেম। চমৎকার বেশ! আপনার দিকে আপনি চেয়েই বড় লজ্জিত হলেম। কখনও ঘরের বার হই নাই,—কখনও পুরুষ মানুষের সামনে যাই নাই, আর আজ একবারে পুরুষ সেজে পুরুষের সামনে চলা বড়ই লজ্জার কথা। কিন্তু করি কি, উপায় ত নাই?—যদি অস্বীকার করি কোন চড়া কথা বলি, দুরাত্মা হয় ত আরও কোন অনর্থ ঘটাবে। কাজ কি? দেখি, এ পোড়া অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ আছে। মনে মনে সাহস বেঁধে অগত্যা কাপড় ছাড়লেম।

মাষ্টারবাবু তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে এসে বোল্লেন, "হয়েছে?—কাপড় ছাড়া হয়েছে? বাঃ! দিব্য মানিয়েছে ত!—চমৎকার চেহারা! কার সাধ্য আর চেনে?—বেশ। তবে আর বিলম্ব কোরো না। সমস্ত গাড়ী চোলে গেছে, একখানিও নাই। কেবল ডাকগাড়ী আছে। তাতে নবাব সরকারের ডাক যায়। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি অনেক যায়। সাড়ে চারটের সময় ছাড়বে। পাটনার গাড়ী এসে পৌঁছিলেই তখনি ছাড়বে, আর বড় বিলম্ব নাই। সম্ভ্রান্ত লোক না হলে ডাকগাড়ীতে যাওয়া যায় না। অনেক বোলে, ৮৲ টাকা ভাড়া স্বীকার কোরে, ২৲ টাকা তাদের অতিরিক্ত জলপানীর বন্দোবস্ত কোরে তবে ঠিক কোরে এসেছি। শীঘ্র এস, দেরী হলে ডাকগাড়ী তোমার আমার জন্যে অপেক্ষা কোর্ব্বে না।" এই বোলে একজন মুটের হাতে ব্যাগটি দিয়ে ঘর হতে বেরুলেন। আমিও তাঁর পশ্চাতে। এক পা যাই, আবার দাঁড়াই। কেমন বাধো বাধো ঠেকতে লাগলো। মেয়ে মানুষ—পুরুষ সেজে লোকের সামনে যাওয়া, বড়ই লজ্জার কথা! যদি কেহ দুকথা বোলে তামাসা বিদ্রূপ করে, তা হলেই ত অপমানের সীমা থাকবে না। এখন করি কি? অগত্যা ধীরে ধীরে বেরুলেম, গাড়ীতে উঠলেম। মুটে তাড়াতাড়ি বাবুর ব্যাগ গাড়ীতে তুলে দিলে।

আমরা গাড়ীতেই বোসে আছি। অনেকক্ষণ, প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশী সময় বোসে আছি। এমন সময় আর একখানি ডাকগাড়ী উপস্থিত হলো। ডাকগাড়ীর বড় বড় ঘোড়া।—ভাল মজবুত গাড়ী!—উপরে ৪জন সুসজ্জিত সিপাহী। ডাকগাড়ী এসে উপস্থিত হলেই, সে গাড়ীর কতকগুলি খোলে আমাদের গাড়ীতে তুলে দিলে। আমাদের গাড়ীর লোকজনেরা ঠিক হয়ে বোস্‌লো। যথাসময়ে অমনি ডাকগাড়ী ছেড়ে দিলে। আমরা আবার গাড়ীতে উঠে পশ্চিম দিকে চোল্লেম।

সন্ধ্যার সময় গাড়ী চৌবেমুণ্ডিতে পৌঁছিল। চৌবেমুণ্ডি গ্রামখানি ছোট। খোলার আর খড়ের ঘরই বেশী। কেবল হিন্দুস্থানীর বাস। বাঙালীর নামমাত্রও শুনলেম না। চৌবেমুণ্ডিতে ডাকের ঘোড়া থাকে। এখানে আস্তাবল আছে। গাড়ী থাম্‌তেই দুজন সইস দুটি বড় বড় ঘোড়া এনে উপস্থিত কোল্লে। গাড়ীর ঘোড়া দুটি পরিবর্ত্তন কোরে নূতন ঘোড়া দুটি জুড়ে দিলে। সিপাহী গাড়োয়ানও বদলী হলো। একটি হিন্দুস্থানী বাবু ডাকের খোলেগুলি গুণে একটা কাগজ নূতন সিপাহীদের হাতে দিলেন। বাবুটি বড় ভদ্র। আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কোল্লেন,—শিষ্টাচার দেখালেন, সময় হলে—গাড়ী ছাড়্‌বার হুকুম দিয়ে—আমাদের সেলাম কোরে চোলে গেলেন!

মাষ্টারবাবু অনেকক্ষণ ধোরে হিন্দুস্থানী বাবুটির সঙ্গে কথা কইলেন। চমৎকার অভ্যাস! হিন্দুস্থানী বাবু কিছুতেই বুঝতে পাল্লেন না যে, মাষ্টার-বাবু সাজা-হিন্দুস্থানী, আর আমি ত হাবাবোবা, কথা কইবার ক্ষমতা নাই, কাজেই কেহ জানতে পাল্লে না। বাঙালী আমি—এখন ভেকধারী হিন্দুস্থানী বালক।

গাড়ী দ্রুতবেগে চোলেছে; রাত প্রায় ৮টা। মাষ্টারবাবুর কাছে ঘড়ী আছে, ঘড়ী খুলে মাষ্টারবাবুই বোল্লেন, "রাত ৮টা"। মাষ্টারবাবু সিপাহীদের জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "রাস্তা ভাল ত?—কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই ত? গুণ্ডা যণ্ডা নাই ত?" সিপাহীরা একবাক্যে উত্তর কোল্লে, "না সাহেব! কোন ভয় নাই।" মাষ্টারবাবু নিরস্ত হলেন, গাড়ী সেই সমভাবেই চোলেছে।

সাম্‌নে—গাড়ী হতে দেখলেম, রাস্তার পাশে, প্রায় এক পোয়া আন্দাজ দূরে একটি বন। বনটি তেমন ভয়ানক নয়। বড় বড় গাছ, কি বড় বড়

বনজন্তু নাই, এই রকম বোধ হলো। বনটির শোভা কিন্তু বেশ! চারিদিকে খোলা মাঠ, সেই মাঠের মধ্যে এমন একটি ছোট বন, দেখতে বেশ! আমরা দেখতে দেখতে যাচ্চি, সামনে—যেন সেই বনের মধ্যেই বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। সিপাহীরা পরস্পর সন্দেহ কোল্লে, আবার তখনি হেসে উড়িয়ে দিলে। গাড়ীর গতি বন্ধ হলো না।

বনের নিকটে যেতেই ৪।৫টি আওয়াজ এক সঙ্গে হলো। একটা গুলি দক্ষিণ দিকের ঘোড়ার পায়ে গুরুতর আঘাত কোল্লে। একটা গুলি একজন সিপাহীর লাল পাগড়ী উড়িয়ে নিয়ে গেল। সিপাহী পাগড়ীহীন মাথায় হাত বুলিয়ে মহা ভীত হলো, গড়াতে গড়াতে গাড়ীর পেছুন দিক দিয়ে নেমে—চীৎপাৎ হয়ে পড়ে—আবার ঝেড়ে উঠে ভোঁ দৌড়! মহা হৈ হৈ ব্যাপার! গাড়ী থাম্‌লো। চারদিকে একটা চীৎকার পড়ে গেল। সিপাহীরা তলোয়ার খুলে মহা হাঁকাহাঁকি আরম্ভ কোল্লে। চারদিকে অনুসন্ধান হলো, সব ফাঁকি! এ সব তবে কি?

আবার গাড়ী চল্লো। একটু যেতে না যেতেই আবার শব্দ!—আবার এক কালে ৪।৫টি শব্দ! এবার আর নিশ্চিন্ত থাকা নয়। বাবু নীচে নেমে চীৎকার কোরে বোল্লেন, "তোমরা কর কি? বনের মধ্যে ডাকাত! ডাক মারা যায়! কি সর্ব্বনাশ! নবাবের ডাক,—সরকারী ডাক, তোমরা এখনো বোসে আছ? আমিও সরকারী লোক, আমার সাম্‌নে ডাক মারা যায়? যাও, মশাল নিয়ে বনের মধ্যে অনুসন্ধান কর। গাড়োয়ান থাক, আমি আছি, ডাকের থোলে আমি রাখছি। ভয় কি তোমাদের? যাও, এখনি যাও। বেশী বিলম্ব হলেই ডাক মারা যাবে।" মাষ্টারবাবু অতি ব্যগ্রভাবে এই কথাগুলি বোল্লেন। সিপাহীরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে বনের মধ্যে প্রাণটি হাতে কোরে প্রবেশ কোল্লে।

চমৎকার ডাকাতি! গাছের আড়ালে ডাকাতেরা গা ঢাকা হয়েছিল, পেছুনদিক হতে তিন জন সিপাহীকেই বেঁধে ফেল্লে। একেবারে পিছ্‌মোড়া বাঁধন!

সিপাহীদের হাত পা বেঁধে—তিনজনকে এক যায়গায় রেখে—ডাকাতেরা আমাদের গাড়ীর সামনে এলো। আমরা এই অবসরে অনায়াসেই পলাতে পাত্তেম। কেবল সিপাহীদের জন্যে বাবুর কথামত গাড়োয়ান গাড়ী চালাতে পাল্লে না। ডাকাতরা একেবারে আমাদের সাম্‌নে এসে পোড়লো। বাবু

বন্দুক ছুড়্লেন, ডাকাতদের কেশাগ্রও নষ্ট হলো না। গাড়োয়ান ভয়ে জড় সড় হয়ে আম্‌তা আম্‌তা কোরে আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ কোত্তে লাগলো। বাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক সওয়াল জবাব কোল্লেন। বাবুর সঙ্গে সওয়াল জবাব হোচ্চে, এমন সময় গাড়োয়ান গাড়ী হতে নেমে ভোঁ দৌড়! অনেক দূর গেছে, এমন সময় ডাকাতদের সেই দিকে দৃষ্টি পোড়্লো, ৭।৮ জন ডাকাত বাঘের মত লাফিয়ে তার অনুসরণ কোল্লে। দুজন যমদূতের মত ডাকাত আমাদের গাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো।

এদিকে সিপাহীরাও কৌশলে বাঁধন খুলে গুটি গুটি বনের পাশ দিয়ে ছুট দিলে। বাবু ডাকাতদের প্রতি ধমক দিয়ে বোল্লেন, "ঐ উল্লুক! হাঁ কোরে কি দেখছিস্? ঐ দেখ, সিপাহী পলায়।" ধমক খেয়ে ডাকাতদের যেন ভ্যাবাচাকা লেগে গেল। ফ্যালফ্যাল কোরে চেয়ে রইল। মাষ্টারবাবু আবার পলাতক সিপাহীদের দেখিয়া বোল্লেন, "ঐ দেখ্, ধর্ ধর্।" ডাকাতেরা সিপাহী ধোরতে সেইদিকে ছুটলো। বাবুর পকেটে ছুরি ছিল, ছুরি দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা থোলে কেটে ফেল্লেন। ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়ে এক তাড়া-গালা-মোহর-করা হল্‌দে কাগজ-আঁটা চিটি বার কোরে ভিতরের জামার পকেটে রাখ্‌লেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কাজটি শেষ কোরে সুচতুর মাষ্টারবাবু আবার আগেকার মত স্থির হয়ে বোস্‌লেন। আমি ত অবাক!

ডাকাতেরা গাড়োয়ানকে ধোরে বেঁধে এনে উপস্থিত কোল্লে। এদিকে সিপাহী তিনজনও ধৃত হয়ে গাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হলো। ডাকাতেরা এখন সকলে মিলে আমাদের উপর হাঁকডাক আরম্ভ কোল্লে। একজন একটা বন্দুকে বাবুর মাথা লক্ষ্য কোরে বোল্লে, "থোলে ছাড়, নইলে এখনি কাজ ফর্সা কোরে দেব।" বাবু টাকা বোঝাই একটা থোলে ডাকাতদের সাম্‌নে ঝম্ কোরে ফেলে দিলেন। ডাকাতেরা থোলে পেয়ে আনন্দিত হলো। সকলে ইসারা ইঙ্গিতে কি সঙ্কেত কোরে থোলে নিয়ে দৌড় দিলে! দেখতে দেখতে ডাকাতী-পর্ব্ব সমাধা হলো।

বাবু গাড়ী হতে নেমে সিপাহীদের বাঁধন খুলে দিলেন। অনেক ভর্ৎসনা কোল্লেন। তাদের কতই ভয় দেখালেন। সিপাহীরা অবশিষ্ট থোলেগুলি তাড়াতাড়ি একত্র কোরে আগের মত বোস্‌লো, আবার গাড়ী চোললো। গাড়ী চোল্‌লো, কিন্তু তেমন বেগে আর চোলতে পাল্লে না। একটা ঘোড়া

খোঁড়া' হয়ে গেছে কি না, তাই গাড়ী খুব ধীরে ধীরেই চল্লো। বাবুর মুখে হাসি ধরে না।

নিকটেই লোকালয়। বাবু বোল্লেন, "এইখানে আজ আমরা থাকবো! আর রাত্রে যাব না। এখানে আজ থেকে—কাল সকালে যাব।" সিপাহীরা বাবুকে ছাড়তে অস্বীকার কোল্লে। তারা কাঁদ কাঁদ হয়ে বোল্লে, "আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। সব কথা আপনি খুলে বোল্লে আমরা অব্যাহতি পাব। আমাদের কথায় কেহ বিশ্বাস কোর্ব্বে না। এই কাণ্ডতেই আমাদের একেবারে জেলে যেতে হবে।"

বাবু আশ্বাস দিয়ে বোল্লেন, "কোন চিন্তা নাই। উজীরসাহেবের সঙ্গে কালই আমি দেখা কর্ব্বো। কোন ভয় নাই তোমাদের। যখন আমি স্বয়ং গাড়ীতে ছিলেন, তখন তোমাদের কোন দোষ আইনে গ্রাহ্য হবে না। বরং এই চিঠিখানি উজীর সাহেবকে দিও, তা হলেই তোমরা খালাস পাবে। অন্যান্য কথা কাল আমি স্বয়ং তাঁর কাছে বোল্‌বো। তোমাদের কোন ভয় নাই।" এই বোলে মাষ্টারবাবু ব্যাগ হতে কাগজ কলম বার কোরে একখানা পত্র লিখে দিলেন। সিপাহীরা পত্রখানি পাগড়ীর কোণে শক্ত কোরে বেঁধে গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমরা সেই লোকালয়ে প্রবেশ কোল্লেম।

এখানিও ছোট গ্রাম। এখানিতেও কেবল হিন্দুস্থানীর বাস। আমরা সেই হিন্দুস্থানী পল্লীতে প্রবেশ কোল্লেম। বাবু একখানি ছোট খড়ের ঘরের সাম্‌নে গিয়ে "রামদিন! রামদিন!"—বোলে ডাকতে লাগলেন। অনেক ডাকাডাকির পর ঘরের মধ্যে হতে কে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "বড় বাবু?" বাবু উত্তর কোল্লেন, "হাঁ।" বাবুর সাড়া পেয়ে রামদিন তাড়াতাড়ি চোক মুছতে মুছতে দরজা খুলে দিলে।—আলো জ্বাল্‌লে।—আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। বাবু রামদিনকে কি ইঙ্গিত কোল্লেন, সে কাল বিলম্ব না কোরে তখনি প্রস্থান কোল্লে।

ঘরখানি, ছোট কিন্তু বেশ পরিষ্কার। একদিকে একখানি ছোট তক্তাপোষ। তাতে গদি ও পরিষ্কার চাদর পাতা। চারধারে চারিটি বালিশ। নীচের সমস্ত মেঝে পাটীপাতা, ঢালাও বিছানা। দেওয়ালের গায়ে ৪।৫ খানা পুরাতন ছবি। এক পাশে একটি কাপড় রাখার আল্‌না, একখানি বেঞ্চের উপর ঘেরাটপ-ঘেরা একটি কাঠের হাতবাক্স, আর একটি রথের মত চূড়ো তোলা কাপড় রাখা বাক্স। তক্তাপোষের পাশে—জানলায় একটী

আলবোলা, বৈটকের উপর দুটি হুকা, সাদা, কাল, ছিপি খোলা, ছিপি আঁটা ৭।৮ টি বোতল, দুটি কাচের গেলাস! একধারে কয়েকখানা পিতল কাঁসার বাসন।

বাবু নিজে কাপড় ছাড়লেন। আবার যে বাঙালী সেই বাঙালী হলেন। আমাকে আর কাপড় ছাড়তে বোল্লেন না, তবে এখন কথা কইতে অনুমতি পেলেম। পুরুষের পোষাক পোরে, জরি-বসানো জুতা পায় দিয়ে—গায়ে চাপকান এঁটে আমার ভয়ানক কষ্ট হোচ্চে। কিন্তু কি করি, অনুমতি না পেলে ত সে সব ছাড়া যায় না?

আমি নীচের ঢালা বিছানায় বোস্‌লেম। বাবু কাপড় ছেড়ে হাতে মুখে জল দিয়ে তামাক সেজে বারান্দার কেদারায় বোস্‌লেন। আমাকে বোল্লেন, "পাশেই জল আছে, হাতে মুখে জল দাও, একটু বিশ্রাম কর।" আমি হাতে মুখে জল দিয়ে আবার এসে সেই ফরাসের উপর বোস্‌লেম।

রামদিন ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। মনে বড় কৌতূহল হলো। তাড়াতাড়ি রামদিনের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। চেহারা দেখে মনে বড় ভয় হলো।

রামদিনের চেহারা ভয়ানক। এমন ভয়ানক চেহারা দেখে কার না ভয় হয়? রামদিনের রং কাল নিস্, দেহ যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। দেড় হাত বুকের ছাতি, চোক দুটি যেন কুমোরের চাক, লাল বড় বড় চোক সর্ব্বদাই যেন ঘুরছে! মোচা গোঁপ চাড়া দেওয়া, চাপ দাড়ি। মাথায় বড় বড় বাব্‌রী চুল, গলায় মুণ্ডমালার মত তিনটি সোণার ভাটা-গাঁথা-মালা। সমস্ত শরীর যেন গেঁটে গেঁটে। দুই হাতে রূপার তাগা। গেরুয়া রঙের কাপড় মাল-কোঁচা-মারা। চেহারাটা এত ভয়ানক যে, দেখ্‌লে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। চাউনিতে যেন বিষমাখা। যার দিকে চায়, সেই যেন শুকিয়ে যায়। কটমটে চাউনিতে বারম্বার আমার দিকে চেয়ে,—রামদিন আমার সাম্‌নে একটা পিতলের ঘটিতে কতকটা দুধ রাখ্‌লে। মাষ্টারবাবু বারান্দা হতে বোল্লেন, "সমস্ত রাত আহার হয় নাই। দুধটুকু সমস্ত খাও! বিছানা আছে, একটু ঘুমাও।" বড় ক্ষুধা পেয়েছিল, রামদিন বেরিয়ে গেলেই দুধটুকু পান কোল্লেম, শরীর শীতল হলো। বড় ঘুম পেয়েছিল, মাষ্টার বাবুর অপেক্ষা না রেখে তক্তাপোষে শয়ন কোল্লেম। তখনি নিদ্রাকর্ষণ হলো। রাত বড় অধিক ছিল না, এক ঘুমেই রাত্রি প্রভাত!

সকালে উঠ্‌তেই গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা মনে পোড়লো। যাঁদের প্রতাপে বঙ্গদেশ স্তম্ভিত,—মুসলমানী শাসনের চালচলোন এখনো সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন না হলেও যাঁদের অল্পদিনের সুশাসনে এদেশ অরাজকতা হতে অনেকাংশে পরিত্রাণ পেয়েছে, যে সমস্ত কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারীরা মোটা মোটা বেতনে লম্বোদর পূর্ণ কোচ্চেন, তাঁদের এত শক্তাশক্তি নিয়মেও কাল যে কাণ্ড ঘটে গেলো—এত পাহারা—এত সাবধান—এমন সুবন্দোবস্ত থাকতেও কাল যে ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হলো, তা চিন্তা কোত্তেও ভয় হয়। যে সমস্ত বদ্‌মায়েসের দল দেশের এইরূপ সর্ব্বনাশ কোচ্চে,—যে সকল ফন্দিবাজ লোকেরা আশ্রিতের বুকের রক্ত পান কোরে জীবনধারণ কোচ্চে, যে সকল ফেরেব-ফন্দির তরজমাকারীগণ এইরূপ বিপদ বাধা অতিক্রম কোরে আপনার কার্য্যসিদ্ধি কোচ্চে, তারা প্রকৃতই সংসারের আবর্জ্জনা!—সংসারের শত্রু। তাদের দমন করা বড়ই বিষম কথা! কাল যে কাণ্ড হয়েছে, তারই প্রকৃত প্রবাদ—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

চতুর্থ চক্র।

বেবাক জাল!

তিন দিন আমরা এইখানেই আছি। সে রাত্রে গ্রামের নাম জান্‌তে পারি নাই, এখন জেনেছি, গ্রামের নাম বিরসীয়া। পশ্চিমদেশ, গ্রামের নামও পশ্চিমে। বিরসীয়া নামের অর্থ কি, বুঝতে পাল্লেম না। মানে যাই হোক, গ্রামের নাম কিন্তু বিরসীয়া। তিন দিন আমরা এই বিরসীয়াতেই আছি। একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ রসুই করে, রামদিন জিনিসপত্র এনে দিয়ে দেয়, আর আমরা খাই। আর কোন কাজ নাই। কেবল খাওয়া শোয়া, আর সেই অকূল চিন্তাসাগরে সাঁতার দেওয়া।

একদিন বৈকালে মাষ্টারবাবু বাঙালী-সাজে বেড়াতে বেরুলেন। আমি বাইরের দরজা বন্ধ কোরে ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে কত রকম ভাবনাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম!

কোথায় ছিলেম,—কোথায় এলেম,—আবার হয় ত কোথায় যেতে হবে। আমাতে এদের কি প্রয়োজন, কিছুই ঠিক কোত্তে পাচ্চি না। হৃদয়-সমুদ্রে চিন্তার জোয়ার-ভাটা যাতায়াত কোচ্চে। আপন মনে কেবলই ভাবচি। হটাৎ মাষ্টারবাবুর চাপকানের দিকে নজর পোড়লো। চেয়ে দেখ্‌লেম, সেই সব গোণমোহর-করা চিঠি। বড় কৌতুহল হলো। লেখাপড়া জানি। বাল্যকালে লেখাপড়া শিখেছি। যেরূপ লেখাপড়া জানি, তাতে চলিত ভাষায় পড়াশুনা চলে। সেই সাহসে ভর কোরে উঠ্‌লেম। মাষ্টারবাবু বেরিয়ে গেছেন, এখনি কিছু তিনি আস্‌বেন না। বাসাতেও আর কেহ নাই, চিঠিগুলি দেখ্‌বার এই বেশ সুযোগ। চাপকান হ'তে চিঠিগুলি বার কোল্লেম। দেখি, সব চিঠিই মাষ্টারবাবু পোড়েছেন। পোড়ে শুনে রেখে দিয়েছেন। আমি একে একে চিঠিগুলি খুল্লেম। সবগুলি পড়া হলো। চিঠির মধ্যে দুইখানি ইংরেজি, তিনখানি নাগরি, চারখানি ফারসি, আর পাঁচখানি বাংলা! প্রথম চিঠিখানি এই;—

বঃ শ্রীযুক্ত বাবু হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীযুক্ত লালা বদরীদাস সিংহ সাহেব—

মোঃ এলাহাবাদ।

মহাশয়দিগের হিসাবী ফর্দ্দ এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। হুণ্ডিতে সহি করিয়া অত্র সহ পাঠান গেলো। নম্বর বিমর্জ্জিম-হুণ্ডির বাবত বেবাক টাকা আমাদের আবশ্যক। এই চালান বিমর্জ্জিম কোম্পানীর ২৩ তেইশ হাজার টাকা এই ডিউ মাফিক জমা না দিলে এথাকার মালামাল কোরক শীল দ্বারা আদায় হইবে। সে কারণ লিখি, অত্র হুণ্ডি প্রাপ্তমাত্র টাকা চুকাইয়া দিবেন। গত আমদানীর নমুনা পাঠান গিয়াছে, পৌছান সংবাদ লিখেন নাই। যদি নমুনয়ে জিনিষ ওখানে খারাপ হয়, লিখিবেন। রঞ্জনলাল ও হরিশ সরকারকে এখানে না পাঠাইবার কারণ কি? এখানে আসিলে তাহাদিগের বাহাল্লী পরোয়ানা দিয়া পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত কর্ব্বো; তাহারা যে খারাবী করিয়াছে, তাহা আর আমদালে আনিষ না। এখানকার সমস্ত মঙ্গল জ্ঞাপন ইতি।

শ্রীযাদবচন্দ্র ক্ষেত্রী (হিন্দী সই।)

পত্রখানির মধ্যে ১০,০০০, দশ হাজার টাকার হুখানি হুণ্ডি। হুণ্ডি আমি চিনি না, নাম মাত্র শোনা ছিল। পত্রের অর্থ বুঝে নিলেম, এরই নাম হুণ্ডি। চিঠির পৃষ্ঠে আরও লেখা আছে,

হুণ্ডির নং ৬৪৭৬ বিঃ হিসাব ৫০০০৲ টাকা।

হুণ্ডির নং ৭৬৫২ বিঃ হিসাব ৫০০০৲ টাকা।

১০,০০০৲ মঃ দশ হাজার টাকা মাত্র।

দ্বিতীয় পত্রখানিতে লেখা আছে :—

প্রিয়তমে !

গোপনে তোমাকে পত্র লেখা বড়ই বিপদের কথা। আর কতদিন এরূপে কাটাইতে হইবে, তাহা ঈশ্বর জানেন। লোকগঞ্জনার ভয় করিলে সুখভোগ অদৃষ্টে ঘটে না। আমার ইচ্ছা তোমাকে কাছে রাখি। এখানে কোন কষ্ট নাই। বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিবে। সে-বারে তুমি মতও করিয়াছিলে, আবার মন ফিরিল কেন জানি না। যাহা হউক, আর পারিব না। কি কুক্ষণেই তোমার সহিত ভালবাসা, কি কুক্ষণেই এ প্রেম, সুখভোগ এ অদৃষ্টে ঘটিল না। হাসির কথা, তোমার স্বামী মহাশয় এখানে একজন খোট্টানীর প্রেমে মজিয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, "এবে বুড়া, তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে!" আমি বদলী হইয়া শীঘ্রই জব্বলপুর যাইব। এই সময় আসাই সুবিধা। এখানে আসিতে তোমার যে আপত্তি ছিল, তাহা আর রহিল না। এখান হইতে জব্বলপুর অনেক দূর, তোমার স্বামীর সহিত সাক্ষাতের ভয় নাই। যদি মত হয় লিখিও; সে সুযোগ করিব। আপাতত এই পত্রের উত্তর শীঘ্র দিও। শ্যামা আমাদের মূলাধার। মধ্যে মধ্যে তাহাকে কিছু কিছু দিতে ভুলিও না। আমি ভাল আছি। যে দুঃখ কেবল তোমার অদর্শন। ইতি—

তোমারই সেই—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা,

ইটোয়া।

কি ভয়ানক! এতদূর ব্যাপার? স্বামী বর্ত্তমানে এই কাণ্ড? চিঠিখানি পোড়ে গা কাঁপতে লাগলো। এরা কি মানুষ? পরের স্ত্রী, স্বামী

পর্য্যন্ত আছে, তাকে এই রকম ভোগা দিয়ে কুলের বার করার চেষ্টা। এদের মত পাষণ্ড আর দ্বিতীয় নাই। এদের স্বভাবচরিত্র মষ্টারবাবুর চেয়েও ভয়ানক!

তৃতীয় পত্রখানি আরও ভয়ানক! সেখানিতে আছে,—

মোঃ রাণীমহল্লা।

নমস্কারান্তে নিবেদনমিদং।

মহাশয়! সংবাদ শুব। যে জন্য আমাদিগকে মহাশয় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, দণ্ড-পুরস্কারের কর্ত্তা মহাশয়। বামাল সাকুল্যে মায় ইষ্টাট পত্র জোর আড়াই হাজার। মোক্তুবাবুকে একবারে মুলুকে চালান দিয়াছি। তাহার একগাছ চুলেরও কেহ সন্ধান পাইবেক না। এখানকার আড্ডাধারি বাবুর প্রণামি দুই শত দেওয়া হইয়াছে। তেঁহ আর তিন শত চাহেন। সুবিদা বুঝিলে তাঁহাকে কলা দেখাইব। এ টাকা আর দিতে হইবেক না। টাকা সহ সত্বরে পৌছিবো। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

সেবক শ্রীহযবরল ও শ্রীজড়দগব।

চতুর্থ পত্রখানি পাঠ কোরে বড়ই দুঃখিত হলেম। দুরাত্মা যদি এ পত্রখানি নষ্ট না কোত্ত, তা হলে আর কোন আক্ষেপই থাক্‌তো না।

চতুর্থ পত্রখানিতে লেখা ছিল;—

শ্রীচরণ কমলেষু—

তিনখানি পত্র লিখিলাম, উত্তর নাই। সেই জন্য রেজেষ্টারি করিয়া লিখিলাম। এবার বোধ হয় দয়া হইবে। আমার চাকরী নাই। শ্রীমতী জ্বরকাশে পীড়িত, হাতে একটী পয়সা নাই যে, চিকিৎসা করাই বা বাটী লইয়া যাই। তখনি আমি বলিয়াছিলাম, অল্প বেতনে বিদেশে পরিবার লইয়া যাওয়া বড়ই বিপদের কথা।, আপনি তখন জোর করিয়া পাঠাইলেন, এখন এই তার প্রতিফল। বাঁচিবার কোন আশা নাই। বিনা চিকিৎসাতেই মারা যাইবে। বেশী বিলম্বও নাই। আমি আজ যে বিপদে পতিত, এমন বিপদ লোকের হয় না। যদি দয়া হয়, তবে পত্রপাঠ ভায়াকে টাকা সহ পাঠাইবেন, অভাবে টাকা কুয়েকটি ডাকে পাঠাইবেন। যদি না দেন, ৺ আছেন। যদি মরিয়া যায়,—তবে জানিবেন, আমার সহিত আপনার সম্বন্ধও এই পর্য্যন্ত ইতি—

সেবক শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ।

পত্রখানি পাট কোরে বড় কষ্ট হলো। কি করি, উপায় নাই। যদি ক্ষমতা থাক্‌তো, তখনি চিঠিখানি আবার ডাকে পাঠাতেম। আমাকে পরাধীন কোরে বিধাতা সংসারে পাঠিয়েছেন। কেবল দুঃখ-কষ্টই সার হলো। আর একখানি পত্র অবশিষ্ট আছে। সেখানি হলেই হয়। সে-খানিতে তেমন গুরুতর কথা কিছু নাই। সামান্য কথা লেখা আছে ;—

শ্রীযুক্ত শ্বশুর মহাশয়—

প্রণাম শতকোটী নিবেদনঞ্চ বিশেষ।

আমার এই শেষ পত্র। আপনি পরিবার লইয়া আজ ৭।৮ বৎসর পশ্চিমে আছেন। আমার পরিবার বয়স্থা হইয়াছে। তাহারও নিতান্ত বাসনা যে এখানে আইসে। আপনি বারম্বার আপত্তি করিতেছেন। আর আপত্তি শুনিতে গেলে চলে না। আগামী ২৭শে তারিখে ভাল দিন আছে। সেই দিন প্রাণাধিক সুরেশচন্দ্রকে পাঠাইব। অবশ্য অবশ্য পাঠাইবেন। যদি না পাঠান, তবে এই আমার শেষ। নিবেদন ইতি—

প্রণত শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্ত্তী।

বর্দ্ধমান।

পত্রগুলি পাঠ শেষ কোরে—সে-গুলি যথাস্থানে রেখে আবার শুলেম। যেমন ছিল, যে চিঠিখানি যেদিকে যেভাবে ছিল, ঠিক, সেই ভাবেই রাখ্‌লেম।

কেবল চিঠি কখানি রেখে এসে শুয়েছি, এমন সময় মাষ্টারবাবু দরজায় ঘা দিলেন। আর একটু বিলম্ব হলেই সর্ব্বনাশ হতো! বিধাতা এ যাত্রা রক্ষা কোল্লেন। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুল্লেম। মাষ্টারবাবু একাকী নন, আর দুজন লোক সঙ্গে কোরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। খাতির কোরে বসালেন, রামদিনকে তামাক দিতে বোল্লেন, খাতির যত্নের ধূম পোড়ে গেল।

আগন্তুক দুটির একটি বাঙালী, আর একটি হিন্দুস্থানী। বাঙালীটি বাবু নন! পায়ে নাগরা জুতা, গায়ে দেশী পিরিহাণ, পরণে কালাধারী সাদাধুতি, মাথায় একটি আধ হাত-লম্বা চৈতন। লম্বা নাকে রসকলি, দাঁতগুলি লম্বা লম্বা, চোক বড়—পাতা ফুলো, গোঁপ দাড়ী কামানো, রং মেটে মেটে, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

হিন্দুস্থানীটিও তেমন বড় লোক নন। তাঁহার পায়েও নাগরা, গায়ে বুকবন্ধ মেজরাই, মাথায় লাল কাপড়ে সাদাকাল বুটি দেওয়া পাগড়ী। বয়স তেমন বেশী নয়, আন্দাজ পঁচিশ। রংটি ফিট গৌরবর্ণ, মুখখানি লম্বা, কাণে সোণার বীরবৌলী। চোক, কাণ, বেশ মানান-সই। সামান্য একটু লম্বা।

মাষ্টারবাবু খাতির যত্ন কোরে বসিয়ে—পান তামাক দিয়ে শেষে সেই চিঠির তাড়া বার কোল্লেন। আমি বিছানার একপাশে গিয়ে নীরবে শুয়ে রইলেম। লোক দুটি আড়ে আড়ে আমার দিকে চাইতে লাগলো।

বাবু চিঠিগুলি বার কোরে সেই হুণ্ডির চিঠিখানি বার কোল্লেন। চিঠিখানি বাঙালী বাবুর হাতে দিয়ে বোল্লেন, "এই দেখুন গোবিন্দবাবু! ঠিক এই রকম হওয়া চাই। অবিকল এই রকম দরকার। একটু এদিক ওদিক হলে হবে না। লেখা, কালি, কলম, সবই এই রকম হবে। দেখুন বেশ বুঝে দেখুন, হবে কি না। বরং আগে আলাদা কাগজে একবার লিখে দেখুন।" এই বোলে বাবু ব্যাগ হতে এক ফর্দ্দ সাদা কাগজ দিলেন। বাঙালী বাবু কাপড়ের মধ্য হতে একটি ছোট বাক্স বার কোল্লেন। বাক্সের মধ্যে সারি সারি ছোট ছোট দোয়াত সাজান। এক পাশে ছোট বড় কতকগুলি কলম, দুখানি ছুরি। বাঙালীবাবু লেখাটি অনেকক্ষণ ধোরে দেখে, চসমা নাকে দিয়ে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, চিঠিখানি একবার নিকটে, চোখের সামনে এনে, আবার দূরে নিয়ে গিয়ে ভাল কোরে দেখলেন। শেষে বেছে বেছে সেই কলমের রাশ হতে একটি কলম বার কোরে একটি দোয়াত হতে কালি তুলে একবার লিখে দেখঁলেন। আবার সে কলমটি রেখে আর একটি নূতন কলম নিলেন। এই রকম কালি বদল কোরে—কলম বদল কোরে শেষে—মনের মত অতি ধীরে ধীরে মাষ্টারবাবুর দেওয়া সেই কাগজে কি লিখলেন, কতকটা লেখা হলে বাবুকে দেখতে দিলেন। বাবু এতক্ষণ হিন্দুস্থানীটির সঙ্গে কি বিষয়ে চুপি চুপি পরামর্শ কচ্ছিলেন। অতি গোপনে পরামর্শ আমি শুনতে পেলেম না।

বাবু পরামর্শ বন্ধ কোরে কাগজখানি হাতে নিয়ে বেশ কোরে দেখে আগের খানির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বোল্লেন, "ঠিক হয়েছে! চমৎকার! অবিকল হয়েছে। চমৎকার হাত আপনার! লিখুন,—ধোরে ধোরে একটু যত্ন করে লিখুন, বেশ হবে।" গোবিন্দবাবু কোন উত্তর কোল্লেন

না। বাবুর প্রশংসায় কেবল একটু হাসলেন মাত্র। হুণ্ডির চিঠিখানি নিয়ে তারই নীচে গোবিন্দ বাবু লিখ্‌তে লাগ্‌লেন। বাবু বোলে দিতে লাগ্‌লেন,—

"পুঃ—পত্র ডাকে রওনা করিলে বিলম্ব হইবার আশঙ্কায় এখানকার প্রধান কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত নবকুমার ঘোষজাকে পাঠান যায়। পত্রপাঠ মাত্র ইহাকে বেবাক টাকা বুঝ সমুঝ করিয়া দিয়া রসিদ লইবেন। এ লোক বড় বিশ্বাসী। টাকা দিতে সন্দেহ না হয়। বিশেষ তাগীদ জানিবেন।" এইটুকু লেখান শেষ হলে—বাবু একবার সহাস্য বদনে দেখে—চিঠিখানি বাক্সের মধ্যে রেখে গোবিন্দবাবুকে কটী টাকা দিলেন। বোল্লেন, "এই আপাতত খরচ করুন। যদি সুবিধা হয়, অবশ্যই সে রকম বিবেচনা কর্ব্বো। একদিনের কাজ ত নয়। আপনার দোরে যেতেই ত হবে।" গোবিন্দবাবুও হাস্যমুখে টাকা কটি নিয়ে বোল্লেন, "আপনাদেরই ত আমি প্রতিপাল্য, গরীবকে মনে রাখবেন, তা হলেই আমার যথেষ্ট। তবে বিদায় হই,—নমস্কার।" মাষ্টারবাবু প্রতি নমস্কার কোরে উঠে দাঁড়ালেন। গোবিন্দবাবু চোলে গেলেন।

হিন্দুস্থানীটির সঙ্গে অনেক কথা হলো। হিন্দি চিঠিগুলি তার হাতে দিয়ে কি কি বোলে দিলেন, ভাল বোঝা গেল না। রাত্র ৯টা বাজতেই সে চলে গেল, আমাদেরও খাবার প্রস্তুত, আহার কোরে আপন আপন বিছানায় নিদ্রা গেলেন।

আমি ঘরের মধ্যেই শুই। বাবু বারান্দার খাটিয়ায় শয়ন করেন। রামদিনও বাইরে থাকে। ঘরের মধ্যে আমি ঘুমুলে বাইরের দরজায় চাবি পড়ে। মাষ্টারবাবুর এই ভয়,—পাছে আমি পলাই।

প্রাতেই নিদ্রা ভঙ্গ হলো। মাষ্টারবাবুর তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নিতে বোল্লেন। দরজায় একখানি গাড়ী দেখে বুঝলেম, আজ এখান হতে অন্য কোথাও যেতে হবে। আমার আর ভাবনা কি?—যখন আমার স্বাধীনতা নাই, তখন এরা যেখানে নিয়ে যাবে, আমাকে সেইখানেই ত যেতে হবে। তবে আর নূতন ভাবনা কি? আমি আজ্ঞামাত্র প্রস্তুত হলেম। এবারেও আমার সেই পূর্ব্ব বেশ। সেই পায়জামা,—সেই চাপকান, সেই মোটা রুমাল। মাষ্টারবাবু আর বেশ পরিবর্ত্তন কোল্লেন না। তিনি যে বাঙালী বাবু, এখনো সেই বাঙালীবাবু!

আমরা গাড়ীতে উঠলেম। বাবু এবার আর ব্যাগ নিলেন না। সামান্য একটি গলায় ঝুলান ছোট ব্যাগ মাত্র নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী দ্রুতবেগে চল্লো।

প্রাতেই গাড়ী ছাড়া হলো। বেলা যখন প্রায় ১২টা, তখন আমরা মকদুমপুরে পৌঁছিলেম। মাঝে একবার গাড়ী বদল হয়েছিল। মকদুমপুর বেশ স্থান। অনেক বড় লোকের বাস।—দিব্যি সহর! প্রায় সবই পাওয়া যায়। এখানে আবার গাড়ী বদল কোত্তে হলো। সামান্য রকম জলযোগ কোরে আমরা আবার পৃথক্ গাড়ীতে রওনা হলেম! মকদুমপুর হতে খাবার কিনে নিয়েছিলেম, রাত্রে তাই খাওয়া হলো। রাত্ত ৮টা কি ৯টার সময় আবার গাড়ী বদল হলো। সমস্ত রাত্রের মধ্যে আর কোনখানে থাম্‌লো না। সমস্ত রাত চোলে বেলা ৬টার সময় আমরা জামুঘাটে পৌছিলেম। এই ঘাটের অপর পারেই এলাহাবাদ।

এ ঘাট গঙ্গার ঘাট। উত্তরবাহিনী গঙ্গার সঙ্গে প্রয়াগতীর্থের নীচে যমুনা একত্রে মিলিত হয়েছেন। এই গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের জন্যই প্রয়াগ-তীর্থের এত মাহাত্ম্য। জামুঘাটটি ছোট-ঘাট। আরও অনেক বড় বড় বাঁধা ঘাট আছে। এটি সে সকলের ছোট। আমাদের নিকট হলো বোলে অগত্যা এই ঘাটেই আমরা পার হলেম। ওপারেই গাড়ী ছিল, হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও লালা বদরীদাস সিঙের নাম কোর্ত্তেই গাড়োয়ানেরা সযত্নে গাড়ীতে স্থান দিলে। ভাড়া নিয়ে কোন গোল হলো না। বেলা ৯টার সময় আমরা যথাস্থানে এসে পৌছিলেম।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বদরী সিং এখানকার প্রধান সওদাগর। অগাধ টাকা, অসীম ক্ষমতা,—বিশেষ মানসম্ভ্রম আছে। প্রকাণ্ড বাড়ী। লোকজন, চাকর বেহারা বিস্তর। উপরে আপিস। মাষ্টারবাবুর ধাঁ কোরে উপরে উঠে গেলেন! আমিও পেছু পেছু উপরে উঠলেম। মাষ্টার বাবু পরিচয় বোল্লেন, তিনিই যাদবচন্দ্র ক্ষেত্রীর প্রধান কর্ম্মচারী, নাম নবকুমার ঘোষ। এই সমস্ত পরিচয়ে সুচতুর মাষ্টারবাবু পরিচিত হলেন। তখনি খাতির যত্নের ধুম পোড়ে গেল। এদিকে তামাক এল, ওদিকে স্নানের আয়োজন হলো, সে দিকে আহারের বন্দোবস্ত হলো।—ধুম ব্যাপার। অপিসে একটা বিষম সাড়া পোড়ে গেল,—তাগাদা এসেছে।

মাষ্টারবাবু আহার কোর্ল্লেন না,—স্নান কোর্ল্লেন না,—জলবিন্দুমাত্র

পান কোর্ব্বেন না,—টাকা পেলেই রওনা হবেন। টাকার বিশেষ প্রয়োজন। সময় মত টাকা আদায় না পেলে মান সম্ভ্রম সব নষ্ট হবে। টাকা এখনি চাই। এই কথাই বারম্বার বোল্‌তে লাগলেন। টাকা আদায়ের জোর তাগাদা আরম্ভ কোল্লেন।

সকলেই একবাক্যে বোল্লেন, "তাও কি হয়' মহাশয়! এই এত পরিশ্রম কোরে এলেন,—তিন চার দিন অনাহার,—আহার করুন, একটু বিশ্রাম করুন,—দেখুন শুনুন, কাল যাবেন। টাকারও কিছু অভাব আছে, সেটাও এর মধ্যে যোগাড় হয়ে আস্‌বে। স্নান করুন। বেলা হয়েছে,—তৃষ্ণা পেয়েছে,—সমস্ত আয়োজন ঠিক, স্নান করুন।" মাষ্টারবাবু সে কথা গ্রাহ্যই কোচ্চেন না। টাকা না হলে মান যাবে,—সমস্ত বিষয় নিলামে উঠ্‌বে, এত পসার সব মাটি হবে,—এই কথাই কেবল বোল্‌চেন। শেষে মত হলো, রাত্রেই রওনা হবেন। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত টাকার যোগাড় চাই।

অগত্যা হরিশবাবু এই কথাতেই মত কল্লেন। এদিকে যেমন আমাদের স্নান আহারের আয়োজন হলো, ওদিকেও তেমনি সরকারেরা তাগাদায় বেরুলো। চারিদিকেই টাকার তাগাদা। সকলের মুখেই শুনি, টাকা! টাকা!—টাকা!

মাষ্টারবাবুর পরামর্শে আমার আজ স্নান করা হলো না। গা জ্বল্‌চে, সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ কোচ্চে,—নাইতে পেলে শরীর শীতল হয়, কিন্তু ইচ্ছা থাকতেও আজ আমার স্নান বন্ধ। আর একটি কথা,—এখানেও আমি হাবা বোবা। হরিশবাবু আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লেন।—আমি উত্তর কোল্লেম না। মাষ্টারবাবু পরিচয় দিলেন, "ইনি ক্ষেত্রী মহাশয়ের জ্ঞাতি ভাই। আমাকে বড় ভালবাসেন, বিশেষ স্নেহ আছে, তাই ভাল-বাসার খাতিরে এতদূর কষ্ট স্বীকার কোরে এসেছেন। নাম এঁর তিলক রাম। বড় ভালমানুষ,—বড় দয়া,—কিন্তু হলে কি হবে, বিধাতা মেরেছেন। কথা কইবার শক্তিটি অনেক দিন হতেই নষ্ট হয়ে গেছে। বেশ শুন্‌তে পান; বেশ লেখাপড়া বোধ আছে, ১২।১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বেশ ছিলেন,—কোনই রোগ বালাই ছিল না, তার পরে একটা কঠিন ব্যাধি এসে জুটে—এই সর্ব্বনাশটি কোরে গেল! তা আর হবে কি? সবই ঈশ্বরের হাত!—মানুষের ত কোন সাধ্য নাই!"

পরিচয় পেয়ে আমার আরও খাতির বাড়্‌লো। আদর-যত্নের সীমা নাই। যথাসময়ে রান্না হলো। আমরা আহার কোল্লেম। আগে বড় লজ্জা কোত্তো, কিন্তু কেমন যে স্বভাব; এই কদিনেই বেশ সহ্য হয়ে গেছে। পুরুষমানুষ দেখে আগে যেমন ভয় পেতেম,—সাম্‌নে যেতে লজ্জা বোধ হতো, এখন আর ততটা লজ্জা হয় না। মাষ্টারবাবু আমি একত্রেই আহার কোল্লেম। পৃথক ঘরে শয়ন কল্লেম।

উপর্যুপরি দুদিন পরিশ্রমে শরীর বড় ক্লান্ত ছিল, শুতে মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি। এতক্ষণ কোথা দিয়ে চোলে গেছে, কিছুই জান্‌তে পারি নাই। ঘুম ভেঙে দেখি, বেলা আর নাই। তাড়াতাড়ি উঠে বোস্‌লেম। হাত মুখ ধুয়ে বোসে আছি, এমন সময় একজন চাকর একখানি থালায় একথালা খাবার এনে আমার সম্মুখে উপস্থিত কোল্লে। হিন্দিতে বোল্লে, "বাবু জল খেয়েছেন, এ সব কেবল আপনার জন্যই আছে।" আমি ইঙ্গিতে সম্মতি জানালে সে প্রস্থান কোল্লে। আমি যা পাল্লেম, তাই জলযোগ কোল্লেম। খাচ্চি, এমন সময় মাষ্টারবাবু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন, "ভাল কোরে খাও, এখনি রওনা হতে হবে—সমস্ত রাত আর কিছু খেতে পাবে না। যা পার, বেশ কোরে খাও।" আমি এই কথা শুনে আরও কিছু কিছু খেলেম। খেতেই সন্ধ্যা হলো।

আপিস ঘরে বাতি জ্বালা হলো! আপিস ঘরে গিয়ে বোস্‌লেম। মাষ্টারবাবু হুণ্ডি দুখানি হরিশবাবুর হাতে দিলেন। তিনি সে দুখানি বেশ করে এপিট ওপিট দেখে, নোটে টাকায় দশহাজার গণে দিলেন। তখনি টাকা তোড়াবন্দি হলো, শীল করা হলো। হরিশবাবু টাকাগুলি মিলিয়ে নিতে বল্লেন। মাষ্টারবাবু ভদ্রতা জানিয়ে বল্লেন, "আপনি যখন আপন হাতে গণে দিলেন, তখন আমারই গণে নেওয়া হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমাদের ত নূতন কারবার নয়, ভয় কি?" হরিশবাবুও যথেষ্ট শিষ্টাচার দেখালেন। রাত্রে যেতে কষ্ট হবে,—দিনে কিছু আহার হয় নাই, বিশ্রাম হয় নাই,—এসব কথায় অনেক খাতির জানালেন। মাষ্টারবাবুরও তার উত্তরে বল্লেন, "কি কর্ব্বো, দিন সংক্ষেপ। বরং আর একবার এসে, আপনাদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কোর্ব্বো।" আমার সম্বন্ধেও অনেক কথা হলো। মাষ্টারবাবু সে কথাও বেশ ভদ্রতার সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন।

একবার মনে হলো, সব কথা প্রকাশ করি। আপনার প্রাণ বাঁচাই, জুয়াচোরের শাস্তি দি; কিন্তু এই ব্যাপরটা কতদুর গড়ায়, তাই দেখবার জন্য মন তখন বড় কৌতুহলী হয়েছে। ঈশ্বর যা করেন তাই হবে, ভেবে মনের এ প্রবৃত্তি দমন কল্লেম।

একজন একখানি গাড়ী ডেকে দিল। আমরা দুজনেই সেই গাড়ীতে উঠে ষ্টেশনের দিকে চল্লেম। যাবার সময়ে কেবল মনে হতে লাগলো, আজকের এই কাণ্ডের বেবাকই জাল! আমি জাল।—মাষ্টারবাবু জাল! ভাষা জাল!—নাম জাল!—পত্র জাল!—আজকের ব্যাপারের—বেবাক জাল!

পঞ্চম চক্র।

মানুষ চুরী।

আমরা ষ্টেশনে এসে পৌছিলেম। মাষ্টারবাবু গাড়ী হতে নাম্‌তে না নাম্‌তে চার পাঁচ জন লোক ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো। ভাব দেখে,—চেহারা দেখে,—চাউনি দেখে বেশ বুঝতে পাল্লেম, সব লোক-গুলিই বদমাইসের ওস্তাদ। সবগুলি বাঙালী নয়, হিন্দুস্থানীও আছে। সব লোকগুলিরই আপন আপন জাতের ভদ্র-আনা কাপড় পরা। বাবু একটু হেসে—তাদের দিকে চেয়ে বল্লেন, "সমস্ত ঠিক?" উত্তরে তারা বল্লে, "হাঁ, সব ঠিক। তোমার সব ঠিক ত?" বাবু হেসে বল্লেন, "ঠিক না হলে আর ফিরে আসি? তেমন লগ্নে আমার জন্মই নয়।" বাবু মহা গর্ব্বিত ভাবেই লগ্নের প্রশংসা কল্লেন। আমি দেখলেম, অতি কুলগ্নেই বাবুর জন্ম!—তা না হলে এমন ফিকিরফন্দি—এমন রাহাজানি-মৎলব ভদ্র-লোকের বুদ্ধিতে কখনই কুলায় না।

কথায় বার্ত্তায় বাবু ষ্টেশনে উঠলেন। লোকেরাও টাকার তোড়া নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চল্লো। আমি সকলের পশ্চাতে। একবার মনে হলো,—চারি-

দিকে লোকজন দেখে একবার মনে হলো, এদের এই ভয়ানক কাণ্ড, এদের এই বদমায়েসী—ফেরেব বাজীর গুপ্তরহস্ত প্রকাশ করে দি। আবার ভাবলেম, তা হলেও আমি নিস্তার পাই কৈ? এদের দলে অনেক লোক; প্রকাশ কোল্লে এরা শাস্তি পায় সত্য,—আপাততঃ আমিও মুক্তি পাই বটে, কিন্তু এর পর? আমি যতদিন সংসারে থাকবো,—এরা অত্যাচার কোত্তে কখনই ত্রুটি কোর্ব্বে না। যেমন কোরে হোক, এ রাগ তুল্‌বেই তুলবে। হয় ত কেটেই ফেল্‌বে, জাত নষ্ট কর্ব্বে, সর্ব্বনাশ হবে? তার চেয়ে এদের সঙ্গে থেকে বিশ্বাস জন্মে দিয়ে যদি কখনো উদ্ধার পেতে পারি, তবে সেই মুক্তিই নিরাপদ। আর এখন আমি যাইব বা কোথা?—আমার নিরাপদ্ স্থানই বা কোথা? এরা ভিন্ন আমার সত্য-পরিচয় কেহ জানে না, এরা ভিন্ন আমার সত্য-পরিচয় পাবারও ত অন্য উপায় নাই! আবার কি পাটনায় যাব? আবার কি সেই বিশ্বাস-ঘাতকের কুচক্রে পোড়ে বিপদগ্রস্ত হব?—কাজ নাই। সাত পাঁচ ভেবে এবারেও মনের এ প্রবৃত্তি দমন কোল্লেম।

এক সঙ্গেই সকলে গাড়ীতে উঠলেম। একখানা গাড়ীর এক কামরাতেই সকলে বোস্‌লেম। টাকার তোড়া নিয়ে কেবল একজন মাতালো-গোচের লোক সকলের শেষের গাড়ীতে উঠলো। কে কোথা নাম্‌বে,—কতদূর কে যাবে,—তারও কিছু সন্ধান পেলেম না;—গাড়ী চল্লো। এবার আবার কোন্ দেশে যাচ্চি,—কিছুই জান্‌তে পেলেম না। ভাবতে ভাবতে চল্লেম।

মোকামা ষ্টেশনে সকলে নাম্‌লেম। এখানে কেবল আমি আর মাষ্টার-বাবু গাড়ী বদল কোল্লেম। আর সকলে ষ্টেশনেই অপেক্ষা কোত্তে লাগলো। মাষ্টারবাবু তাদের কোথায় যেতে বল্লেন, তা বুঝতে পাল্লেম না। এই সব বদমায়েসদের রকম রকম ইঙ্গিত ইসারা আছে। জানা না থাকলে, একবর্ণও কেহ বুঝতে পারে না। আমার জানা ছিল না, বুঝতেও পাল্লেম না। দুজনে কেবল সেই গাড়ীতে রওনা হলেম! টাকার তোড়া তাদের নিকটেই রইল।

কোথা যাচ্চি,—ঠিক জানি না। একজন লোকের মুখে শুনেই স্থির কোরেছি, আমরা জামালপুর যাচ্চি। মাঝে আবার একবার গাড়ী বদল কোরে সন্ধ্যাকালে আমরা নাম্‌লেম। কতকগুলো লোক চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "মুঙ্গের,—মুং—গের,—মু—ঙ্গের!" মনে জান্‌লেম,

এ স্থানের নাম মুঙ্গের। কোথায় জামালপুর আর কোথায় মুঙ্গের, কিছুই জানি না। বেশ বুঝলেম, এরা পরস্পর যখন কথাবার্ত্তা কয়, তার মধ্যেও অনেক ফিকিরফক্কি,—ইঙ্গিত ইসারায় বয়েৎ আছে। মাষ্টারবাবু টিকিটমাষ্টারকে টিকিট দিয়ে ষ্টেশন হতে নীচে নেমে এলেন। অনেকগুলি গাড়ী উপস্থিত ছিল, শিবতলা যাব বোলে একখানি গাড়ী ভাড়া কোরে গাড়ীতে উঠলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে উঠে শিবতলায় চল্লেম।

রাত ৭৷৷ টার সময় শিবতলায় গাড়ী থাম্‌লো। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্যের বাসা অনুসন্ধান কোত্তে লাগলেম। প্রায় এক ঘণ্টাকাল অনুসন্ধানের পর ঠিক হলো। একখানি ছোট্ট একতালা বাড়ীতে ঘনশ্যামবাবুর বাসা। দরজায় দাঁড়িয়ে অনেক ডাকাডাকির পর ঝি এসে দরজা খুলে দিলে, আমরা প্রবেশ কোল্লেম। মাষ্টারবাবু অম্লানবদনে পরিচয় দিলেন, "নিবাস বর্দ্ধমান, নাম—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কর্ত্তার জামাতা রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার জ্যেষ্ঠ।" আমার পরিচয় দিলেন, "ইনি আমার মামাত ভাই, এঁর নাম প্রাণহরি বন্দ্যোপাধ্যায়। একা পরিবার নিয়ে যাওয়া বড় অসুবিধা বোলে দাদা দুজনকেই পাঠিয়েছেন।" এই বোলে একখানি পত্র ঘনশ্যামবাবুর হাতে দিলেন। এতক্ষণে দুরাত্মার ভয়ানক অভিসন্ধি বুঝতে পাল্লেম। চিঠিখানিও চিন্‌তে বাকী রইল না। সেই ডাক-মারা চিঠি, কেবল খামখানি বদল হয়েছে মাত্র। হুণ্ডির চিঠির শিরোনামা যেমন নূতন খামে লিখিয়েছিল, এখানিও ঠিক সেই রকম কোরেছে। মনে বড় ভয় হলো। যে পাষণ্ড এমন ভয়ানক কাজ কোত্তে পারে, যে আমার মত শত্রুকে সঙ্গে কোরে—শত্রুর সম্মুখে এমন অত্যাচার—দাগাবাজী কোত্তে পারে, তার অসাধ্য কাজ আর জগতে নাই। কিছু প্রকাশও কোত্তে পাচ্চি না। দলের লোক আমাকে চিনেছে। মাষ্টারবাবুর সঙ্গে এসেছি, তাও জানে তারা, কি হয়, তারাও সন্ধান রাখছে। প্রকাশ কোল্লেই আমার বিপদ! তাই ভেবে এবারও অগত্যা চুপ কোরে রইলেম।

ঘনশ্যামবাবু কাণে শুনেছেন মাত্র, সুরেশ নামে জামাতার একটি ভাই আছে; সুতরাং তিনি এই ভেকধারীকে কি কোরে চিন্‌বেন? মাষ্টার বাবু যা বল্লেন, ঘনশ্যামবাবুর তাতেই বিশ্বাস। খাতির-যত্ন আরম্ভ হলো, বধূঠাকুরাণী জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেবরের রূপ, গুণ, সব দেখতে

লাগলেন। স্বামীর ঘরে যাবার জন্যে সরলা বধূঠাকুরাণীর চোকে মুখে যেন আনন্দের হাসি খেলা কোচ্চে। তিনি বয়স্থ,—সবই বুঝেন।

আমাকে বাইরে রেখে, আমার নাম প্রাণহরি এটি মনে রাখতে উপদেশ দিয়ে, মাষ্টারবাবু মেয়েদের প্রণাম কোত্তে অন্দরে গেলেন। আমি আর গেলেম না। এ'সব পাপসংসর্গে—পাপ কাজের অনুসঙ্গী হয়ে বড়ই মনোকষ্টে আছি, আর না। অসুখ হয়েছে বোলে কাটিয়ে দিলেম। মাষ্টারবাবু একাই চোলে গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে মাষ্টারবাবু ফিরে এলেন। আমার জন্যে নিজেই হাতে কোরে খাবার এনেছেন। আমি তাঁর এ অনুগ্রহে নিতান্ত বাধিত হলেম না। বুঝতে পাল্লেম, এ সকলও সেই বদমায়েসীর মায়াচক্র!

আমরা যে ঘরে বোসেছি, এ ঘরটিও বাড়ীর মধ্যের। একটি বড় ঘর, তারই মধ্যে একখানা ত্রিপলের বেড়া দিয়ে একটি ঘরকে দুটি করা হয়েছে। তারই একটি ঘর অন্দরের দিকে আছে, আর একটি বৈঠকখানা হয়েছে। আমরা দুজনে সেই বৈঠকখানা ঘরে বোসে আছি। মাষ্টারবাবুর সঙ্গে বাড়ীর মেয়েদের কি রকম আদর সম্ভাষণ হলো, আমি সঙ্গে ছিলেম না সুতরাং জানতে পারি নাই।

বোসে আছি, একটু একটু তন্দ্রা আস্‌ছে, এমন সময়ে পাশের ঘরে সেই ত্রিপলের ওপাশে কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেম! অমনি চট্‌কা ভেঙ্গে গেল!—কাণ পেতে শুনতে লাগলেম!—কে যেন বোল্‌চে, "ঠাকুরপো! কাল আর গিয়ে কাজ নাই। এলে, দুদিন থাক; আর একটা ভাল দিন দেখে গেলেই হবে। কাল বরং একখানা চিঠি লিখে দাও।" মাষ্টারবাবু উত্তর কোল্লেন, "না বউ, তা হবে না। দাদার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, অনেক সই-সুপারিশের চাকরী, অনেক কাণ্ড কোরে, একশটি টাকা মাইনে হয়েছে। বিলম্ব হলে অনেক ক্ষতি হবে। এবার না হয়, আবার একবার আস্‌বো। তখন বরং দুদিন থাকবো।" মাষ্টারবাবুর কথায় আর কোন উত্তর না কোরে সরল-হৃদয়া বধূঠাকুরাণী চোলে গেলেন।

তিনি এখনো জানতে পারেন নাই যে, তাঁর সাধের ঠাকুরপো, তাঁকে কেমন শ্বশুর বাড়ী নিয়ে যাবে। এখন এত আদর,—এত যত্ন,—এত ভদ্রতা,—এত প্রাণের টান; এর প্রতিফল বেশী দিন নয়—কালই জানতে পারবেন। তখন বুঝ্‌বেন, তিনি কেমন স্বামীর ঘরে গেছেন!

রাত্রে আহারাদি হলো। আমি একাই সেই ঘরে শয়ন কোল্লেম। মাষ্টারবাবু ঘনশ্যামবাবুর কাছে শুলেন। আমার প্রতি মাষ্টারবাবুর যেন অনেকটা সদয়ভাব দেখ্‌লেম। তিনি আপনা হতেই বোল্লেন, "প্রাণহরি এক্‌লা ভিন্ন শুতে পারে না। কাছে লোক থাক্‌লে ওর একেবারেই নিদ্রা হয় না।" এই কথাতেই আমার একাকী শয়ন।

একটি কথা বোল্‌তে ভুলে গেছি। আমি পুরুষ-বেশী বটে, কিন্তু আগে হিন্দুস্থানী-বেশে ছিলেম, এখন আর আমার সে বেশ নাই। বাঙ্গালি ভদ্রলোকের মত বেশভূষা। শীতকাল।—শাল গায়ে আছে। মাষ্টারবাবুই এ পোষাক দিয়েছেন। তাই গায়ে দিয়ে পুরুষ সেজে এখানে এসেছি। পশমী গলাবন্দে আমার মাথা ঢাকা, শরীর গরম কাপড়ে ঢাকা, চিন্‌বার উপায় নাই। আর গেছিও রাত্রে, তাতে আরও সাজিয়েছে ভাল। শীতকাল, তাই মান রক্ষা; অন্য সময় হলে মাষ্টারী বুদ্ধিতে যে কি কৌশল যোগাতো তা, আমার বুদ্ধিতে আস্‌বে কেন?

সকালেই ঘুম ভেঙে গেল। মাষ্টারবাবু আগেই উঠেছেন। হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেছে, অন্দরে যাত্রার আয়োজন হচ্চে। পাঁচ বাড়ীর মেয়েরা এসেছে, মহাগোল! এখানে যাঁরা চাকরী করেন, তাঁদের অনেকেই পরিবার নিয়ে আছেন। সেই সব মেয়েরা অন্দরে মহাগোল আরম্ভ কোরেছে। ৮টার সময় গাড়ী, এক্‌টা তাড়া পোড়ে গেছে। আমি হাত মুখ ধূলেম। অনেক দূর, কিছু না খেয়ে গেলে কষ্ট হবে, তাই সকালে সকালে খাবার তৈয়ার হয়েছে। আমরা খাবার খেয়ে প্রস্তুত হলেম। অন্দরেও সমস্ত আয়োজন ঠিক। গাড়ী ডাকা হলো, সকলেই গাড়ীতে উঠলেম। ঘনশ্যামবাবু সঙ্গে এসে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন।—নিজে টিকিট কোরে দিলেন। বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত টিকিট নেওয়া হলো।

বধূঠাকুরাণীকে আমি এতক্ষণ দেখি নাই। কেবল রাত্রে সেই পরদার আড়াল হতে কথা শুনেছিলেম মাত্র,—এখন দেখ্‌লেম। এমন ভুবনভরা রূপ আমি কখনো দেখি নাই। চমৎকার চেহারা!—রংটি গোলাপী, গৌরবর্ণ হতে যেন রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে। ডাগর চোকে কৃষ্ণবর্ণ তারা দুটি যেন হাস্‌ছে, নাক্‌টি দিব্য মানান-সই—কাণ দুটি ছোট ছোট, কপাল ছোট, চুল বাঁধা কিন্তু তবুও বুঝ্‌লেম, চুলগুলি যেন কাল রেশম। বেশী লম্বাও নয়, বেটেও নয়। বয়স প্রায় চোদ্দ কি পনের। বস্তুতই এমন

গঠন আমি আর কখনো দেখি নাই। চেহারায় এমন একটি ভাব যে, দেখলেই যেন ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে।

মাষ্টারবাবু আগে একে দেখেছিলেন, না জোর অদৃষ্টে এই রত্ন কুড়িয়ে পেলেন? গল্পে শুনেছি, কলিকালে পাপ কার্য্যেই লাভ। এটি আপাততঃ আমার সত্য বোলেই বিশ্বাস হলো! আহা! না জানি এই পাপিষ্ঠের দল অভাগিনীকে কত কষ্টই দেবে! বয়স হয়েছে, বুঝতে পেরেছেন, তাই স্বামীসোহাগ পাবার জন্যে,—স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা, স্বামীর প্রেম লাভ কোত্তে আপনা হতেই ব্যাকুল হয়েছেন,—তাই বিনা বাধায় দেবরের সঙ্গেই স্বামী-গৃহে আস্‌ছেন! এখন এর মনের গতি কেমন? হৃদয়চিত্রে যে কত সুখের চিত্রই আঁকচেন,—বাসনা-সাগরে কত নূতন নূতন সুখ-তরণীই যে ভাসাচ্চেন, স্বামী সম্ভাষণ কি রকমে কোর্ব্বেন, সেই সুখের ভাবনা কত ভাবেই যে ভাবচেন,—তার আর সীমা সংখ্যা নাই। কালের কি ধর্ম্ম! পিতার কথা মনে নাই,—মাতার কথা মনে নাই,—বয়স্যা সখীগণের কথা মনে নাই,—কেবল সেই এক চিন্তাই চিন্তা,—স্বামী।

সে দিন আমরা গাড়ীতেই কাটালেম। সন্ধ্যার সময় ষ্টেশন হতে খাবার কিনে আমরা তিন জনে খেলেম। বধূ-ঠাকুরাণীর নাম জানি না। মাষ্টারবাবুর সঙ্গে তাঁর অনেক কথা হলো। সম্পর্ক ধরে অনেক হাস্য পরিহাসও হলো, কিন্তু নাম জানা গেল না। চতুর-চূড়ামণি মাষ্টারবাবু রহস্য কোরে বোল্লেন, "তোমাদের দেশ অতি জংলা দেশ। মানুষের নামগুলো পর্য্যন্ত বন্য।" বধূ-ঠাকুরাণীও হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "কেন? কিসে খারাপ? আমার নামটাই না হয় খারাপ, আর সকলের নাম ত ভাল? আর খারাপই বা এমন কি, তোমাদের দেশে কি কুসুমকুমারী নাম কারও নাই? চল, যাই আগে—কত দেখব।" কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি। বধূ-ঠাকুরাণীর নাম এতক্ষণে জানলেম, কুসুমকুমারী।

এই সব কথা যখন হয়, তখনো আমরা গাড়ীতে। কোথায় যাচ্চি, তা আমিও জানি না, কুসুমকুমারীও জানেন না, জানেন কেবল মাষ্টারবাবু। মাষ্টারবাবুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেই তিনি বোল্‌বেন, বর্দ্ধমান তাঁকে জিজ্ঞাসা করা না করা তুল্য কথা। তবে এটি নিশ্চয় যে, আমরা বর্দ্ধমানে যাচ্চি না, অন্য কোন দেশে যাচ্চি!

সমস্ত রাত গাড়ীতেই কেটে গেল। রাত্রে একবারমাত্র গাড়ী বদল কোত্তে হয়েছিল, আর আধঘণ্টা মাত্র গাড়ীর জন্যে একটা ষ্টেশনে অপেক্ষা কোত্তে হয়েছিল, এই মাত্র। তার পর আর নাম্‌তে হয় নাই। সমস্ত দিন গাড়ীতেই কেটে গেল। ভোরেই এক ষ্টেশনে এসে গাড়ী থাম্‌লো। বাইরে চেয়ে দেখি, একখানা তক্তার মত কিসের গায়ে মোটা মোটা নাগরী হরপে লেখা আছে, মোকামা! তারই পাশে ইংরাজিতেও আছে, মোকামা।

আবার সেই মোকা! মনে বড় ভয় হলো! বিবেচনা কোল্লেম, সেই সব লোকগুলো হয় ত এইখানেই উপস্থিত আছে, এই গাড়ীতে এসে উঠবে। অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়ালো, অনেক লোক নেমে হাত মুখ ধুলে, জল খেলে, আমারও খেলেম; কিন্তু লোকগুলোকে আর দেখতে পেলেম না। ভয় অনেকটা কমে গেল। গাড়ী আবার চল্‌লো।

গাড়ী বদল কোত্তেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। সন্ধ্যার সময় আবার গাড়ী বদল কল্লেম। লোকের মুখে শুন্‌লেম, স্থানটির নাম মোগলসরাই। কুসুমকুমারী হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, “ঠাকুরপো! তোমার সে বর্দ্ধমান কতদূর? তিন দিন গাড়ীতে প্রাণ ওষ্ঠাগত—তবু বর্দ্ধমানের দেখা নাই, সে আর কতদূর?” মাষ্টারবাবুও হেসে বোল্লেন, “আর বেশীদূর নয়, ১০ টার মধ্যে বাড়ী পৌঁছিতে পারবো।” কুসুমকুমারী আবার বোল্লেন, “বাবার মুখে শুনেছি, সকালে গাড়ীতে উঠলে রাত ৯।১০ টার সময় বর্দ্ধমানে যাওয়া যায়। তবে এত বিলম্ব হচ্চে কেন? এ আবার কোন্ রাস্তা?” মাষ্টারবাবু আবার বোল্লেন, “সে ডাকগাড়ীতে গেলে ঐ রকম সকালেই যাওয়া যেত বটে, কিন্তু সে গাড়ী এখন আর চলে না।” মাষ্টারবাবু সরলা কুসুমকে যেভাবে বুঝালেন, তিনি সেই ভাবেই বুঝলেন। আমি আবার কোন্ নূতন স্থানে যাচ্চি, সেই ভাবনাই ভাবতে লাগলেম।

দেখতে দেখতে গাড়ী ষ্টেশনে এসে লাগলো। রাত তখন ৯টা। আমরা সকলেই নাম্‌লেম। কুসুমকুমারী আনন্দে অধীর হয়ে, কতই আনন্দে কত কথাই বোল্‌তে লাগলেন। আমি ভাবতে ভাবতে মাষ্টারবাবুর সঙ্গে ষ্টেশনের বাইরে এলেম।

মাষ্টারবাবু একখানি গাড়ীতে উঠেই বোল্লেন, “সোণারপুর বড়

হাবেলী চল্। যে ভাড়া হয় দেওয়া যাবে।” আমরা উঠলেই গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকালে। আমরা যেন কোন অজ্ঞাত সহরের মধ্য দিয়ে চল্লেম। কুসুমকুমারী আনন্দভরে বল্লেন, “ঠাকুরপো! এই ত বর্দ্ধমান? বেশ সহর!” মাষ্টারবাবু কোন উত্তর না দিয়ে চুপ কোরে রইলেন। দেখতে দেখতে গাড়ী যথাস্থানে উপস্থিত হলো। মাষ্টারবাবু গাড়ীর ভাড়া দিয়ে, আমাদের সঙ্গে কোরে—চার পাঁচটা গলি পেরিয়ে একটি জীর্ণ বাড়ীর দ্বারে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, “মা! মা! দরজা খোলো।” একজন বৃদ্ধা প্রদীপ নিয়ে দ্বার খুলে দিলে। জিজ্ঞাসা কোল্লে, “বউ এসেছে?” মাষ্টারবাবু বোল্লেন, “হাঁ।”

কুসুমকুমারী ঘোম্‌টা টান্‌লেন, শাশুড়ীকে প্রণাম কোল্লেন। মনে কোল্লেন, এই বুঝি তাঁর শ্বশুরবাড়ী। আমি ঘৃণায়—ভয়ে—আরও কত রকম ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে মনে মনে বোল্লেম,—কি সর্ব্বনাশ!—মানুষ চুরি!

ষষ্ঠ চক্র।

বাড়াভাতে ছাই!

আমরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। মাষ্টারবাবু আগে, তার পর কুসুমকুমারী, সকলের শেষে আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। বুড়ী আগে আগে আলো দেখিয়ে চোল্লো।

বাড়ীটি ভয়ানক! দরজা পেরিয়ে বাড়ীর মধ্যে দিয়ে অনেকদূর এলেম, তবুও চোলেছি। প্রকাণ্ড বাড়ী—দুমহল। প্রথম মহলের দরজা পেরিয়েই চারিদিকে চকমিলান দোতালা একসা ঘর। চারিদিকে নীচে উপরে বাড়ীর আয়তন দেখে অনুমান হলো, প্রায় ২৫।৩০টি ঘরের কম নয়। সব ঘুর্ অন্ধকার! একটি প্রাণীও নাই, কেবল অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ কোচ্চে। এতগুলি ঘর কেবল খালি পোড়ে আছে। বুড়ী আলো দেখিয়ে যাচ্চে

তাই অতি কষ্টে চোলেছি। বারম্বার টাল্ খাচ্চি, পা পিছলে যাচ্ছে। কোথায়—কোন্ দিকে যাচ্চি,—অন্ধকারে কিছুই ঠিক কোত্তে পাচ্চি না, কেবল সঙ্গে সঙ্গে যাচ্চি মাত্র। আমার চেয়েও কুসুমকুমারী কষ্ট পাচ্চেন। তাঁকে আমি এক রকম ধোরে নিয়ে চোলেছি। এমন রাক্ষসী-বাড়ী আর কোথাও আছে কি না, জানি না। বড় বড় থাম, বড় বড় ঘর, মাথায় কোরে যেন খাঁ খাঁ কোচ্চে। নীচের ঘরগুলি যেন একটু নীচু, তাতে আরও বেশী বেশী অন্ধকার। এমন বাড়ী যে, চীৎকার কোল্লেও বাই-রের লোক জান্তে পারে না। এত অন্ধকার যে, কাছের লোক দেখা যাচ্চে না। আমরা যেন ক্রমেই অন্ধকারের অন্ধকার উদরে প্রবেশ কোচ্চি।

অনেকগুলি ঘর পেরিয়ে,—অনেক গলি ঘুঁচি ছাড়িয়ে অন্দরমহলে এলেন। অন্দর মহলটিও অবিকল সদর মহলের মত। সেই রকম দোতালা ঘর,—সেই রকম অন্ধকার, সেই রকম জনশূন্য! আমরা অন্দরমহলের উঠানে এসে দাঁড়ালেম। দেখলেম নীচের ঘর সব চাবীবন্ধ। বুড়ীর হাতের আলো যতদূর গেল, ততদূরই চেয়ে দেখলেম, সব ঘরেই বড় বড় তালাবন্ধ।

একটু অপেক্ষা কোরেই,—চারিদিকে একবারে চেয়েই—বুড়ী আলো নিয়ে উপরে উঠলো। মাষ্টারবাবু অনুসরণ কোত্তে ইঙ্গিত কোরে পিছিয়ে দাঁড়ালেন, আমরা মাষ্টারবাবুর আগে আগে চোল্লেম। উপরে উঠে, উপরের বারান্দা দিয়ে আবার অনেক দূর এলেম। উপরে উঠে দেখি, পশ্চিম দিকের একটি ঘরের দরজা ভিতর হতে বন্ধ। ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্চে। আমাদের পায়ের শব্দ শুনে ঘরের ভিতর হতে একজন ভাঙা গলায় কাঁপা কাঁপা আওয়াজে জিজ্ঞাসা কোল্লে, সর্ব্বেশ্বর!” মাষ্টারবাবু উত্তর কোল্লেন, “হাঁ।” যেমন উত্তর, অমনি চার পাঁচজন লোক তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ছুটে এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়লো। বুড়ীকে ধমক দিয়ে—আলোটা তার হাত হতে কেড়ে নিয়ে আমাদের মুখের কাছে ধোল্লে। আমরা অবাক!—লজ্জায় ম্রিয়মাণ।

লোকগুলো যে বদ্‌লোক, তা তাহাদের এই ব্যবহারেই বুঝে নিলেম। ভদ্রলোক ভদ্রপরিবারের দিকে এমন বাঁধা-ধরা চাউনিতে কখনই চাইতে পারে না। কুসুমকুমারী এখনও কিছু বুঝতে পারেন নাই। শুনেছিলেন,

শ্বশুরদের প্রকাণ্ড বাড়ী,—মস্ত দালান, বড় বড় চক্‌মিলান—সদর-অন্দর-ওয়ালা বড় বাড়ী, কেবল লোক অভাবে পলাতক বাড়ীর মত পোড়ে আছে। এ বিশ্বাস ছিল বোলে, তিনি এই বাড়ীতে প্রবেশ কোরেও কোন সন্দেহ কবেন নাই, কিন্তু এতক্ষণে—এই লোক কয়েকটির ব্যবহার দেখে কুসুমকুমারী যেন কেমনতর হয়ে গেলেন! কাঁপতে লাগলেন! কাঁপা কাঁপা আওয়াজে—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ঠাকুরপো! এ কার বাড়ী?"

মাষ্টারবাবু এদের কাছে সর্ব্বেশ্বর নামে পরিচিত। নাম শুনে বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান কোল্লেম না। রূপ বদ্‌লানো, পোষাক বদ্‌লানো,—জাত বদ্‌লানো যার অঙ্গের ভূষণ; জালিয়াতী, ফেরাবী, বদ্‌মায়েসী যার ব্যবসা; সে যে সামান্য একটা নাম বদল কোর্ব্বে, সেটা কি আর বড় আশ্চর্য্যের কথা? মাষ্টারবাবু এখন সর্ব্বেশ্বরবাবু! সর্ব্বেশ্বর ত সর্ব্বেশ্বর। কথাটা তত গ্রাহ্যই কোল্লেম না। তবে এখন মাষ্টারবাবুকে সর্ব্বেশ্বরবাবু বোলে ডাকবো,—এইমাত্র ঠিক কোরে রাখলেম।

সর্ব্বেশ্বরবাবু লোকগুলোকে একটি হাসির ধমক দিয়ে,—সহাস্যে দু-প্যাচটা গালমন্দ দিয়ে সরিয়ে দিলেন। আমরা আবার সেই ঘরের, পাশের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেম।

বুড়ীর আঁচলের খুঁটে প্রকাণ্ড একটা রিঙের ছোট বড়—দেশী বিলাতী এক তাড়া চাবী। বুড়ী সেই চাবীর রাশ হতে চাবী ঠিক কোরে দরজা খুল্লে। আমরা তিনজনেই সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। মাষ্টারবাবু অন্য কোথায় চোলে গেলেন।

ঘরটি খুব ছোট। জিনিসপত্র, খাট, তক্তাপোষ, লেপ, বালিশ, বাসন, তৈজস কিছুই নাই। অথচ এটি থাকবার ঘর। বড় আশ্চর্য্য বোধ হলো। যেখানে সাত দিন থাকা যায়,—সে ঘরে পথিকলোক অন্ততঃ দুদিন কালও থাকে, সে ঘরের পাঁচটা হাঁড়ি, দুখানা বাসন, দুই একখানা কাপড়, কি দুই একটা বাক্স প্যাট্‌রা থাকেই থাকে। আর এই বহুদিনের বসত বাড়ীতে, অনেক দিনের বাসের ঘরে, জিনিসপত্রের নাম মাত্রও নাই। আছে কেবল কতকগুলা ছেঁড়া মাজুরী, তুলো-ওড়া—চিটধরা কাল কাল বালিশ, একটা জলের কলসী, আর একটা কাণা-ভাঙা কাচের গেলাশ। আর এক পাশে তেলমাখা ছাতাধরা একটি মাটির দেরকো,—তার উপরে

একটা সেই রকম মানানসই মেটে প্রদীপ। ঘরের আস্‌বাব—সাজসরজাম মোটের উপর এই পর্য্যন্ত।

আমরা সেই নাজুরীতেই বোস্‌লেম। বুড়ী আমাদের বোস্‌তে বোলে মুখে দুটা মিষ্ট কথায় যত্ন জানিয়ে কোথায় চোলে গেল! আমরা দুটিতে বোসে আপন আপন অদৃষ্টের ভাবনা ভাবতে লাগলেম।

পাশের ঘরে ইয়ারকী চোল্‌ছে। লোকগুলো মদ খেয়ে—থেকে থেকে চীৎকার কোচ্চে,—ভাঙা ভাঙা আওয়াজে গান ধোচ্ছে,—বড় বড় রাজা-উজীর-মারা গল্পে আসর জমাচ্চে,—পরস্পর নিজের প্রাধান্য জানাচ্চে, লম্বাচোড়া বারফট্টাই কোরে মদের আসর সরগরম কোরে তুলছে। থেকে থেকে একটা বদসুরো ঢপ্‌ঢপে ঢোলে বড় বড় চাপড় দিয়ে গানের মান্য রক্ষা কোচ্চে। হৈ হৈ ব্যাপার পোড়ে গেছে। সকলেই জ্ঞানশূন্য, সকলেই মদের মত্ততায় ভর।

সর্ব্বেশ্বর মজলিসে যেতেই সকলে আনন্দে অধীর হয়ে চীৎকার কোরে উঠলো। পাঁচজনে পাঁচরকম গলায়—পাঁচরকম কথায় সর্ব্বেশ্বর-বাবুর খাতির আরম্ভ কোল্লে। আবার একটা মহা গোল পড়ে গেল। মাতালেরা কত রকম কথাই বোল্‌ছে, কত রকম পৈশাচিক কাব্যের অভিনয়ই কোচ্ছে, আমরা প্রাণের ভয়ে—অদৃষ্টের চিন্তায় কেবল চিন্তাসাগরে সাঁতার দিচ্ছি। মাষ্টারবাবু একদিনের তরেও আমাকে মন্দ কথা বলেন নাই, তাতেই আমার যা কিছু সাহস; কিন্তু এই বদ্‌মায়েসের দলের কাণ্ডটা দেখে পর্য্যন্ত আমার মনের সে সাহসটুকু আর নাই। সেই জন্য আবার এই নূতন চিন্তা,—আবার এই এক নূতন ভাবনা,—আমার অদৃষ্টে না জানি আরও বা কি আছে!

কুসুমকুমারীর সঙ্গে আমার একটি কথাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। আমি যে তাঁর সম্পর্কে দেবর, এই মাত্রই তিনি জানেন। এর অধিক পরিচয় আমিও তাঁকে বলি নাই, তিনিও তা জানেন না।

কুসুমকুমারীর ভাব দেখে,—তাঁর মলিন মুখখানি দেখে, হৃদয়ে বড় ব্যথা পেলেম। এত চিন্তা আমার, যে চিন্তার কুলকিনারা নাই, সীমা-সংখ্যা নাই, সেই চিন্তায় আমি চিন্তিত; তার মধ্যেও সরলা কুসুম-কুমারীর চিন্তা উদিত হলো। আমরা দুজনেই নির্দ্দোষী, দুজনেই স্ত্রীলোক, দুজনেই বিপন্ন। আমাদের পরস্পরের মনের টান,—পরস্পর পরস্পরের

সুখদুঃখভাগী না হবো কেন? আহা! সরলা বড় সাধেই শ্বশুরবাড়ী এসেছে, বড় সাধেই দেবরের সঙ্গে বেরিয়েছে, আনন্দের সাগরে তিনি ভাস্‌ছেন, এখন তার পরিণাম কাল উপস্থিত! দুটি চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে, যে মুখখানি এতক্ষণ হাস্‌ছিল,—সেই মুখখানি এখন বিষাদের কালিমায় ম্লান হয়ে এসেছে, চোক্ দুটি লাল হয়ে উঠেছে, পদ্মপত্রের জলের মত জলভারে চোক দুটি টস্‌টস্‌ কোচ্চে। এ দেখে কি চুপ কোরে থাকা যায়? এ কষ্ট দেখে কার হৃদয়ে না আঘাত লাগে?—কার না কষ্ট হয়? তবে যারা নিষ্ঠুর,—পাষাণে যাদের প্রাণ বাঁধা,—জীবহত্যা—পরস্ব হরণ যাদের ব্যবসা, সে সব নরপশুদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের সেই পাপহৃদয়ে অনুরাগ নাই—বিরাগ আছে, করুণা নাই—উৎপীড়ন আছে, দান নাই—গ্রহণ আছে, মায়া নাই,—লোক দেখানো বা লোক ভুলানো কপট মায়া আছে। আর্ত্তের করুণ-রোদনে তারা হাস্য করে, পীড়িতের কাতরোক্তি শুনে আনন্দে নৃত্য করে,—দুর্ব্বল শিশুর সকাতর দৃষ্টি-ম্লানমুখ দেখে করতালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। এ সব দুরাত্মাদের কথা মনুষ্য-সংসারে তুলনা হয় না। এরা সংসারের কলঙ্ক,—মনুষ্যকুলে পশু, বিধাতার জঘন্য সৃষ্টির শেষ দৃষ্টান্ত! এদের ভারেই ধরা পীড়িত!

কুসুমকুমারীকে চুপি চুপি—পাশের ঘরের বদ্‌মায়েসেরা যাতে না শুন্‌তে পায়, এমন চুপি চুপি বোল্লেম, "কুসুম! ভয় কোরো না,—চিন্তা কোরো না। দুঃখ কি?—কষ্ট কি?—এদের কাছে থাক্‌বে। কেঁদো না, দুঃখ করো না,—চুপ কর।" এখন কুসুমের মন বুঝ্‌বার জন্যই আমার এই কথা।

কুসুমকুমারী অতি কাতরভাবে কেবল ফ্যালফ্যাল কোরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন! ভয়ে সর্ব্বশরীর যেন কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। মুখে কিছু উত্তর কোল্লেন না। চেহারার ভাব দেখে স্পষ্টই মনের গতি বুঝলেম। এ সময় রহস্যের সময় নয়,—মন বোঝার বেশী আড়ম্বর কোল্লে শেষে অন্য দুর্ঘটনাও ঘোট্‌তে পারে, এই ভেবে বোল্লেম, "কুসুম! কোন ভয় নাই তোমার। তুমি যেমন বিপদে পোড়েছ, আমিও তেমনি বিপদগ্রস্ত। তোমাকে যেমন এরা কৌশলে ধোরে এনেছে, আমাকেও তেমনি কৌশলে এনেছে। কোন ভয় নাই।—ব্যাকুল হয়ো না।—বেশী চিন্তা করো না। মনকে দৃঢ় কোরে উদ্ধারের উপায় চিন্তা কর। অনেক প্রলোভন,—অনেক

কৌশল, অনেক ফেরাবী পেল্‌বে। সাবধান! যেন এদের কৌশলে ভুলে যেও না” কুসুম আমার কথা শুনে যেন আরও ভীত হলেন। ভাঙা ভাঙা স্বরে, অতি ধীরে ধীরে বোল্লেন,—“তবে কেন আমাকে এখানে আন্‌লে? তুমিই বা কেন গেলে?—আমার গতি কি হবে?” আমি আশ্বাস দিয়ে বোল্লেম,—“ভয় কি? ঈশ্বর আছেন। তাঁকেই মনে মনে ডাক, তাঁরই সাহায্যে আমরা সকল বিপদে পরিত্রাণ পাব।” কুসুম সেই রকম সকাতরে বোল্লেন,—“তোমার নাম কি?’ উত্তরে বোল্লেম,—“নাম আমার এখন বোল্‌বো না। আমার কাছে তোমার লজ্জা নাই, ভয় নাই, আমিও স্ত্রীলোক।” কুসুমের বিশ্বাস হলো না। এমন পুরুষের পোষাক-পরা আমি,—সরলা কুসুম এ কৌশলের কি বুঝ্‌বেন?—কাজেই তাঁর বিশ্বাস হলো না। মুখের ভাবে আমি তাঁর মনের ভাব বুঝে নিলাম। সন্দেহভঞ্জন কোল্লেম। আমি যে স্ত্রীলোক,—তার পরীক্ষা দিলেম। কুসুম যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। আমার আরও নিকটে সোরে এসে হাত দুখানি ধোরে বোল্লেন,—“ভাই! এ বিপদে আমাদের কি কেহ রক্ষা-কর্‌বার নাই? উপায় কি হবে? আমি বাবার ঠিকানা জানি, তাঁকে পত্র লিখ্‌লে কি হয় না?” আমি বোল্লেম, “না। কে চিঠি লিখ্‌বে? লিখ্‌তে জানি—কিন্তু কাগজ কলম কোথায়? কে চিঠি নিয়ে যাবে? সে কথা এখন থাক্‌। এখানে কারও সাহায্য পাবার প্রত্যাশা নাই। নিজের বুদ্ধিতে যতদূর হয়, তারই সাহায্যে উদ্ধারের উপায় কোত্তে হবে। এ তাড়াতাড়ির কাজ নয়। ভেবে চিন্তে—মৎলব এঁটে তবে কাজ কোত্তে হবে। এতগুলি ফন্দিবাজ লোকের চোকে ধূলা দেওয়া,—এতগুলি বদ্‌মায়েসের বদ্‌মায়েসী বুদ্ধির উপর টেক্কা দেওয়া বড়ই কঠিন কথা! তাড়াতাড়ির কাজ নয়।—ভয় করো না। যখন দুজন হয়েছি,—তখন বড় ভাবনা নাই।”

কুসুমের সঙ্গে অনেক কথা হলো। দুজনেরই এক বয়স,—দুজনেই এক রকম অবস্থায় পোড়েছি,—দুজনেই মিলেছে ভাল। আমরা দুজনে যে পরিচিত হয়েছি, একথা প্রকাশ কোত্তে কুসুমকে নিষেধ করে দিলেম। কি জানি?—এই ভয়, পরিচয় পেয়ে পাছে এরা আবার এক্‌টা কাণ্ড কোরে বসে!

অনেকক্ষণ চেঁচাচেঁচির পর মাতালের দল নীরব হলো। বোধ হলো,

বেজায় মদের নেশায় এরা অচৈতন্য হয়ে পোড়েছে! রাত্রিও অনেক হয়েছে, প্রায় তিন ঘণ্টারও বেশী দুজনে বোসে আছি। কদিনের পরিশ্রম,—এক রকম অনাহার, আর কত কষ্ট সহ্য হয়? দুজনে আপন মনে বোসে ভাবছি, এমন সময় মাষ্টারবাবু এলেন। ইনিও মদ খেয়েছেন; চোলে যেতে টাল খাচ্চেন,—কথা জড়িয়ে গেছে,—বিদ্‌কুটে চেহারা আরও বিগ্‌ড়ে গেছে। লালচোকের কাল কাল মণি দুটো বোঁ বোঁ কোরে ঘুরচে। মাষ্টারবাবু ওরফে সর্ব্বেশ্বর একখানা কাপড় এনে দিলেন। বোল্লেন, "আর কেন? কাপড় ছাড়, ঝি খাবার আন্‌তে গেছে, এখনি আস্‌বে। খাবার খেয়ে এইখানেই থেকো। এ বিছানায়—না হয়, আরও বিছানা এনে দেবে। দুজনে শুয়ে থেকো। কোন চিন্তা নাই।' এই পর্য্যন্ত বোলে, কাপড়খানি আমার হাতে দিয়ে টোল্‌তে টোল্‌তে চোলে গেলেন। আমি কেবল কাপড় ছাড়তে যাচ্চি, এমন সময় আবার সর্ব্বেশ্বর আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকে, একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বোল্লেন, "কোন কথা কুসুমের সাক্ষাতে প্রকাশ কোরো না। যা জিজ্ঞাসা কোর্ব্বে, জানি না বোলে সেরে নিও। বেশী হা হুতাশ করে, দুকথা মিষ্টি বোলে বুঝিও। তোমার কোন ভয় নাই। আমি যখন আছি, তখন আর তোমার ভয় কি? সংসার চেন। পাঁচ রকম দেখ। কোন ভয় নাই।" মদের মুখে সর্ব্বেশ্বর এই কথা বোলে চোলে গেলেন। আমি ফিরে এসে, কাপড় ছেড়ে আবার বোস্‌লেম। দুজনে অনেক কথা হলো। দুজনের প্রাণের ব্যথা,—মনের কথা পরস্পর বলাবলি কোল্লেম। হৃদয়ে যেন অনেকটা বল পেলেম। সাহস বাড়্‌লো,—বুদ্ধি বাড়্‌লো উৎসাহ বাড়্‌লো, সেই সঙ্গে আশাও বাড়্‌লো। মনে মনে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লেম, আজকাল না হোক, একদিন না একদিন উদ্ধার হবোই হবো।

দুজনে ভাবছি, পাশের ঘরের ঘড়িতে টুং কোরে ১টা বাজলো। বুঝলেম, রাত ১টা। একবার মনে কল্লেম, আর আহারে কাজ নাই, দোর দিয়ে শুই। আবার ভাবলেম, আমি যেন না খেলেম, কুসুমকে কিছু খাওয়ান চাই। এই ভেবে বুড়ীর আগমন প্রতীক্ষায় বোসে রইলেম।

অনেকক্ষণ পরে বুড়ী একখানা থালায় কোরে খানকতক লুচি, দুটি প্যাঁড়া, একটু তরকারী, আর একটী বড় পিতলের ঘটির একঘটি জল আন্‌লে। বুড়ী খাবার রেখেই হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "বৌমা! অমন

কোরে বোসে কেন গা? তোমার ঘর, তোমার দোর, দেখে শুনে নাও, আমি ত আজ আছি, কাল নাই।" বুড়ীর এই ফাঁকা কথা ফাঁকা হয়ে গেল। আমরা দুজনের একজনও কোন উত্তর কোল্লেম না। বুড়ী একটু যেন সঙ্কুচিত হলো। এদিক ওদিক চেয়ে—একটু পরে বোল্লে, "খাবার খাও। অনেক রাত হয়েছে।—আর কি বিছানা আনবো?" আমি বোল্লেম, "আন। এ বিছানায় কি বৌমা শুতে পারেন?" বুড়ী আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বোল্লে, "তা আনবো বৈ কি?—ভাল বিছানা না হলে কি ঘুম হয় মা? আমি ত খারাপ বিছানায় শুতেই পারি না।" এই রকম ভূমিকা কোরে বুড়ী বিছানা আনতে গেল। খাবারগুলি নিয়ে কুসুমকে আগে খাওয়াতে চেষ্টা কোল্লেম। কুসুম ভেবেই আড়ষ্ট, খেতে কি আর তার ইচ্ছা আছে? অনেক জিদাজিদির পর,—অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে দুখানি লুচি মাত্র খাওয়ালেম! আমিও যা পারলেম, খেলেম। বড় তৃষ্ণা পেয়েছিল,—দুজনে সমস্ত জলটুকু খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ কোল্লেম। তখন শরীর অনেকটা শীতল হলো।

জল খেয়ে আমরা বোসেছি, এমন সময় আবার সেই বুড়ী। দুটি কাল কাল বালিশ, আর একখানা তোষোক এনে উপস্থিত কোল্লে। বালিশ যে দুটি ছিল, নূতন দুটিও প্রায় সেই রকম। গুণের মধ্যে তুলোওড়া নয়। তোষোকটি হাতে কোত্তেই এমন দুর্গন্ধ বেরুলো যে, সেটি ঘরে রাখতেও ইচ্ছা হলো না। বুড়ীকে তোষকটি ফেরত দিয়ে আমরা সেই ছেঁড়া মাজুরীতেই শয়ন কোর্ব্বো, স্থির কোল্লেম। বুড়ীকে বিদায় দিয়ে—দোর বন্ধ কোরে দুজনে একত্রে সেই মাজুরীতে শুলেম! শুয়ে শুয়েও দুজনে অনেক কথা হলো। কুসুমকুমারী আমাকে এর মধ্যেই দিদি বোলে ডাকতে আরম্ভ কোল্লেন। তাঁর সেই স্নেহমাখা দিদি সম্বোধনে আমার যেন অনেক কষ্ট লাঘব হলো। আমরা দুজনে দুজনের অবলম্বন হয়ে—দুজন দুজনের উদ্ধারে প্রতিশ্রুত হয়ে কত কথাই বোল্লেম।

কুসুমকুমারীর মুখে দিদি সম্বোধন শুনে আর এক কথা মনে পোড়ে গেল। সরোজবাসিনীও আমায় এই রকম আদর কোরে—এই রকম প্রাণ খুলে দিদি বোলে ডাকতো। আহা! সরোজবাসিনীর কথা মনে কোরে চোকে জল এলো। সরোজ যথার্থই আমায় বড় ভালবাসতো। আমার কাছ ছাড়া হয়ে এক দণ্ডও থাকতো না। আসার সময় এ কটিবার

মুখখানি দেখেও আসুতে পেলেম না। যদি জানতেম, এই বিদায়ই আমার জন্মশোধ বিদায় হবে, আর আমি পাটনায় যেতে পাব না, আর আমি সরোজকে দেখ্‌তে পাব না, আমার জন্মের মত নির্ব্বাসন এই, তা হলে আমি একবার জন্মের মত প্রাণভোরে সরোজকে দেখে আসতেম। আসবার সময় সরোজের গলাটি ধোরে কেঁদে কেঁদে বোলে আসতেম, "সরোজরে! তোর দিদি আজ জন্মের মত তোদের মায়া কাটিয়ে চোল্লো।" এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে চোকে জল এলো। আপন মনে কতই কাঁদলেম। আপন মনে মনকে কতই বুঝলেম। যে পাষণ্ড বিনা দোষে আমায় নির্ব্বাসন দিয়েছে,—যে পিশাচ আমাকে বিনা অপরাধে এমন যন্ত্রণা দিচ্চে, সেই নরপশু রায় মহাশয়ের নাম মনে হতে বড় দুঃখ হলো। গিন্নি, যিনি আমাকে আপন কন্যার মত যত্ন কোত্তেন,—আদর কোরে খাওয়াতেন, সেই গিন্নীর চরিত্র মনে হয়ে বড় অভিমান হলো।—আবার চোকে জল এলো। আপনা আপনিই আবার সম্বরণ কোল্লেম। আবার হতভাগিনী কুসুমের কথা মনে হলো। তার আশায় নৈরাশ,—মনে পোড়্‌লো। আরও মনে হলো, একেই বলে,—বাড়াভাতে ছাই!

সপ্তম চক্র।

এ বাড়ীটি তবে কার?

রজনী প্রভাত। সুখীর সুখ-রজনী,—দুঃখীর দুঃখ-রজনী প্রভাত। আবার সুখীর দুঃখ-রজনী,—দুঃখীর সুখ-রজনীও প্রভাত। প্রভাত চিরদিনই হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি; এই চারযুগেই রজনী প্রভাত হয়, কিন্তু এই প্রভাত সকলের ভাগ্যে সমান সুখ দিতে পারে না কেন? প্রভাতে

কেহ হাসে, আবার কেহ কাঁদে কেন? এ কথার তাৎপর্য্য স্থির করা বড় কঠিন কথা। প্রভাতে সুখও আছে, দুঃখও আছে। পতিপ্রাণা প্রবাসবাসী-স্বামীর আশাপথ চেয়ে যখন বোসে থাকেন, তখন যত শীঘ্র প্রভাত হয়, ততই তাঁর আনন্দ; আবার যখন প্রবাসগমনোন্মুখ-স্বামীর প্রবাসগমনের শেষনিশি সমাগত হয়, তখন প্রিয়তমা কাতরে প্রার্থনা করেন, "রজনি! আর একটু অপেক্ষা কর। চন্দ্রদেব! তোমার ওমুখ অনেকবার দেখবো। স্বামী প্রবাসে গেলে, ছাদে বোসে আকাশের গায় তোমার ঐ মুখ দেখে উদাস-প্রাণে ধৈর্য্য ধারণ কোর্ব্বো। এখন একটু অপেক্ষা কর, স্বামীর মুখচন্দ্রদর্শনে এত শীঘ্র বঞ্চিত করো না।" পীড়িত পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির, নিশাশেষে তত যন্ত্রণা নাই, একটু নিদ্রা এসেছে, তাঁর আত্মীয়স্বজন তখন প্রার্থনা করেন, "রজনি! একটু অপেক্ষা কর, পীড়িতের যন্ত্রণার একটু বিরাম দাও।" পতিশোকাতুরা-রমণী মৃতপতি ক্রোড়ে গভীর শোকে পাগলিনী, করযোড়ে বিনীতবচনে প্রার্থনা করেন, "রজনী! আর প্রভাত হয়ো না। তুমি প্রভাত হলে আমার মৃতপতিকে আর দেখতে পাব না।" বালিকা অযোগ্য-স্বামীর লাঞ্ছনায় অতি মাত্র বিরক্ত হয়ে কাতরে প্রার্থনা করে, "রজনি! তুমি প্রভাত হও, এ লাঞ্ছনা আর সহ্য হয় না।" নায়িকা কুসুমভূষণে ভূষিতা হয়ে যখন আশান্বিত-হৃদয়ে নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করেন, পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে যখন রজনী প্রভাতপ্রায় হয়, তখন তিনি শেষ আশায় হৃদয় বেঁধে প্রার্থনা করেন, "রজনি! আর একটু অপেক্ষা কর।" যে দণ্ডপ্রাপ্তব্যক্তি রজনী প্রভাত হলেই দণ্ড ভোগ কোর্ব্বে, সেও কাতরে প্রার্থনা করে, "আর এ নিশি যেন পোহায় না।" প্রভাত কিছু সকলের ভাগ্যে সমান ফল প্রসব করে না। আমরা যে কি প্রার্থনা কোল্লেম, তা আর এখন প্রকাশ কোত্তে পাল্লেম না।

রজনী প্রভাত। চিরদিন যেভাবে রজনী প্রভাত হয়, আজও সেইভাবে রজনী প্রভাত হলো। আমরা উঠে বোস্‌লেম। মাতালদের আর কোন সাড়া পেলেম না। রাত্রে তারা শুয়েছিল জানি,—মদের ঘোরে অচৈতন্য হয়েছিল তাও জানি, কিন্তু সকালে তারা যে কোথায় গেল, তা জানি না। আমরা উঠতেই বুড়ী, এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে হাত মুখ ধুতে গেলেম। আমার যথাস্থানে এসে বোস্‌লেম।

আমরা বোসে আছি, এমন সময়ে সর্ব্বেশ্বরবাবু এলেন। হাস্‌তে হাস্‌তে

দরোজার কাছে এসে বোল্লেন,—"তবে বৌঠাকরুণ! ভাল আছ ত? মনে কিছু কোরো না—কোন চিন্তা নাই,—দাদা এখনি আস্‌বেন। এখন না আসেন, সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই আস্‌বেন। কোন চিন্তা নাই।" সর্ব্বেশ্বরের কু-মৎলব কুসুমকে যে বোলেছি, সর্ব্বেশ্বর সে কথা জানেন না। সেই জন্যই তাঁর এই মন-ভুলানো কথা। কাজে যা, তা আমিও জানি, কুসুমও অবশ্য জেনেছেন!

সর্ব্বেশ্বর যতগুলি কথা বোল্লেন, তার সকলগুলিই মায়া! সকলগুলিই জাল! অনেক কথা হলো। আমিও তার কোন উত্তর কোল্লেম না, কুসুমকুমারীও না। সর্ব্বেশ্বর আমাকে ডাকলেন। অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে চৌকি ছিল, বসালেন। মিষ্ট মিষ্ট কথায় স্নেহ-মমতা জানালেন। আমার সম্বন্ধে অনেক কথা হলো। এমন ভাবে কথা কইলেন যে, তার মধ্যে যেন কোর্‌কাফের বিন্দুবিসর্গও নাই। সর্ব্বেশ্বর বোল্লেন, "হরিদাসী, আমার এই সব কাজ দেখে মনে মনে কিছু সন্দেহ করো না। কতকগুলো বদ্‌মাইস লোক, যাদের মাথার উপর মুরুব্বী না থাকলে জগৎটাকে ছারে খারে দেয়, আমি মুরুব্বী হয়ে তাদেরই চরিয়ে নিয়ে বেড়াই। যে অত্যাচারী, তাদের উপরেই আমাদের যত অত্যাচার! যারা পরের সর্ব্বনাশ করে, আমার লোকেরা তাদেরই—সেই সমস্ত বদ্‌মাইস লোকেরই সর্ব্বনাশ করে। ভালমানুষ আমাদের মাথার মণি! আমরা তাদের কাছ দিয়েও যাই না। এই যে দুটি কাজ তোমার সাম্‌নেই হলো,—মনে করো না, এ সব আমাদের অন্যায়। এর মধ্যে যে সব রহস্য কথা—অদ্ভুত অদ্ভুত মজার কথা আছে, সে সব পরে জান্‌তে পারবে। তখন তোমার মনের সব ধোঁকাই ঘুচে যাবে। কোন ভয় নাই তোমার, তুমিও আমাদের একজন। আমাদের উপর রাগ করো না। তোমার পরিচয় কেবল আমিই জানি। তোমার জীবনের কথাগুলি আমার পেটেই লুকান আছে। সে সব কথা এখন বল্‌বার নয়। সময় হোক, দিন আসুক, কোন কথাই গোপন থাকবে না। সময়ে সব কথাই আমার মুখে শুনতে পাবে।" আমি সর্ব্বেশ্বরের কথায় আশ্চর্য্য জ্ঞান কোল্লেম। সর্ব্বেশ্বর আমার পরিচয় জানেন, আমি কে, কোথায় আমার বাড়ীঘর, কোথায় আমার মাতাপিতা আত্মীয়স্বজন, একমাত্র সর্ব্বেশ্বরই সে সংবাদ জানেন। এঁ হতেই আমি সত্য পরিচয় পাব। আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞাসা

কোল্লেম, "মাষ্টারবাবু! আমার জীবনের যে সব ঘটনা, তা জানবার জন্য আমি অনেক দিন হতে বড় ব্যাকুল হয়েছি। আমি কে, আমার পরিচয় কি,—সে সব কথা এখনি বলুন। কারও কাছে, সে রহস্য প্রকাশ পাবে না।—কেহই জান্তে পার্ব্বে না। আর আমাকে বাঁধায় ফেলে রাখবেন না। আপনি যদি না জান্তেন, জেনেও যদি এ কথা প্রকাশ না কোত্তেন, তা হলে ছিল ভাল। আপনি সব কথা জানেন, দুজনে একত্রে আছি, অথচ সে সংবাদ আমি জান্তে পাই না, এ বড়ই কষ্টের কথা! বলুন—এখনি বলুন।" সর্ব্বেশ্বর বাধা দিয়ে বোল্লেন, "ঐ জন্যই এতদিন বলি নাই।—এখন না,—আর দুদিন যাক। সময় হলে কোন কথাই অপ্রকাশ থাকবে না। এখন সে সব প্রকাশ কোল্লে তোমার ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। তোমার মঙ্গলের জন্যই বোল্‌ছি, এখন থাক। সময় হলে আমি আপন হতেই সে কথা প্রকাশ কোর্ব্বো। এখন পীড়াপীড়ি কোরো না। এখন সে সব কথা তোমার শুনে কাজ নাই।" আমি দেখলেম, এখন বেশী জেদাদিদি কোল্লে ফল হবে না। হয় ত চোটে উঠে একেবারেই বোলবে না। আর দুদিন বরং যাক্। এতদিন যে আঁধারে আছি, আরও না হয় দু-দিন সেই আঁধারেই থাকি। সর্ব্বেশ্বরকে আর বেশী পীড়াপীড়ি কোল্লেম না। বাজে কথাও অনেক হলো। কতক কথা বিশ্বাস হলো, কতক বা অবিশ্বাস কোল্লেম। কোন্ গুলি বিশ্বাস কোল্লেম, কোন্ গুলিতে সন্দেহ হলো, সর্ব্বেশ্বর তার কিছুই জানতে পাল্লেন না। সব কথাই যেন আমি বিশ্বাস কোরেছি,—সকল কথাই যেন আমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছি, এইভাব প্রকাশ কোল্লেম। অনেক কথার পর সর্ব্বেশ্বর আমায় বিদায় দিলেন। আমি আবার সেই ঘরে।

দেখ্তে দেখ্তে বেলা হলো। পাশের ঘরের ঘড়িতে টুং টাং কোরে ১১টা বেলা ঘোষণা কোল্লে। বুড়ী এসে আমাদের নাইতে নিয়ে গেল।

লোকে কত তপস্যা কোরে,—কত কষ্ট স্বীকার কোরে,—কত পুণ্যফলে কাশীতে ৺বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি দেখতে পায়। শুনেছি, অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য পুণ্য না হলে কারও ভাগ্যে কাশীদর্শন ঘটে না। আমরা তেমন পুণ্য কিছু করি নাই, তবুও বিনা চেষ্টায় আজ আমাদের ভাগ্যে কাশী দর্শন ঘটলো। এখন বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন হলেই জীবন স্বার্থক হয়। তা হলেই এত কষ্ট—এতমনস্তাপ, এত চিন্তার ভার কমে যায়। মন বিশ্বেশ্বর

দর্শনের জন্য ব্যাকুল হলো, প্রকাশ্যে কিছু বোল্লেম না। মনে মনে স্থির কোরে রাখলেম, সময় হলে আমার এ বাসনা পূর্ণ কোর্ব্বোই কোর্ব্বো।

কাল রাত হতেই আমরা যে এই অন্ধকূপে ছিলেম, এতক্ষণের পর আজ এই বেলা ১১টার সময় আমরা তিনজনে বাইরে এসে যেন আনন্দিত হলেম। এতক্ষণ প্রাণ যেন ত্রাহি ত্রাহি কোচ্ছিল, ফাঁকের ফাঁকা বাতাসে মনের যেন বেশ স্ফূর্ত্তি হলো। বাইরে বেরিয়ে আর বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখতে অবসর হল না। ফাঁকে বেরিয়ে মনের আনন্দেই চোলে এসেছি, কোন দিকে চাইতে পারি নাই! ফিরে যাবার সময় বাড়ীটির বাইরের চেহারাটা ভাল করে দেখবো, এ কথাটা মনে মনে স্থির করে রাখলেম।

দুই দিকেই বড় বড় বাড়ী, মধ্যে দিয়ে পাথরের পাকা রাস্তা। এমন ভয়ানক ভয়ানক বাড়ী আর আমি কোথাও দেখি নাই। সব বাড়ীগুলিই বড় বড়। যেন ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণের ঘর—সগর্ব্বে মাথা উঁচু কোরে দাঁড়িয়ে আছে। সব ঘরগুলিই পুরাতন, তেমন সুশৃঙ্খলা নাই। চুন খোসেছে, খিলান ফেটেছে, স্থানে স্থানে ইঁট বেরিয়ে পোড়েছে, তবুও বাড়ীটি সেই সমান গর্ব্বে খাড়া আছে। সকল বাড়ীতেই লোক কম। যে বাড়ীতে কুড়িখানি ঘর, সেখানে দুই একজন মানুষ, আর সব ঘর খালি। যেমন বাড়ী, তার মানান মত লোকজন না থাকলে সে যে কি ভয়ানক দেখায়, তা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন। এ সব বাড়ীতে ঢুকতেই গা কাঁপে। বাড়ীগুলি যেন খাঁ খাঁ কোচ্চে। রাস্তার দুধারেই এই রকম বাড়ী। আমরা দেখতে দেখতে চোল্লেম। অনেক দূর আসা হলো।—প্রায় আধ ক্রোশ। এতদূর এসে—সম্মুখে দেখলেম গঙ্গা। গঙ্গার ধারে যেতেই—গঙ্গার শীতল বাতাস গায়ে লাগতেই পথের ক্লেশ ভুলে গেলেম। এমন জল কোথাও দেখি নাই। যেমন পরিষ্কার, তেমনি শীতল, আবার তেমনি স্থির। গঙ্গার স্রোত নাই, স্থির জল। পূর্ব্বে শুনেছিলেম, বিশ্বেশ্বরের অনুরোধে গঙ্গা কাশীতে বল প্রকাশ করেন না। কাজেও এখন তাই দেখলেম। স্রোতের সম্পর্কও নাই, বেশ স্থির জল! গঙ্গার সব ঘাটই বাঁধা। যেখানে ইচ্ছা স্নান করা যায়। যতদূর নজর গেল, ততদূরই দেখলেম; সব ঘাট বাঁধা। মাঝে মাঝে এক একটা গোল গোল চত্তর। বৈকালে সেইখানে বোসে কাশীবাসীরা পরম সুখে গঙ্গার পবিত্র লহরী দেখেন,

সন্ধ্যাকালের শীতল বাতাসে মন প্রাণ পুলকিত করেন। শাস্ত্রালাপ হয়। একথা.বুড়ীর মুখে শুনলেম।

অনেক লোক। ঘাটে বিস্তর লোক। রাণার উঁপরে বড় বড় তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে এক একজন খোট্টা ব্রাহ্মণ চন্দন, ফুল, চরণামৃত, অর্ঘ্য, এই সব নিয়ে বোসে আছে। যার আবশ্যক, তাকে এই সব দিয়ে মূল্য নিচ্চে। গঙ্গার গর্ভে বোসে পেটের দায়ে এরা আপামর সাধারণের দান গ্রহণ কোচ্চে। কত বৃদ্ধ বৃদ্ধ লোক আকণ্ঠ গঙ্গার জলে ডুবিয়ে বড় বড় কোরে গঙ্গার স্তব আওড়াচ্চেন,—কত বউ-ঝি ঘোম্‌টার মধ্যে মুখ লুকিয়ে ডুব দিয়ে উঠে যাচ্চে। কত লোক সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য কোরে সচন্দন জবায় "মার্কণ্ড ভাস্করো রবিঃ" বোলে অর্ঘ্য দিচ্চেন। নানা রকম্ ধরণের নানা রকম ভাবের কত স্ত্রীপুরুষ স্নান কোচ্চে। আমি এই সব একমনে দেখছি, এমন সময় বুড়ী তাড়া দিলে। আমরা তাড়াতাড়ি নেয়ে নিলেম। মনে মনে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাকে নমস্কার কোরে, উদ্দেশে ভগবান বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম কোরে আমরা আবার বাসার দিকে চোল্লেন!

বাসার বাইবের চেহারাটা একবার তাল কোরে দেখ্‌তে হবে, এ কথাটা অনেকক্ষণ হতে স্থির কোরে রেখেছি। এখন বাড়ীর সাম্‌নে আস্‌তেই সেই কথাটা মনে পোড়ে গেল। চেয়ে দেখ্‌লেম,—বাড়ীর ভিতরেও যেমন, বাইরেও তেম্‌নি। অতি পুরাতন বাড়ী! গলির মধ্যে এত বড় বাড়ী, তাতে আবার লোকজন নাই! চারদিকে অতি দুর্গন্ধ, অতি অপরিষ্কার, কেবল বাড়ীর মধ্যে যাবার একটি ছোট রাস্তা ভিন্ন চারদিকেই অপরিষ্কার। সদর রাস্তা হতে এই বাড়ীটি এমন দূরে যে, এখান হতে খুব বেশী বেশী চীৎকার কোল্লেও শুনতে পাওয়া যায় না। এই গলির কেবল একখানি বাড়ীই যে বড়, তা নয়। সারী সারী ঠিক এক ধরণের,—একমাপের তিনখানি বাড়ী। তিনখানি বাড়ীর মধ্যে একটুকুও স্থান নাই।—পরস্পর সংলগ্ন। এমন ভাবে সংলগ্ন যে, তিন ভাগে বিভক্ত কোত্তে একটু বুদ্ধির প্রয়োজন।—তিনখানি বাড়ী এক ধরণের। না জানা থাকলে—কি একবার দুবার না দেখলে অজানা লোক তিনখানির কোন্‌খানিতে যে যাবে, তা স্থির কোত্তে পারে না। তিন খানির দরজাই এক মাপের; বাইরে সেই দরজা ভিন্ন আর দ্বিতীয় দরজা জানালা নাই; যেন গারদ। আরও দেখলেম, আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ পাশের বাড়ী

দরজার উপরে একটা চূণের দাগ। আমাদের দরজায় দুটি দাগ, আর বাম পাশের বাড়ীর দরজায় তিনটি চূণের দাগ। ঠিক একভাবে দাগ দেওয়া। মনে মনে বুঝলেম, এটা চিহ্ন। আমরা মাঝের বাড়ীতে আছি। সমান মাপের বাড়ী দুখানি আমাদের দুই পাশে। এই সব দেখে শুনে আমরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম।

দরজা সর্ব্বদা খোলা থাকে না। পালা মত এক একজন লোক ভিতর হতে দরজা বন্ধ কোরে বোসে থাকে। কেহ ডাকলে একটি ফাঁক দিয়ে দেখে দরজা খুলে দেয়। বুড়ী ডাকতেই একজন লোক আমাদের দেখে দরজা খুলে দিলে। ঢুকতেই আবার দরজা বন্ধ হলো।

আমরা আবার এ গলি দিয়ে—সে ঘরের মধ্যে দিয়ে—ওঘরের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে এলেম। বুড়ী দুখানা কাপড় এনে দিলে, তাই পোরে কাপড় ছাড়লেম। ছাড়া কাপড় দুখানি নিয়ে বুড়ী চোলে গেল। একটু পরেই চারটি প্যাঁড়া জল খেতে দিলে। দুজনে এক একটি খেয়ে জল খেলেম। মনে মনে রান্নার কথা ভাবছি, এমন সময় নীচের এক পাশের ঘরে নজর পোড়লো। দেখি, বড় বড় ডাবার ডেকে ভাত হচ্চে, তরকারী হচ্চে, দুজন হিন্দুস্থানী রসুয়ে ব্রাহ্মণ—গামলা গামলা তরকারী, হাঁড়ী হাঁড়ী দাল—ঝাঁড়ী ঝাঁড়ী ভাত রেঁধে স্তূপাকার কোচ্চে। কোথা হতে ষণ্ডা ষণ্ডা পাঁচ রকম লোক আস্‌ছে, খেতে বোস্‌ছে,—কাঁড়ী কাঁড়ী অন্ন ধ্বংস কোরে কে কোথা দিয়ে চোলে যাচ্চে। যেন অন্নক্ষেত্র লেগে গেছে। দেখতে দেখতে আমার সাম্‌নেই প্রায় পঞ্চাশ জন লোক খেয়ে গেল। এত লোক, সকলেই কি এই বাড়ীতে থাকে? কাল রাত্রে যখন আমরা আসি, তখন দেখেছিলেম, বড় জোর ৭।৮ জন। তবে এ সব লোক থাকে কোথা? সন্দেহ হলো, একটু উঠে—ঘুরে ফিরে দেখলেম, দরজা বন্ধ।—তবে এরা যায় কোথা?

বাবু আর এক ঘরে থাকেন। তিনি এ দলের চাঁই। তাঁর একটু আদবকায়দার দরকার, তাই আলাদা ঘরে একটু ভাল ভাবে থাকেন। চেয়ে দেখলেম, বাবু একখানি চেয়ারে বোসে কি একখানি কাগজ দেখছেন। আমার দিকে নজর পোড়তেই সহাস্যবদনে আমাকে আহ্বান কোল্লেন। রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। আমি কুসুমকে সাবধানে বোস্‌তে বোলে বাবুর খাস্‌-কামরায় উপস্থিত হলেম। ঘরটি বেশ বড়—দিব্বি হাওয়া

খেলে। ঘরের এক পাশে একটি পরিষ্কার বিছানা। একপাশে সারি সারি সাতটি লোহার সিন্দুক, দুটি টিনের বাক্স, একটি কাঠের কাজকরা হাতবাক্স! একদিকে পেরেকের গায়ে একটা বড় চামড়ার ব্যাগ, একটা গলায় ঝুলানো ছোট ব্যাগ; বিছানা বাদে যেটুকু স্থান, তাতে ঢালাও বিছানা। ঘরের বাইরে পেরেকে ঝুলান প্রায় কুড়ি পঁচিশটে খেলো হুঁকো। ভিতর দেওয়ালের গায়ে এক জোড়া দেওয়ালগিরি। বাবুর নিকটে একটি খুব বড় নলওয়ালা আলবোলা। পশ্চিম কোণের দিকে ছোট একটি মেজ। তার উপরে কতকগুলি কাগজ, একটি দোয়াত, গোটাকতক কলম, একখানা ছুরি। বাবু ঘরের দরজায় টুলে বোসে কি পোড়ছেন। আমি যেতেই পড়া বন্ধ কোরে বোল্লেন, "হরিদাসি! খাওয়া হয়েছে ত?" আমি ধীরে ধীরে বোল্লেম, "না, এখনো হয় নাই।" সর্ব্বেশ্বর বাবু লাফিয়ে উঠে—একটু চেঁচিয়ে বোল্লেন, "অ্যাঁ।—বল কি? এখনো খাওয়া হয় নাই?"—এই বোলে, ছুটে বারান্দায় এসে, নীচের দিকে মুখ ঝুলিয়ে চীৎকার কোরে হিন্দিতে বোল্লেন,—"দোবেজি, এদের এখনো ভাত দাও নাই?" দোবেজী থতমত খেয়ে বোল্লেন, "এই যে।" এই বোলে—তটস্থ হয়ে দুথালা ভাত আমাদের ঘরে এনে দিলেন। আমার উপর বাবুর অপার করুণা। তিনি সস্নেহে বোল্লেন, "ও ঘরটি বড়ই কদর্য্য! ওখানে তোমাদের থাক্‌তে বড় কষ্ট হচ্চে বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার এই পাশের ঘর তোমাদের জন্যে বন্দোবস্ত কোরেছি। আহারের পর এই ঘরে এস! এই ও ঘরের চাবি নাও। চাবি আপনার কাছে রেখো। নিজে খুল্‌বে, নিজে বন্ধ কোর্ব্বে। কারও হাতে চাবি দিও না। বড় ভাল ঘর। আমার এ বাড়ীতে এমন ঘর আর নাই।" এই বোলে একটি চাবি আমার হাতে দিলেন। বাবুর হাত হতে চাবি নিয়ে কুসুমের কাছে এলেম।

এসেই দেখি, দরজা বন্ধ। মনে বড় ভয় হলো। কুসুম ত কোন দুর্ঘটনা ঘটায় নাই? বিপদে পোড়ে কুসুম ত আত্মহত্যা করেন নাই? এই রকম ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে সবলে দরজায় আঘাত কোল্লেম।—কুসুম দরজা খুলে দিলেন। ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করার কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেম। কুসুম মুখে কোন উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরের দিকে সঙ্কেত কোল্লেন। পাশের ঘরে দেখি, ভয়ানক গোল! মদের স্রোত

চোল্‌ছে, গাঁজার ধোঁয়াতে ঘর অন্ধকার! চেঁচাচেঁচি,—ডাকাডাকি, হাঁকা-হাঁকিতে বাড়ীময় একটা মস্ত সোরগোল পোড়ে গেছে! কুসুমকুমারী এই সব কাণ্ড দেখে ভয়ে ভয়ে দরজা দিয়েছেন। আমিও ঘরে এসে দরজা দিলেম। ভাতের ঢাকা খুল্লেম। দেখি, ভাত,—কতকটা কড়ায়ের দাল, আলুপটলের খোলা—পাকা থোড়, এই সব পাঁচ রকম দিয়ে একটা ছ্যাঁচড়া, আর দুখানি ভাজা মাছ। উপকরণ এই পর্য্যন্ত। আমরা দুজনে এরই সাহায্যে যা পাল্লেম, তাই আহার কোল্লেম। এমন জঘন্য ঘরে থাকা বড়ই কষ্ট-কর, এই ভেবে, তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ কোরে, বাবুর খাস্‌কামরার পাশের ঘরে এলেম। চাবি আমার কাছেই ছিল, দরজা খুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম।

ঘরটি নিতান্ত ছোট নয়। তবে পুরাতন বোলেই বা কিছু অপরিষ্কার। মেঝের সমস্তটা নূতন পাটি পাতা, দুটি তোষক, তিনটি নূতন বালিশ, বড় একটা মশারী, ঘরের আসবাব এই পর্য্যন্ত। আমরা যে ঘরে ছিলেম, তার তুলনায় এ ঘর প্রকৃতই যেন স্বর্গ।

আমরা আছি।—এই নূতন ঘরে আমরা দুটিতে বেশ আছি। রাত্রে লুচী তরকারী, দিনে ভাত। বৈকালে আর স্নানের পরে সামান্য রকম জলযোগ, আহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই। বুড়ী আমাদের সকল কাজকর্ম্ম করে। যা যখন দরকার হয়, তখনি তা এনে দেয়। এই রকম কোরে এক সপ্তাহ কাটালেম।

একদিন বেলা প্রায় ১টা, আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে ছিলেম, সবেমাত্র উঠে বোসেছি, এমন সময় পাশের ঘরে দুজন লোকের চড়া চড়া হিন্দি কথা শুনতে পেলেম। চড়া চড়া কথা, লম্বাচৌড়া তাগাদার কথা। হিন্দুস্থানী কড়া কড়া কথায়—তাদের জাতভাষায় বোলছে, "তিন মাসের ভাড়া বাকী।—সাতশো টাকা! তোমাদের কাছে টাকা ফেলে রাখা, বিশ্বাস কি? টাকা দাও, না হয় বল, সব কথা প্রকাশ কোরে দি। তোমাদের এ সব কাজে বাড়ী ভাড়া দেওয়া বড়ই বিপদের কথা। ভাড়া ফেলে রাখলে কি কোরে চলে?" বাবু কাতরতা জানিয়ে আর এক সপ্তাহ মেয়াদ নিলেন।

মনে বড় সন্দেহ হলো। প্রথমে ভেবেছিলেম, বুড়ীর বাড়ী, তার পর স্থির কোরেছিলেম, বাবুর বাড়ী। বাবু একথা নিজেও প্রকাশ

কোরেছেন। এখন আবার দেখি, বাবুর বাড়ীও নয়। এতেই সন্দেহ হলো, এ বাড়ীটি তবে কার?

অষ্টম চক্র।

বাক্সের মধ্যে আছেই বা কি?

প্রায় একমাস আমরা কাশীতে। মনের দুঃখ মনেই রেখে,—প্রাণের ব্যথা প্রাণের মধ্যে লুকিয়ে আমরা আজ প্রায় একমাস কাশীতে। এত দিন সেই একভাবেই আছি। কত লোক যায়, আসে, মাষ্টারবাবু ওরফে সর্ব্বেশ্বরবাবু কখনো বাসায় থাকেন, কখনো বাইরে যান, মধ্যে মধ্যে আবার আসেন, এইমাত্র। কোন গুরুতর ঘটনা, যা মনের সঙ্গে গেঁথে রাখা যায়,—... ...লে প্রাণে আঘাত লাগে, যে ঘটনা দেখলে প্রাণের গায়ে সেই ঘটনার ছাপ পড়ে, তেমন কোন গুরুতর ঘটনা এই একমাসের মধ্যে ঘটে নাই। মাষ্টার বাবু জানেন, আমি লেখা পড়া জানি। পাটনায় আমি আর সরোজ, আমরা দুজনে রায় মহাশয়ের যত্নে ইংরেজী, বাংলা আর হিন্দি শিখেছিলেম। রায় মহাশয় প্রথম প্রথম যত্ন কোরে আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। এ সংবাদ সর্ব্বেশ্বরবাবু রাখেন। তাই সময় কাটাবার জন্য দুখানি সহজে বোঝা যায় এমন ইংরেজি গল্পের বই, দুখানি বাংলা সাহিত্য, আর একখানি নাগরী বত্রিশ সিংহাসন কেতাব আমাকে পোড়তে দিয়েছেন। সময় সময় তাই পড়ি, কুসুমকুমারী মনোযোগ দিয়ে তাই শোনেন। যেখানে না বুঝতে পারেন, আমি যত্ন কোরে বুঝিয়ে দি। কুসুমকুমারী বড় আনন্দিত হন। দুটি হতভাগিনীর জীবনের একমাস এইরূপ সুখেদুঃখে অতিবাহিত হলো।

একদিন ফাল্গুন মাসের প্রথমে আমাদের ঘরে বোসে একখানি ইংরেজী কেতাব পোড়ছি, আর কুসুমকে বুঝিয়ে দিচ্চি। কুসুমকুমারী ইংরেজী জানেন না, তাই প্রতি ছত্রে বুঝিয়ে দিতে হোচ্চে। পুস্তকখানি কোন ইংরেজদস্যুর গুরুঠাকুরের লেখা। ইংরাজ জাতীর ঘোরতর কলঙ্ক,—ভয়ানক

ভয়ানক পৈশাচিক ব্যবহার,—অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্য সেই কেতাবে ইংরেজি হরপে আঁকা আছে। আমরা দুজনে সেই কেতাবখানি পোড়ছি,—আর আমাদের এই দাল্-ভাত-খোর বাঙালীদস্যুর সঙ্গে রুটি-আলু-গোস্তখোর বিলাতী দস্যুর তুলনা কোচ্ছি। ফাল্গুন মাস, এখনি খুব গরম পোড়েছে। বেলা প্রায় ১টা! বড় গরম বোধ হচ্ছে, এক একবার পড়া বন্ধ কোরে ভিজে গাম্ছা দিয়ে মুখ-হাত মুছে আবার পোড়ছি।

পড়া একবার বন্ধ কোরেছি, অমনি কানে আওয়াজ গেল, ফিস্ ফিস্ কোরে কে যেন বোল্ছে, "আজ রাত্রে দেখা হবে। রাগ কোরো না।' কথাটা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারিত হলো। অতিকষ্টে দম বন্ধ কোরে, এই কথা কয়েকটি শুনলেম। সাম্নের বাড়ীতেই এই কথা। দরজার উপরেই আমাদের ঘর। গলিতে লোকজনের যাতায়াত বেশ দেখা যায়। ঘরের বাইরের দিকে জানালা নাই, উপরে ছোট একটি গোলাকার ঘুল্‌ঘুলি। অতিকষ্টে সেই ঘুল্‌ঘুলিতে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লেম, রাস্তায় একটি বাবু আমাদের বাড়ীর দিকে মুখ কোরে দাঁড়িয়ে এই কথা বোলছেন। আবার সামনের বাড়ীর নীচের ঘরে দাঁড়িয়ে একটি স্ত্রীলোক তারই উত্তর দিচ্ছেন। বাবুটি এমনভাবে দাঁড়িয়েছেন যে, কেহ দেখ্‌লে তিনি যে পাশের ঘরের কাকেও কিছু বোলছেন, সহসা এটি জান্‌তে পারা যায় না। বাবুটি বাবুরই মত। দিব্যি ফুটফুটে ছোকরা,—গায়ে নিমুর মেরজাই আছে,—হাতে এক গাছা সরু ছড়িও আছে। বাবুটি একটু রোগা, তাই একটু লম্বা লম্বা বোলে বোধ হয়। মুখখানিও লম্বা। রগ বসা, গাল বসা, নাকটা লম্বা, চোক দুটি ডাগর। গোঁপ আছে, দাড়ী নাই, কিন্তু খুব বড় বড় জুলপী আছে, তাতে মুখখানা আরও বেমানান দেখাচ্ছে। বাবুর চেহারাটি ছিল ভাল, বোধ হয় বদচালে অল্পবয়সেই শরীরের লাবণ্য মাটি কোরেছেন। বাবুর বয়স ত্রিশের মধ্যেই আছে। আর যে স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাবুর কথার উত্তর দিচ্চেন, তার চেহারার সমস্তটা দেখ্‌তে পেলেম না। তবে যেটুকু দেখ্‌লেম, তাতেই বোঝা গেল, তিনি যুবতী। বর্ণটা কটা। গৌরবর্ণের মধ্যে যে একটু লাল লাল আভা বেরিয়ে, রংটিকে মানানসই করে,—যুবতীর গৌরবর্ণে সেই লাল আভাটুকু নাই। তাতেই কটা বোলে বোধ হোলো। চেহারা মাঝারী। চুল খোলা ছিল, তেমন বেশী লম্বাচুল নয়, ছোট। বয়স

অনুমানে বোধ হলো, উনিশ কুড়ি। বাবু চুপি চুপি বোল্‌ছেন, "রাগ কোরো না। তুমি রাগ কোল্লে, আমার আর আছে কে? বসন্! তুমিই আমার সব—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। তোমার জন্যই ত এত? রাত ১১টার সময় আমি নিশ্চয়ই আস্‌বো।" বাবু যুবতীর নাম বোল্লেন, বসন। বসন হয় ত আদরের নাম। পুরা নাম বসন্ত। আমরা আপাততঃ মনে মনে যুবতীকে বসন্ত নামেই জেনে রাখ্‌লেম। বসন্ত যেন কাঁদ কাঁদ হয়ে বোল্লে, "এমন কোরে আর কত কাঁদাবে? এমন কোরে যদি দাগা দেবে—এমন কোরে যদি পথে বসাবে—যদি এমন কোরেই কষ্ট দেবে, তবে কেন আমার সর্ব্বনাশ কোল্লে? আজ আমার শেষ দিন। এসো, তোমার পায়ে পড়ি, আজ আর যেন কাঁদিও না। একটু বেশী রাত্রে এসো। আমি ছাতের উপর থাক্‌বো। বাইরের ঘরে লোক আছে। আবার আমায় নিতে এসেছে। কাল বৈকালে এসেছে। জেদ্ কোচ্চে, নিয়েই যাবে।—যাবেই যাবে। কোনমতেই শুন্‌বে না। তুমি একটা উপায় না কোল্লে আর আমার উপায় নাই। যাই—তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার মুখ না দেখে কি কোরে থাক্‌বো,—কি কোরে বাঁচ্‌বো? তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবার এসো। সব যোগাড় কোরে রাখ্‌বো, রাত ১টার সময় এইখানে এসো।"

কি সর্ব্বনাশ! বসন্ত ত সামান্য রসন্ত নয়? এ সব কি কথা? বসন্তের চরিত্র যে অতি ভয়ানক, তা বেশ বুঝ্‌লেম। স্বামী আছেন,—নিতে এসেছেন, তা যাবে না? পতির প্রেম তুচ্ছজ্ঞান কোরে, উপপতির প্রেমে উন্মত্ত হয়েছে? এদের চরিত্র দেখে আতঙ্ক হয়! সংসারে এমন লোকও আছে? যে সব কুলকামিনীরা সাধারণতঃ সতী নামেই পরিচিত, তাদের মধ্যেও এমন দুশ্চারিণী থাকে!—পৃথিবী এ সকল পিশাচিনীর ভার কেন ধারণ করেন, জানি না।

বাবু বসন্তের কথার উত্তরে বোল্লেম, "নিশ্চয়ই আস্‌বো! কোন চিন্তা নাই তোমার। কেশববাবু এসেছেন—সে জন্য তোমাকে বেশী ভাব্‌তে হবে না। আমি যা হয় একটা উপায় কোর্ব্বই কর্ব্বো। এখানে না পারি, লক্ষ্ণৌ যাব। তিনি ত এখন বাড়ী যাবেন না? চাকরী-স্থানেই ত নিয়ে যাবেন? তবে আর ভাবনা কি তোমার? যদি আজ কোন সুযোগ হয় উত্তম, না হয় সেখানে গিয়েও হবে। আমি কি ভাই

চুপ কোরে আছি? তুবি আমায় যা কোরেছ,—তোমার জন্যে আমার প্রাণ যা কোচ্চে, তা আমিই জানি, আর ঈশ্বরই জানেন।” বসন্ত আরও কাঁদ কাঁদ হয়ে, কাঁপা কাঁপা আওয়াজে বোল্লে, “নরেন্। প্রাণের নরেন্! তুমি যে আমায় ভালবাস, তা কি আমি জানি না? তুমি যদি আমাকে ভালই না বাস্‌বে, তা হলে আমার জন্যে দেশ ছেড়ে এখানে আস্‌বে কেন? বাবা কাশীসাসী হলেন, মা, আমি সকলেই কাশী এলেম। তুমি যে কেবল আমার জন্যেই এসেছ, তা কি আমি জানি না? একটু দাঁড়াও, আমি টাকা দিচ্ছি। লোকজন যোগাড় কর। আমাকে যাতে নিয়ে যেতে না পারে, তাই কর। তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। তুমিই আমার সব। তার সঙ্গে আমি কখনই যাবনা। প্রাণের টান না থাক্‌লে, মনের মিল না হলে কি ভালবাসা হয়? হোক না কেন বড় লোক, হোক না কেন বড় চাকরে,—হোক না কেন স্বামী, তা বোলে তার সঙ্গে যে যেতে হবে, তাকে যে ভালবাস্‌তে হবে, এমন কি কথা? যাব না আমি। এতদিন বাবার আশা ছিল, এতদিন পরে তিনিও মত দিয়েছেন। তবে আমার উপায়?”

বাবু একটি ছোট খাট দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে—ভালবাসার সাগরে যেন হাবু-ডুবু খেয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বোল্লেম, “কোন ভয় নাই তোমার। টাকা দাও, অবশ্যই উপায় হবে। মাথার উপর ভগবান আছেন। অবশ্যই তিনি মুখ তুলে চাইবেন।—অবশ্যই একটা না একটা উপায় হবেই হবে।”

ভগবান্ আছেন!—বড় আশ্চর্য্য কথা! এ কাজে ভগবান্ যদি সহায় হন, তবে তিনি কেমন ভগবান? তিনি পাপীর শাস্তিদাতা, আর এই পাপকাজে তিনি সহায় সবেন? এও কি বিশ্বাস্য?

বাবুর কথা শেষ হলেই বসন্ত জানালা গলিয়ে একতাড়া কাগজ ফেলে দিল্ল। বাবু সেই কাগজ তাড়াটি কুড়িয়ে নিয়ে সাঁ কোরে উত্তর দিকে চোলে গেলেন। আমি বেশ বুঝতে পাল্লেম, সেগুলি সবই নোট।

ব্যাপার দেখে বড় কৌতূহল হলো। এ কাণ্ড এখন কতদূরে দাঁড়ায়, এ শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়, তাই দেখ্‌বার জন্যে বড় কৌতূহল জন্মাল। কখন্ সন্ধ্যা হবে,—কখন্ আবার বাবু আস্‌বেন,—কখন্ আরও রহস্য শুন্‌তে পাব, মনের মধ্যে তাই কেবল তোলা পাড়া কোত্তে লাগ্‌লেম। আগে

এমন পাপ কথা শুন্‌লে কানে হাত দিতেম, এখন এই পাপসংসর্গে থেকে মনের গতি যেন অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে, নতুবা এসব কথা শুন্‌তে, এসব রহস্য আরও ভাল কোরে জান্‌তে মন এত ব্যাকুল হবে কেন? আমর কখন্‌ সন্ধ্যা হয়,—কখন্‌ রাত ১টা বাজে, এই অপেক্ষায় বোসে রইলেম আর এই ঘটনা—এদের কথাবার্ত্তা মনে মনে তোলাপাড়া হতে লাগ্‌লো।

সন্ধ্যা হলো। আমাদের ব্যগ্রতায় সন্ধ্যা যে আজ সকাল সকাল হলো তা নয়, নিয়মিত সময়েই সন্ধ্যা হলো। আমরা ঘরে আলো জ্বাল্লেম। বাইরের দরজা বন্ধ কোরে পথের দিকে চেয়ে বোসে রইলেম। রাত ক্রমে ৭টা, ৮টা, ক্রমে আরও বেশী হোতে লাগ্‌লো। ৮টার সময় বুড়ী খাবার এনে দিলে। আমরা নিয়মিত জলযোগ কোল্লেম।

এই এক মাসের মধ্যে বুড়ীর সঙ্গে আমাদের বেশ একটু ভাব হোয়েছে বুড়ীও আমাদের এখন বেশ ভালবাসে। এদের দলের অনেক গুপ্তকথা চুপি চুপি গল্প করে, অনেক রহস্য গোপনে গোপনে প্রকাশ করে। আমরা উৎসাহ দি, প্রশংসা করি, বুড়ী আরও খুসী হয়ে সেই সব কথা অকপটে প্রকাশ করে। বুড়ীকে আদর কোরে বসিয়ে, আমাদের জলখাবারের অংশ দিয়ে—জল খাইয়ে, পাশের বাড়ীর সংবাদ নিলেম। বুড়ী কোন কথাই গোপন কোল্লে না। বুড়ী বোল্লে, "বাবু ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন। বাবুর আদি নিবাস পূর্ব্বদেশ। বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসী হয়েছেন। জমিদার লোক। পরিবার সঙ্গে আছেন। এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেটি দেশে থাকেন, জমিদারী দেখেন,—ছোট মেয়েটি এইখানেই আছেন। মেয়েটি বড় ভাল। বেশ চেহারা,—নাম বসন্ত। স্বভাব চরিত্র খুব ভাল। আমাদের বাবুর নজর পোড়েছিল,—কাজে কিন্তু কিছু হয় নাই। মেয়েটি দিব্যি দেখ্‌তে। বাবুর নাম গঙ্গানারায়ণ রায়। ঘরে আর কেহ নাই। বেশীর মধ্যে একজন চাকর আর একজন রসুয়ে।" বুড়ী বসন্তের চরিত্র খুব ভাল বোলেই জানে। আমরা আজ যা দেখ্‌লেম, সেটা বুড়ী জানে না, আমরাও প্রকাশ কোল্লেম না। বুড়ী আরও বোল্লে, বাবুর জামাই লক্ষ্ণৌ থাকেন, বড় চাকরী করেন, প্রতিমাসেই নগদ তিন শ টাকা বেতন পান। উপরিও বিলক্ষণ দশ টাকা আছে। বাবু মেয়েটিকে পাঠান না। তাঁর ইচ্ছে, জামাইকে ঘরেই রাখেন। জামাই তা না শুনে চাকরী করেন বোলে, কর্ত্তা রাগ কোরে মেয়ে পাঠান না। জল-

খাবার আন্‌তে গিয়ে শুনলেম, জামাই আবার এসেছেন।—কতবার ফিরে ফিরে জামাই বাবু আবার এবার এসেছেন। বসন্তকে বেশী বেশী ভালবাসেন কি না? তাই এত অপমানেও তবু আসেন। তা না হলে অমন বড়-লোককে মেয়ে, দিতে কত লোক হাতে ফুল নিয়ে বোসে আছে। জামায়ের নাম কেশব বাবু।" বুড়ীর সঙ্গে কথা কইতে ১১টা বাজ্‌লো। আর বেশী সময় নাই দেখে, বুড়ীকে বিদায় কোল্লেম। দুজনে ঘুল্‌ঘুলিতে মুখ দিয়ে নরেনবাবুর আগমন প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম। ক্রমেই রাত বেশী হতে লাগ্‌লো।
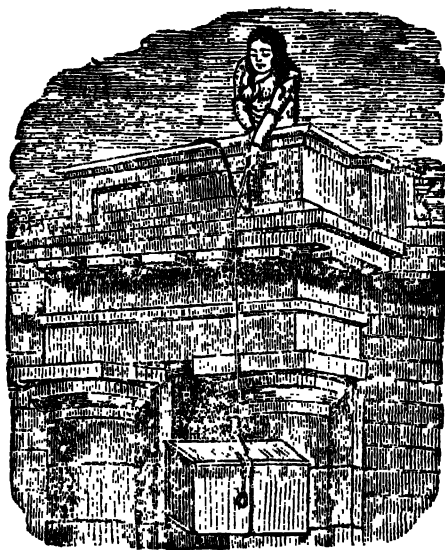
বোসে আছি। দুটিতে একদৃষ্টে পথের দিকে চেয়ে বোসে আছি, পাশের ঘরের ঘড়িতে ঠুং কোরে ১টা বাজলো। আমরা সচকিতে পথের দিকে আরও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলেম, কাকেও দেখ্‌লেম না। অনেকক্ষণ বোসে আছি, রাত যখন প্রায় দেড়টা, তখন বাবু সাঁ সাঁ কোরে এসে পাশের বাড়ীর কোণে দাঁড়ালেন। অমনি এক গাছা বড় দড়ি ছাতের উপর হতে সড় সড় কোরে নেমে এলো। বাবু চারদিকে একবার চেয়ে দড়িগাছটি বেশ কোরে হাতে জড়িয়ে ধোল্লেন, দড়ি উপরে টান পোড়লো। এমন সময় আর একজন লোক উত্তর দিক হতে একটা বাক্স মাথায় কোরে আস্‌ছে, দেখা গেল। বাবু বাক্সওয়ালাকে দেখে—হাত হতে দড়ি খুলে নিয়ে

দক্ষিণদিকে অমনি ভোঁ দৌড়! দড়িগাছটি সড় সড় কোরে উপরে উঠে গেল। বাক্সওয়ালা বাক্সটি মাথায় কোরে অতি সতর্কতার সহিত এসে বাবু যেখানে ছিলেন, সেইখানে দাঁড়ালো। কোমরে একখানা চাদর পাট করা জড়ান ছিল, লোকটা সেই চাদরখানি খুলে বেশ কোরে গায়ে দিয়ে বাবু সেজে দাঁড়ালো। প্রায় একঘণ্টা কাল কেটে গেল।

লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। এক একবার চারদিকে দেখ্‌ছে,—একবার একবার বাক্সের প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌ছে, আবার ছাতের উপরের দিকে চেয়ে আছে। এই রকমেও প্রায় আধঘণ্টা গেল। রাত তখন প্রায় আড়াইটে।

আবার দড়ি গাছটি সেই রকমে নাম্‌লো। আস্তে আস্তে দড়িগাছটি নেমে এলো। লোকটা দড়ি গাছটি ধোরে বেশ কোরে বাক্সটি বেঁধে দড়ি ধোরে বার কতক নেড়ে দিলে। বাক্স ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেল। লোকটা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বারকতক এদিকে ওদিকে চেয়ে আবার উত্তর দিকে ছুট্‌ দিলে।

এ সব কি কাণ্ড! এই সব কাণ্ড কারখানাগুলো দেখে আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যাচ্চে! এ সব কি ব্যাপার! স্বপ্নেও যে এ সব বিষয় কখনো দেখা যায় না। মাঝে এ লোকটা কোথা থেকে এসে, একটা বাক্স বেঁধে দিয়ে চোলে গেল। এই বা কে? বাক্সের মধ্যে আছেই বা কি?

নবম চক্র।

খুন! খুন!! খুন!!!

রাত্রি প্রায় তিনটের সময় শুয়েছিলেম। ঘুম ভাঙ্‌তে একটু বেলা হলো। ঘুম ভাঙ্‌তেই একটা মস্ত গোল কানে গেল। কুসুমকে তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুলঘুলিতে মুখ বাড়িয়ে দেখি, পাশের সেই বাড়ী, গলি রাস্তা, লোকে পুরে গেছে! লাল লাল পগ্‌ড়ী মাথায়—বড় বড় লাঠি, কোমরে চাপ্‌রাস-বাঁধা সিপাহীর দল,—বড় বড় ভুঁড়ীওয়ালা মাথায় কাল টুপি,—ইজারকোট পরা বাবু, আর মেলা বাজে লোকে গলিররাস্তা গিস্‌ গিস্‌ কোচ্চে। চারিদিকে সকলের মুখেই শব্দ—খুন! খুন!! খুন!!!

বাড়ীর ভিতর লোকে লোকারণ্য! জামাইবাবু, বৃদ্ধ গঙ্গানারায়ণ বাবু, বেহারা, সকলের হাতেই হাতকড়ী পোড়েছে। বসন্ত, গিন্নী, তাঁরাও নিষ্কৃতি পান নাই, তাঁরাও ঘোম্‌টা দিয়ে দুজন সিপাহীর হেপাজাতে রোয়েছেন। হৈ হৈ ব্যাপার! কাণ্ডকারখানা দেখে,—ভাবগতিক দেখে, আমার ত রক্ত শুকিয়ে গেল! ঠক্ ঠক্ কোরে শরীর কাঁপতে লাগলো! একি ব্যাপার! বদ্‌মায়েসের আড্ডায় আছি,—পাছে যদি আমাদেরই ধরা পাকড়া করে, এই এক প্রধান ভাবনা! বাড়ীর মধ্যে দুম্ দাম্ শব্দ হতে লাগলো! ছাদের উপরে, ঘরের মধ্যে, চারদিকেই পুলিসের লোক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি কোচ্চে। ছুটাছুটি পোড়ে গেছে! ব্যাপার দেখে কে?

চারজন লোকে ধরাধরি কোরে দড়িবাঁধা একটা বাক্স বাড়ীর ভিতর থেকে টেনে বাইরে আন্‌লে। দেখেই চিন্‌লাম, কাল রাত্রের সেই বাক্স! আরও কৌতুহল হলো। আরও মনোযোগ দিয়ে দেখলেম। পুলিসবাবুর হুকুম অনুসারে বাক্সের ডালা খোলা হোলো। সর্ব্বনাশ! বাক্সের মধ্যে গলা-কাটা একটা মানুষ! দিব্য ভদ্র-আনা চেহারা! গলার নলি কাটা! একটা কোপ ডান হাতের উপর দিয়ে গর্দ্দানটা দোফাঁক কোরে বেরিয়ে গেছে,—আর একটা পাঁজরা ভেদ কোরে পেটের ভিতর পর্য্যন্ত চোলে গেছে। এই দুটি ভিন্ন আর কোথাও কোপের চিহ্ন নাই। গায়ে জামা ছিল, পরণে একখানি কালাপেড়ে ধুতি ছিল, সমস্তই রক্তমাখা! যে ছোরা দিয়ে দুরাত্মা এই কাজ কোরেছে, সেই রক্তমাখান ছোরাখানিও সেই বাক্সের ভিতর পাওয়া গেল। ব্যাপার ভাল কোরে শোন্‌বার জন্যে নীচের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেম। সর্ব্বেশ্বরবাবু দরজা খোলা কি, টু-শব্দটী করা পর্য্যন্ত বন্ধ কোরে দিয়েছেন। আমাদের বাড়ীটিতে যে মানুষ আছে, এটীও কেহ জান্‌তে পাচ্চে না। আমাদের বাড়ীর দরজায় মোটা মোটা তালা বাহির হতে বন্ধ হয়েছে। যেন এ বাড়ীতে কেহই নাই।—সকলেই কিন্তু আছে, তবে নীরবে।

আমি গুটি গুটি নীচের ঘরে এসে দাঁড়ালেম। কেহই টের পেলে না। এখন প্রত্যেক কথাই বেশ শুন্‌তে পেলেম। মাঝে একটী দেওয়ালমাত্র ব্যবধান বই ত নয়। গলিরাস্তার উপরেই দারোগাবাবুর কেদারা পোড়েছে। তিনি আমিরী মেজাজে চিৎ হয়ে হাঁকডাক সোরগোল

কোচ্চেন। কাহাকেও দ্বীপান্তর দিচ্চেন, কাহাকেও পুলিপোলাও পাঠাচ্চেন, কাহাকেও ফাঁসিকাঠে ঝুলাচ্চেন, কাহাকেও বা চাবুক দেখিয়ে ভয় দেখাচ্চেন। এ সকলই কিন্তু মুখে,—কাজে কিছুই নয়!

কাগজ এলো,—কলম এলো। একজন সিপাহী, দোয়াত-দান ধরে, সভয়ে দারোগাবাবুর দক্ষিণদিকে দাঁড়ালো। বড় গরম,—একজন আরদালী পাখার বাতাস কোত্তে লাগলো। দারোগাবাবু ইংরাজী কেতায় পা ফাঁক কোরে কেদারায় ঠেস দিয়ে বোসে একবার বামে একবার দক্ষিণে হেলে বাবু-আনা-কেতার কসরত দেখাচ্ছেন। জমাদার-বক্সীরা বাড়ীর মধ্যে খানাতল্লাস—সুরথাল কোচ্চে। বেলা প্রায় ৯টা।

মকর্দ্দমার বিচারের ভার পুলিস-কর্ম্মচারীর উপর নাই। পুলিসের তদন্তনামাও আদলেতে প্রায় টিকে না। আদালতের নাম ধর্ম্মাধিকরণ; সেখানে ধর্ম্মের বিচার। আর পুলিস অধর্ম্মাধিকরণ। কলেকৌশলে—বলে-তোষামোদে পুলিসের কার্য্যসিদ্ধি। পুলিসসিংহ নিরীহ লোকের যম, যমের কাছে নিরীহ মেষ! এটুকু বিচক্ষণ বিচারকগণ জানেন, তাই পুলিসের কথা আদালতে তেমন গ্রাহ্য হয় না। পুলিস কেবল শান্তিরক্ষা কোর্‌বেন, অশান্তি হয় দমন কোর্‌বেন, না পারেন উপরে জানাবেন। অত্যাচার-কারীদের ধোরে বিচারকের হাতে দিবেন, পুলিসের কাজ এইটুকু হলেই যথেষ্ট, কিন্তু পুলিস এ কথা শুন্‌বেন কেন? তাঁর প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি কেনই বা নিশ্চেষ্ট হবেন? পুলিস এখানে বিচারকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে জবানবন্দী নিতে আরম্ভ কোল্লেন। জমাদারবাবু বড় বড়—তক্তা তক্তা কাগজ ভেঁজে নিয়ে বোসে গেলেন। বেত হাতে দারোগাবাবু মুখ খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে কিষ্কিন্ধ্যাবাসীর অনুকরণ কোরে জবানবন্দী নিতে লাগলেন।

কর্ত্তার জবানবন্দী।

সওয়ালজবাবে কর্ত্তা এইরূপ এজাহার দিলেন,—"আমার নাম শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ রায়, পিতার নাম ৺ রামরূপ রায়, নিবাস রুদ্রনগর। বয়স ৬৮ বৎসর, পেশা জমিদারী। এ পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। কেহ কখনো আমার বাড়ীতে আসে না। জামাই কাল বৈকালে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার সদ্ভাব আছে। এ পর্য্যন্ত আমার কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাই নাই। আজ পাঠাব স্থির ছিল। একটী পুত্র দেশে। যে লোক খুন হয়েছে, তাকে আমি চিনি না। রাত্রে ঘুম ভাঙে নাই, উঠিও

নাই। আমি কিছুই জানি না। আমার পরিবার ও কন্যার চরিত্র খুব ভাল একদিনের জন্যেও কোন সন্দেহ হয় নাই। আমার জমিদারীর সকল প্রজাই আমার অনুগত। কখনো কোন প্রজার প্রতি অত্যাচার করি নাই। জমিদারীর কোন লোক এখানে আসে নাই, এখানে তাদের বিচার হয় না। আমার জমিদারীর আয় ২৩ হাজার টাকা, এখানে মাসে তিনশ টাকা মাত্র খরচ হয়। মাসে মাসে টাকা দেশ হতে আসে। এখানে বেশী টাকা আমার কাছে নাই। বড় জোর গহনা ইত্যাদি সাকুল্যে দশহাজার। কারও উপর আমার সন্দেহ নাই। এ লোক আমার কেহই নয়। কখনো দেখেছি বোলে মনেও হয় না। কাল কোন লোক আমার বাড়ীতে আসে নাই।” কর্ত্তার জবানবন্দী এই পর্য্যন্ত।

জামাইবাবুর জবানবন্দী।

“আমার নাম কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পিতার নাম ৺ গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। নিবাস স্বরূপপুর, বয়স ৩২ বৎসর ৭ মাস। পেশা চাকরী আমি আজ ১৩ বৎসর বিবাহ কোরেছি। বিবাহ দেশে হয়। এ পর্য্যন্ত স্ত্রী আমার বাড়ী যায় নাই। আমি ৪।৫ বার নিয়ে যেতে যত্ন কোরেছি। নানা ওজর দেখিয়ে পাঠান হয় নাই। আজ আমার কর্ম্মস্থানে পরিবার নিয়ে যাবার কথা ছিল। আমার পরিবারের চরিত্র ভাল বোলেই আমার বিশ্বাস। পরিবারের চরিত্র সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। কখনো গোপন অনুসন্ধান করি নাই। কাল তিনটের সময়ে আমি এখানে এসেছি। এ বাড়ীতে অন্য কোন লোক দেখি নাই। যে খুন হয়েছে, তাকে কখনো আমি দেখি নাই বা চিনি না। শ্বশুর মহাশয় আমার সঙ্গে পরিবার না পাঠান ভিন্ন কোন দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই। ইহাঁদের উপর আমার বিশ্বাস আছে। আর কারও চরিত্র আমি কিছু জানি না।”

বেহারার জবানবন্দী।

“আমার নাম ছটুলাল। পিতার নাম গুরুদয়াল, জাতে আমরা হিন্দু-কুরমী। বাবুর এখানে ২ বৎসর ৪ মাস আছি। মাসে ৬৲ টাকা বেতন পাই। সকলেই আমায় ভালবাসেন। রাত্রে আমি এখানে থাকি না। কাজকর্ম্ম সেরে ১০।১১ টার সময় ঘরে যাই। পাঁড়ে ঘাটে আমার ঘর। আমার বিবাহ হয় নাই। ঘরে আমার এক ভাই, দুই বোন আর মা আছেন,

আমি কখনো কোন মকর্দ্দমায় আসামী হই নাই। ভাদ্র মাসে ডাকাতি আমি শুনেছি, দেখি নাই। দিদিবাবু আমায় ভালবাসেন। আমাদের বাড়ীতে অন্য লোক কেহ আসে নাই। দিদিবাবু একলা একঘরে থাকেন। সে ঘরে আর কেহই থাকে না। কাল ১০ টা কি ১১ টার সময় আমি ঘরে যাই। যাবার সময় কাকেও দেখি নাই। জামাইবাবু বড় ভাল লোক। তিনি যতবার এসেছেন, ততবারই আমাকে বক্সিস দিয়াছেন। যে খুন হয়েছে, তাকে আমি চিনি না। খুনের সময়—খুন যখন—আমি তখন বাড়ীতে গেছি।"

গিন্নীর জবানবন্দী।

"আমার নাম ভুবনমোহিনী, স্বামীর নাম * * *। আমার কন্যার চরিত্র খুব ভাল, কোন দোষ নাই। মায়ের সঙ্গে তার বেশ সদ্ভাব আছে। আমি কাকেও চিনি না।"

বসন্তের জবানবন্দী।

"আমার নাম বসন্তকুমারী। স্বামীর নাম * * *। আমি বরাবর বাপের বাড়ীতেই আছি। স্বামী আমায় ভালবাসেন। বাবা পাঠান না। আজ স্বামীর সঙ্গে যেতে আমার মত ছিল। যে খুন হয়, তাকে চিনি না। খুন যখন হয়, আমি তখন ছিলাম না—বাক্স আমি নিজে তুলি নাই। তোলা আমি কিছুই জানি না। বাক্স আমি দেখেছি। বাক্স আমি কখনো দেখি নাই। খুন কে কোরেছে, তা আমি জানি না। আর কারো সঙ্গে আমার ভালবাসা নাই। আগে ছিল,—এখন নাই। ভালবাসা আমি জানি না। বেহারাকে আমি ভালবাসি। রাত্রে সে আমার বাড়ীতে আমার ঘরে ছিল। কাল তাকে আমি দু-টাকা বক্সিস দিয়েছি। অনেক দিয়েছি! আমি একা একঘরে থাকি। একা ভয় পায় না।—কোন কোন দিন একা থাকলে ভয় পায়!—সব দিন ভয় পায় না। বাক্সে বাঁধা দড়ী আমাদের। আমি সে দড়ি চিনি না। আমি আর কিছুই জানি না। আমার নিজের এক হাজার টাকা ছিল। দু এক টাকা কোরে এ টাকা জমিয়েছিলেম। এখনো আছে। সব নাই, ৪।৫ শ আছে। টাকা খরচ হয়েছে। কাকে দিয়েছি, মনে নাই। কাল দুশ টাকা খরচ হয়েছে। কাকে দিয়েছি, মনে নাই। বেহারাকে দিই নাই। আমি কারও দিকে চাই না। ঘরেই থাকি, সামান্য লেখাপড়া জানি। পত্র ডাকে আসে জবাব দি। বাবা জানেন

অনেকে লেখে, স্বামীও লেখেন। তাঁকেও উত্তর দি! খুনের কিছুই আমি জানি না।"

জবানবন্দী শেষ হলো। দারোগাবাবু বাড়ীতে সরকারী চাবি লাগিয়ে সিপাহী মোতায়েন কোরে জবানবন্দীগুলি বড় বড় কোরে একবার পোড়ে স্বহস্তে কলম ধোল্লেন। পুলিসী কায়দায় তদন্তনামা লিখলেন,—

"মহামহিম মহিমার্ণব

শ্রীল শ্রীযুক্ত ম্যাজেষ্টর সাহেব বাহাদুর—

বরাবরেষু—

অধীন ঘাটির ৪২ নং পদাতীক মারফৎ এজাহারী বয়ান পাইয়া বেলা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় অকুস্থানে হাজির হওত মামলে সুরথাল ও সাক্ষীহায়ের জবানবন্দী মোলাহেজা করণান্তর শ্রীগঙ্গানারায়ণ রায় ও শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ছটুলাল ও শ্রীমতী ভুবনমোহিনী ও শ্রীমতী বসন্তকুমারী আসামীয়ানের লাস্ থাস্ হুজুর বরাবর চালান করা যায়। তদন্তমতে নামহীন খুনীলাস গলায় ও ডান হাতের পাঁজরা কাটা হেতু ছোরাঘাতে মৃত্যু অবধারণ করিলাম। ছোরা দীর্ঘে ১৫ ইঞ্চি ও প্রস্থে হালতক আড়াই ইঞ্চি, বাঁট হাড়ের বটে। কিসের হাড়, তাহা অধীন মালুমে আনিতে পারিল না। সে বিষয় কসুর মাঁপের হুকুম হয়। আসামীহায়ের ঘর দরওজায় সরকারী চাবী তালা লটকাইয়া ৫২ নং ও ১৩ নং পদতাতিকদ্বয়কে মোতায়েন করিয়াছি। খুনির কিনারা জন্য গোয়েন্দা লাগান ও সরকারী বক্সিসের ঘোষণা ও নানা তক্‌নামা দিবার প্রলোভিত করা ও নিজেও করিতেছি ও করিব, তাহাতে অধীন পোক্ত রটে। সম্প্রতি পদাতিক মারফৎ আসামীয়ানের হাজীর গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়। হুজুর মালিক নিবেদন ইতি।" সহি।

তদন্তনামাখানি লিখে দারোগাবাবু দুই তিনবার পোড়লেন। পড়া শেষ হোলে, আসামীদের যথাবিধি চালান দিলেন। আগে পাছে সিপাহী, মধ্যে আসামী, পাঁচজন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চালান হোলো। ক্রমে লোকের ভিড়ও কমে গেল। আমি উপরের ঘরে এলেম। আজকের এ ব্যাপেরর বিন্দুবিসর্গ কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। অনেক ভেবে চিন্তেও কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। এখনো কাণে কেবলই প্রতিধ্বনি হতে লাগ্‌লো— খুন! খু!! খুন!!!

দশম চক্র।

এই সবই ইন্দ্রজাল।

কাল্‌কের কাণ্ডগুলো দেখে একবারে হতবুদ্ধি হয়ে পোড়েছি। তবুও ইচ্ছা হচ্চে, বিচারে কি হয় একবার দেখে আসি। আমার ত সে ক্ষমতা নাই, কাজেই এ বাসনা ত্যাগ কোল্লেম। কেবল বুড়ীর দ্বারা সন্ধান নি। রোজ শুনি, আজও মকৰ্দ্দমা মেটে নাই,—খুনে এখনো ধরা পড়ে নাই। যতবার জিজ্ঞাসা করি, ততবারই এই একই উত্তর।

গঙ্গানারায়ণ বাবুর বাড়ী সেইরূপ দরজা বন্ধই আছে। দুজন সিপাহী সৰ্ব্বদাই সেই বাড়ীর দরজায় হাজির থাকে, সেখানে বোসেই গাঁজা খায়, সেখানে বোসেই সিদ্ধি ঘোঁটে, সেই দরজার পাশের ঘরেই দালরুটি বানায়, দারোগাবাবুর হুকুমও এই রকম। সিপাহী দুজন হাজির রুজু থাকার জন্য আমাদের বাড়ীর কেলেঙ্কারীও অনেকটা কোমে গেছে। মাতালের আর তেমন চীৎকার নাই,—গেঁজেলের আর তেমন হাঁকডাক নাই, গুলিখোরের ভাঙা গলায় আর কুকুর-রাগিণীর আলাপ নাই,—আমোদের দামে খোলা প্রাণের আর সে উচ্চ হাসি নাই, সব নীরব। তবে যে একেবারেই নাই, তাও নয়। আছে সব, তবে কম আর বেশী।

আমাদের এক পাশের ঘরে বাবু সর্ব্বেশ্বর থাকেন, অপর পাশের ঘরটী চাবি বন্ধ থাকে। সে ঘরটী যে কেমন, তা এ পৰ্য্যন্ত দেখি নাই। একদিন বুড়ী বোল্লে, "এমন মজার ঘর আর কোথাও নাই। বড় চমৎকার! ঘরের ভিতর গেলেই বড় মজা দেখবে। ঘরের চারধারে চারখানি বড় বড় কাচ আঁটা,—দেওয়াল জোড়া কাচ;—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোটা কাচ। এত বড় কাচ আর হয় না। সেই কাচের বড় সরেস গুণ। একদিকে যদি দাঁড়ানো যায়, তবে কেউ তাকে দেখ্‌তে পায় না। ঘরে যদি দশজন লোক থাকে, দরজায় দাঁড়িয়ে তার একটীকেও কেউ দেখতে পাবে না। বোধ হবে, ঘরে যেন লোক নাই। আর একখানা কাচের নিকটে যদি একজন লোক দাঁড়ায়, তা হলে দরজায় দাড়িয়ে দেখলে বোধ হবে, ঘরে যেন একশ দুশ লোক রয়েছে। আর একখানা কাচে বড় একটা আঁকা ছবি।

বড় একখানা জাহাজ ঝড়বৃষ্টি পোড়ে ডুবে যাচ্চে! জাহাজের লোকগুলো কেউ জলে পোড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে,—প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কেউ মাস্তলে উঠেছে, ঝড়ের বেগে কেউ বা মাস্তল হতে ছিঁড়ে জলে ছিট্‌কে পোড়েছে, কেউ বা জলে এখনো পড়ে নাই, মাঝামাঝি রাস্তায়—তখনো শূন্যের উপর আছে। কেউ বা এইমাত্র পোড়্‌ছে। একদিকে জাহাজে আবার আগুন ধোরে গেছে। ধোঁয়া উঠ্‌ছে, দাউ দাউ জ্বোল্‌ছে, হঠাৎ দেখলে ভয় লাগে! এই ঘনঘটা যেন তোমার সাম্‌নে হোচ্চে, এমনি বোধ হবে। শুনেছি, সেই ছবির আরও কি কল আছে। আমি সেটা জানি না! আর একদিকে যে কাচখানি আছে, সেখানি জোড়া কাচ, এখানি দোরের দুই পাশে। মাঝে দোর আছে কি না, তাই কাচখানার মাঝের খানিকটা নাই। এ কাচের এই গুণ যে, সেইদিকে যত চেয়ে থাক্‌বে, ততই নূতন নূতন ভাল ভাল চিত্রকরা ছবি দেখ্‌তে পাবে, একবার একখানা দেখ্‌লে, তখনি আবার চেয়ে দেখ, সেখানি আর নাই, আবার একখানি নূতন ছবি। বড় ভাল ভাল ছবি। শুনেছি, একমাস ধোরে দেখ্‌লেও এর ছবি ফুরায় না! দণ্ডে দণ্ডে আপনা হতেই নূতন নূতন ছবি দেখ্‌তে পাবে। আমার আর একবার দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা, তা আমার কথা ত কেউ গ্রাহ্য করে না, তুমি যদি বল, তা হোলে বাবু রাজী হলেও হতে পারেন। আমার কাছে ঘরের বৃত্তান্ত যে তোমরা শুনেছ, তা যেন বোলো না। তা হলেই সর্ব্বনাশ! দেখা ত হবেই না, লাভের মধ্যে আমার প্রাণটা যাবে। কোন্ ফাঁকে কেটে কুচি কুচি কোরে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবে। তোমরা বোল্‌বে, না বোলেই, বিশেষ সওয়াল জেরা কোল্লেও পেটের কথা মুখে আস্‌বে না জেনেই বোল্লেম। খুব সাবধান! দেখো, যেন হিতে বিপরীত না হয়!

বড়ীর কথায় বড় কৌতূহল হলো। ঘরটা যে একবার দেখ্‌তে হবে, মনে মনে এই স্থির কোরে রেখে, বুড়ীকে বল্লেন, "কোন ভয় নাই তোমার। কোনমতেই এ কথা প্রকাশ পাবে না। তুমি যাতে আর একবার ঐ ঘর দেখ্‌তে পাও আমি তা কোর্‌বোই কোর্‌বো।" এই কথায় বুড়ীকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় কোল্লেম। আমিও সুযোগ দেখ্‌তে লাগ্‌লেম!

সর্ব্বেশ্বরবাবু বাসায় এলেন। কদিন তিনি বাসায় ছিলেন না। তিন দিন পরে বাসায় এলেন। বাসায় এসে একটু জিরিয়ে—জল খেয়ে—তামাক

খেতে খেতে আপনার ঘরে বোসেই আমাকে ডাক্‌লেন। আমি তখনি তাঁর ঘরে হাজির। সর্ব্বেশ্বরবাবু সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসা কোল্লেন।—আমরা কেমন আছি, আহারাদির কোন কষ্ট ছিল কি না, শোবার কোন কষ্ট হয় কি না, সকলের শরীর কেমন আছে, এই সব সংবাদ মাষ্টারবাবু একে একে জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমিও ঘাড়টী নীচু কোরে সমস্ত কথাগুলির উত্তর দিলেম। তাঁর কথা শেষ হলে, আমি বোল্লেম, "মাষ্টারবাবু! আমাদের পাশের ঘরটী বেশ। অমন চমৎকার ঘর,—সর্ব্বদা বন্ধ রাখেন কেন? খুলে রাখ্‌লেও ত বসা উঠা যায়।" সর্ব্বেশ্বরবাবু হেসে বোল্লেন, "হরিদাসি! ও ঘরটী খোলায় নিষেধ আছে। ও বড় ভাল ঘর! ওর মধ্যে অনেক জিনিস আছে। সে সব বাজে জিনিস নয়,—বাসন তৈজস কাট্‌কাট্‌রার জিনিসও নয়, বড় মজার মজার জিনিস। কারও কাছে বোলো না, বড় গোপনীয় কথা। তোমাকে বরং একদিন দেখাব। দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে! প্রথমটা যেন কিছুই বুঝ্‌তে পারবে না,—ভয় পাবে, ঢুক্‌তেই সাহস হবে না। তোমায় এক দিন দেখাব।" বুড়ী যা বোলেছিল, সে কথাটা মিথ্যা নয়। আমি জিদ্ কোরে বোস্‌লেম। আব্দার কোরে বোল্লেম, "আমার দেখ্‌তে বড় সাধ হয়েছে,—আজই দেখান;—এখনি দেখান। যতক্ষণ না দেখাবেন, ততক্ষণ আমার ধাঁধাঁ ঘুচবে না। এখনি দেখাবেন আসুন!"

সর্ব্বেশ্বরবাবু আমার আব্দার অগ্রাহ্য কোল্লেন না;—হেসে বোল্লেন, "তবে চল।" এই বোলে একটী চাবি বাহির কোল্লেন। আমাদের ঘর থেকে বুড়ীকে ডেকে নিলেম। কুসুমকে দেখাতে সর্ব্বেশ্বরবাবু আপত্তি কল্লেন। যদি আপত্তিই করেন, তবে আর বেশী পীড়াপীড়িতে দরকার কি? কুসুমকে রেখে আমরা তিন জনে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম।

চমৎকার ঘর! সর্ব্বেশ্বরবাবু আগে ঢুকলেন;—একদিকের কাচখানির নিকটে দাঁড়িয়ে আমাকে বোল্লেন, "কি দেখ্‌ছো?" আমি অনেক অনুসন্ধান কোরেও ঘরে লোক দেখ্‌তে পেলেম না!—একটীও না; বুড়ীও গিয়ে সেই কাচের কাছে দাঁড়ালো। দুজন লোকের একটীও নজরে পোড়্‌লো না! এমন আশ্চর্য্য আর কি আছে? ঘরের ভিতর লোকে কথা কোচ্চে, আড়াল নাই,—লুকিয়ে নাই, পরিষ্কার ঘর,—তার মধ্যে দু-দুজন লোক, একটীকেও দেখতে পেলেম না? অতি আশ্চর্য্য!

সর্ব্বেশ্বরবাবু সেখান থেকে আর একখানি কাচের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেন। বুড়ীও সেই কাচের কাছে দাঁড়ালো। সর্ব্বেশ্বর বাবু বোল্লেন, "হরিদাসি! এবার কি দেখছো?" চেয়ে দেখি, অসংখ্য লোক!—দু-দশজন নয়—ঘরময় লোক। ঘরখানাকে যেন একটা মাঠ বোলে বোধ হলো। সেই মাঠে এক মাঠ লোক। কেবল সর্ব্বেশ্বরবাবু আর বুড়ী। খানিক পরে আবার নানাপ্রকার ভোল দেখা দিলে। কতকগুলো লোকের জামা গায়, দিব্য বাবু, কতকগুলো গা খোলা, কতকগুলো ঘোমটা দেওয়া, কতকগুলো বুড়ী। বুড়ীর মাথায় যেন কদম ফুল ফুটে আছে। এমন হাজার হাজার লোক। এ আবার পূর্ব্বের চেয়ে আরও আশ্চর্য্য।

সর্ব্বেশ্বরবাবুর অনুমতি অনুসারে আমিও ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। সর্ব্বেশ্বরবাবু দরজার দিকের সেই কাচখানির দিকে চেয়ে থাকতে বোল্লেন। আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেম। অসংখ্য ছবি দেখতে পেলেম। প্রথমে দেখলেম—

প্রথম ছবি।

একজন অশ্বারোহী। প্রকাণ্ড ঘোড়া—লেজ খাড়া কোরে ছুটেছে। ঘোড়ার গায়ে সব সাজ দেওয়া সাঁজোয়া, চক্ চক্ কোচ্চে। অশ্বারোহীর সমস্ত শরীর লোহার জামায় (বর্ম্ম) ঢাকা। একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অচৈতন্য যুবতীকে কোলে নিয়ে একটী বনের ভিতর দিয়ে চোলেছেন। চমৎকার ছবি! এইখানি দেখছি, হঠাৎ দেখি, সে ছবিখানি আর নাই। তখনি দেখি, প্রথম ছবির পরিবর্ত্তে—

দ্বিতীয় ছবি।

প্রকাণ্ড একটী গাছ। অনেক দূরে ডাল-পালা ছোড়িয়ে পোড়েছে। সেই গাছের আড়ালে একটী সুন্দরী। সুন্দরীর মুখে হাসি নাই। মুখখানি শুকিয়ে গেছে!—ঠক্‌ঠক্ কোরে কাঁপছে! সমস্ত কাপড় ছিঁড়ে গেছে—সভয়-দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। দূরে একটা প্রকাণ্ড চেহারার দস্যু পাকা বাঁশের লাঠি হাতে হাঁপাচ্চে—আর মোটা মোটা চোক ঘুরিয়ে চারদিকে চেয়ে সেই যুবতীকে অন্বেষণ কোচ্চে।—দেখছি,—বেশ দেখছি, অমনি এ ছবিখানি কোথায় চলে গেল।—সম্মুখে দেখি,—

তৃতীয় ছবি।

প্রকাণ্ড বন! বনে জনমানবমাত্র নাই। কেবল একটী পঞ্চমবর্ষীয়

মৃতশিশুক্রোড়ে অভাগিনী জননী!—এ চিত্র এমনভাবে চিত্রিত যে, দেখেই আমার চোকে জল এলো। অতি কষ্টে চোকের জল চোকেই সম্বরণ কোল্লেম। দেখতে দেখতে সে চিত্রের অন্তর্ধান। অমনি সম্মুখে,—

চতুর্থ ছবি।

আকাশে মেঘ উঠেছে। মেঘের কোলে ছোট ছোট পাখী উড়্ছে, চারদিক যেন নিস্তব্ধ! ভয়ানক প্রান্তর! লোকালয় নাই,—গাছপালা নাই,—পথ ঘাট নাই, কেবল ধূ ধূ মাঠ। সেই মাঠের মধ্যে একটী অসহায়া রমণী! অদূরে একখান পাল্কী কাৎ হয়ে পোড়ে আছে, অনেক দূরে বেহারারা পালিয়ে যাচ্ছে, এখনো রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে। তিনজন যমমূর্ত্তি দস্যু রমণীকে আঁকাড় কোরে ধোরে কোথায় নিয়ে যাচ্চে! রমণী প্রাণপণে চেষ্টা কোচ্চেন, প্রাণপণে বল প্রকাশ কোচ্চেন, বিফল সবই হোচ্চে। রমণীর সেই সকাতর মুখখানি দেখলে পাষাণের চোকেও জল আসে। দেখছি,—বেশ ভাল কোরে দেখছি, অমনি সেখানি অদৃশ্য। সম্মুখে আবার দেখলেম,—

পঞ্চম ছবি।

বিবাহসভা! একদিকে বরযাত্রীরা সারি সারি বোসে আছেন। তামাক চোল্‌ছে। কেহ কাৎ, কারও গালে হাত, কারও কোঁচায় হাত, কেহ হেলে, কেহ টেরে, নানা ভঙ্গীতে বোসে আছেন। পুরোহিত বোসেছেন। টোপর মৌড় মাথায় বর বোসেছেন, চেলী কাপড়ের ঘোম্‌টার মধ্যে কণে বোসেছে। কন্যার পিতা কন্যা সম্প্রদান কোচ্চেন। একদিকে ঢুলী বাজন্দেরে, যেহারা, পাঁচ রকমের ছোট লোক একত্রে বোসে তামাক খাচ্চে। একদিকে লুচী ভাজা হোচ্চে। হালুইকর বামনেরা মাথায় গামছা বেঁধে দমাদম্ লুচী ভাজছে! উঠানে এই ব্যাপার। বাড়ীর অর্দ্ধেক মাত্র ছবিতে দেখা যাচ্চে। সেই আধখানি বাড়ীর জানালায় জানালায় মেয়ে মহলের নানা ধরণের মুখ দেখা যাচ্চে। চারদিকে বিয়ে বাড়ীর উপযুক্ত ধূম লেগেছে। এই রকম কত ছবি দেখলেম,—এই রকম কত ধরণের কত নূতন নূতন ছবি চোকের সাম্‌নে বদল হলো। আমি ত অবাক! ভেবে পেলেম না যে, এ ভোজবাজী, কি ইন্দ্রজাল!

একমনে দেখছি! সর্ব্বেশ্বরবাবু বোল্লেন, "একবার এদিকে দেখ!" আমি ফিরে চাইলেম। দেখি, সেই জাহাজডোবা ছবি। বুড়ী যা বোলেছিল,

সে কথাগুলি চোকের সাম্‌নে স্পষ্টই দেখতে পেলেম। সমুদ্র,—জাহাজ, লোকজন সবই যেন সত্য সত্য মনে হলো! যথার্থই প্রাণে ভয় হলো! একটু বিশেষ কোরে দেখতে তখন বুঝলেম, ছবি! ছবিখানি বেশ কোরে দেখলেম। বড় চমৎকার চিত্র! এমন চিত্র যে মানুষে আঁক্‌তে পারে, এটা আমার ধারণাতেই এলো না। সর্ব্বেশ্বরবাবু বোল্লেন, "আর কেন? চল, সন্ধ্যা হয়েছে।" আমরা বেরুলেম। বেরুতে বেরুতে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মাষ্টারবাবু! এ কি ইন্দ্রজাল?" মাষ্টারবাবু কোন উত্তর কোল্লেন না, কেবল একটু হাস্‌লেন মাত্র। আমার কেবলই মনে হতে লাগলো, আজ যা দেখলেম, তার সমস্ত ভোজবাজী;—যা কিছু দেখলেম, এ সবই ইন্দ্রজাল!

একাদশ চক্র।

এই আমার মুক্তি!

আরও একমাস গত! দেখতে দেখতে আমরা আরও একমাস কাটালেম। গঙ্গানারায়ণ বাবুরা আজও হাজতে।—এ পর্য্যন্ত বিচার শেষ হয় নাই, হাজতেই পোচ্ছেন। রোজরোজই সংবাদ পাই,—আজও মকর্দ্দমা শেষ হয় নাই। গঙ্গানারায়ণবাবুর বাড়ীতে সেই রকম চাবী বন্ধই আছে। সিপাহী দুজন সেই রকম দালরুটীর আদ্যশ্রাদ্ধ কোরে নাক ডাকাচ্চে। এ একমাস কাল একভাবেই চোলেছে। আমি এখন একটু স্বাধীনতা পেয়েছি। সকলেরই আমার উপর বিশ্বাস জন্মেছে, তত বাঁধাধরার মধ্যে আমি আর এখন নাই। বাড়ীর ভিতর যেখানে ইচ্ছা বেড়াতে পারি,—যে ঘরে ইচ্ছা যেতে পারি, গরম হোলে ছাতেও বেড়াই। তাতে কেহ বড় আপত্তি করেন না। সর্ব্বেশ্বরবাবু বলেন, "তুমি নিজে বেড়াও ক্ষতি নাই, কুসুমকে সঙ্গে নিও না।" আমিও তাই করি। কুসুম ঘরেই থাকেন। স্নানের সময় ভিন্ন সমস্তদিনে তাঁর আর আকাশ দেখা ঘটে না। বুড়ী সঙ্গে কোরে কেবল নাইয়ে আনে, এই পর্য্যন্ত।

আমরা যে ঘরে থাকি,—সর্ব্বেশ্বরবাবু যে ঘরে থাকেন,—সেই ছবিগুলি যে ঘরে আছে, সব ঘর পশ্চিম দিকে। আর আগে আমরা যে ঘরে ছিলেন, সে ঘরগুলি পূর্ব্বদিকে। পূর্ব্বদিকের ছাতে উঠলে পশ্চিম দিকের সব ঘরগুলির ভিতর পর্য্যন্ত নজর পড়ে। আমি প্রায় পূর্ব্বদিকের ছাতেই উঠি—সেই দিকেই বেড়াই,—আবার মধ্যে মধ্যে কুসুম কি করেন না করেন, ছাত থেকেই তা দেখি।

এ দেশে ফাল্গুন মাসেই গরম পড়ে। এখন বৈশাখ মাস। এখন ত আর ঘরের বাহির হবার উপায় নাই। বড় গরম,—সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় আমি ছাতের উপর উঠেছি। বেড়াচ্চি, চারদিকে দেখচি, হঠাৎ দরজায় দুম্‌দাম্‌ শব্দ হলো। আমি চোম্‌কে উঠলেম! বাড়ীর যে যেখানে ছিল, সকলেই ভীত,—তটস্থ! সকলেই ব্যাপারখানা কি, কাণ্ডটা কি, দেখবার জন্য ছুটাছুটি কোরে দরজার দিকে যাচ্চে, এমন সময় দুন্‌ কোরে দরজার কপাট দুখানা পোড়ে গেল! কিল্‌কিল্‌ করে ত্রিশ চল্লিশ জন কোমরবাঁধা—বড় বড় লাঠি হাতে—কারও বা তরোয়াল হাতে সিপাহী এসে বাড়ী পুরে গেলো। সিপাহীরা টপাটপ্‌ উপরে উঠে কেউ এ ঘর, কেউ ওঘর অনুসন্ধান কোত্তে লাগলো। কপাট চৌকাট ভাঙা, চীৎকার—গণ্ডগোল,—দুম্‌দাম্‌—ভয়ানক শব্দ! কানে তালা লেগে গেল। ব্যাপার দেখে বুদ্ধিশুদ্ধি উড়ে গেল! নাম্‌বার উপায় নাই, বোধ হলো, এইবার বুঝি গেলেম!

হড়াৎ কোরে ছবির ঘর খুলে গেল। যত লোক—আমাদের এই আড্ডার যত লোক টপাটপ সেই বড় জাহাজডোবা ছবির উপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পোড়তে লাগলো। পড়ে আর অদৃশ্য। সেখানে দরজা নাই, জানালা নাই, নিটোল দেওয়ালে একখানি ছবি ঝুলান আছে। সেই ছবির উপর পোড়ে লোকগুলো কোথায় অদৃশ্য হলো? এখনি আমাকে ধোর্‌বে, হয় ত কতই শাস্তি দেবে,—কতই লাঞ্ছনা কোরবে,—তা বেশ বুঝতে পাচ্চি, কিন্তু এই কাণ্ড দেখে আমার সে ভাবনা উড়ে গেল! কেবলি ভাবতে লাগলেম,—এ সব কি? এ ভোজবাজী না ইন্দ্রজাল!

সর্ব্বেশ্বরবাবু এতক্ষণ ঘরের ভিতর ছিলেন, সময় বড় বেগতিক দেখে ছোট একটী বাক্স হাতে কোরে তিনিও সেই ছবির উপর লাফিয়ে পোড়লেন। ছাতের উপর থেকে স্পষ্টই দেখ্‌ছি। সর্ব্বেশ্বরবাবু সেই ছবিখানির উপর যেন

লাফিয়ে পোড়লেন। আমাদের দলের একজন লোকের পাছু পাছু একজন সিপাহী ছুটেছে। এই ধরে—এই ধরে কোত্তে কোত্তে লোকটী সেই ঘরে ঢুকে গেল। সিপাহীও তাহার পাছু পাছু ঢুক্‌লো। লোকটা গড়াতে গড়াতে ছবির ভিতর ঢুকে পোড়লো। সিপাহী দৌড়ে গিয়ে লোকটার একখান পা চেপে ধোল্লে ;—দুজনে টানাটানি। ঝনাৎ কোরে শব্দ হলো, সিপাহীর হাত আর লোকটির পা এক সময়ে কেটে দুখান হয়ে পোড়লো। সিপাহী চীৎকার কোরে গোড়িয়ে পোড়লো,—আমাদের লোকটির কি হলো, জান্‌তে পাল্লেম না। রক্ত দেখে আমার ত রক্তভেল্কী লেগে গেল! চারদিকেই যেন রক্তের নদী দেখতে লাগলেম। হাতকাটা সিপাহীর দুরবস্থা দেখে আরও ৭।৮ জন সিপাহী সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। দেখতে দেখতে অম্‌নি ঝনাৎ কোরে বাইরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ৭।৮ জন সিপাহীর একবারে জীবন্ত সমাধি! এও এক আশ্চর্য্য কাণ্ড! এও এক ইন্দ্রজাল!

আমি এখন করি কি? কোন্ দিকে পালাই, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। ছাতের উপর বুকে হেঁটে যাতে সিপাহীরা না দেখতে পায়, এমন ভাবে ছাতের এদিক ওদিক দেখতে দেখতে দেখলেম, আমাদের ছাত হতে আমাদের পাশের বাড়ী—যেখানি আমাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকে লাগাও ছিল, তারই ছাতে যাওয়া যায়। আমি অম্‌নি তাড়াতাড়ি সেই ছাতে গেলেম, চারদিকে চাইতে চাইতে একটি সিঁড়িও দেখতে পেলেম। সিঁড়ি ধোরে প্রাণপণে ছুট্‌লেম। কোথায় পা দিচ্চি, তার ঠিকানা নাই; কোথায় যাচ্চি, পড়ি ত মরি—হুঁস নাই। এক রকম মোরিয়া হয়েই ছুটেছি।—ঘুরে ঘুরে—এ গলী সে গলী ঘুরে একেবারে গঙ্গার ধারে এসে পোড়লেম। কোথা দিয়ে এলেম, তার ঠিক নাই, একেবারে গঙ্গার ধারে। যে ঘাটে রোজ স্নান করি, এ সে ঘাট নয়, আর একটা নূতন ঘাট। গঙ্গার শীতল বাতাস গায়ে লাগতে যেন বাঁচলেম। বড় হাঁপ লেগেছিল, বেদম হয়ে পোড়েছিলেম, চোকে মুখে গঙ্গার জল দিয়ে রাণার উপর বোসলেম। শরীর শীতল হলো। তখন মনে হলো, কুসুমকুমারী কোথায়? আমি আজ মুক্ত, কিন্তু কুসুমকুমারী কোথায়? কুসুম যেখানেই থাক, আজ কিন্তু এই আমার মুক্তি!

দ্বাদশ চক্র।

নিরাশ্রয়ে আশ্রয় ভগবান।

তৃষ্ণা গেছে। গঙ্গার শীতল বাতাসে শরীর শীতল হয়েছে। দম্‌বন্ধ হয়ে এসেছিল, এখন সেটাও নাই।—তাই আবার ভাবনা এলো, এখন আমি যাই কোথা?

দেখতে দেখতে রাত অনেক হয়েছে। আমি যখন প্রথম্ আসি, তখন রাণায় রাণায়,—চত্বরে চত্বরে,—ঘাটে ঘাটে অনেক লোক ছিল। এতক্ষণ আপনার ভাবেই আত্মহারা ছিলেম,—আপনার চিন্তাতেই আপনি ডুবেছিলেম,—চারদিকে চাইবার অবসর পাই নাই। এখন চেয়ে দেখি, চারিদিকই জনশূন্য!—কোথাও একটি লোকও নাই! আমি কেবল আপনার ভাবে আপনি উন্মত্ত হয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের পরিণাম চিন্তা কোচ্চি। সহায় নাই,—জানা-শুনা নাই,—আত্মীয়-স্বজন নাই, তবে আমি এখন যাই কোথা? সঙ্গতির মধ্যে পাঁচটি টাকা! যখন আমার দুর্ভাগ্যের প্রথম সূত্রপাত হয়,—যখন চিরপ্রতিপালক রায় মহাশয় আমাকে বিনা অপরাধে বিসর্জ্জন দেন,—দুরাচার মাষ্টারবাবু সদয়বাবুর পীড়ার ভান করে যখন আমাকে প্রথম গাড়ীতে তোলে,—পাটনা থেকে যে দিন চিরদিনের জন্য বিদায় হই,—সেই দিন হতে এই টাকা পাঁচটি আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। টাকা থাক্‌লেই বা স্থান পাই কোথা? কোথায় পথিকদের থাক্‌বার আড্ডা, কোথায় দোকান,—কোন্ কোন্ স্থানে বদ্‌লোকের বাসা, কিছুই জানি না! তাহাতে আবার রাত্রিকাল! এক বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে না পেতে আবার কি কোন নূতন বিপদে পোড়বো? দুরাচার রাক্ষসদের হাত থেকে উদ্ধার হয়ে শেষে কি আবার কোন পিশাচের হাতে পোড়্‌বো? এই ভাবনাতে বড়ই ভাবিতে হোলেম! তবে আমি এখন যাই কোথা?

আহা! যদি কুসুমকুমারী সঙ্গে থাকতেন, দুটিতে যদি একসঙ্গে থাকতেম, তা হোলেও দুজনে পরামর্শ কোরে যা হয় একটা যুক্তি স্থির করা যেত। একার বুদ্ধিতে আর কত যোগায়? আমার ভাবনা যতটা

ভাবছি, সরলা কুসুমকুমারীর ভাবনা তার চেয়ে আমার আরও বেশ হয়েছে! আমি তবু অনেকটা দেখে শুনে—অনেকটা ভুগে ভুগে মনে মনে সাহস বাড়িয়েছি।—দারুণ বীভৎস কাণ্ড দেখেও সহসা ভীত হই না বিশেষ বিপদে পোড়লেও ভেবে চিন্তে যা হোক একটা যুক্তি স্থির কোরে পারি, কিন্তু কুসুমকুমারীর ত সে ক্ষমতা নাই। তিনি এই বিপদে হয় ত কত কষ্টই পাচ্চেন। যে লোকগুলি আজ এই লুঠতরাজ কোল্লে,—ধরা পাকড়া কোল্লে, তারা যে কেমন লোক, তা কিছুই জানি না। বদ্‌মায়েসী দমন কোত্তে তারা এসেছিল,—কি সমধর্ম্মীর শত্রুতা সাধন কোত্তে এসেছিল, তা কিছুই বুঝতে পারি নাই। যদি শান্তিরক্ষায়—অত্যাচার দমনে তাদের আগমন হয়, তা হোলে ততটা ভয়ের কারণ নাই। শান্তিরক্ষকেরা কুসুম-কুমারীর মুখে তাঁর পিতার ঠিকানা জেনে অবশ্যই তাঁর পিতার কাছে তাঁকে রেখে আস্‌বেন। তারা যদি এদেরই মত দস্যু হয়?—যদি সমব্যবসায়ীর শত্রুতা সাধনেই এসে থাকে? তা হোলে ত কুসুমকুমারীর দুর্দ্দশার সীমা থাক্‌বে না!

কুসুমকুমারীর সঙ্গে যেদিন প্রথম পরিচয় হয়, সেদিন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বোলেছিলেম, যদি কখনো আমার উদ্ধার ঘটে,—যদি কখনো আমি মুক্তি পাই, তা হোলে তুমিও মুক্তি পাবে। আমি ত এখন মুক্ত, এখন ত আর আমি কারও অধীনে নই, তবে আমার সে প্রতিজ্ঞা থাকলো কোথায়? আপনার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেম, পলাবার সময় কুসুমের কথা একটীবারও মনে হলো না। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? সরলা আমার কথায় বিশ্বাস কোরে এতদিন সময়ের মুখ চেয়ে চুপ কোরেছিলেন, আমি ত সে প্রতিজ্ঞা—তাঁর সেই বিশ্বাস রাখলেম ভাল! তিনি হয় ত পলাতে পাত্তেন, কেবল আমার কথার উপর বিশ্বাস কোরে—আমার আশাপথ চেয়েই এই বিপদে পোড়েছেন। আমিই এক রকম তাঁর বিপদের কারণ! আমিও একজন প্রধান ডাকাত! এ পাপের, এ গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

ক্রমেই রাত অধিক হোচ্চে,—ক্রমেই লোকজনের সাড়াশব্দ কোমে আস্‌ছে,—ক্রমেই নগর নিস্তব্ধ হয়ে আস্‌ছে, এখন আমি যাই কোথায়? কি করি, কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্চি না। এখানে আছি বেশ!—একটা রাত না হয় উপবাসেই গেল,—একটা রাত না হয় নাই বা ঘুমালেম, কিন্তু এই একবেলার আহারের জন্য,—এক রাত ঘুমাবার জন্য আবার কি কোন

দস্যুর হাতে ধরা পোড়বো?—আবার কি অকূল দুঃখপাথারে ভাস্‌বো? আহার-নিদ্রা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে নিরাপদে এই রাণার উপর সমস্ত রাত জেগে কাটানই ভাল। এত কষ্ট সহ্য কোরেছি,—এত বিপদ মাথার উপর দিয়ে গেছে,—সামান্য একটা রাত এমন কোরে জেগে—বোসে বোসে কাটান কি বড় আশ্চর্য্য কথা?

এই যুক্তি সার যুক্তি!—এই কথাই সার কথা! মনে মনে এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত কোরে আপন মনে চিন্তা-সাগরের লহরী গণনা কোত্তে লাগলেম। সম্মুখে পবিত্রসলিলা গঙ্গা পবনবেগে চালিত হয়ে কখনো বড় বড়—কখনো ছোট ছোট লহরীমালা প্রসব কোচ্চেন। লহরীগুলি ধীরে ধীরে এসে কূলে কূলে আঘাত কোচ্চে। দিব্য মধুর শব্দ উঠছে। যদি চিন্তা না থাকতো,—যদি ভাবনা না থাকতো, তা হোলে আজ যে সুখ আমি ভোগ কোচ্চি,—এ সুখ সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

গঙ্গায় যেমন ছোট বড় ঢেউ উঠ্‌ছে, আমার হৃদয়সাগরেও তেমনি ছোট-বড় চিন্তার ঢেউ উঠ্‌ছে। কোথায় ছিলেম,—আবার কোথায় এলেম!—আমি কে—আমার কি কেহ নাই? আমার কি কেহ ছিল না? জগতে আমি কি এমনি অসহায় অবস্থাতেই এসেছি?—তাও কি কখন হয়? যিনি প্রবলপ্রতাপশালী মহাসম্ভ্রান্ত রাজা, তাঁরও যেমন মাতাপিতা ছিলেন বা আছেন, তেমনি দিনপাত-অচল একমুষ্টি চালের ভিখারী দরিদ্রেরও মাতা পিতা ছিলেন বা আছেন। মাতা পিতা সকলেরই থাকেন। কারো অদৃষ্টগুণে মাতা পিতার চরণসেবা ঘটে, কোন দুর্ভাগ্য জ্ঞান হবার পূর্ব্বেই পিতৃ-মাতৃহীন হয়! আমার ত যেন মনে হয়,—তেমন স্পষ্ট নয়, ভাসা ভাসা আব্‌ছা আব্‌ছা মনে হয়,—আমার যেন মা ছিলেন, বাপ ছিলেন, অতি আদরে আমাকে প্রতিপালন কোত্তেন,—সবই ছিল, সুখসম্পদ সবই ছিল, কিন্তু এখন দেখছি, সব অন্ধকার। ত্রিজগতে আমি আমার বলি, এমন কোন কিছুই নাই। কেবল আমিই আমার, আর আমারই আমি!

তাই বা কি কোরে? আমারই আমি কি কোরে হোলেম? আমাতে যদি আমার পূর্ণ অধিকার থাকবে, তবে এ বিষাদের ভরা বইব কেন? সহায়সম্পত্তি ধনজন হারিয়ে এমন পথের ভিখারী সাজবো কেন? আমার ত আমি নই, আমি পরের আজ্ঞাকারী, পরের ক্রীতদাসী। আমি পরাধীনেরও পরাধীন।

জীবন কি তবে একভাবেই যাবে?—এ বিষাদ অমাবস্যাপূর্ণ হৃদয়াকাশে আর কি সুখ-রবির উদয় হবে না?— হৃদয়ে মরুভূমে আর কি শান্তিতরু জন্মাবে না? লজ্জার কথা,—তবু একবার মনে হয়, এ হৃদয়-নিকুঞ্জে নিকুঞ্জবিহারীর কি পদার্পণ হবে না?—আমার এ নয়নজল কি এ জীবনে আর ফুরাবে না?—হৃদয়-নদীর এই চিন্তা-জোয়ারে কি কখনো ভাটা দেখা দিবে না? উঃ! আর যে পারি না!—আর যে সহ্য হয় না! জ্ঞান হয়ে চিরদিন দুঃখে দুঃখেই কাল কাটাছি,—অনেক দুঃখ কষ্টের ঝড় মাথার উপর দিয়ে গেছে,—দুঃখে দুঃখে দুঃখের প্রাণ দুঃখময় হয়েছে, তাই এত কষ্টে আজও জীবন আছে।—এত যন্ত্রণাতে তবুও আবার সেই যন্ত্রণা নিবারণ কোত্তে বাসনা হোচ্চে। অন্য লোক হোলে এতদিন কোন্‌কালে আত্মহত্যা কোত্তো, না হয় অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটাতোই ঘটাতো।

কত রকম চিন্তা কোচ্চি। কত রাত হয়েছে,—প্রভাত হোতে আর কত বাকী আছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। আপন মনে কেবল চিন্তাই কোচ্চি! হঠাৎ গায়ে আরও শীতল বাতাস লাগলো। চেয়ে দেখি,—পূর্ব্বদিক ফর্সা হয়েছে। রজনী প্রভাত।

একটা রাত মাথায় উপর দিয়ে চোলে গেছে। আমি এখন আবার ভাবছি, এখন যাই কোথা? এখনো ঘাটে লোক আসে নাই,—এখনো গঙ্গাতীর গঙ্গাস্তবে শব্দিত হয় নাই,—এখনো কুলবধূরা ঘোম্‌টা দিয়ে প্রাতঃস্নান কোত্তে আসেন নাই। এখনো গাছের আগায় রাত আছে, চারিদিকে অন্ধকার আছে,—গলি-ঘুঁজিতে এখনো শৃগালের গতিবিধি হোচ্চে। এতক্ষণ এক স্থানেই বোসেছিলেম, উঠে গিয়ে গঙ্গায় হাত-মুখ ধুয়ে এলেম। গঙ্গার শীতল জলে হাত-মুখ ধুতে সকল কষ্টের যেন অবসান হলো! গঙ্গার দিকে মুখ কোরে হাত-মুখ ধুচ্ছিলেম,—হাত-মুখ ধোয়া শেষ কোরে আবার উঠতে যাব, দেখি, এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

চোম্‌কে উঠলেম! বড় ভয় হলো! মনে ভাবলেম, আবার বুঝি দস্যু হাতে পোড়লেম!—প্রাণ শুকিয়ে গেল!—থতমত খেয়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ কোরে চেয়ে রইলেম। মূর্ত্তির বেশ অপূর্ব্ব! পরিধান গেরুয়াবসন, পায়ে খড়ম,—বাম হাতে কমণ্ডলু,—গলদেশে গেরুয়ার উত্তরীয়, ডান হাতে একগাছি হেতালের লাঠি! মূর্ত্তির চেহারা অপূর্ব্ব! সাদা চুল,—সাদা দাড়ী নাভি পর্য্যন্ত ঝুলে পোড়েছে;—সাদা গোঁপ। রঙ যেন কাঁচা সোণা।

বয়স হয়েছে,—পাকা দাড়ী পাকা গোঁপ দেখে বুঝলেম, বয়স হয়েছে, কিন্তু চেহারা দেখে,—লাবণ্য দেখে বোধ হয় যেন, যৌবনে যৌবকান্তি এই বৃদ্ধের দেহে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাচ্চে। চোখের জ্যোতিঃ অসাধারণ,—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, শরীর দীর্ঘ,—দেহ মাংসল, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত,—শরীরে যেন বেশ বল আছে। চেহারাটী দেখলেই মনে ভক্তির উদয় হয়। আমি ভাল কোরে দেখে প্রণাম কোল্লেম, কোন কথা কইলেম না। একে যোগী বলি, কি তপস্বী বলি, কি দণ্ডী বলি, কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্চি না। গায়ে ভস্ম নাই,—তপস্যার কোন ভেক নাই,—দণ্ডীর পরিচয়ের সে রকম দণ্ড নাই, তবে ইনি কে? কি বোলে সম্বোধন করি? ভেবে চিন্তে বুঝলেম, যোগী বলাই ভাল।

আমি প্রণাম কোরে করযোড়ে দাঁড়ালেম। যোগী যেন সন্তুষ্ট হয়ে বোল্লেন, "কে তুমি? তোমার নিবাস কোথায় মা? সমস্ত রাত্রি একাকিনী গঙ্গাতীরে যাপন করাই বা কেন তোমার? আমার কাছে গোপন করো না, স্পষ্ট বল! চেহারায় বোধ হচ্চে, তুমি কোন ভদ্রপরিবারের কন্যা,—হৃদয়ে বড় আঘাত পেয়েছ,—অসহায়া হয়েছে,—আছে সব, কিন্তু জান না। না জান,—বেশ। স্পষ্ট বল,—স্বীকার কর,—গোপন করো না।" যোগীর কথায় আমি যেন আশ্চর্য্য জ্ঞান কোল্লেম। সমস্ত রাত আমি এখানে ছিলেম, ইনি তা কি কোরে জান্‌তে পাল্লেন? ঘাটে ত জনপ্রাণীও ছিল না। যোগী কি তবে সর্ব্বজ্ঞ? মনে বড় ভয় হলো। গোপন কোত্তে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাহস হলো না। জীবনের সমস্ত কথাগুলি অকপটে তাঁর চরণে নিবেদন কোল্লেম। আমার দুঃখকাহিনী শুনে সরল-হৃদয় যোগী যেন বড় দুঃখিত হোলেন;—আশ্বাস দিয়ে বোল্লেন, "কোন ভয় নাই মা! অপেক্ষা কর, আমি তোমারে আশ্রয় দিব।"—এই বোলে যোগী গঙ্গায় অবগাহন কোল্লেন। আমি অনেকক্ষণ বোসে রইলেম। যোগীর স্নান-পূজা সমাপ্ত হোতে ক্রমেই অনেক বেলা হয়ে উঠলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘাটে লোকারণ্য। অসংখ্য লোক স্নান কোত্তে ঘাটে এসে জমা হলো। আমি আর বিলম্ব না কোরে নেয়ে নিলেম;—রুক্ষই নেয়ে নিলেম। ভিজে কাপড়ে রাণার উপর যোগীর জন্য অপেক্ষা কোত্তে লাগলেম। অনেকক্ষণ পরে যোগীর পূজা শেষ হলো। কমণ্ডলু পূর্ণ গঙ্গাজল নিয়ে বড় বড় কোরে গঙ্গার স্তব আওড়াতে আওড়াতে অগ্রে অগ্রে

চোল্লেন। আমাকে ইঙ্গিতে অনুসরণ কোত্তে বোল্লেন। আজ্ঞা পেয়ে আমি যোগীবরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেম।

গঙ্গার ঘাট থেকে যোগীর আশ্রম প্রায় একক্রোশ দূরে। স্থানের নাম যোগীরাই রেখেছেন,—"ভক্তমন্দির।" যোগীর সঙ্গে আমি সেই ভক্তমন্দিরে প্রবেশ কোল্লেম। বড় প্রাচীরে ঘেরা বাড়ী;—অনেকটা দূর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মধ্যে এক শিবমন্দির। প্রাচীরের গায়েই ছোট ছোট চালা বাঁধা। যোগীসন্ন্যাসীরা সেই চালাতেই থাকেন। বাড়ীর ভিতর একখানিও বড় ঘর নাই। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে দেখ্‌লেম, অনেকগুলি যোগী। ছেলে,—যুবা,—বৃদ্ধ,—বেঁটে,—লম্বা,—মাজারী,—মানানসই,—জটা, গালপাট্টা, সুধু গোঁপ, গোঁপদাড়ী-হীন, নানা রকমের চেহারার, নানাধরণের যোগী একত্রে সেই বাড়ীতে আছেন। সব যোগীই হিন্দুস্থানী। অনেকেরই কৌপীনমাত্র সার। কেবল জনকয়েকের একটু বড়—হাঁটু-ঢাকা গেরুয়া পরা।

যোগীবর একখানি চালাঘরের দরজা খুল্লেন। আমাকে তারই ভিতর একখানা কুশাসন নিয়ে বোস্‌তে বোল্লেন। আমি মাথাটী নীচু কোরে আজ্ঞা প্রতিপালন কোল্লেম। যোগী বাহিরে গেলেন।

চালাখানি ছোট। আসবাবপত্রও তেমন অধিক নাই। এক কোণে একটী সরাঢাকা জলের কল্‌সী, একধারে উনানের পাশে দুটী সক্‌ড়ী হাঁড়ী, একটী বড় নোড়া,—একটি ছোট বাট্‌লো,—দুখানি কুশাসন,—একখানি হরিণের চামড়া,—একটি লোহার বড় চিম্‌টে, একটি আগুন-রাখা মাল্‌সা, দেড় হাত কাটের নলওয়ালা ছোট একটি হুঁকো। দেয়ালের গায়ে একটি লোহার হুকে ঝুলান একগাঝি রুদ্রাক্ষ, একগাছি পদ্মবীজ, আর এক গাছি সাদা নটকার মালা। আস্‌বাবের মধ্যে এই পর্য্যন্ত। আমি ঘরে বোসে এই সব দেখ্‌ছি, এমন সময় যোগী সেই চালায় প্রবেশ কোল্লেন। এক্‌টা একপোয়া ওজনে আকের গুড়ের লাড়ু আমার হাতে দিয়ে জল খেতে বোল্লেন। আমি সেই লাড়ুর একটু ভেঙে নিয়ে জল খেলেম। যোগী বোল্লেন, "আমরা ব্রাহ্মণ, যদি আমাদের পাকে আহার কর, উত্তম, না হয় নিজে রেঁধেও খেতে পার।" আমি বোল্লেম, "আমি রাধ্‌তে জানি না। আপনার প্রসাদই খাব এখন।" যোগী সন্তুষ্ট হোলেন। তাড়াতাড়ি উনান জেলে রান্না চড়ালেন। আমি একপাশে সেই কুশাসনে বোসে যোগীর রান্না দেখ্‌তে লাগ্‌লেম।

রান্না শেষে হলো। মোটা বুক্‌ড়ী চেলের ভাত, অরহরের দাল, আর আলু ভাতে। যোগী তৈল ব্যবহার করেন না, ঘৃত দিয়ে তৈলের কাজ সাল্লেন। দুখানি পাতে পরিবেশন কোল্লেন। পরিবেশন শেষ হোলে আমাকে আহার কোত্তে বোল্লেন। আমি তখন আহার কোল্লেম না, ইচ্ছা, যোগীর প্রসাদ পাব। তিনি অগ্রে আহার কোল্লেন, আহার শেষ কোরে বাহিরে গেলেন। আমি খেতে বোস্‌লেম। বড় তৃপ্তির সহিত আহার কোল্লেম। আহার শেষ হোলে ঘরটি পরিষ্কার কোল্লেম। যোগী বাধা দিচ্ছেলেন, আমি সে কথা না শুনে নিজেই সমস্ত পরিষ্কার কোল্লেম! যোগী বড়ই সন্তুষ্ট হোলেন। আহারান্তে যোগী সেই চালার একপাশে বোসে বড় বড় হাতে লেখা ভাগবৎ পাঠ কোত্তে লাগ্‌লেন! আমি যা বুঝি, শুন্‌তে লাগ্‌লেম। বাড়ীর আর সকলের কার্য্যও এইরূপে নির্ব্বাহ হলো। আহারান্তে কেউ কেতাব পোড়্‌তে বোস্‌লেন, কেউ জপে বোস্‌লেন, কেউ বা অন্য কোন কাজ কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি একমনে সেই চালায় বোসে পাঠ শুন্‌তে লাগ্‌লেম। অনেকক্ষণ পরে যোগী বোল্লেন, "মা! কিছু বুঝ্‌তে পার? যদি কোথাও না বুঝতে পার, জিজ্ঞাসা করো, লজ্জা করো না। আমি সমস্ত কথাই বেশ কোরে বোলে দিব। কোন লজ্জা নাই।" আমি যেখানে যেখানে বুঝ্‌তে না পারি, সাহস পেয়ে সে সব কথাগুলি জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেম। যোগীও আনন্দের সহিত সেই সব বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। অনেক দূর পাঠ হলো, আর দৃষ্টি চলে না, অগত্যা পাঠ বন্ধ হলো;—সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা হলো। যোগীরা যোগীশ্বর মহাদেবের আরতির আয়োজন কোল্লেন। নিজেরাই শাঁক ঘণ্টা বাজালেন, ধূপ ধুনা পোড়ালেন, বৈকালে নিবেদন কোল্লেন, সমস্ত কাজ নিজেরাই সাল্লেন। আরতি শেষ হলে, মন্দিরের রকে যোগীরা জপে বোস্‌লেন। আমিও একটি ধারে বোসে আপন মনে ভগবান যোগীশ্বরচরণে মনের ব্যাথা জানাতে লাগ্‌লেম।

যোগী অনেকগুলি প্রায় কুড়ি পঁচিশ জনের কম হবে না। আরও শুন্‌লেম, এখানে আরও অনেক যোগীসন্ন্যাসী থাকেন, তাঁরা তখন তীর্থযাত্রায় গেছেন। ধোত্তে গেলে, ভক্তি-মন্দির সন্ন্যাসীদের বড়দরের একটি আড্ডা।

আমি বোসে আছি। এক একবার যোগীদের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি, এক একবার যোগীশ্বরাক চেয়ে দেখ্‌ছি, একবার বা বাইরের দিকে চেয়ে বাইবেব কোথায় কি হোচ্ছে দেখ্‌ছি। সকল যোগীর চক্ষুই মুদ্রিত,—চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি, সকল যোগীর চক্ষুই মুদ্রিত; কেবল একজনমাত্র আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন, চোকে চোকে পোড়্‌তেই যোগী লজ্জায় মুখ নত কোল্লেন। আমি এই অবসরে যোগীব চেহারাটি একবার ভাল কোরে দেখে নিলেম। যোগীর বয়স পঁচিশের মধ্যেই। চেহারাটি দিব্য মানান-সই;—বেশী মোটাও নন্, কাহিলও নন্! গোঁপ-দাড়ী বড় বেশী উঠে নাই। মাথায় বড় বড় চুল।—রং গৌরবর্ণ নয়, একটু মাটোমাটো। কিন্তু তাতেই যেন চেহারা আরও খোল্‌তাই হয়েছে। দিব্য কাণ, চোক-দুটি যেন লালপদ্মের মধ্যে চঞ্চল ভ্রমর খেলা কোচ্চে, দৃষ্টি অতি কোমল। আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলেন, কিন্তু তাতে আমার মনে সন্দেহ হলো না। তাঁর দৃষ্টিতে কোন কুভাব বুঝা গেল না।

চাউনি, চেহারা আর চালচলন দেখ্‌লে বিচক্ষণেরা মানুষের মনের কথা বোল্‌তে পারেন। নানারকম চেহারা,—নানারকম চালচলন দেখে আমারও এমন একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, সমস্ত না হোক, লোকের চালচলন দেখে, তার মনের ভাব আমি অনেকটা এঁচে নিতে পাবি। সেই সাহস আছে বোলেই বোল্‌ছিলেম, যোগী যে দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছেন, তাতে মন্দভাবের কোন গন্ধই নাই। তাঁর চাউনিতে কোন বদ্‌মাইসী ফন্দির গন্ধ পাওয়া যায় না। দৃষ্টি যেন স্নেহমাখা! এ যোগীরও হিন্দুস্থানী সাজ। অন্যান্য হিন্দুস্থানী যোগীরা যেমন যেমন সাজ ব্যবহার কোচ্চেন, এঁর সাজও তাই। তবুও চেহারা যেন বাঙালী বাঙালী বোলে বোধ হয়। এই যোগীর সম্বন্ধে মনে মনে আমার এই যা একটুখানি সন্দেহ।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে যোগীবর জপ সমাধা কোল্লেন। এখন খোল—ধমক খঞ্জনী—করতাল নিয়ে ভজন আরম্ভ হলো। কখন ভয়ানক চীৎকার কোরে,—কখন ধীরে ধীরে,—কখন প্রাণপণে চেঁচিয়ে—কখন অবজ্ঞার সুরে ভজনগীত হোতে লাগ্‌লো। গীত সমাধা হোতে রাত প্রায় এগারোটা।

ভজন শেষ কোরে যোগীরা যাঁর যে ঘর, তিনি সেই ঘরে গেলেন।

সেই যোগীও আবার আমার দিকে সেইরূপ আড়ে আড়ে চাইতে চাইতে আপন ঘরে চোলে গেলেন। আমারও কেমন ইচ্ছা হলো, আমিও আড়ে আড়ে চাইতে চাইতে আমাদের চালায় এলেম। যোগীর চালায় যখন আমি আছি, তখন সেটা "আমাদের" বলায় আর দোষ কি? যেখানে থাকি,—দুদিন একদিন যেখানে থাকি, সেখানকার লোকজন, ঘর-দরজা,—এমন কি পশুপক্ষী, তৈজস বাসনগুলিকে পর্য্যন্ত "আমার" বোল্‌তে ইচ্ছা হয়। সবই যেন আপনার বোলে বোধ হয়, কিন্তু কেমন যে অদৃষ্ট, কেউ একস্থানে আর আমাকে স্থান দিতে চায় না। যেখানে হোক, বেশী দিন থাকাই আমার অদৃষ্টে ঘটে না। কেবল পথে পথে ভ্রমণ আর বিপদ অতিক্রম, আমার জীবন কেবল এই দুটি কাজের জন্য। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত কখনো কোন লোকের ক্ষতি করি নাই, তবে আমার মত নিরপরাধীকে কষ্ট দিয়ে লোকের কি লাভ? টাকা নাই—কড়ি নাই, সম্পত্তি নাই, তবে কিসের লোভে আমার উপর লোকের এত অত্যাচার? যদি কারণ দেখ্‌তে পেতেম,—যদি মনে মনে বুঝ্‌তে পাত্তেম, তা হোলে এতটা কষ্ট হতো না;—মনকে প্রবোধ দিতে পাত্তেম। কিন্তু এখন প্রবোধ দিবার ত কোন কারণই দেখি না। আমি মনে জানি, আমি নিরপরাধী, তবে যে লোকে আমার উপর কেন অত্যাচার করে, তাই ভেবে ভেবেই আমার মনের কষ্ট দ্বিগুণ হয়েছে। হা ভগবান্! আর কতদিন এমন কষ্ট সহ্য কোর্‌বো?

যোগী রাত্রে কিছু আহার করেন না। আমার জন্যে খাবার আনিয়ে দিলেন। সেই চালাতেই আমার শয়নের ব্যবস্থা কোরে তিনি চোলে গেলেন। যাবার সময় বোলে গেলেন, "জল খেয়ে দরজা বন্ধ করো।—ভিতর থেকে বেশ কোরে বন্ধ করো!"—এই উপদেশ দিয়ে যোগীবর প্রস্থান কোল্লেন। আমি সেই কুশাসনেই শয়ন কোল্লেম। স্থানটি পবিত্র সন্ন্যাসীর আশ্রম, কোন ভয় নাই,—সন্দেহ নাই, তবুও সমস্ত রাত এক একবার একটু তন্দ্রা আসে, আবার ভাবনায় চিন্তায় ঘুম ভেঙে যায়। এই রকমেই রাত্রি প্রভাত।

যখন দস্যুর সেই আড্ডা থেকে পালিয়ে আসি,—যখন নিরাশ্রয়ে গঙ্গার ধারে রাত কাটাই, তখন মনে কোরেছিলেম, আর কোথাও হয় ত আশ্রয় পাব না। জীবনের যে কয়দিন অবশিষ্ট আছে, সে কয়দিন বুঝি

এই রকম নিরাশ্রয়েই কাটাতে হবে। এখন দেখ্‌ছি, নিরাশ্রয় হতভাগা-হতভাগিনীদের আশ্রয় দেন, এমন সদাশয় ব্যক্তি অনেক আছেন। যিনি নিরাশ্রয় করেন, সেই ভগবানই আবার তার আশ্রয়স্থানের সংযোগ কোরে দেন। মনে মনে বেশ জানলেম, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান!

ত্রয়োদশ চক্র।

বিশ্বেশ্বর তেওয়াড়ী।

তিন দিন এই ভাবেই ভক্ত-মন্দিরে কাটালেম। সেই এক রকম আহার,—এক রকম শয়ন,—এক রকম পূজা-অর্চ্চনা, এক ভাবেই তিন-দিন গত। চারিদিনের দিন বৈকালে যোগীবর একখানি পত্র হাতে কোরে কুটিরে প্রবেশ কোল্লেন। আহারের পর 'কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন, বৈকালে সেই পত্রখানি হাতে কোরে বাসায় ফিরে এলেন। আমি বোসেছিলেম, যোগীবরকে দেখে সম্ভ্রমে সোরে বোস্‌লেম। যোগীবর একখানি কুশাসনে উপবেশন কোল্লেন। আপন মনে পত্রখানি আর একবার পোড়ে আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন, "মা! আমাকে কালই স্থানান্তরে যেতে হবে। এই দেখ, পত্র এসেছে। না গেলে বিশেষ ক্ষতি হবে। সেখানে যে কতদিন থাকতে হবে, তারও কিছু স্থিরতা নাই। তবে দুই এক মাস ত হবেই, তার উপর আরও দু-দশ দিন বিলম্ব হোতে পারে। আমি বিবেচনা কোচ্চি, তোমাকে আমার এক শিষ্যের বাড়ীতে রেখে। শিষ্য যোগী নন,—সংসারী। বড় পরিবার। ছেলে-মেয়ে, দাস-দাসী, চাকর-চকরাণী বিস্তর! মহাজনী কারবার আছে। অনেক বিষয়। একজন পরিচিত সম্ভ্রান্ত লোক। স্বভাবচরিত্র বড় ভাল;—বড় দয়ালু। সেখানে থাকলে তিনি তোমাকে কন্যার মত রাখ্‌বেন, কোন কষ্টই হবে না। যতদিন ইচ্ছা,—এমন কি, একভাবে সমান আদর যত্নে

আজীবন থাক্‌তে পারবে। কার্য্য শেষ হোলে আমি আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। যদি নিতান্ত অসুবিধা হয়, তখন না হয়, আবার আমার সঙ্গে আস্‌বে; কি বল?" আমি এখানে বেশ আছি। কোন কষ্ট নাই, আশঙ্কা নাই,—ভয় নাই, আবার কোন্ দেশে কার আশ্রয়ে থাক্‌বো? যোগী তাঁর প্রশংসা কোল্লেন, কিন্তু আমার অদৃষ্টের দোষে যদি তাঁর সেই সব গুণ আমার কাছে নির্গুণ বোলে বোধ হয়, তবে আবার কোথায় যাব? এই সব ভাবনা এককালে আমার মনের মধ্যে উদিত হয়ে তোলা-পাড়া হোতে লাগলো। কি উত্তর দিব, স্থির কোত্তেই পাল্লেম না। যোগীবর আবার বোল্লেন, "কোন চিন্তা নাই, আমার শিষ্য তেমন নন, তোমার কোন ভাবনা নাই। একে তাঁর স্বভাবই দয়ালু, তার উপর আমার আজ্ঞা, বেশ থাকবে;—আদর যত্নে থাকবে, কোন কষ্টই থাকবে না।" আমি আর বেশী কথা কইলেম না। স্বীকার কোল্লেম, "আপনার আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য্য।"—যোগীবর সন্তুষ্ট হয়ে বোল্লেন, "বেশ, আমি তোমাকে রেখে আস্‌বার সমস্ত ঠিক কোরে রেখেছি। আমি যেখানে যাব, সেদিক বিপরীত দিকে, তা না হোলে আমি স্বয়ংই তোমাকে রেখে আস্‌তেম। তবে আমি স্বয়ং গেলেও যে ফল, না গেলেও সেই ফল হবে; তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। দুজন বিশ্বাসী সন্ন্যাসী তোমাকে রেখে আস্‌বেন। আমি পত্র লিখে রেখেছি। এই দেখ, সকালেই কাল রওনা হবে।"—পত্রখানি আমার হাতে দিয়ে আরও বোল্লেন, "পত্রখানি কাছে রাখ, হারিও না। আমি আস্‌ছি। হয় ত না আসতেও পারি। যদি আমার আসতে বিলম্ব হয়, তুমি শয়ন করো, আমার জন্য বেশী রাত পর্য্যন্ত জেগে বোসে থাকার প্রয়োজন নাই। কাল পথ চোল্‌তে হবে। রাস্তায় ভাল খাবার পাওয়া যাবে না, তাতেই বেশী বেশী খাবার এনেছি। সবগুলি খেয়ে শয়ন করো!"—এই সব কথা বোলে যোগীবর প্রস্থান কোল্লেন। আমি তখনি দরজা বন্ধ কোরে আগে চিঠিখানি খুল্লেম। চিঠিতে লেখা আছে;—

পরম মঙ্গলাস্পদ শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর তেওয়ারী বাপা নিরাপৎসু—

পরমশুভাশীর্ব্বাদঃ

সম্প্রতি এক অনুরোধ। আমার ধর্ম্মকন্যা—নিরাশ্রয়া—সহায়-সম্পত্তি-হীনা, তোমার আশ্রয়ে পাঠাইলাম। ৺দয়াময় নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দান

করিবার ক্ষমতা তোমাকে দিয়াছেন বলিয়াই লিখিতেছি, ইহাকে সম্বন্ধে কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। বিশেষ বিদিতার্থ আরও লিখিতেছি, আমার এইটীই প্রধান অনুরোধ বলিয়া জানিবে। আমি সম্প্রতি চন্দ্রনাথ চলিলাম। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বোধ হয় তিন মাস লাগিবে। বর্ষার প্রথমেই আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং সেই সময় আমার ধর্ম্মকন্যা পরম সুখে আছেন দেখিলে, তুমি আমার সার্থক শিষ্য মনে করিব! মঙ্গলময় তোমার মঙ্গল বিধান করুন, নিরন্তর আমার এই আশীর্ব্বাদ, ইতি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক শ্রীভবতারণ শর্ম্মা।

এতক্ষণে যোগীবরের নাম জানলেম। যোগীবরের নাম ভবতারণ শর্ম্মা। যাঁর আশ্রয়ে আমি থাকতে যাচ্চি, তাঁর নাম বিশ্বেশ্বর তেওয়ারী।

এইখানে একটু সন্দেহ হলো। পত্রখানি বাঙলায় লেখা। যোগীবরের চেহারা, বেশভূষা সবই হিন্দুস্থানীর মত। তবে ইনি বাঙালী না হিন্দুস্থানী এই এক সন্দেহ। তিনি যাই হোন, যখন আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, যত্ন কোরে আবার পাঠাচ্ছেন, তখন তাঁকে অন্য কোনভাবে ভাবা উচিত নয়। তিনি হিন্দুস্থানীই হোন, আর বাঙালীই হোন, আমার কাছে তিনি পূজনীয় আশ্রয়দাতা।

রাত্রে আর যোগীবরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। রাত দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরে শেষে দরজা বন্ধ কোরে শয়ন কোল্লেম। নিদ্রা হলো না। আবার কোথায় যাব,—সে কোন্ দেশ,—সঙ্গে যাঁরা যাবেন, তাঁরাই বা কেমন, এই সব চিন্তায় আর ঘুম হলো না। এক রকম বোসে বোসেই সমস্ত রাত কাটালেম।

প্রভাতেই যোগীবর দুজন সন্ন্যাসীসঙ্গে এসে উপস্থিত। এসেই বোল্লেন, "আর বিলম্ব করো না। এঁরাই তোমার সঙ্গে যাবেন। পথে কোন কষ্ট হয়, এঁদের কাছে তা বোলতে লজ্জা করো না। চিঠিখানি আছে ত?"—আমি সম্মতি জানিয়ে বেরুলেম। বাইরে এসে দেখি, যে লোকটী আজ ক'দিন ধোরে আমার দিকে কেবল চেয়ে চেয়ে দেখছেন, তিনি আর একজন অপরিচিত যোগী আমার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত। আমি যোগীর চরণে প্রণাম কোরে—শিব-মন্দিরে প্রণাম কোরে—মুখে দুর্গা শ্রীহরির নাম উচ্চারণ কোরে সন্ন্যাসীর পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম।

এখানে—এই ভক্ত-মন্দিরে বাস আমার এই পর্য্যন্ত। এখন আবার আর একস্থানে যাচ্চি। বিধাতা একস্থানে আমাকে থাকতে দিচ্চেন না। কেবল আমাকে পথে পথে—দেশে দেশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন। বিধাতার এত অত্যাচার,—এত নির্দ্দয়তা কেন?

আমরা তিনজনে যাচ্চি। হাঁটাপথ—তিনজনে হেঁটেই যাচ্চি। সন্ন্যাসীরা পরস্পর কত কথা—কত গল্প—কত উপন্যাস বলাবলি কোচ্চেন, আমি কেবল শুন্‌তে শুন্‌তে যাচ্চি, কথা কইবার দ্বিতীয় লোক নাই। এঁদের সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত আমার আলাপ হয় নাই, কেবল সঙ্গেই যাচ্চি মাত্র।

বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত পথ চোলে আমরা একটী বাজারে পৌঁছিলেম। পথে একটিও লোকালয় দেখতে পাই নাই, কেবল মাঠ,—মাঠের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তা। রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ। বৈশাখ মাস, পাথর গরম হোয়ে যেন আগুনের হল্‌কা উঠছে, পথের দুপাশে বড় বড় গাছ, তাই এতদূর অতিকষ্টে এসেছি। পথের পাশে গাছ থাকলে, সেই গাছের ছায়ায় রাস্তা একটু শীতল না থাকলে এতদুর আসা যেত কি না সন্দেহ।

আমরা বাজারে এসে পৌঁছিলেম। বাজারে হিন্দুস্থানী দোকানদারই বেশী, তবে বাঙালীও দু-একজন দেখলেম। বাজারের নাম কি, তা শুনতে পেলেম না।

বাসা ভাড়া হলো। সন্ন্যাসীদের একজন স্নান কোরে সিদ্ধপক্ক রন্ধন কোল্লেন। আমি দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে স্নান কোরে এলেম। বাজারের নীচে একটি ছোট খাল। জল বড় বেশী নাই, কিন্তু বেশ পরিষ্কার শীতল জলের মধ্য দিয়ে নীচের পাথর পর্য্যন্ত বেশ নজর হয়। আমরা স্নান কোল্লেম, স্নান কোরে পথের সমস্ত ক্লেশ যেন ভুলে গেলেম। শরীর বেশ শীতল হলো। স্নান কোরে বাসায় এলেম। আহারাদি হলো,—একটু বিশ্রাম কোল্লেম।

বাজারে গাড়ী পাওয়া যায়। ঘোড়ার গাড়ী। ছোট ছোট ঘোড়া, ছোট ছোট গাড়ী। সেই গাড়ী ভাড়া কোরে আমরা গাড়ীতে উঠলেম। রাত সাতটার সময় আমরা ষ্টেসনে পৌঁছিলেম। সেইখানেই রাত্রের মত জলযোগ করা হলো। সাড়ে আটটার সময় রেলের গাড়ীতে উঠে আমরা তিনজনে পশ্চিমে রওনা হলেম।

সমস্ত রাত গেল, তার পর সমস্ত দিনরাত গেল, তার পরদিন পাঁচটার সময় আমরা এক ষ্টেসনে নাম্‌লেম। আবার গাড়ী বদল কোরে রাত এগারোটার সময় আমরা গাড়ী থেকে নাম্‌লেম। ষ্টেসনের নিকটেই দোকান, সেই দোকানে রাত্রি যাপন করা হলো। প্রায় তিনদিন আহার হয় নাই, সামান্য জলযোগ কোরেই কাটান গেছে। সেই তত রাত্রে সিদ্ধপক রেঁধে আহার করা গেল। আহারাদি শেষ হোতে রাত প্রায় একটা বাজলো। তার পর তিনজনে সেই দোকানেই নিদ্রা গেলেম।

সকালেই ঘুম ভেঙে গেল। স্থানের নাম শুনলেম—মথুরা। মথুরা হিন্দুর একটি প্রধান তীর্থ, এ কথা আগে জানা ছিল, এখন সেই মথুরায় এসে রাস্তার ক্লেশ যেন ভুলে গেলেম। 'একেই বলে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস!

এখানে ঘোড়ার গাড়ী দেখলেম। শুন্‌লেম, ২।৪ খানা যা আছে, তা সব সময়ে পাওয়া যায় না। এক্কা আছে।—এক্কা অর্থাৎ একঘোড়ার গাড়ী। ছোট একটী ঘোড়া একাই এক্কা টানে। দুখানি চাকার উপর দুজন লোক পরস্পর পেছুন ফিরে বোসতে পারে। এক্কায় যাওয়া যে কি কষ্ট, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন সকলে ধারণা কোত্তেই পারবেন না এক্কাগুলির অধিকাংশই ছাত খোলা, তবে যেগুলি জানানা এক্কা, সেগুলি কাপড়ের ছাত দেওয়া। দূর হতে দেখতে ঠিক যেন ছোট ছোট দোলমঞ্চ।

দুখানি এক্কা ভাড়া হলো। একখানিতে আমি একা, অপরখানিতে সন্ন্যাসী দুজনে উঠে মথুরাসহরের মধ্যে চোল্লেম। অনেকদূর চোল্লেম, ষ্টেসন থেকে প্রায় দেড় ক্রোশ কি তারও অধিক দূর এলেম। একটা চৌমাথা রাস্তায় এক্কা থামিয়ে সন্ন্যাসীরা আমাকে নাম্‌তে বোল্লেন, এক্কাওলার ভাড়া চুকিয়ে অগ্রসর হোলেন। একটু দূরেই একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী। বাড়ীটি নূতন রং করা,—বেশ শ্রীও আছে। দেখলেই বড়লোকের বাড়ী বোলে বোধ হয়। লোকজন বাড়ীতে বিস্তর, খুব জাঁকালো। আমরা সেই বাড়ীতে প্রবেশ কল্লেম। সন্ন্যাসীর একজন জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বাবু কোথায়?" চাকরটি বোল্লে, "বৈঠকখানার পাশের ঘরে আছেন।"—আমরা সেই পাশের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। দোতলায় বৈঠকখানা, তারই পাশের ঘরে বাবু একটি বাক্স সম্মুখে কোরে

বোসে আছেন। বাক্সের উপর একখানি কাগজ রেখে চসমা চোকে দিয়ে তাই দেখছেন। হাতে গুড়গুড়ীর নলটি আছে। একটু দূরে একজন ভদ্রলোক বোসে আছেন। আমরা এমন সময় সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম।

ঘরটি খুব বড় নয়, মাজারী ধরণের ঘর। ঘরজোড়া ঢালাও বিছানা। সেই বিছানার উপর একদিকে একটি ছোট তোষক পাতা। বাবু তাকিয়া, ভুঁড়ি, আর বাক্স নিয়ে সেই মস্‌নদের উপর বোসে আছেন। দেয়ালের গায়ে গোটাকতক অপরিষ্কার দেয়ালগিরি, তাদের ব্যবহার বন্ধ। একটি বড় রথঘড়ী সম্মুখ দেয়ালে ঝুলান। ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখলেম, বেলা তখন নটা বেজে তেঁতাল্লিশ মিনিট।

বাবুর বয়স একটু ভারী। চুলগুলিতে পাক ধোরেছে। গায়ের চামড়া একটু একটু ঝুলেছে, মাথায় ছোট একটি টাকের পত্তন হয়েছে, বড়দরের একটি ভুঁড়িও আছে। এই সব দেখে অনুমান কোল্লেম, বাবুর বয়স ষাটের মধ্যই আছে। বাবুর রংটি ফর্সা, তাতে একটু তামাটে আভা বেরিয়েছে। চোক দুটি বড় বড় কোণে কালিপড়া। কাণের মধ্যে কাঁচায় পাকায় একরাশ চুল। বাবু একটু বেঁটে। গোঁপ আছে, দাড়ী নাই;—বড় বড় জুল্‌পি আছে।

আমরা ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। সন্ন্যাসীরা হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। বাবু চস্‌মাটি বাক্সের উপর খুলে রেখে ভাল করে চেয়ে নমস্কার কোল্লেন, উঠে দাঁড়িয়ে খাতির কোরে বসালেন। সংবাদ জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আদর-অপেক্ষার ত্রুটি হলো না। সন্ন্যাসীরা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার পরিচয় দিলেন। আমি যোগীবরের পত্রখানিও দিলেম। বাবু পত্রখানি পোড়ে বোল্লেন, "বেশ! আমার প্রভুর এমনি অনুগ্রহই বটে। তা আমার বাড়ীতে থাকবে, তার আর কথা কি? আপনার বাড়ীর মত থাকবে, কোন কষ্টই হবে না। মেয়েদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। আপনার বাড়ীর মত থাকবে—বেশ হয়েছে।" এই কথা বোলে যোগীবরের উদ্দেশে অনেক ভক্তি জানালেন। তখনি চাকর ডেকে সন্ন্যাসীদের আহারাদির আয়োজন কোরে দিলেন। বাবু অবশেষে বাক্সটির চাবি বন্ধ কোরে আমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে বোল্লেন, "এস হরিদাসি! আমার সঙ্গে এস, তোমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে

সকলের সঙ্গে পরিচয় কোরে দিয়ে আসি। কোন চিন্তা করো না। দিব্য মেয়ে তুমি. তোমার চেহারায় বোধ হচ্চে, তুমি বড় শান্ত মেয়ে। এস, তোমায় চিনিয়ে দিয়ে আসি।"—আমি উঠ্‌লেম। সন্ন্যাসীরা বোল্লেন, "হরিদাসি! বেশ সাবধানে থেকো।—কোন ভাবনা নাই। হয় ত আর দেখা হবে না। তা না হোক, তুমি সাবধানে—বেশ সাবধানে থেকো এঁরই নাম বিশ্বেশ্বর তেওয়ারী।" আমি সন্ন্যাসীদের প্রণাম কোল্লেম। তাঁরা চোলে গেলেন। আমি বিশ্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ কোল্লেম। জেনে নিলেম, এঁরই নাম বিশ্বেশ্বর তেওয়ারী।

চতুর্দ্দশ চক্র।

এ পত্রখানি কার?

বিশ্বেশ্বর তেওয়ারী আমাকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। খুব বড় বাড়ী, পরিবারও অনেক। অন্দরমহলে নীচে উপরে প্রায় ২০।২৫টা ঘর। বাবুর পরিবার অনেক। তাতেই এত বড় বাড়ী বেশ মানানসই দেখাচ্চে। বাবুর পরিবারের মধ্যে দুটি ছেলে,—পাঁচটি মেয়ে,—একটী পুত্রবধু,—গিন্নী, একটি শ্যালী,—দুটি জ্ঞাতি বিধবা ভগ্নী,—একটি সহোদরা আর এক দূর-সম্পর্কের অনাথা বিধবা। নিজের পরিবারের মধ্যে এই পর্য্যন্ত। এ ছাড়া সরকার, বেহারা, দাসদাসী বিস্তর আছে।

আমাকে দেখেই মেয়েরা সকলে ঘিরে দাঁড়ালো। বাবু আমার পরিচয় দিলেন। যত্ন কোরে রাখতে বোল্লেন। মেয়েরাও বিশেষ আদর কোরে আমাকে গ্রহণ কোল্লেন। বাবু প্রস্থান কোল্লেন, আমি অন্দর-মহলেই থাক্‌লেম।

পরিবারদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল। আলাপে বুঝ্‌লেম, সকলেই বেশ সদালাপী। আমাকে দেখে সকলেই যেন সুখী হোলেন। সকলেই হেসে হেসে কত কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন! গিন্নী নিজে আমার

তেল মাখিয়ে দিলেন, মেয়েরা মাথায় জল ঢেলে দিলে। আমি বড়ই লজ্জিত হোলেম;—নিষেধ কোল্লেম, কেউ সে কথা শুন্‌লেন না! আমার নাওয়া, জল খাওয়া, তার পর আহার পর্য্যন্ত হয়ে গেল!

মেয়েদের সকলকেই চিন্‌লেম, সকলকেই দেখলেম, সকলের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হলো। সকলের কাছেই যত্ন পেলেম।

বাবুর বড় ছেলের নাম যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বরবাবুর বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি! রং বেশ ফর্সা—চোক বসা,—কোণে কালিপড়া;—কাণ ছোট,—চোক গর্ত্তে পড়া,—বুক থাল, ছিনে ঘাড়,—মাথায় বড় বড় বাবরী, বড় বড় গোঁপ,—বড় বড় জুল্‌পী, একটু লম্বা। সাম্‌নের দিক একটু যেন কুঁজো।

ছোট ছেলের নাম রুদ্রেশ্বর। রুদ্রেশ্বরের বর্ণ শ্যাম। বড় বাবুর রঙের তুলনায় এ রং কালো। রং দেখে এক মায়ের গর্ভে জন্ম বোলে বোধ হয় না। বড় বড় দাঁত,—বেজায় বেমানান লম্বা। গোঁপ-দাড়ী ভাল উঠে নাই। চোক-দুটি বড় বড়, মাথায় চুল উস্‌খো থুসখো। বয়স ২৫।২৬, বাবুগিরীটুকু বিলক্ষণ আছে।

বাবুর পাঁচটি মেয়ে। বড়টি বিধবা, নাম নবদুর্গা। নবদুর্গার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসরের কম হবে না। যৌবনকালে নবদুর্গার চেহারাটি বেশ ছিল, এখন যেন একটু ম্লান হোয়ে পোড়েছে।

মেজমেয়ের নাম সুরবালা। সুরবালার স্বামী আছেন। স্বামীর নাম কি, জানি না। সুরবালার চোক দুটি বেশ বড় বড়, একপিট চুল, রংটুকুও বেশ ফর্সা। মোটের উপর দেখ্‌তে বেশ। বয়স ২৭।২৮ কি তারও দু-এক বৎসর কম-বেশী।

সেজমেয়েও সধবা। তাঁর স্বামী এখানেই আছেন। চিরদিনের জন্য এখানে থাকেন না, মাঝে মাঝে যেমন এসে থাকেন, সেই রকমই আজ ২।৩ দিন মাত্র এসেছেন। তাঁকে এখনো আমি দেখি নাই। সেজমেয়ের নাম কিরণবালা। কিরণবালার চুল ছোট, চোক দুটি কটা,—মুখে ব্রণের দাগ, একটু বেঁটে। সামান্য মোটা, বয়স আন্দাজ ২২।২৩ বৎসর।

নমেয়ে বিধবা। শুনলেম, আট বৎসরে বিবাহ আর ৯ বৎসর বয়সেই বিধবা হন। ন-মেয়ের নাম শৈলবালা। শৈলবালার চেহারাটি মন্দ নয়। রং একটু ময়লা, গড়ন বেশ মেয়েলী ঢঙের। সমস্ত শরীর দিব্য

মোলায়েম। চুলগুলি কোঁকড়া,—চোক-ছুটি একটু ছোট, মুখে বসন্তের দাগ। বয়স কুড়ির মধ্যে।

ছোট মেয়ের নাম সুশীলা। বয়স পোনের কি ষোল। সধবা। মেয়েগুলির মধ্যে এঁর চেহারা সব চেয়ে ভাল। যেমন রং, তেমনি গড়ন, সবই মানানসই, বেশ মোলায়েম। মুখখানি দেখলেই যেন ভালবাসতে ইচ্ছা করে। সদাই মুখে যেন হাসি লেগে আছে।

বড় বৌয়ের বয়স ২১।২২ কি তারও দু-এক বৎসর কম-বেশী। বড় বৌ সুন্দরী। কর্ত্তা আপনার বড় ছেলের বিবাহ সুন্দরী দেখেই দিয়েছেন। সৌন্দর্য্যে এ বাড়ীর মধ্যে ছোট মেয়ে প্রথম, বড় বৌ দ্বিতীয়।

বাবুর সহোদরার বয়স ৬০।৬৫ কি তারও বেশী। শালীর বয়স ৪০।৪৫, আর মামাত বোনের বড়টির বয়স ৩০।৩৫ আর ছোটটির বয়স ২০।২৫ অনুমানে স্থির কোল্লেম। এঁরা সকলেই বিধবা, বাবুর আশ্রয়েই প্রতিপালিত হোচ্চেন।

গিন্নীর চেহারা গিন্নীর মত। তাতে তেমন কোন বর্ণনার বিষয় নাই। মেয়েগুলির সকলের গায়ে সমান অলঙ্কার। সকলেরই সমান বেশভূষা। কেবল বিধবাদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ ঘর। আমিও একটি ঘর পেলেম। আমার ঘর সাজানো হলো। গিন্নী স্নেহ কোরে বোল্লেন, "হরিদাসি! এই ঘর তোমার। তুমি এই ঘরে থাকবে।" আমি ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোল্লেম, প্রকাশ্যে কিছু বোল্লেম না।

আছি বেশ। কোন কষ্ট নাই,—আমিও যেন এই বাড়ীর মেয়ে, আমিও যেন এ বাড়ীর আপনার জন, এই ভাবেই আছি। বাবুর সম্পর্ক অনুসারে মেয়েদের দিদি বোলেই সম্বোধন করি। গিন্নীকে মা বলি, কেবল ছোট মেয়ে সুশীলা আমাকে দিদি বোলে ডাকে। আমি তার নাম ধোরেই ডাকি। বোনের মত স্নেহ করি।

প্রায় একমাস এখানে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি। আমার ঘরের একখানি ঘর পরেই সেজদিদির ঘর। একাই তিনি সে ঘরে থাকেন। বাড়ীর ব্যবস্থাও তাই। প্রত্যেকের এক একটি পৃথক্ ঘর। একদিন রাত্রে আকাশে বড় মেঘ উঠেছে। মেঘে আকাশ অন্ধকার কোরেছে। ঘন ঘন মেঘগর্জ্জন হোচ্চে, বিদ্যুৎ হানছে। প্রদীপ নিবিয়ে শুয়েছি মাত্র, দক্ষিণদিকের জানালা খোলা ছিল, বিদ্যুতের আলো আমার ঘরের ভিতর

এসে চকমকি খেলাচ্চে। ভাবে বোধ হোচ্চে, ঝড়-জলের আর বেশী বিলম্ব নাই। মেঘগর্জ্জনে আমার বড় ভয় করে। ঘন ঘন গর্জ্জনে আমার বুকের মধ্যে যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। একা ঘরে থাকতে সাহস হলো না। ভাবলেম, সেজদিদির ঘরে যাই। তাড়াতাড়ি আমার ঘরের দরজা বন্ধ কোরে সেজদিদির ঘরের দরজায় এলেম; দেখলেম, আলো আছে, দরজা বন্ধ। ঘরের ভিতর দুজনে যেন ফিস্‌ফিস্ কোরে কথাবার্ত্তা হোচ্চে। জানালা বন্ধ। এত রাত্রে সেজদিদির ঘরে আবার কে এসেছেন? জানালার ফাঁক দিয়ে তাই দেখতে বড় ইচ্ছা হলো।—কৌশলে জানালার ফাঁকে একটি চোক দিয়ে দেখলেম, সেজদিদি খাটের উপর বোসে পা-দুখানি নীচে ঝুলিয়েছেন, একটু তফাতে রাম সরকার চেয়ারে বোসে সেজদিদির সঙ্গে কথা কোচ্চে। মনে ভাবলেম,—বুঝি কোন কাজের কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে রাম সরকার এখানে এসেছে। রাম সরকার পুরাতন চাকর, তার সকল স্থানেই অবারিত দ্বার। আট বৎসরের অনাথ বালক কুড়িয়ে এনে কর্ত্তা মানুষ কোরেছেন, ঘর কোরে দিয়েছেন,—বিবাহ দিয়েছেন। রাম সরকারকে সকলেই ভালবাসেন। কর্ত্তা বড় বেশী ভালবাসেন বোলে রাম সরকারের প্রভুত্ব কিছু বেশী বেশী।

এই সব মনে মনে ভেবে সেজদিদিকে ডাকবো, জানালার ফাঁক থেকে সোরে আসবো মনে কোচ্ছি, এমন সময় দেখলেম, রাম সরকার সেজদিদির বিছানায় উঠে বোসলো। সেজদিদির হাতখানি ধোরে চুপি চুপি বোল্লে, "কিরণ! রাগ করো না। তুমি ভয় না কর, কিন্তু আমাকে ত সকলের ভয় কোত্তে হয়। কত চেষ্টা কোল্লেম, কত ফিকিরফন্দি খাটালেম, কিছুতেই সুবিধা হলো না। আস্‌তে কি আমার অসাধ?"

কি সর্ব্বনাশ! সেজদিদির এ কি চরিত্র! এতদিন ত ভাল বোলেই জানতেম, আজ আবার একি দেখি? রাম সরকার—বাড়ীর সরকার, তার সঙ্গেই এই! আর রাম সরকারেরই বা কি সাহস? ছেলেবেলা থেকে মানুষ কোরেছেন,—প্রতিপালন কোরেছেন, বিশ্বাস কোরেছেন, তাঁরই মেয়ের সঙ্গে এই কাণ্ড! ধর্ম্মের দিকেও ত একবার চাইতে হয়! এমন বিশ্বাসঘাতক রাম সরকার! বাইরে দেখতে দিব্যি—যেন ভাল মানুষটি, অন্তরে অন্তরে এমন কু?

তা ভেবে আর আমি কি কোরবো?—এখন এরা আরও কি বলে, তাই ভাল কোরে শুনতে হলো। আবার মনোযোগ দিয়ে, জানালার ফাঁকে চোক দিয়ে, দম্ বন্ধ করে শুনতে লাগলেম। সেজদিদি রাগে ফুলে উঠে একটু চড়া কথায় চাপা আওয়াজে বল্লেন, "তা আস্‌বে কেন? এদিকে যেমন রস ফুরিয়ে এসেছে দেখচো, অম্‌নি গা-ঢাকা হবার চেষ্টায় আছ। তা কর, ধর্ম্মে কখনো সইবে না। তোমারে আমি জব্দ কোত্তে ত্রুটি করবো না। এত বদ্‌মাইসী তোমার? মনে কোরেছ, আমি হাবা, হ্যাকা, দু-কথায় বুঝিয়ে যাবে, তা মনে করো না। তুমি আমাকে তেমন কোচখুকী মনে করো না। তোমাকে আমি দেখবো। আমি সমস্ত রাত জেগে কাটালেম,—জেগে জেগে মাথা ধোরিয়ে ফেল্লেম, বাবুর আর বার হলো না। যাও, আর ভালমানুষী জানাতে হবে না। তুমি যা, তা অনেকদিন জানতে পেরেছি, কেবল মন বুঝে না, তাই।"

রাম সরকার বড় কাতর হয়ে সেজদিদির পা-দুখানি জোড়িয়ে ধোরে বোল্লে, "রাগ করো না, আমার ঘাট হয়েছে। আর কখনো কামাই কোরবো না। তুমি রাগ কোল্লে আমি কোথা যাব? আমার আর কে আছে?" রাম সরকার ভেউ ভেউ কোরে কেঁদে উঠলো। কান্নার ধমকে কথা বন্ধ হয়ে গেল। সেজদিদির পা-দুখানি ধোরে সজলনয়নে তার মুখের দিকে কেবল ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রইল।

সেজদিদির যেন দয়া হলো। রাম সরকারের হাত-দুখানি ধোরে তুলে বসিয়ে যেন একটু নরম হয়ে বোল্লেন, "দেখো, খরদার আর এমন কাজ করো না!"—রাম সরকার প্রতিজ্ঞা কোল্লে, "আর কখনো এমন কাজ কোরবো না।" বিবাদ মিটে গেল। তার পর কি হলো তা জানি না! গায়ে বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা জল পোড়তেই আমি আপনার ঘরে ফিরে এলেম। আপনার ঘরেই শুয়ে রইলেম। সেজদিদিকে আর ডাকা হলো না।

সমস্ত রাত জেগে কাটালেম। সেজদিদির কাণ্ড,—রাম সরকারের কাণ্ড ভেবে ভেবেই রাত কেটে গেল। মনে মনে বুঝ্‌লেম, সংসারে সবই দেখি এই কাণ্ড! একটু অনুসন্ধান কোল্লে এই সংসার-সব্বরীর অনেক তত্ত্ব পাওয়া যায়। সংসারের সবই অবাক কারখানা!

আবার একটা মাস মাথার উপর দিয়ে চোলে গেল। সেদিন

রাত্রে যে কাণ্ড দেখেছি, তা কাহারও কাছে প্রকাশ কোল্লেম না। সেজদিদির সঙ্গে যখনই দেখা হয়, রাম সরকারকে যখনই দেখি, তখনই সেই কথা মনে হয়। মুখের দিকে চাইতে পারি না, বড় লজ্জা করে।

আর একদিন আর এক কাণ্ড! আমি একদিন রাত্রে বড়দাদার ঘরে গেছি। অনেক রাত্রে কে একজন মহাজন এক চুবড়ী খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। এমন অসময়ে খাবার দেখে গিন্নী বোল্লেন, "কেন আর খাবারগুলো নষ্ট হয়, সকলই খেয়ে ফেল!" এই বোলে সকলকেই ভাগ কোরে দিলেন। আমার ভাগ আমাকে দিয়ে—আমাকে খাইয়ে বোল্লেন, "বড়বৌকে খাবারটা দিয়ে যাও।" আমি তাই সেই খাবার হাতে কোরে বড়বৌয়ের ঘরে গেছি। রাত তখন এগারটা।

আমি ঘরে গিয়ে দেখলেম, বাইরে দরজা বন্ধ। ডাকলেম, বৌ দরজা খুলে দিলেন। বৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, এক চোক জল। আমি খাবারটা নামিয়ে রেখে বড়বৌয়ের হাতখানি ধোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "হাঁ বৌ! তুমি কাঁদচো? দাদা কোথায়? এখনো আসেন নাই?" বড়বৌ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বোল্লেন, "সে কথা হরিদাসী আর কেন জিজ্ঞাসা কর? আমার পোড়া কপাল! পূর্ব্বজন্মে কত পাপ কোরেছিলেম, তাই আমার এ শাস্তি।" এই বোলে বড়বৌ আরও কাঁদতে লাগলেন। আমি যেন আশ্চর্য্য জ্ঞান কোল্লেম। বড়বৌ এমন কোরে কাঁদেন, এমন দুঃখ ত তাঁর নাই। রাজার মত স্বামী,—শ্বশুর-শাশুড়ী, টাকাকড়ি, অভাব কি? ভাব বুঝতে পাল্লেম না। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে কি বৌদিদি! বল কি? তোমার আবার পোড়কপাল?—তোমার আবার দুঃখ?" বড়বৌ একটু থেমে বল্লেন, "দুঃখ নয় কিসে? এমন স্বামী—পরকে দিয়ে প্রাণ রাখা কি কম কষ্টের কথা? আমি যে বড় কঠিন, তাই এ কথা কেউ জানতে পায় না। আপনার দুঃখ আপনার বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখি;—আপনার আগুণে আপনি পুড়ি। প্রকাশ কোল্লে কি আর রক্ষা আছে?" আমি যেন চোম্‌কে উঠলেম, দাদাবাবুর আবার এমন কাজ?

দাদাবাবুর চেহারায় ত কোন কুমৎলবী বা বদ্‌খেয়েসী বোলে বোধ হয় না। সংসারে তবে লোক চেনা বড় সহজ নয়। আগে আমার

দর্প ছিল, মনে মনে জেনে রেখেছিলেম, লোক চিন্‌তে আমি বড় পাকা জহুরী; এখন দেখ্‌ছি, আমার দর্প ভেঙ্গে গেল! বড়বৌকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে কি বৌদিদি! এমন সর্ব্বনাশ কে কোরেছে?"

"কে কোরেছে?" বড়বৌ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন, "কে কোরেছে, তাও আবার হরিদাসী জিজ্ঞাসা কোচ্চো? এ কি অপর লোক, যে প্রকাশ কোর্‌বো, তাকে জব্দ কোর্‌বো, চাল কেটে উঠিয়ে দিব? এ যে ঘরে ঘরে কাণ্ড! মুখ ফুটে বল্‌বার কি পথ আছে?" আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হলো! বড়বৌ বলেন কি? এ কি সত্য ঘটনা, না স্বপ্ন? কৌতুকে কৌতুকে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে বৌদিদি?"

"পিসী মা।" বড়বৌ উত্তর কোল্লেন, "পিসী মা;—ছোট পিসী মা। যাকে যত্ন কোরে ঘরে রেখেছেন,—কর্ত্তা যে কালসাপ দুধকলা দিয়ে পুষেছেন,—সেই ছোট পিসীমা।—সেই পদ্মমুখী!" আমি ত অবাক! মুখ দিয়ে আর কথা সরে না! অবাক কাণ্ড! বড়বৌ আমার হাতখানি ধোরে কাঁদো কাঁদোমুখে বোল্লেন, "হরিদাসি! যা হবার হয়েছে, যা হোচ্চে, তা হোক। কারো কাছে প্রকাশ করো না। আমার যা হোচ্চে, তা আমারি হোক। আমিই সহ্য করি। প্রকাশ কোল্লে, কোন ফল হবে না, বেশীর ভাগ একটা কেলেঙ্কারী। কাজ কি ভাই আর গোলে? এ কথা প্রকাশ করো না।" আমি বোল্লেম, "প্রকাশ না করি, কিন্তু এর প্রতীকারের কি কোন উপায় নাই? দাদাবাবুকে একবার ভাল কোরে বুঝিয়ে বোল্লে তিনি কি শোনেন না? তিনি বুদ্ধিমান, সবই বুঝেন। ভাল কোরে একবার বুঝিয়ে বলা ভাল। পিসীমারই বা সাহসটা কি? বিধবা,—আলো আতপ খান,—ঘি সন্ধব খান,—সাদা কাপড় পরেন, পান পর্য্যন্ত খান না, তাঁরই চরিত্র এই! ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড—এত ব্যাপার!"

আমি আর বেশী কি বোল্‌বো, ফিরে এলেম! বৌদিদি আরও বোল্লেন, "হরিদাসি! এ বাড়ীর গতিকই এই। হাড়েনারে জ্বালাতন কোরেছে। দুদিন থাকতে থাকতেই জান্‌তে পার্‌বে। তুমি নূতন এসেছ, কিছুই জান না। সাবধানে থেকো। যা দেখ, কেবল দেখেই রেখো। প্রকাশ কোরো না!" আমি এই উপদেশ মত কাজ কোত্তে স্বীকৃত হয়ে আপনার ঘরে এসে শুলেম। মনে মনে ভাবতে লাগলেম

এমন ভদ্রপরিবার, এঁদের ঘরের ভিতর এতটা কাণ্ড! যা শুনলে কাণে হাত দিতে হয়, বা মুখে উচ্চারণ কোল্লে পাপ হয়, এরা সেই সব অনায়াসে কোচ্চে। ধন্য বুকের পাটা! বড় ঘরের বড় কথা, যে জানে, সেই জানে। এরা ঘরে ঘরে কি ভয়ানক কাণ্ডটাই কোচ্চে!

প্রায় তিনমাস কাটালেম, সুখে স্বচ্ছন্দে তিনমাস কাটালেম। নূতন কাণ্ড আর বড় কিছু নজরে পড়ে না। তবে পূর্ব্বে যা দেখেছি,—পূর্ব্বে যা শুনেছি, সে সব ক্ষয়ানক ভয়ানক কথাগুলি আজও বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট মনে আছে।

একদিন বৌদিদির ঘর থেকে আমার ঘরে আস্‌ছি,—রাত বেশী হয় নাই, বড় জোর ১১টা, বৌদিদি বড় ভালবাসেন,—আমাকে দেখ্‌লে তাঁর আঁধার মুখে হাস দেখা যায়,—তাই আমি আর সুশীলা প্রায় অনেক সময় বৌদিদির ঘরেই থাকি। কোন কোন দিন দিনের বেলায় দাদাবাবু এক আধ ঘণ্টা আসেন। আমরা সে সময় বেরিয়ে যাই। রোজ যেমন যাই, আজও সেই রকম গেছি। সুশীলার ঘুম পেতে সে উঠে গেল, আমিও তার দেখাদেখি উঠলেম। ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে আস্‌তে ৫।৬টা ঘর পেরিয়ে আস্‌তে হয়। মাঝে আবার একটা ছোট গলি রাস্তা আছে। উপরের দুখান ঘরের ঠিক মাঝখান দিয়ে সেই গলিরাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে নীচে নেমে যাওয়া যায়। আমার ঘরে আস্‌ছি, গায়ে খস্ কোরে কি যেন একটা বাধ্‌লো। হাতে কোরে তুলে দেখি, খামের মধ্যে পোরা একখানি পত্র। এখনো খোলা হয় নাই। হয়তো কে নিয়ে যেতে ফেলে গেছে। এই ভেবে পত্রখানি যত্ন করে ঘরে নিয়ে এলেম, বালিশের নীচে রাখ্‌লেম। আবার মনে হলো, শিরোনামটা একবার দেখি। মনের যেমন প্রবৃত্তি, কাজেও ঠিক সেই রকম হয়। চিঠিখানি প্রদীপের আলোতে নিয়ে গিয়ে দেখি, মেয়েমানুষের লেখা। বড় অশুদ্ধ—বানান ভুল, নূতন লেখাপড়া শিখে লেখা। উপরে শিরোনাম আছে,—

"শ্রীজুৎ বাবু বিসনরাম
মধুপুরি মথুরা।"

এ লোকটা আবার কে? পত্রই বা এ বাড়ীর লেখে কে? মনে বড় সন্দেহ হলো। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোল্‌বার চেষ্টা কোল্লেম। খামের ধারে

ধারে জল দিয়ে একটু রাখতেই বেশ খোলা গেল। পত্র পোড়ে আমি ত অবাক! বৌ দিদি যা বোলেছেন, তাই! পত্রে লেখা আছে :—

"পৃয়তমেশু—

তোমার মনে যে এই ছিল, তাহা আমি স্ত্রিলোক, য়ামার পূর্ব্বে বিশ্বাষ ছিল নাই। তুমি যে এরূপ দাগা দেবা, তাহা পূর্ব্বে যানা থাকলে অমন কায করিতাম নাই। তুমি য়াগে য়নেক চাতুরি করিআ য়াপন কায হাত করিআ এখন য়াপন পত দেখীয়াছ, উত্যম, য়ামার এখন বীপদ। য়ামি জদী আর্তঘাতী হই, তমার পাপ হইবেক। জদী য়ামাকে বাচাইতে তমার মোন থাকে, এই পত্তর পাওা মাত্তে খেমার মার সঙ্গে দেখা করিবা। সব কতা তার মুখে সুনিবা। য়ামার সর্ব্বনাশ করীয়া এখন এই, মাজ ৩ মাষ হয়েছে। প্রেকাষ হবার আর দেরি নাই। এত মোদ্ধে কাজ না হয়িলে ধাষ্টমো হবে। য়ার কি লিখিব। তুমি য়েমন করিয়া ভুলীয়া থাকিবা ইহা একদিনও ভবীনা। হতভাগীণীর কপালে কতো দুখ্খু য়াছে, তা ভগবান যানেন, ইতি।"

"হতভাগিনী—সইলোবালা"

এ কি কাণ্ড! এতদিন জানতেম, নদিদির চরিত্র ভাল। অল্প বয়েস, তবুও তাঁর আচার-ব্যবহার দেখে তাঁর উপর কোন সন্দেহই হয় নাই। হরিনাম করেন,—আহ্নিক না কোরে জল খান না,—আলো আতপ খান, ব্রত উপবাস করেন, তাঁর চরিত্র এই! বিষণরাম কে? তার নামও ত এতদিন শুনি নাই? নাম শুনে বিবেচনা কোল্লেম, বিষণরাম বাঙালী নয়। এঁরা যেমন জাতহিন্দুস্থানী, অনেকদিন বাঙ্‌লাদেশে থেকে একরকম বাঙালী হয়ে গেছেন, বিষণরামও হয় ত সেই রকম কিছু হবে। পত্রে বিষণরামের উপাধি নাই। তা থাকলেও বরং অনেকটা চিন্‌তে পারা যেতো। বিষণরাম যাই হোক, ন-দিদি আবার এ কি?—তিণমাসই বা কি? মনে বড় ধোঁকা লাগ্‌লো। মনে মনে স্থির কোল্লেম, ব্যাপারটা একবার দেখ্‌তে হবে। কাণ্ডটার চরম কতদূর, তার সঠিক সংবাদটা যেরূপে হয় জান্‌তে হবে।

মনে মনে মৎলব ঠিক কোরে পত্রখানি আবার বেশ কোরে আঁটলেম। পত্রখানি এঁটে কাপড়ের ভিতর বেশ কোরে লুকিয়ে ন-দিদির ঘরে গেলেম।

ন-দিদির ঘর বন্ধ। ঘরের ভিতর আলো আছে। দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতেই ন-দিদি দরজা খুলে দিলেন। আমাকে দেখেই বোল্লেন, "কি

হরিদাসি! এত রাত্রে ডাকচো কেন? এত রাত হয়েছে, এখনো শোও নাই? আমি বোল্লেম, "না দিদি! এখনো শুই নাই। বড় তৃষ্ণা পেয়েছে, আমার ঘরে জল নাই, তাই একটু জল খেতে এলেম।" এই বোলে আমি ন-দিদির বিছানায় বোস্‌লেম। ন-দিদি জল গড়াতে গেলেন। জল খাওয়া কেবল মুখে বৈ ত নয়। ঘরের এক কোণে জল থাকে, ন-দিদি যেমন সেইদিকে জল আন্‌তে গেছেন, আমি সেই অবসরে পত্রখানি তাঁর বালিশের নীচে রেখে দিলেম। ন-দিদি জল আন্‌লেন, না খেলে নয়, তাই একটু খেয়ে বেরিয়ে এলেম।

ঘরে এসে শুয়ে কেবল ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, ন-দিদির আবার এমন চরিত্র! নিধিরাম লোকটা কে? এ চিঠি কার?

পঞ্চদশ চক্র।

এই বুঝি সতীত্ব?

এ বাড়ীর কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গেছি। এমন কেলেঙ্কারী, এমন লোক হাসাহাসি—এমন ভদ্রপরিবারের মধ্যে এতদূর ভয়ানক ব্যাপার আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। এক একজন লোকের চরিত্র এক একরকম। যত দিন যাচ্চে, ততই নূতন নূতন কাণ্ড, নূতন নূতন বদমাইসীর নূতন নূতন কারখানা প্রকাশ পাচ্চে। আছি বেশ, কিন্তু এদের এই সব ব্যাপার দেখে মনে বড় ভয় হয়েছে। কি জানি, অদৃষ্টে যে কি আছে, তাই ভেবেই সারা হোচ্চি। এমন বাঁধাবাঁধির সংসার,—এমন শক্তাশক্তি নিয়ম,—এমন উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত, কিন্তু তবুও এ কেলেঙ্কারী সমভাবেই চোলেছে।

বড়বাবুর চরিত্র, ছোট পিসীমার চরিত্র, সেজদিদি কিরণবালার চরিত্র দেখে আমি ত অবাক হয়ে গেছি। তার উপর আবার এ কি? বিধবা ন-দিদি শৈলবালার এ কি চরিত্র! বুকের পাটাও ত কম নয়! ধন্য সাহস! এমন জলজলাট সংসার,—এমন লোকজনের জমজমাট,—এক হাট মেয়ে-ছেলের মধ্যে এদের এই কাণ্ড! ধন্য সাহস!

সেজদিদির স্বামী এসেছেন। তিনি কোথায় থাকেন, সে সংবাদ বড় কেহই রাখেন না। আদুরে মেয়ে—যা বলে, তাই মঞ্জুর। মেয়ের অসুখ, জামাই ঘরে ঢুক্‌তে পারেন না, কর্ত্তাগিন্নীর এই হুকুম। মেয়ের যে এদিকে কি রোগ ধোরেছে, পরম বিশ্বাসী পেয়ারের চাকর রাম সরকার যে কি মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে, তা কেহই দেখেন না,—হয় ত জানেনও না!

এদিকে এই, তার উপর আবার ন-দিদির এই ঢলাঢলি। মনে মনে স্থির কোরে রেখেছি, পত্রখানার মর্ম্মটা একবার ভাল কোরে বুঝে নিতে হবে। তাই সব কাজ ছেড়ে আজ-কাল ন-দিদির ঘরেই ঘুরি। যত আনাগোনা তাঁরই ঘরে।

যেদিন পত্রখানা বালিশের নীচে লুকিয়ে রেখে আসি, তার পরদিনই কতক সন্ধান পেলেম। দুপুর বেলা—সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, সকলেই আপন আপন ঘরে এসেছেন, আমি সুশীলার ঘরে যাচ্চি। ন-দিদি কি কোচ্চেন, সেটা একবার দেখে যাই মনে কোরে, তাঁর ঘরের কাছে গেলেম, দেখলেম, দরজা বন্ধ। দুজনে কি কথা বলাবলি হোচ্চে। কে এ দুজন? দরজায় কাণ পেতে শুনতে লাগলেম। ন-দিদি বোলছেন, "শ্যামা! তুই বড় ভুলো। চিঠিখানি নিয়ে যেতে তোকে কাল পঁচিশবার বোল্লেম, তুই ফেলে গেলি। যদি দাদার হাতে পোড়তো? যদি বাবা দেখতে পেতেন, তা হলে কি সর্ব্বনাশ হতো বল্ দেখি? টাকা নেওয়ার সময় ত খুব, কাজের বেলা ত এই?" শ্যামা একজন ঝিয়ের নাম। শ্যামা বোল্লে, "কি কোরবো দিদিবাবু! মনটা আমার এদানী এই রকমই হয়েছে। মিন্সে চোলে যেতে ঐরকম ভুলোই হয়েছি। তা যা হবার, তা হয়ে গেছে। এখন দাও, এখনি দিয়ে আসি।" ন-দিদি বোল্লেন, "যা!—এখনি যা! শ্যামার মায়ের হাতে এখনি দিয়ে আয়! বোলে দিস্, আজিই যেন খবর পাই। এখনি যেন যায়। যদি আজ আন্‌তে পারে, তা হোলে তখনি হাতের উপর দশ টাকা। তুইও কিছু পাবি। খিড়কীর দরজায় তুই থাকবি, এ কথাও বোলে দিস্!"

"তা পাব বৈ কি দিদিবাবু! তোমাদের খেয়েই ত আমরা মানুষ। তোমাদের হিল্লেয় আছি, তোমরা যদি না দিবে, দিবে কে?" শ্যামা এই রকম গৌরচন্দ্রিকা কোরে বেরয়ে আসছে দেখে, আমি সোরে পোড়লেম। মনে মনে স্থির কোল্লেম, আজ একবার ভাল কোরে দেখতে হবে।

সুশীলার ঘরে আর যাওয়া হলো না। আপনার ঘরে এসে শুয়ে শুয়ে কেবল মতলব আঁটতে লাগ্‌লেম। সন্ধ্যা হলো, ঘরে প্রদীপ জ্বাল্লেম, তখনো সেই চিন্তা। রাত্রে খাবার সময় হলো, সকলে খেতে বোস্‌লেন, তখনো সেই চিন্তা। সকলের খাওয়া হলো, সকলেই আপন আপন ঘরে গেলেন, তখনো সেই চিন্তা।

আমি আপনার ঘরে যাচ্চি। মনে হলো একবার ন-দিদিকে দেখে যাই। গিয়ে দেখি, তখনো দরজা বন্ধ। শ্যামা ঘরের ভিতর। দুজনে পরামর্শ হোচ্চে। আমি ঘরের প্রদীপটী নিবিয়ে—দরজায় চাবী দিয়ে খিড়কীর পাশের ঘরে এসে আড়ি পেতে বোসে রইলেম। এ ঘরে কেউ কখনো থাকে না। ঘরে আলো দেওয়া হয় না। পোড়োঘর। প্রায়ই খালি পোড়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে কাঠ থাকে। আমি সেই আঁধার ঘরের ভিতর আড়ি পেতে বোসে থাকলেম।

অনেকক্ষণ গেল। প্রায় দু-ঘণ্টারও বেশী আমি সেই অন্ধকার নির্জ্জন ঘরেই কাটালেম। ঘরটা যেন গুদাম!—যেমন অন্ধকার,—তেমন দুর্গন্ধ, আবার তেম্‌নি মশার উপদ্রব। এই দুঘণ্টায় প্রায় এক ছটাক রক্ত মশার পেটেই গেল। বড়ই কষ্ট হোচ্চে। কিন্তু এদিকে এমন একটা ঝোঁক পোড়ে গেছে যে, এতটা কষ্টও যেন কষ্ট বোলেই বোধ হোচ্চে না। আছি, অনেকক্ষণ সেই একভাবেই আছি,—দেখি, শ্যামা এলো। আমি যেখানে যে ঘরে বোসে আছি, সেই ঘরের ভিতরই ঢুকলো। দেখে ত আমার প্রাণ উড়ে গেল! মনে কোল্লেম, শ্যামা হয় ত আমাকে দেখেছে। দেখুক, কিন্তু কথা কওয়া হবে না। খুব সতর্ক হয়ে—নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত চেপে চেপে [illegible]ল সাবধানে বোসে রইলেম। ভয় গেল! শ্যামা আমার প্রায় দুহাত [illegible]তে আমার মত চুপ কোরে বোসে রইল। একঘরেই দুজন। দুজনই [illegible],—দুজনই আড়ি পেতে আছি। এও এক আশ্চর্য্য তামাসা!

[illegible]ায় আধঘণ্টা পরেই খিড়কীর কপাটে ঠুক্‌ঠুক্ কোরে কে যেন আঘাত [illegible]। শ্যামা বোসেছিল, সাঁ কোরে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। [illegible] বাবু প্রবেশ কোল্লেন। শ্যামা তাড়াতাড়ি খিড়কী বন্ধ কোরে বাবুকে [illegible] কোরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এঁকে বেঁকে শেষে যথাস্থানে হাজির হলো। [illegible]?—ন-দিদির ঘরে। আমি পাছু পাছুই চোলেছি। সব দেখতে [illegible] দিদি দরজা খুলে বাবুকে [illegible] নিলেন। শ্যামা সাঁ কোরে

পশ্চিমদিকে চোলে গেল। ন-দিদি দরজা বন্ধ কোল্লেন, আমি তখনি জানালার ফাঁকে একটী চোক দিয়ে কাণ্ডটা কতদূর গড়ায়, তাই দেখ্‌তে লাগলেম।

বাবু আমার দিকে পেছন ফিরে বোসেছেন। মুখ দেখা যাচ্চে না। ন-দিদির মুখ আমার দিকে। কাজেই বাবুটিকে ভাল কোরে দেখা হলো না। আন্দাজে বুঝলেম, বাবু খুব মোটা সোটা, গুণ্ডা-ষণ্ডার মত। শরীরে বেশ শক্তি আছে।

বাবুকে দরজা খুলে দিয়েই ন-দিদি মানে বোসলেন। মানে বসা যেন সংক্রামক রোগের মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন যাকে দেখি, তিনিই তখনি যেন মান কোরে আছেন। মান যেখানে শোভা পায়, মানের যে স্থান, সেখানে মান করা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু যেখানে মান খাটে না, যেখানে কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্যই পাপের ভার বইতে হয়, সেখানে আবার মান কেন? যা রয় সয়, তাই করাই ভাল।

ন-দিদি মানে বসেছেন। প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, কথা কইবেন না। ন-দিদি সেই ভাবেই বোসে আছেন। বাবুর মুখেও কথা নাই। বাবুও নীরবে বোসে আছেন। এই ভাবেই কতক্ষণ গেল। মান রইল না। ন-দিদির মহামান আপনা হোতেই ভেঙে গেল, ন-দিদি আগেই কথা কইলেন। তিনি বোল্লেন, "এত কষ্ট কি দিতে হয়? তখন তখন কত তাড়াতাড়ি, এখন দশ দিনে-খবর দিয়েও বার পাওয়া যায় না। এই কি তোমার উচিত হয়েছে? আমি লজ্জার মাথা খেয়ে—বাপ-মায়ের মুখে কালি দিলেম, ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করলেম, কেবল তোমার জন্যই ত? তুমি কি আমায় এই ফল দিলে? আমার ধর্ম্ম নষ্ট কোরে—জাত খেয়ে, শেষে পা ঠেলা দিলে? এও কি কখন প্রাণে সয়? যা কোরেছি, তার আর ভাবনা কি, তবে এখন যে বিপদে পোড়েছি, সে বিপদে উদ্ধার না কোল্লে, আমি কোথায় যাব? লজ্জার মাথা খেয়ে আর কতবার বোলবো? তিনমাস হয়েছে, আর দুদিন পরে লোক জানাজানি হবে। তখন কি কোরে আর মুখ দেখাব? যা কোরেছ কোরেছ, এখন যা হয়, একটা উপায় না কোল্লে আর গতি নাই। বল, আমাকে রক্ষা কোর্‌বে?"—ন-দিদি এই পর্য্যন্ত বোলে বাবুর মুখের দিকে চাইলেন।

বাবু গম্ভীরভাবে উত্তর কোল্লেন, “তা আমি আর কি করবো? আমি কি স্ব-ইচ্ছায় কোরেছি। আর আমার অপরাধই বা কি? চারিদিকে ঝঞ্ঝাট, কারবারটি যায় যায় হয়েছে, আমার বিপদের সীমা নাই। আমি কি ইচ্ছা কোরে আসি না? আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। আমি এখন তোমায় কি কোরে রক্ষা করি? আর খরচ-পত্র জোগান এখন আমা দ্বারা হয় কি কোরে? বিশেষ তোমার কাছে তেমন খতে পত্রে ত বাঁধা নই। অত তাগাদা—অত ধূমধাম আমি কেন সহ্য কোরবো? আমার দ্বারা কোন উপায় এখন হবেনা। আমার অবস্থা এখন বড় মন্দ।”—বাবুর কথার ভাবও বড় মন্দ! তিনি যেভাবে কথা কইলেন, তাতে ন-দিদির মানের বেশ প্রতি-শোধ হয়েছে। তাঁর যেমন গর্ব্ব, বাবুর কথায় সে গর্ব্ব তেম্‌নি খর্ব্ব হয়েছে। ন-দিদির মনে ছিল, তিনি যেন চড়াকথায়—ভয় দেখিয়ে কার্য্য-সিদ্ধি কোরবেন, কিন্তু বাবুর মুখের তোড়ে—তাঁর বাঁকা বাঁকা কথায় ন-দিদি যেন কেমনতর হয়ে গেলেন। মুখখানি শুকিয়ে এলো। কাতর হয়ে নরমে বোল্লেন, “তবে তুমি আমার সর্ব্বনাশ কোল্লে কেন?” বাবু তেজিমেজাজে আবার সেই রকম বাঁকা বাঁকা কথায় বোল্লেন, “কে তোমার সর্ব্বনাশ কোরেছে? আমি কি জোর করে তোমার ঘরে এসেছিলেম? কত সাধ্য সাধনা কোরেছ, কতবার কত লোক পাঠিয়েছ,—কত পত্র লিখেছ, তবে ত আমি এসেছি। আমি তেমন তুতিছেলে নই। তোমার সব পত্র আমি কায়দা কোরে রেখেছি। আমি জানি, কালে একদিন না এক দিন একটা গোল উঠ্‌বেই উঠ্‌বে। আমি সেই জন্যই সে সব যোগাড় কোরে রেখেছি। তুমি যত চেষ্টা কর,—যত ফিকির-ফন্দি কর,—যত কৌশলই ভাঁজ, সে সব চিঠির কাছে সব ফাঁক!”

ন-দিদির মুখ আরও শুকিয়ে গেল। আরও যেন ভীত হয়ে বোল্লেন, “তবে তোমার মনে গোড়া থেকেই এসব কু-আঁকা ছিল। এই না তোমার ভালবাসা? প্রথমটা ত এমন দেখি নাই। এতদিন ধোরে আমার সর্ব্বনাশ কোরে শেষে এখন এই কথা? এই কি ধর্ম্ম?” বাবুর মেজাজ কিছুতেই নরম হলো না। তিনি আবার তেমনি ধরণে বোল্লেন, “খতে পত্রে আমি তোমার কাছে ত বাঁধা নই? বেশ ত,

প্রথমটা কে না লোভ দেখায়? কাজ হাসিল হোলে তখন আর তেমনটি থাকে না। এই ত এ কাজের রীতি! তোমাতে আর আছে কি? তোমার যা বস্তু, তা অনেক দিন শুষে নিয়েছি। খোলাটা আছে বৈ ত নয়! আমার মনের বাসনা অনেক দিন পূর্ণ হয়েছে। এখন আর তোমার রাঙ্গা চোক দেখে ভয় পাব কেন গা? আজ বাদে কাল তোমার ছেলে হবে, ব্যাটা নিয়ে সুখে থাকবে। আমি আর মন্দ কাজটা কি কোরেছি?"

তীক্ষ্ণশ্লেষে ন-দিদি যেন বড় ব্যথিত হোলেন। রাগে গর্ গর্ কোত্তে কোত্তে বোল্লেন, "তা বেশ কোরেছে। আমার ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে, তুমি এখনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও! এক তিলও বিলম্ব করো না। নইলে আমি চীৎকার কোরে বাড়ীর লোক সব জমা কোরবো।"—বাবু হাসলেন;—হো হো করে হেসে হেসে—গোড়িয়ে গোড়িয়ে পোড়ে বোল্লেন, "তবে ভাল কোরে বসি। ডাক তুমি,—তোমার যে যেখানে আছে, ডাক। গুণের পরিচয়টা একবার ভাল কোরে দেও! মেরে ফেলার ভয় দেখিও না। সেকাল এখন আর নাই। আমি নিজের কাজ গুছিয়ে রাখি, এই দেখ।" এই বোলে বাবু জামার পকেট থেকে একখানি চক্‌চোকে ছোরা বাহির কোল্লেন। দেখেইত আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল। প্রদীপের আলো লেগে ছোরাখানা যেন চক্‌মক কোত্তে লাগলো। ন-দিদিও একটু সোরে বোস্‌লেন। আগে একটু জোরে কথা হোচ্ছিল, ছোরার চক্‌চকানি দেখে ন-দিদির সে জোর আর রইল না। তিনি কাতর হয়ে বোল্লেন, "ছোরার ভয় আর কি দেখাবে? ছোরাত বুকে মেরেই রেখেছ! নূতন আর কি বেশী মারবে। যা করেছ ঢের, আর কাজ নাই। তুমিও আপন পথ দেখ, আমিও আপন পথ দেখি।"

ন-দিদি দরজা খুলে বেরুলেন। বাবু বোসেই থাকলেন। বাহিরে অনেকক্ষণ শ্যামার সঙ্গে ন-দিদির কি কি কথা হলো। আবার ফিরে এসে বোল্লেন, "একটু থাম, শ্যামা আসুক।" এই বোলে মাথাটি নীচু কোরে ন-দিদি বোসে রইলেন। কোন কথা কইলেন না। বাবুও সেই একভাবেই বোসে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে পা টিপে টিপে শ্যামা এলো। বন্ধ দরজায় টুক টুক

কোরে ছটো টোকা দিতেই ন-দিদি দরজা খুলে দিলেন। শ্যামা এসেই বোল্লে, "বাবু শীগ্‌গির আসুন, রাত আর নাই। গিন্নী উঠেছেন। শীগ্‌গির,—শীগ্‌গির!"

বাবু তাড়াতাড়ি উঠ্‌লেন। ন-দিদিকে আর কিছু না বোলে শ্যামার সঙ্গে সাঁ কোরে বেরিয়ে গেলেন।

অবাক কাণ্ড!—অদ্ভুত ব্যাপার!—তাজ্জব কারখানা! বৌদিদি ঠিক কথাই বোলেছেন। এদের এক একজনের কীর্ত্তি-কারখানা এক এক রকম। ন-দিদি বিধবা, তাঁরই এই চরিত্র! আবার আর এক কাণ্ড! পেটে ছেলে হয়েছে!—কি সর্ব্বনাশ! এ ত জীবহত্যা কোরবেই কোরবে! ভদ্রলোকের মেয়ে,—বিধবা, ছেলে ত আর রাখতে পারবে না, কি সর্ব্বনাশ!

পাঁচরকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে আপনার ঘরের দিকে যাচ্চি। রাত বেশী নাই। হঠাৎ একটা শব্দ উঠ্‌লো, "চোর!—চোর! চোর!—আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। উপর থেকেই দেখ্‌লেম, বাবু অন্দরের উঠানে ছুটোছুটি কোচ্চেন, শ্যামা উপরের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চীৎকার কোরে বোলছে, "চোর!—চোর!—চোর!" দরোয়ান-চাকরে অন্দর পূরে পোড়্‌লো। কর্ত্তা স্বয়ং এলেন। মেয়েরা সকলেই উঠে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেম। সকলেই বেরিয়েছেন, শ্যামার চীৎকারেই ঘুম ভেঙেছে, কেবল ঘুম ভাঙে নাই ন-দিদির। তিনি কেবল এখানে নাই। আর সকলেই এখানে।

চোরের কাছে কেউ যেতে সাহস কোচ্চে না। চোর একখানা ছোরা ঘুরিয়ে কেবল ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে। এত দরোয়ান চাকর,—এত পালোয়ান, ছোরার ভয়ে কেউ কাছে এগুতে সাহস কোচ্চে না।

আমি ত দেখবামাত্রই চোরকে চিনে ফেল্লেম। সে চোর অন্য চোর নয়, যে চোর ন-দিদির মন চুরি কোরেছিল, যে চোর আজ রাত্রে ন-দিদির ঘরে ছিল, এ চোর সেই চোর!

মৎলবটা বুঝ্‌তে আর বাকী রইল না। ন-দিদি যে এই কাণ্ডটায় কি কৌশল খেলেছেন, সে মৎলবটার বহর আমি এক মুহূর্ত্তেই মেপে ফেল্লেম। সে কথা প্রকাশ না কোরে কাণ্ডটা কতদূর গড়ায়, তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লেম।

বেলা হলো। রোদ উঠ্‌লো! চোর তখনো উঠানে দাঁড়িয়ে অনবরত ছোরা ঘুরুচ্চে।—ভোঁ। ভোঁ। শব্দে ছোরা ঘুরুচ্চে। নিকটে যায় কার সাধ্য!

পুলিসে খবর গেছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে লালপাগড়ী মাথায় চারি পাঁচ-জন লোক এসে উপস্থিত। সহসা তারাও চোরের কাছে যেতে সাহস কল্লে না। এমন খুনে চোর তারা আর কথনো দেখে নাই! অনেকক্ষণ গেল। একজন পেছন দিক দিয়ে কৌশলে চোরকে ধোরে ফেল্লে। একজন ধোত্তেই চারি পাঁচজন গিয়ে তার উপরে পোড়্‌লো। চোরের যত বল, তখন সব ফুরালো।

চোরকে ধোরে পুলিসের লোকেরা ফাঁড়ীতে নিয়ে গেল। বাড়ীর চাকরেরা, শ্যামা, এরা সকলেই এজেহার দিতে গেল। বাড়ীময় সোর উঠলো, "চোর!—চোর—চোর!"

আমি জানলেম, এ চোর নয়, ন-দিদির খেলা। এ চলাচলির মূল ন-দিদি! ন-দিদি বিধবা,—সতী, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এরই নাম কি সতীত্ব?

ষোড়শ চক্র।

হিতে বিপরীত।

ন-দিদি যে কৌশল স্থির কোরেছেন,—বিষণরামকে জব্দ করবার জন্য যে উপায় অবলম্বন কোরেছেন, তাতে কোন ফল হলো না। ন-দিদি নিজের হিত কোত্তে বিপরীত কোরে তুলেছেন। এখন ভাবছেন, কাজটা বড় ভাল হয় নাই। তখন মনের আবেগে একটা কাজ কোরে ফেলেছেন, এখন তার প্রতিফল ত ভোগ কোত্তেই হবে। এখন আর উপায় কি? ন-দিদি অকুল ভাবনায় আকুল!

ন-দিদির চরিত্র যারা এতদিন ভালরকম জানতো না,—যারা ন-দিদিকে ভাল বোলেই জেনে রেখেছে, চোরের ব্যাপারে ন-দিদির উপর তাদেরও সন্দেহ হয়েছে। সকলের মুখে একদিনের তরেও চোরের নামটীও কেউ

শুনতে পায় নাই। ন-দিদি সর্ব্বদাই যেন কি ভাবেন। কারও সঙ্গে ভাল কোরে কথা কন না, কারও কোন কথায় উত্তর করেন না, কেবল আপন মনেই ভাবেন। ন-দিদির স্বভাবের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে তাঁর উপর আরও সন্দেহ হয়েছে। কেবল সাহাস কোরে কেউ প্রকাশ করে না। মনের সন্দেহ মনেই চেপে চেপে রাখে।

ন-দিদির কাণ্ড, চোরের কাণ্ড, আগাগোড়া স্বচক্ষে দেখেছি। চোর সেদিন রাত্রে ন-দিদিকে যে সব কথায় ভয় দেখিয়েছিল, তাও শুনেছি; শুনেই স্থির কোরেছি, ন-দিদির এই চলাচলিটা কিছু গুরুতর রকম হবে। এ সব কথা মনে মনেই ঠিক কোরে রেখেছি, কারও কাছে এর ঘুণাক্ষরও প্রকাশ করি নাই। জানি কি, শেষে আমাকে নিয়ে একটা কাণ্ড বেধে উঠবে। অদৃষ্ট আমার যেমন, তাতে বিপদ্ত পদে পদে। এ সময় খুব সাবধানে চলাই ভাল।

চোরের বিচার আরম্ভ হলো। আবার শ্যামা,—দরোয়ান—রাম সরকার, সকলেই কোমর বেঁধে চোরকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাতে চল্লো। আমি কখন কোন্ কথা শুনতে পাব, তাই ভাবতে লাগলেম।

আহারাদি হয়ে গেল। সকলে আজ এক জায়গায় চোরের কথাই কেবল কেবল আন্দোলন কোচ্চি। বেলা প্রায় তিনটে।

আমরা আন্দোলন কোচ্চি, এমন সময় রাম সরকার আর কর্ত্তা হাঁপাতে হাঁপাতে অন্দরে এলেন। কর্ত্তা চীৎকার কোরে বোল্‌তে বোল্‌তে আসছেন, "কি সর্ব্বনাশ! জাত গেল!—মান গেল!—সম্ভ্রম গেল!—শৈল আমার সর্ব্বনাশ কোল্লে!—সব খোয়ালে! সর্ব্বনাশ কোল্লে!"

গিন্নী বোসেছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি? হয়েছে কি? কাণ্ডটা কি?"

কর্ত্তা থপ্ কোরে মাথায় হাত দিয়ে বোসে পোড়লেন। কাতরস্বরে বোল্লেন, "হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! চোরের জবানবন্দীতে সর্ব্বনাশ হয়েছে। সে কি চোর? সে আমার যম! হায়! হায়! এত কাণ্ড আমার বাড়ীতে। কেউ দেখবার নাই, কেউ শোনবার নাই, কেউ শাসন করবার নাই। যার যা ইচ্ছা, সে তাই কোচ্চে!—হায়!—হায়!—সর্ব্বনাশ হলো!" কর্ত্তার চোঁকে জল দেখা গেল।

ভাবে আমি সব কথাই বুঝে নিলেম। চোর যে কি রকম জবানবন্দী

দিবে, তা আমি আগেই ঠিক কোরে রেখেছি। এখন কাজেও তাই দেখলেম। কর্ত্তার ভাবভঙ্গী দেখেও বেশ বুঝে নিলেম। এখন উপায় কি?”

কর্ত্তা কথা কইতে পাল্লেন না। রাম সরকার সমস্ত কথাই বোল্লে। চোর স্পষ্টাক্ষরে বোলেছে, সে চোর নয়। অনেকদিন ধোরে শৈলবালার ঘরে যাতায়াত করে। শ্যামা তাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যায়, আবার ভোর বেলা বাহির করে দেয়। কালও শ্যামা তাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে গিয়েছিল। ক-দিন আসে নাই বোলে শৈলবালা তাকে আসবার জন্য যে চিঠি লিখেছিল, সেখানিও চোরের জামার জেবে ছিল। আদালতে সে সেখানিও দেখিয়েছে। শৈলবালার গর্ভ হয়েছে। সে বিধবা, কৌশলে দুষ্কার্য্য শেষ করবার জন্য শৈলবালা চোরের উপর জুলুম করে। চোর কোনমতে স্বীকার না করায়, ঘরের বাহিরে এনে, চোর বোলে—সোরগোল কোরে ধোরিয়ে দিয়েছে।—চোরের এই জবানবন্দীতে হাকিমের বিশ্বাস হয়েছে। চোরের বিচার ছেড়ে এখন শৈলবালার বিচার হবে। যে চিঠি চোর দেখিয়েছে, সে চিঠি শৈলবালার হাতের কি না, তাও আদালতে পরীক্ষা হবে। আর শৈলবালার প্রকৃতই গর্ভ হয়েছে কি না, তাও ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। সর্ব্বনাশ! জাত গেল,—মান গেল, একেবারে সব গেল!

রাম সরকারের কথা শুনে গিন্নীর যেন বাক্‌রোধ হলো। তিনি ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপতে লাগলেন, ফ্যাল ফ্যাল কোরে চাইতে লাগ্‌লেন। যেন অবাক,—আরষ্ট! আমাদেরও মুখ শুকিয়ে গেল। আজ যে একটা মহা বিভ্রাট উপস্থিত হবে, তাই ভেবে আমরা আরও ভয় পেলেম। এখন উপায় কি? করি কি?

কর্ত্তা ধমক দিয়ে গিন্নীকে বোল্লেন, “আর এখন ভেবে কি হবে? পরোয়ানা বেরিয়েছে। এখন সহজে না যায়,—জোর কোরে আদালতে নিয়ে যাবে। তোমার গুণের মেয়ে খুব কীর্ত্তিটাই রাখ্‌লে। এখন যাতে মান থাকে, তাই কর। এখনি টাকাকড়ি দিয়ে রামের সঙ্গে খিড়কীর দরজা দিয়ে বাহির কোরে দেও। পাল্কী আন্‌তে পাঠিয়েছি। এখনি বৃন্দাবনে চোলে যাক্। এখানে প্রকাশ কর,—সে আজ ছয়মাস কাশীবাসী হয়েছে। সকলকে বেশ কোরে বোলে দাও, সকলেই যেন বলে, শৈল আজ ছ-মাস কাশীতে আছে! এ না হোলে আর উপায় নাই। আর দেরী কারো

না!—যাও!—যাও! যোগাড় কর! হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হলো!” কর্ত্তা ভেউ ভেউ কোরে কাদ্‌তে লাগলেন।

আমরা সকলেই সেখানে বোসে আছি, নাই কেবল শৈলবালা—ন-দিদি। গিন্নী হায় হায় কোত্তে কোত্তে শৈলবালার ঘরের দিকে গেলেন। এদিকে আবার আর এক কাণ্ড!

সেজদিদি সেখানে ছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর সাধের ধন—প্রাণের রাম সরকার ন-দিদির সঙ্গে যায়। তবে ত সর্ব্বনাশ। তাঁর গতি কি হবে? ন-দিদির চরিত্র মন্দ,—দুজনে এক জায়গায় থেকে যদি তাঁর বুকে ছুরি দেয়!—যদি তাঁর সর্ব্বনাশ করে! সেজদিদির তাই ভেবে বড় আকুল হোলেন। রাম সরকারকে ইসারা কোল্লেন। ইসারা আমিও বেশ বুঝ্‌লেম।

রাম সরকার সেজ-দিদির গোলাম। সে কি আর না বোলতে পারে? অমনি বোল্লে, “কর্ত্তা! ন-দিদিবাবুর সঙ্গে আর কি কেউ গেলে হয় না? আমার বড় অসুখ—শরীর খারাপ আছে।”

কর্ত্তার মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। একে ত এই বিপদ, তার উপর আবার রাম সরকারের এই কথা। কর্ত্তা যেন কেমনতর হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি রাম সরকারের হাত দুখানি ধোরে বোল্লেন, “রাম! তোমার মত বিশ্বাসী আর কে আছে,—বুদ্ধিমানই বা কে আছে যে, অনায়াসে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে? সেখানে যাও, ডাক্তার দেখাও। যত টাকা লাগে, সব আমি দিব। টাকার জন্য ভয় নাই। মান থাক্‌লে, জাত বাঁচলে ভিক্ষা কোরে খেলেও চোলবে। যাও, যত টাকা লাগে দিব। টাকার দিকে নজর করবার আবশ্যক নাই। যাও বাবা! তুমিই এ বিপদে আমায় রক্ষা কর!”

রাম সরকার সেজদিদির হুকুম রক্ষা কোত্তে পাল্লে না। কর্ত্তার কাতরতায় তার মুখ দিয়ে আর “না” কথাটী বেরুলো না। হাজার হোক্ চাকর, হাজার হোক্ কর্ত্তার টাকাতেই—কর্ত্তার যত্নেই এত বড় হয়েছে। সে কি আর এ অনুরোধ কাটাতে পারে? রাম সরকার অগত্যা সম্মত হলো। কিন্তু কর্ত্তার বিশ্বাসকে ধন্য! রাম সরকারের মত বিশ্বাসী তাঁর আর কেউ নাই! এইটীই আরও আশ্চর্য্য!!!

সেজদিদির এ কৌশল ভেসে গেল দেখে, তিনি আর এক উপায় অবলম্বন

কোল্লেন। কুলটার মনে এত ফিকির-ফন্দিও যোগায়! এত খেলাও এরা খেলে!

মেয়েদের মধ্যে ন-দিদির উপর গিন্নীর বেশী টান। ন-দিদিকেই তিনি বেশী ভালবাসেন, এটী সেজদিদির জানা ছিল। তাই তিনি গিন্নীর কাছে গিয়ে বোল্লেন, "মা! শৈল না বুঝে একটা কাজ কোরেছে, তার ত আর চারা নাই; কিন্তু তাই বোলে ওকে একবারে ভাসিয়ে দেওয়া কি উচিত হোচ্চে?—একা রাম সরকারের সঙ্গে কোথা যাবে? কি হবে? একদিনও দুঃখ-কষ্টের মুখ দেখে নাই, কখনও কষ্টভোগ করে নাই, দুটো পেটের ভাতের জন্য কত কষ্টই পাবে। রাঁধতে জানে না। না খেতে পেয়েই হয় ত মারা যাবে! একে এই বিপদ,—তার উপর আবার এই ভেবেই সারা হয়ে যাচ্চে। এ রকম ত আর চিরদিন থাক্‌বে না। বোলছি কি, ওর সঙ্গে আমি যাই, তবু অনেকটা সান্ত্বনা পাবে।—মারা যাবে না! এর পর মিটে গেল আবার আস্‌বে।"

এ কথায় গিন্নীর অমত হবার কথা নয়। যদিও ন-দিদি গুরুতর দোষে দোষী, তবুও মায়ের প্রাণ ত বটে। তিনি তখনি সেজদিদির কথায় সম্মত হোলেন। তবে এই এক আপত্তি, জামাই বাড়ীতে আছেন।—তাঁর অমতে কোন স্থানে মেয়ে পাঠান ত উচিত নয়। তাতেই গিন্নী যেন একটু ম্লান হোলেন। সেজদিদিকে প্রকাশ্যে সে কথাও বোল্লেন। সেজদিদি সে কথা আমলেই আন্‌লেন না। সেজদিদি বোল্লেন, "তা হোক! এ ত সাধ কোরে আর কোথাও যাচ্চি না। বিপদ আপদ সকলেরই ত আছে। এতে আর কেন অমত হবে?" গিন্নী সম্মত হোলেন।

সেজদিদির বাসনা পূর্ণ হলো। আর বিলম্ব করা নয়। খিড়্‌কী দরজা দিয়ে সেজদিদি ন-দিদি দুজনে দুখানি পাল্কীতে উঠ্‌লেন। বেশী দূর ত নয়, তখনি পৌঁছিতে পারবেন। রাম সরকার টাকা কড়ি নিয়ে অন্য পথে চোলে গেল। বাবুর সেখানে নিজের বাড়ী আছে, তা ছাড়া আপনার জনের বাসা আছে।—বাসা ত আর খুঁজতে হবে না।

পাঁচটার মধ্যেই সকলে বেরিয়ে গেলেন। কর্ত্তা গিন্নী আমাদের সকলকে একত্রে ডেকে বারম্বার সাবধান কোরে দিলেন। সকলেই বোল্‌বে, "ন-দিদি আজ ছ-মাস কাশীতে আছেন। কোথায় আছেন, কি বৃত্তান্ত, তা মেয়ে-মানুষেরা অত খবর রাখে না।"

সেদিন কেটে গেল। তার পরদিন সকালে সদরে মস্ত গোল! পুলিসের লোকে সদর পুরে ফেলেছে! কর্ত্তা মস্ত মানীলোক, হঠাৎ তাঁর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করা বড় সহজ কথা না। বিশেষ পুসিলের প্রধান কর্ত্তা-বাবুটি বড় ভদ্রলোক। তিনি সহসা এত বড় লোকের মানহানি কোত্তে সাহস কল্লেন না। সদরেই একটি ঘরে আমাদের সকলকে ডেকে জবানবন্দী নিলেন। আমরাও একবাক্যে বোল্লেম, "ন-দিদি বাড়ীতে নাই। ছ-মাস হলো, কাশীতে আছেন। কোথায় আছেন, তা আমরা জানি না। এর মধ্যে আমরা কেহই সেখানে যাই নাই।"

পুলিসের বাবু আমাদের এই কথাই যথেষ্ট বোলে জ্ঞান কোল্লেন। আমরা মানে মানে অব্যাহতি পেলেম। গিন্নীকে বেশীর মধ্যে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার কন্যার চরিত্র কেমন? তার গর্ভ হয়েছে কি না?" গিন্নী এ কথার উত্তরে বোল্লেন, "আমার মেয়ের স্বভাব খুব ভাল। সে বিধবা, আলো আতপ খায়,—হবিষ্যি করে,—সাদা কাপড় পরে,—ব্রত নিয়ম করে, তার গর্ভ হবে কেন? এও কি একটা কথা?" গিন্নীকেও আর বেশী কথা কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। আমরা আবার অন্দরে এলেম।

তার পর কি হলো?—আমরা অন্দরে এলেম, বোল্‌তে পারি না। সন্ধ্যার সময় কর্ত্তা অন্দরে এলেন। গিন্নী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হলো?" কর্ত্তা বোল্লেন, "আপততঃ ত মিটালেম, এর পর কি হয় বলা যায় না। দারোগা বাবুটি বড় ভদ্রলোক। তিনটি হাজার দিয়ে কোন গতিকে মকর্দ্দমাটা ফাঁসিয়ে দিলেম; কিন্তু আর কিছুদিন না গেলে কি হয় বলা যায় না। এদিকের আবার উপায় কি?"—কর্ত্তা অনেকক্ষণ নীরবে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে একটা হুঙ্কার ছেড়ে বোল্লেন, "মা ব্রহ্মময়ি! আর কত কষ্ট দিবি মা! বুড়ো বয়সে—শেষে কপালে কি এই ঘটালি?"

আহা! কর্ত্তার এই কথায় আমার প্রাণের ভিতর যেন কেমন একটা ভাবের উদয় হলো। গা শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগলো! হায় হায়! ন-দিদির মনে এতও ছিল?

সেদিনও কেটে গেল। কর্ত্তা-গিন্নীতে রাত্রে অনেক কথা হলো। সে সব কথা গোপনীয়; গোপনেই কথোপকথন হলো। আমরা সে সব কথা শুন্‌তে পেলেম না। পরদিন আবার চোরের বিচার। আমাদের লোক গিয়েছিল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে সে বোল্লে, "চোরের এক বৎসর

মেয়াদ হয়েছে। চোর ছোরা নিয়ে চুরি কত্তে এসেছিল বোলে তার এই দণ্ড। আপাততঃ এই শাস্তি হলো। শেষে শৈলবালার চিঠি তজ্‌দীগ হোলে সে বিচার তখন পরে হবে।”

মনে কল্লেম, এখনো তবে গোল মিটলো না। কেবল চাপা রইল মাত্র। তা হোক, কিছুদিন নিষ্কৃতি হলো। তার পর আবার যা অদৃষ্টে থাকে হবে।

ন-দিদি যা ভেবেছিলেন,—যে কৌশল কোরেছিলেন, এখনো তাতে একটীও সুফল দেখা যায় নাই! তিনি যতই চেষ্টা কোরেছেন, এ পর্য্যন্ত যতই কৌশল কোরেছেন, সবই হয়েছে,—হিতে বিপরীত্!

সপ্তদশ চক্র।

বিশহাজার টাকা!

দিনকতক বেশ কেটে গেল। কোন গোলযোগ নাই,—হাঙ্গামা নাই, আবার সেই পূর্ব্বেকার মত দিন বেশ কেটে যাচ্চে। ন-দিদি, সেজদিদি,—রাম সরকার তিনজনেই আজও বৃন্দাবনে।—জনরব কাশীতে। আমরাও বলি—কাশীতে, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কিন্তু বৃন্দাবনে।

প্রবাদ আছে,—লোকে সচরাচর বোলে থাকে, মথুরাবৃন্দাবন। শুনে রেখেছি,—মথুরা বৃন্দাবন। আমি ত এখন মথুরায়, তবে বৃন্দাবন এখান থেকে কত দূর? সে দিন শ্যামাকে সঙ্গে, কোরে গিন্নী মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন, সকালে গেলেন, এক রাত থেকে, আবার তার পর দিন দশটা এগারোটার মধ্যেই ফিরে এলেন। এতেই অনুমানে কেবল বুঝে নিলেম, বৃন্দাবন এখান থেকে বড় বেশী দূরে নয়।

মনে মনে যুক্তি স্থির কল্লেম, বড়বৌ অবশ্যই সব কথা জানেন। তিনি আমার কাছে প্রায় কোন কথাই গোপন রাখেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা কোল্লেই সকল গোল চুকে যাবে,—সব কথাই প্রকাশ হয়ে পোড়বে। এইরূপ যুক্তি স্থির কোরে একদিন সন্ধ্যার পর বড়বৌয়ের ঘরে গেলেম।

গিয়েই দেখি, বড়বৌ একখান কি কাগজ দেখছেন। আমি যেতেই তাড়া-তাড়ি কাগজখানি মুড়ে রেখে—একটু লজ্জিত হয়ে বল্লেন, "কি, হরিদাসী যে!" আমিও সে কথা কাণে না তুলে বোল্লেম, "বৌদিদি, অত ঢাকাঢাকি কেন? দাদাবাবু কি লিখেছেন? এই না তিনি তোমায় ভালবাসেন না? এমন চিঠি!" বড়বৌ আরও লজ্জিত হয়ে বোল্লেন, "সে কপাল কোরে এলে অবশ্যই সে চিঠি পেতেম। এ চিঠি নয়, একটা ফাঁস কাগজ!" এই বোলে হাতের কাগজখানা কুচিকুচি কোরে একটা নরদমার দিকে ছুড়ে ফেলে দিলেন। আমি যেন সেদিকে লক্ষ্যই করি নাই, এই ভাবে বোল্লেম, "তবে বৌদিদি! আর যে বড় দেখতে পাওয়া যায় না। কি অপরাধ কোরেছি?"—বৌদিদি বোল্লেন, "অপরাধ নয় ভাই, হয়েছে কি জানিস্, বাবু আজ ক-দিনের পর ইদানী এক-একবার ঘরে পদার্পণ কোত্তে শিখেছেন। হারানো মাণিক পেলে লোকের কত যত্ন হয়, জানিস্ ত? আমার হয়েছে তাই। তাতেই নরলোকদের কাছে বড় একটা দেখা দিতে পারি না।" বড়বৌ কথার উত্তর দিচ্চেন,—রহস্য কোচ্চেন, সবই হোচ্চে; কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সেই ছেঁড়া কাগজের পুঁটুলীর প্রতি।

আমি বড়বৌকে বাধা দিয়ে বোল্লেম, "বৌদিদি! তামাসা রাখ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য উত্তর দাও। ন-দিদির সংবাদ কি কিছু জান?"

বড়বৌ যেন অবাক্! মোটা মোটা চাউনিতে চেয়ে—ডান গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ের স্বরে বোল্লেন, "ওমা! সে কি হরিদাসি? এ খবর তুমি জান না? এ সংবাদ তুমি রাখ না? এ কি কথা! ওমা! সে কাজ যে ফর্সা হয়ে গেছে! বাবু স্বয়ং গিয়াছিলেন, এখান থেকে ডাক্তার গিয়েছিল। চারি পাঁচশ টাকা উড়ে গেছে। তুমি এর কিছুই খবর রাখ না? কাজ যে অনেক দিন ফর্সা।"

আমি ত আর নাই! কাজ ফর্সা হয়ে গেছে? সে কি কাজ? মনে মনে ভাবলেম, ন-দিদি বুঝি নাই। এই ভেবে আমি তাড়াতাড়ি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বল কি বৌদিদি! কাজ একেবারে ফর্সা? কার কাজ ফর্সা! কি সর্ব্বনাশ! একেবারেই ফর্সা?" বৌদিদি পূর্ব্ববৎ ত্রস্তস্বরে বোল্লেন, "একদিন দুদিন নয়, সাত সাত মাস! চেহারা হয়েছিল,—নখ চুল হয়েছিল, চোক মুখ কান সব হয়েছিল। আহা! ছেলে ত নয়, যেন ইন্দির,—পেট থেকে পোড়ে প্রায় আধঘণ্টা বেঁচে ছিল। উঃ!—কি কাণ্ড!—একবার

ভেবে দেখ দেখ হরিদাসি! এও কি মানুষে পারে? যাদের রক্তমাংসের শরীর, তারাও কি এ কোত্তে পারে?" এ সব কাণ্ড দেখে আমি ত একেবারে অবাক হয়ে গেছি!

আমিও অবাক! বৌদিদি বোল্লেন, "আমি অবাক!" আমিও বোলছি, "আমিও অবাক!" দুজনেই অবাক, দুজনেই আড়ষ্ট! কাণ্ডখানা কি?

মনে মনে বড় ঘৃণা হলো। এদের সকলের উপর প্রথম প্রথম বড় ভক্তি হয়েছিল, কিন্তু যত দিন যাচ্চে, যত নূতন নূতন অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশ পাচ্চে, এদের উপর আমার ততই অভক্তি হোচ্চে, মনে হোচ্চে আর পাপপুরীতে থাকা নয়। এ পাপপুরীতে থাকলেও পাপ। কিন্তু করি কি? আমার যে আর দ্বিতীয় স্থান নাই। পাটনায় এখন ইচ্ছা কোল্লেও যেতে পারি, কিন্তু প্রাণ গেলেও সেখানে আর যাব না। তবে আর স্থান কোথায়?—যাবই বা আর কোথায়? অগত্যা এদের এখানে রয়েছি। নিতান্ত বাধ্য হয়েই আছি। যদি একদিনের জন্যও কোনখানে দাঁড়াবার স্থান থাকতো, তা হোলে এ বাড়ীর মুখে খ্যাঙ্‌রা মেরে কোন্ দিন চোলে যেতেম। কিন্তু তা হয় কৈ? বিধাতা যে আমাকে অকুল সমুদ্রে ভাসিয়ে রেখেছেন।

সেজদিদি কি ন-দিদি, এরা আজও বাড়ী আসেন নাই। শরীর ভাল কোরে না সেরে আস্‌বেন না। একথাও বৌদিদির মুখে শুনলেম। তাঁরা বৃন্দাবনে আছেন, আছেন ত আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর তেমন কোন উচ্চবাচ্য নাই। দিনের মধ্যে একবার নামও হয় কি না সন্দেহ।

প্রায় আরও দুমাস কেটে গেল। আবার একটী বিপদ। কর্ত্তার বড় পীড়া। আর তিনি বাঁচেন কি না সন্দেহস্থল। উত্থানশক্তি রহিত হয়ে পোড়েছে, চারি পাঁচ জন ডাক্তার কবিরাজ দেখছে কিন্তু কিছুতেই ফল হোচ্চে না। ডাক্তার বলেন, "এমন বৃদ্ধাবস্থায় এরূপ সাংঘাতিক পীড়ায় কেহ কখন রক্ষা পায় না। তবে চেষ্টার ত্রুটি হবে না, এতে যতদূর হয়। অদৃষ্টে ভোগ থাকলে অবশ্য বেঁচে উঠ্‌বেন।"

ডাক্তারের কথার ভাবে আমরা বেশ বুঝ্‌লেম, কর্ত্তা এ যাত্রা কখনই রক্ষা পাবেন না। তিনি নিজেও তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছেন। সমস্ত বিষয়কার্য্য বড়বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনিই এখন সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখ্‌চেন। কর্ত্তার আর উত্থানশক্তি নাই।

প্রায় একপক্ষকাল কর্ত্তা শয্যাগত। সমানে ডাক্তার-কবিরাজ আনাগোনা কোচ্চে,—সমানে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা হোচ্চে, কোন ফল হ'চ্চে না। কর্ত্তার পীড়ার খবর পেয়ে ন-দিদি, সেজদিদি, রাম সরকার সকলেই দেখতে এসেছেন।

আমরা সকলেই কর্ত্তাকে ঘিরে বোসে আছি। এমন সময় ন-দিদি এলেন, কর্ত্তার গায়ে হাত দিলেন, পায়ে হাত দিলেন, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা কোল্লেন। কর্ত্তা মুখ ভারী কোল্লেন। ন-দিদিকে কোন উত্তর দিলেন না। মুখখানি আঁধার কোরে গিন্নীকে বোল্লেন, "ওকে যেতে বল। আমার মৃত্যুকালে কেন আর ও আমাকে যাতনা দিতে এসেছে? আমার সাম্‌নে এসে আর কাজ নাই।"

ভাবনায় ভাবনায় কর্ত্তার শরীর জীর্ণ হয়ে এসেছে। মনঃকষ্টে মানুষ ক'দিন বাঁচে? হয় ত কর্ত্তা আরো দুদিন বাঁচ্‌তেন, হয় ত কর্ত্তা এ যাত্রা রক্ষা পেলেও পেতে পাত্তেন, কিন্তু চিন্তাতেই কর্ত্তাকে একেবারে জেস্রে ফেলেছে! চিন্তাতেই বুঝি জীবন যায়।

ন-দিদি এসেছেন। এমন যে একটা কাণ্ড হয়ে গেল,—এমন যে একটা লোক হাসাহাসি ব্যাপার ঘেটে গেল, ন-দিদি যে তার ভিতর ছিলেন, ন-দিদিকে দেখ্‌লে সে কথা কেউ বিশ্বাসই কোরবে না। সদাই যেন স্ফূর্ত্তিতেই আছেন। কোন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কর্ত্তা যে এমন একটা ভয়ানক কথা বল্লেন, সে কথাও যেন গ্রাহ্য নাই। সদাই যেন হাসির তরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্চেন।

যতক্ষণ কোন একটা পাপকার্য্য সম্মুখে থাকে, তখন তা দেখ্‌লে হৃদয় কাঁপে, প্রাণে আতঙ্ক হয়, সে দুষ্কার্য্য সাধনে মনে ভয় হয়। কিন্তু সেই পাপকার্য্য সমাধা হয়ে গেলে তখন, আর মনে ততটা ভয় থাকে না। যতদিন ন-দিদির এ গুপ্তপ্রেম গোপনে ছিল, ততদিন ন-দিদি একটা মস্ত দুর্ভাবনা ছিল, পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে—পাছে একটা ঢলাঢলি জানাজানি হয়। আর এখন যখন জানাজানি হয়ে গেছে, লোকে সব কাণ্ডই জেনে ফেলেছে, তখন আর ভয় কাকে? ন-দিদির অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছে। তাঁর প্রাণে আর ভয় নাই। এখন বরং তিনিই, আবার ভয় দেখান। গিন্নীর এখন ভয়, এই কুলের ধ্বজা পাছে আবার কোন দেশে গিয়ে ধ্বজা উড়িয়ে নাম জাহির

করেন। কারো কথা গ্রাহ্য নাই, কাকেও ভয় নাই, ন-দিদি এখন যেন সে ন-দিদিই নয়। যেমন দেমাক, তেম্‌নি ঠাঠ!

কর্ত্তার রোগ ক্রমেই কঠিন হয়ে আস্‌ছে।—এখন যান, তখন যান হয়েছেন। আমাদের উনোনে আর হাঁড়ি চড়ে না।—আহার নাই, নিদ্রা নাই, সকলেই কর্ত্তাকে ঘিরে দিন রাত বোসে আছে।

সময় হয়ে এলো। সময় কিছু কারো হাত ধরা নয়। বিধাতা যে সময়টি লিখে রেখেছেন, কালের গতিতে ঠিক সেই সময় এসে উপস্থিত! তবে কর্ত্তাকে আর কে রাখে? কর্ত্তা আপনা হোতেই বোল্লেন, "আর আমার জীবনের আশা নাই। আমাকে নামাও, সর্ব্বাঙ্গে রামনাম লিখে দাও!" তৎক্ষণাৎ তাই করা গেল। চারিদিকে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রামনাম উচ্চারণ কোর্ত্তে লাগলো। কর্ত্তা দেখতে দেখতে চক্ষুদুটি মুদ্রিত কোল্লেন!—দেখতে দেখতে প্রাণ-পক্ষী উড়ে গেল! দেখতে দেখতে কর্ত্তার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ হলো!

বাড়ীময় একটা হাহাকার পোড়ে গেল! মা, দিদিরা, বড় বাবু, ছোট বাবু, বড় বউ, পিসীর দল, দাস-দাসী যে যেখানে ছিল, সকলেই আপ্‌সা আপ্‌সি কোরে কাঁদতে লাগ্‌লেন। আমাকে কর্ত্তা বড় ভাল বাসতেন, মা মা বোলে ডাকতেন, কত আদর কোত্তেন, কর্ত্তার মৃত্যুতে আমার হৃদয়েও বড় আঘাত লাগ্‌লো। মনে ভাবলেম, আমাকে ভাল-বেসেই হয় ত কর্ত্তা অকালে প্রাণ হারালেন। এমনি অভাগিনী আমি, এমনি অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছি যে, যে আমাকে একটু ভালবাসে,—যে আমাকে আশ্রয় দিতে চায়, তারই বিপদ পদে পদে! এই ভেবে আরও আকুল হোলেম। আমিও কাঁদতে লাগ্‌লেম্‌। বাড়ীর সকলেই কর্ত্তার গুণে মুগ্ধ ছিল। এখন সেই কর্ত্তার বিরহে সকলেই কেঁদে আকুল হলো। যে শোনে, সেই চোকের জল না ফেলে থাক্‌তে পারে না। কাঁদলেন না,—হা হুতাশ কোল্লেন না, কেবল পাপিষ্ঠা ন-দিদি। সকলের চোকের জল, জল নাই কেবল ন-দিদির চোকে। ধন্য! শত ধন্য ন-দিদির পাষাণ প্রাণে!

রাত্রি যখন এগারোটা, কর্ত্তার তখন মৃত্যু হয়। সমস্ত রাত কেঁদেই কাটালেম। আর কেঁদে কি ফল? বরং যাতে কর্ত্তার, সৎকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তারই আয়োজন করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মচারীরা সব এসে উপস্থিত

হলো; তখনি তখনি আয়োজন হলো, কর্ত্তার শবদেহ তখনি শ্মশান-ভূমে নিয়ে যাওয়া হলো। ইচ্ছা ছিল, কর্ত্তার সঙ্গে যাই, কিন্তু শ্মশান একটু দূরে, তাই কেবল বড়বাবু আর ছোটবাবু সঙ্গে গেলেন। আমরা সকলে স্নান কোরে আবার কাঁদতে বোস্‌লেম।

বেলা বারোটার সময় সকলে ফিরে এলেন। শোকের গতি একটু নরম হয়ে এসেছিল, ছেলেদের কাচা-পরা দেখে গিন্নী আবার ফুকুরে কেঁদে উঠ্‌লেন। আবার কান্নার হাট লেগে গেল!

রোদনের বেগ কতকটা কোমে এলে, বেলা পাঁচটার সময় সকলে হবিষ্যি কোল্লেন। চারিদিকে শ্রাদ্ধের আয়োজন হতে লাগলো। চারিদিক হোতে আত্মীয়স্বজন এলেন, কুটুম্ব সাক্ষাৎ এলেন, শ্রাদ্ধের ধুম পোড়ে গেল। কর্ত্তা বড় সামান্য লোক ছিলেন না, প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে কর্ত্তা স্বর্গগামী হয়েছেন। তাঁর শ্রাদ্ধ ত সামান্য রকমে নির্ব্বাহ করা ভাল দেখায় না। তাতেই আত্মীয়স্বজনেরা স্থির কোল্লেন, কর্ত্তার শ্রাদ্ধে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হবে। বড় বাবুর ইচ্ছা ছিল, হাজার পাঁচের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহ কোরবেন, কিন্তু আত্মীয়দের পরামর্শে সে কথা মুখেও আন্‌তে পাল্লেন না। তাঁদের মতেই অগত্যা মত দিতে হলো। সমস্ত আয়োজন আরম্ভ, শ্রাদ্ধের ধুম পোড়ে গেল।

এগারো দিনে শ্রাদ্ধ। ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। দেখতে দেখতে কর্ত্তার শ্রাদ্ধের দিন এলো, আবার দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। শ্রাদ্ধে কেমন ধূম হলো, কত অনাথ অনাথা পেট পুরে লুচি-মণ্ডা খেতে পেলে, কাপড় পয়সা পেলে, কত উদর-পরায়ণ সাধুব্রাহ্মণ ভোজন কোল্লেন, তা গোণে ঠিক করা যায় না। ফলে খুব সমারোহে—খুব ধূমধামে সম্পন্ন হলো।

এখন বিষয়ের একমাত্র অধিকারী বড়বাবু। এই অতুল সম্পত্তির সমস্তই তাঁর হাতে, ছোটবাবু আজও নাবালক। বড়বাবুরই এখন সব।

বড়বাবুর এবার পোয়া বার! আগে যাই হোক মাথার উপর একজন ছিলেন, নিজের খরচের জন্যে হাততোলা টাকা পেতেন, খরচ কোরে তেমন আয়েস হতো না, এখন সব নিজের। কেউ "না" বলবার নাই, বাধা দিবার নাই, তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা।

বাবুর অনেকগুলি বন্ধু জুটলো। কর্ত্তা থাক্‌তে একদিনও বন্ধুর নাম

শুন্‌তে পেতেম না। এখন প্রায়ই শুনি, আজ অমুক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ, বাড়ীতে আহার কোর্‌বেন না। কাল অমুক বন্ধুর বাড়ী মেয়ের বে, সেখানেই থাক্‌বেন—বাড়ী আস্‌বেন না। এ সব কি? গিন্নী সব বুঝ্‌তে পারেন, কিন্তু কি কোর্‌বেন, এখন ত আর তাঁর সে কাল নাই। বড়-বাবুর লাল চোকের ভঙ্গী দেখে—তেরিয়া মেজাজ দেখে গিন্নী এখন সশঙ্কিত। পূর্ব্বের নামটী মাত্র গিন্নী আছে, কিন্তু সংসারে তাঁর কর্ত্তৃত্বের নাম মাত্রও নাই। গিন্নী এখন নামে গিন্নী কাজে দাসীরও অধম। বড়বাবু মাতৃভক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন। উপযুক্ত পুত্রই গিন্নী গর্ভে ধারণ কোরেছিলেন, তা না হোলে আর এত হয়?

আজ দু-দিন বড়বাবু বাড়ীতে নাই। শুন্‌লেম, কোন বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী হয়ে গেছেন। আমরা তাই ভেবেই নিশ্চিন্ত আছি, হঠাৎ সদরে একটা গোল উঠ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড়বাবু অন্দরে।

বড়বাবুকে দেখে আমার হরিভক্তি উড়ে গেল। চোক দুটী জবাফুলের মত টক্ টক্ কোচ্চে,—চাদরখানা কোথায় ফেলে এসেছেন, দুপাটী জুতা দুরকম, জামার জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, চুলগুলো উস্‌কো খুস্‌কো হয়েছে; দুদিন তিনদিন যেন স্নান হয় নাই। মুখে ভয়ানক দুর্গন্ধ! এ চেহারা দেখে মনে বড় ভয় হলো। সোরে দাঁড়ালেম।

বড়বাবু ঘরে গিয়েই শুয়ে পোড়েছেন। অনবরত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌ছেন, "কো জান ছিন্‌কে লে গিয়া মেরা প্রাণ, কাঁহা মেরা জান!" মুখে অন্য কোন কথা নাই। উন্মত্ত বড়বাবু অনবরতই বোল্‌ছেন, "কো জন ছিন্‌কে লে গিয়া মেরা প্রাণ, কাঁহা মেরা জান!" এ কথার অর্থ কি, কেন বড়বাবু অনবরতই এ কথা বোল্‌ছেন, আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। বড়বাবুর তবুও নিবৃত্তি নাই।—শুয়ে শুয়ে—চোক বুজে আপন মনে ঐ এক কথাই বারম্বার উচ্চারণ কোচ্চেন।

কর্ত্তার মৃত্যুর পর থেকে অনেকের স্বভাব এক একটু পরিবর্ত্তন হয়েছে। আগে আগে বড়বৌ বড়বাবুকে ভয় কোত্তেন, সাহস কোরে কোন কথা বোল্‌তে ভরসা কোত্তেন না, কিন্তু ইদানী আর সে ভয় নাই। বড়বৌ আজকাল বড়বাবুকে সময়-মত বেশ মিষ্ট মিষ্ট দু-কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়েন না।

বড়বৌ ঘরে ছিলেন না। বড়বাবু ঘরে এসে এই কাণ্ড কোচ্চেন

শুনে বড়বৌ ঘরে এলেন। আমরাও সাহস কোরে একটু এগিয়ে গেলেম। বড়বৌ ঘরের ভিতর ঢুকে একটু কড়া আওয়াজে বোল্লেন, "কি?–হয়েছে কি? এক ঘড়া মদ মেরে কি কেলেঙ্কারী হোচ্চে?"

বড়বাবু একটু চেয়ে—মিটি মিটি চেয়ে বোল্লেন, "কে?—দিলচম্পা বিবি! বা! বা! ক্যাবাৎ। আবার গাও জান!—আবার গাও! পেয়ারু আওয়াজে ফিন্ লাগাও! কো জন ছিন্‌কে লে গিয়া মেরা প্রাণ, কাঁহা মেরা জান! গাও—ফাও,—বাইজী,—ফিন্ লাগাও!"

বাবুর ভাব দেখে আমরা ত অবাক্ হয়ে গেছি। কাণ্ডটা বুঝ্‌তেও বাকী নাই। বড়বাবুর কথার ভাবে আমরা অনেকটা এঁচে নিলেম। বড়বৌ বড়বাবুকে বাইরের বারান্দায় টেনে নিয়ে এলেন। মাথায় ঘড়াকত জল ঢেলে দিলেন। ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে দিয়ে আবার বিছানায় শোয়ালেন। বড়বাবুর কিন্তু সে গানের নিবৃত্তি নাই। গলার সুর নাই, গাইতে জানেন না, তবুও ভাঙা ভাঙা চেরা চেরা সুরে, গেঙিয়ে গেঙিয়ে গাইতে লাগ্‌লেন, "কো জন ছিন্‌কে লে গিয়া মেরা প্রাণ, কাঁহা মেরা জান!"

রাত্রি হলো। সকলের আহারাদি হলো। আমরা যে যার ঘরে শয়ন কোল্লেম। তখনো দূর থেকে স্পষ্ট স্পষ্ট কাণে আওয়াজ যেতে লাগ্‌লো, বড়বাবু তখনও সেইরূপ ভাবে থেকে থেকে গেয়ে উঠ্‌ছেন, "কো জন ছিন্‌কে লে গিয়া মেরা প্রাণ, কাঁহা মেরা জান।"

রাত্রে আর কি কাণ্ড হলো, জান্‌তে পাল্লেম না। সমস্ত রাত একটা দুর্ভাবনা থাক্‌লো, বড়বাবু রাত্রে না জানি আরও কি কেলেঙ্কারী কোর্‌বেন। সকালেই ঘুম ভেঙে গেল। হাত-মুখ ধুয়েই তাড়াতাড়ি বড়বাবুর ঘরের দিকে গেলেম। গুটি গুটি উঁকি মেরে দেখ্‌লেম, বড়-বাবু ঘরে নাই। বড়বৌ একা একখানা কেদারায় গালে হাত দিয়ে বোসে কাঁদ্‌ছেন। আমি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম, আস্তে আস্তে বিছানায় বোস্‌লেম। অনেকক্ষণ মুখে কথাই সর্‌লো না। একটু পরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বৌদিদি! দাদাবাবু কোথায়? সকাল বেলা অমন কোরে কাঁদ্‌চো কেন?" বৌদিদি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন, "হরিদাসি! আবার আমার কপাল ভেঙেচে। অনেক কষ্টে একটু মন ফিরেছিল, দু-এক দিন দেখ্‌তে

পাচ্ছিলেম, আবার এই এক বিপদ! কাল সমস্ত রাত "দিলচম্পা দিলচম্পা" বোলে কাটিয়েছেন। আর সেই পোড়া গান প্রায় সমস্ত রাত্রি গেয়েছেন। রাত্রে অনেক কষ্টে ধোরে রেখেছিলেম। রাত তিনটের সময় জোর কোরে—মারধোর কোরে বেরিয়ে গেছেন। আগে দেখা পেতেম না সত্য, কিন্তু কখনো উঁচু কথাটী শুন্‌তে পাই নাই, আর আজ এক কাণ্ড। হরিদাসি! আমার এমনি ইচ্ছা হোচ্চে যে, হয় গলায় ছুরী দি, নয় একদিকে চোলে যাই। আর এ কষ্ট সহ্য হয় না!"

বড়বৌয়ের কথার ভাবে—চেহারার ভাবে বেশ বুঝতে পাল্লেম, তাঁর মনে বড়ই কষ্ট হয়েছে। চোক-দুটী যেন জবাফুল। সমস্ত রাত একটী-বারও বিছানায় পাশ দেন নাই! সারারাত কেঁদেই কাটিয়েছেন। আমি সান্ত্বনা কোরে বোল্লেম, "তা বৌদিদি! কেঁদে আর কি কোরবে? অদৃষ্টের লেখা ত আর খণ্ডাবার যো নাই। কেঁদে আর ফল কি? বরং যাতে দাদাবাবু ভাল হন,—মন্দগতি ফেরে, তারই চেষ্টা কর।"

"তুমি বল কি হরিদাসি?"—বড়বৌ একটু উত্তেজিতস্বরে বোল্লেন, "তুমি বল কি হরিদাসি? এ মতিগতি কি আর ফেরে? ছেলেমানুষ নয় যে, বুঝিয়ে সুজিয়ে মত ফেরাব। বুড় ধাড়ী,—বয়স হয়েছে, আর কি বুঝাবার কাল আছে? সব মিছে হরিদাসি!—সব মিছে!—হরিদাসি! সব মিছে। এখন আপন আপন পথ দেখাই ভাল। যা খুসী তাই করুক, আর কিছু বোল্‌বো না, কিছুর মধ্যেই থাক্‌বো না। আর দুদিন শেষ দেখা দেখে, বাপের বাড়ী চোলে যাব।"

বড়বৌ অনেক রকম দুঃখ কোল্লেন, অনেক ব্যথা জানালেন। আমিও যথাসাধ্য সান্ত্বনা কোল্লেম। সে দিন সেইভাবেই কেটে গেল।

একবার মনে কোল্লেম, বড়বাবুর এ মতি, গতি ফিরান বড়বৌয়ের কাজ নয়। থাক্‌তেন যদি পিসী, তবেই বাবু সায়েস্তা হোতেন। কি হবে, তাঁরা এখন কাশীবাসী, বাবুর এত কাণ্ডও সেই জন্য।

চার পাঁচ দিন কেটে গেল, বড়বাবুর আর দেখা নাই। খাজাঞ্চী বাড়ীর ভিতর গিন্নীর কাছে বোলে পাঠিয়েছেন, বিষয় আর থাকে না। কর্ত্তার মৃত্যুর পর এই দু-মাসে বড়বাবুর নামে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা খরচ লেখা হয়েছে! যেমন খরচ হোচ্চে, এই নিয়মে কিছুদিন হোলে সর্ব্বস্ব উড়ে যাবে। গিন্নী কি কোরবেন? তার ত আর কোন হাত

নাই। তিনি বল্লেন, "যার টাকা, সে যদি এমন কোরে উড়িয়ে দেয়, তবে আর আমি কি কোরবো? সেই কষ্ট পাবে। আমি কটাদিন থাক্‌বো, তা এক রকম কোরে কাট্‌বেই কাট্‌বে। তবে রুদ্রেশ্বরকে পথে বৌসিয়ে যেতে হলো, এই যা কষ্ট।"

খরচের কামাই নাই। খাজাঞ্চীবাবু গিন্নীকে সংবাদই দিন আর যাই করুন, বড়বাবুর খরচের কামাই নাই, বরং দিন দিন আরও বাড়্‌ছে আর অন্দরে বড় একটা পদার্পণ হয় না। বৈঠকখানাই এখন ভাতবাড়ী হয়েছে। সেইখানেই আলাদা ভাল রস্থয়ে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয়েছে, সেই-খানেই কাবাব—কোপ্তা—কলিয়া-পোলাও রান্না হয়, বাবু পাঁচটী প্রাণের বন্ধু নিয়ে তাই খান, সেইখানেই বিছানা আছে, শয়ন হয়। গান-বাজনা হয়,—মদ চলে, কেলেঙ্কারী হয়। মধ্যে মধ্যে দু-একটী কুলধ্বজের পদধূলিও পড়ে। এ সব খবর বাবুর পেয়ারের খানসামা ভীখনের মুখে শুন্‌লেম। বড়বৌ ভীখনকে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু বক্সিস দেন, ভীখন সময়-মত রোজ রোজ রোজনামা দাখিল করে।

একদিন শুনলেম, বিবি দিলচম্পা আজ বৈঠকখানায় আসবেন। আজ ভারী ধুম। কত রকম রকম খাবার তৈয়ার হোচ্চে, ভাল বিছানা পাতা হোচ্চে, খাতির যত্ন কর্‌বার—আদব কায়দা রাখবার নানারকম মিছিল হোচ্চে। সংবাদ শুনে আমরা স্থির কোল্লেম, বিবিকে একবার দেখতে হয়েছে। যার রূপে বাবু এমন পাগল হয়েছেন,—যার গান শুনে বাবু প্রাণ খোয়াতে বোসেছেন, তার চেহারাটা একবার দেখতে হবে।

দুজনে যুক্তি স্থির কোল্লেম। গরম হয়েছে বোলে বৈঠকখানার পাশের জানালা খুলে দিবে, এ কথা ভীখনকে শিখিয়ে দিলেম। অন্য জানালা নয়, যেখানে বিবি বোসবেন, তারই পাশের জানালা খুলে দিতে বলা হলো। ভীখন স্বীকৃত হয়ে চোলে গেল। জেনে রাখলেম, রাত্রি নটার সময় বিবির শুভাগমন হবে।

সকাল সকাল আহারাদি কোরে বড়বৌয়ের ঘরে গেলেম। ভাল কোরে কাপড় পোর্‌লেম। সাবধানে—কি ভাবে কোন্ রাস্তা দিয়ে যাব, তাও দুজনে ঠিক কোরে নিলেম। রাত্রিও নটা বেজে গেল, আমরাও বেরুলেম।

ঘুরে ফিরে—আড়াল দিয়ে—পা টিপে টিপে ঠিক বৈঠকখানার পেছনে

গিয়ে দাঁড়ালেম। ভীখনকে যেমন উপদেশ দিয়েছিলেম, ভীখন ঠিক সেই কথামতই কাজ কোরেছে। বিবি যেখানে বোস্‌বেন, ঠিক তার পাশের জানালাই ভীখন খুলে রেখেছে। আমরা আড়াল থেকে বেশ দেখতে পেলেম।

যা দেখলেম, এমন আর কখনো দেখি নাই। গল্প শুনেছিলেম, স্বর্গে অমরাবতী আছে, সেখানে কত অপ্সরা দিবারাত্রি বিহার করে। কথাটা শুনেছিলেম, আর নিজের যতটা কল্পনাশক্তি, তারই সাহায্যে মনে মনে অমরাবতীর একটা ছবিও এঁকে রেখেছিলেম। এখন মিলিয়ে দেখলেম, আমার মনেও যা, বাইরে চোকের সাম্‌নেও ঠিক তাই। আশ্চর্য্য ব্যাপার!

বড়বাবু ঘরটী এমন সাজিয়েছেন যে, তার বর্ণনা করা যায় না। দেয়ালে এক হাত অন্তর জোড়া জোড়া দেয়ালগিরি, দেয়ালগিরির নীচে বড় বড় ছবি—তার নীচেই আবার বড় বড় ফুলের তোড়া বাঁধা,—মধ্যে একটা একুশ ডালওলা ঝাড়। ঘরটীতে যেন শতচাঁদের আলো। ঘরের ভিতর একটী গোল টেবিল। টেবিলের উপর বড় একটী কাচের ফুল-দান, তার উপর একটা প্রকাণ্ড তোড়া! ফুলদানের মধ্যে পরিষ্কার জল, জলে ছোট ছোট মাচ জীয়ন্ত আছে। টেবিলের একধারে তার-জড়ানো সাদা সাদা বোতল, বড় বড় গেলাস, একটা কাচের ছোট ঘড়া, তাতে লাল রঙের জলের মত কি। আর একপাশে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রঙের ঝাড়, বুটীকাটা নানা আকারের ছোট বড় শিশি। দেয়ালের গায়ে একটী ঘড়ী। ঘড়ীটী বড় নূতনতর। ঘড়ীর উপরে ভেঁপু হাতে কোরে একটী আতুরে ছেলে। ঘড়ী যখন যে কবার বাজে, সেই ছেলেটী ততবার ভেঁপুতে ফুঁ দিয়ে ঘোষণা করে। হুহু শব্দে টানাপাখা চোলেছে, চারিদিক আতর-গোলাপের গন্ধে ভরপুর!

টেবিলের চারিধারে কেদারা! একদিকে বিবি দিলচম্পা, আর তার সাম্‌নেই আমাদের বাবু। বাবুর পাশে তফাতে সারি-গাঁথা পাঁচজন পীল ইয়ার। মদ চোল্‌ছে, তামাক উড়্‌ছে, মাঝে মাঝে হাসির গর্‌রা উঠ্‌ছে। দূরে আমরা সব দেখ্‌চি।

দিলচম্পার রূপ যেন ভুবনভরা। বাবু সাধ কোরে,আর পাগল হন নাই। এমন রূপ দেখ্‌লে মুনিরও মন টলে, বাবু ত কোন্ ছার।

দিলচম্পার বয়স অনুমান কোল্লেম, পোনেরো কি ষোল। বড়বৌ বোল্লেন, কুড়ি বাইশ। বড়বৌয়ের এ কথা সত্য অনুমান, কি গায়ের জ্বালা, তা বুঝ্‌তে পাল্লেম না। আমি কিন্তু অনুমান কোল্লেম, পোনেরো ষোল। রংটী যেন দুধে আল্‌তায় মিশানো। একঢাল চুল,—খোঁপা দেখে চিন্‌লেম। দাঁতগুলি যেন মুক্তা সাজানো, চোক দুটী যেন ঢল্ ঢল্ কোচ্চে। একে ত সেই চোক, তাতে আবার নেশায় একটু লাল হয়েছে বোলে চোকের শোভা যেন শতগুণে বৃদ্ধি হয়েছে। লোকের চেহারার কোন না কোন স্থানে খুঁত থাকে, কিন্তু এ চেহারা নিখুঁত! বড়বৌ অনেক খুঁজে পেতেও খুঁত বাহির কোত্তে পাল্লেন না। দিলচম্পা অসাধারণ সুন্দরী! কথার প্রসঙ্গে এক একবার হাস্‌ছেন, যেন মুক্তা ছড়িয়ে পোড়্‌ছে। দিলচম্পার চেহারা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

বাবু এক একবার প্রেমভাবে ঢোলে ঢোলে—টোলে টোলে দিলচম্পার গায়ে পোড়্‌ছেন। দিলচম্পা অমনি তথনি অতি যত্নে তুলে তুলে বসাচ্চেন। আপনার হাতে কোরে মাথায় গোলাপ জল দিচ্চেন। বড়বৌ এ সব কাণ্ড দেখে একবার একবার ফোঁস ফোঁস কোরে উঠ্‌ছেন। চুপি চুপি বোল্‌ছেন, "দেখ্‌চিস হরিদাসি! নিস্সের রকমটা দেখ্‌ছিস?" আমি সে সব কথা কাণে না তুলে কেবল প্রাণভরে দিলচম্পার রূপ দেখ্‌ছি।

অনেকক্ষণ। প্রায় একঘণ্টা গত হলো। বাবু আদর কোরে দিল-চম্পার গলাটী জোড়িয়ে ধোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লেন, "মেরা জান! একঠো তান লাগায় দে জিয়ে, মেরা দিল্! একদম রোসনাই কর্ দি জিয়ে।"—দিলচম্পা যেন সম্মত হোলেন। তথনি বাবুর ইয়ারমহলে সাড়া পোড়ে গেল। এতক্ষণ কেউ ঘুমুচ্ছিলেন,—মদের নেশায় কেউ কালিয়া-কোপ্তার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন,—কেউ পেটে হাত বুলিয়ে ক্ষুধা বাড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা সাড়া পোড়ে গেল। ঢোলক—তবলা, বেহালা আরও রকম রকম যন্ত্র এলো। সুর বাঁধা হলো। সুরের সঙ্গে দিলচম্পা আপন সুর মিলালেন। যেন স্বর্গীয় বীণাধ্বনি হোতে লাগ্‌লো। আমি ত অবাক! সেই মধুরস্বরে যেন ডুবে গেলেন!

আহা কি মধুর স্বর! তরফায় তরএায়—সরু মোটায়—নরমে গরমে গান চল্লো। বাবু মাঝে মাঝে ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। গানের আসর সরগরম হয়ে গেল।

দিলচম্পা উঠ্‌লেন।—বোসে গাইছিলেন, গাইতে গাইতে উঠ্‌লেন। ঘরের ভিতর যেন একটা বিদ্যুৎ চোম্‌কে গেল। দিলচম্পা গাইতে গাইতে নাচ আরম্ভ কোল্লেন। ইয়ার মহলে বাহবা বাহবা পোড়ে গেল! বাবুর মুখে বাইজীর প্রশংসা আর ধরে না। প্রত্যেক তালে তালে, প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালনে যেন কতই মধুর ভাব উথ্‌লে উথ্‌লে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে গহনার মধুর শব্দ, আবার সেই গহনার ডায়মনে আলো লেগে যেন জ্বোলে জ্বোলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। বাইজী এক কথা একশবার বোলে,—প্রত্যেকবার এক এক রকম অঙ্গভঙ্গী কোরে,-কখন হেসে হেসে,—কখন কেঁদে কেঁদে, কখন কাচুমাচু মুখে,—কখন ভ্রুকুটী কোরে,—কখন হেলে,—কখন দুলে, সেই কথাই বারম্বার গাইতে লাগ্‌লেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে গানের জমাট বেঁধে গেল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে চার পাঁচটা গান হয়ে গেল। বৈঠকখানার ঘড়ীতেও এগারোটা।

বাবুর তবুও নিবৃত্তি নাই। বাবু প্রেমে কি নেশায় জানি না, গদ্‌ গদ্‌ হয়ে বোল্লেন, "বিবি জান্‌! সেই গীতটী একবার হোক!—সেই যে, সেই—আঃ! মনে কর না হে?" বাবু গানটা মনে কত্তে না পেরে ইয়ার-মহলে ধমক দিয়ে বোল্লেন, "মনে কর না হে?" অমনি পরস্পর পরস্পরের উপর হুকুমজারী কোল্লে, "মনে কর না হে? মনে হোক আর নাই হোক, "মনে কর না হে" এই বোলে একটা যেন হৈ চৈ পোড়ে গেল।

কারও মনে হলো না। বাবু নিজেই মনে কোল্লেন। সেই গান, যে গান নিয়ে সে দিন বাবু কত ঢলাঢলি কোরেছিলেন, সেই গান বাবুর নিজেরই মনে পোড়ে গেল। বাবু আপনা-আপনি করতালি দিয়ে সুর কোরে বোল্লেন, "মনে হয়েছে। ই—হি—সেই যে, "কো জন ছিন্‌কে লে গিয়া মেরা প্রাণ, কাঁহা মেরা জান।" বাবু নিজেই মাথা নেড়ে, ঘাড় নেড়ে,—চোক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে লাগ্‌লেন, "কো জন ছিন্‌কে লে গিয়া মেরা প্রাণ, কাঁহা মেরা জান!"

বিবি একটু হেসে—বাবুর দিকে একবার কটাক্ষ কোরে গান ধোল্লে,—

"দিল আঁধার ভেঁইরে।
হিয়াকো চান্দা হামেরা ছিন্‌ লিয়া রে।

কাঁহা মেরা গিয়া সহি,
হিয়া শুনা ভেঁয়ি,
নিপট নিকট নহি, কাঁহা গিয়া মেরা জান রে।
কো জন ছিন্‌কে লে গিয়া মেরা জান,
কাঁহা বাতি বাতি ঢুঁঢ়ি না মিলি নয়ান,
কাঁহা মেরা প্রাণ,—
আঁধার আঁধার ভেঁইরে॥"

বাবু কিন্তু গানটী শিখ্‌তে পারেন নাই। আমি শিখ্‌লেম। বারম্বার এই একটী গান ফিরে ঘুরে গাইতে আমি শিখে নিলেম। গানও থাম্‌লো। তার পর আহারের আয়োজন। সেই টেবিলের উপরে কাচের পাত্রে নানারকম খাবার এসে হাজির হলো। বাবু সবান্ধবে দিলচম্পার সঙ্গে একত্রে আহারে বোস্‌লেন। মনুষ যে কতদূর জঘন্য হোতে পারে, বাবুর এই কাণ্ডটীতে তাই দেখ্‌লেম। রাতও ১টা বাজ্‌লো। আমরা আহার আর দেখ্‌লেম না, চোলে এলেম। এর পর যা হবে, তা অনেকটা আভাসে বুঝে নিয়ে চোলে এলেম।

রোজই দিলচম্পা বৈঠকখানায় আস্‌তে আরম্ভ কোল্লে। রোজ রোজ এই রকম কাণ্ডকারখানা হোতে লাগ্‌লো। রোজ রোজ টাকার শ্রাদ্ধ আর বাবুর মুণ্ডপাত!

আর একদিন দেখ্‌তে হবে। সেদিন প্রথম প্রথম ভয়ে ভয়ে ভাল কোরে দেখা হয় নাই। আর একদিন দেখ্‌বো, স্থির কোল্লেম। বড়বৌ বোল্লেন, "আজই চল। আজ আর ভীখনকে বোলে কাজ নাই। না বোলেই দুজনে যাই চল, দেখে আসি।" যখন এই কথা, তখন রাত প্রায় ১২টা। আমি বোল্লেম, "এত রাত্রে আর নাই বা গেলেন। গিয়ে আর দেখ্‌বো কি? যেতে হোলে সকাল কোরে যাওয়াই ভাল।" বড়বৌ কথা শুন্‌লেন না। তিনি গোঁ ধোল্লেন, "আজি যাব।" আমি অগত্যা সম্মত হোলেম। দুজনে বেরুলেম।

আজও সেই জানালা খোলা। একটী ইয়ারও নাই। বাবু আর দিল-চম্পা দুজনে কথাবার্ত্তা চোলেছে। নিকটে আর কেউ নাই। কেবল ভীখন এদিক ওদিক কোচ্চে। যখন যা আবশ্যক হোচ্চে, তারই সরবরাহ কোচ্চে।

আজ এ নির্জ্জনে বোসে কথা কেন? মনে মনে বড় কৌতূহল হলো! পা টিপে টিপে ঠিক জানালার নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেম। এত নিকটে দাঁড়ালেম যে, এদের নিশ্বাসের শব্দটি পর্য্যন্ত যেন শোনা যায়।

আমরা যখন গেলেম, তখন দিলচম্পা কি বোল্‌ছে। আগে কি কথা হয়ে গেছে, শুনি নাই। মাঝামাঝি সময়ে শুন্‌তে পেলেম। দিলচম্পা বোলছে, 'বাবু! আপনি যা বোল্লেছেন, তা ঠিক কথা। কিন্তু আমার ত আর অপর কোন উপায় নাই? আপনাকে দেখে পর্য্যন্ত আমি নরসিংপুরের রাজা, রাজনগরের বড় তরফের সেজ রাজকুমার, ধুণ্ডারপুরের সেই মহাজনের ছেলেটা, বহুপাড়ার সেই বুড়ো রাজাটা, সকলের আশাই ছেড়ে দিয়েছি। সব দিক চাই, টাকা অমন্না গ্রাহ্য করি না। সব দিক ঠিক হওয়া চাই। তাই আপনাকে মনের মত দেখে আমি সব পথে কাঁটা দিয়েছি। আবশ্যকও হতো না। আমার ত সামান্য খরচ। বিবিয়ানা চালচলন আমি বড় ভালবাস না। দেখ্‌ছেনই ত, এই সামান্য-ভাবেই তুষ্ট থাকি। তবে নইলে নয়, তাই দু-এক শ' ভরি সোণা, কি দুদশ হাজার টাকার জহরত রাখ্‌তে হয়, তাই রাখি। এতে আর বেশী টাকার কি আবশ্যক? তবে ছোট ভাই, না বুঝে একটা কাজ কোরেছে, বিপদে পোড়েছে, আমি না রাখ্‌লে তাকে আর কে রাখ্‌বে? না বুঝ্‌তে পেরেই এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। বাপের লাখ টাকা, আমার পঞ্চাশ হাজার, এক বৎসরে উড়িয়ে দিয়ে শেষে আবার এই বিশ হাজার টাকা দেনা করেছে। এখন জেলে যায়। করি কি, আপনি আমাকে এ বিপদে রাখুন! এখন উদ্ধার করুন, আবশ্যক হয়, আবার নিলে চল্‌বে। আপনিই ত এখন আমার সব।" বাবু একেবারে যেন গোলে গেলেন;—বোল্লেন, "সে কি বিবিজান! বিশ হাজার টাকার জন্যে তোমার ভাই জেলে যাবে? এ কি কথা!—কিন্তু ভাই একটী কথায় মনে বড় ব্যথা দিলে। বিশহাজার টাকা আবার টাকা? তাই আবার তোমার কাছে থেকে ফিরিয়ে নেব? ছি!—আমাকে তুমি এমন কৃপণ বিবেচনা কর?"

বিবি অমনি বাবুর কাছে এসে,—সোরে বোসে,—হেসে হেসে,—একবার বাবুর মুখচুম্বন কোরে,—আদর কোরে বোল্লেন, "তাও কি হয়? কেবল আপনার মন বুঝ্‌বার জন্যেই বোল্‌ছিলেম। ঠিক হয়েছে।—আমার মনটী

য়েমন সাদা, আপনারও ঠিক তাই।—দুজনে মিলেছে ভাল। তাতেই অত্যন্ত ভালবেসে ফেলেছি। ধর্ম্মতঃ বল্‌ছি,—মাইরী, আমি এত ভাল আর কাকেও কখনো বাসি নাই।"

"বাস ?—ভালবাস ? বাবু কেদারা থেকে লাফিয়ে উঠে—বিবিজানের মুখখানি ধোরে আদর কোরে বোল্লেন, "বাস ?—ভালবাস ? তবে আর আমার ভাবনা কি ? টাকা কি এখনি চাই ? রাত যে ১টা বাজে !"

বিবি যেন একটু কাতর হয়ে বোল্লেন, "বড়ই কষ্ট দিলেম। কাল মকর্দ্দমার দিন। আজ রাত্রে টাকা না পাঠালে আর কোন ফলই হইবে না। মোক্তার আমার বাড়ীতেই বোসে আছেন।"

বাবু সামান্য একটু চিন্তা কোরে উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌লেন, "ভীখন !" বাবুর উপযুক্ত খানসামা ভীখন "হুজুর" বোলে বাবুর সন্মুখে হাজির হলো। বাবু কি একটু লিখে বোল্লেন, "জল্‌দি খাজাঞ্জীবাবুকো পাস যাও ? যো দেগা—লেকে জল্‌দি চলি আও !" বাবু পত্রখানি ভীখনের হাতে দিলেন। বিবি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি লিখে দিলেন ?" বাবু ভীখনের হাত হোতে চিরকুটখানি নিয়ে বড় বড় কোরে পোড়লেন।—

"এজ্জতাছার শ্রীযুৎ রঘুনন্দন দোবেজী

সুচরিতেষু—

যেহেতু আমার নিজের কোন প্রয়োজনীয় খরচের জন্য রোকায় জানিবে। এই লোক শ্রীভীখন মারফৎ কোম্পানী বিশ হাজার টাকা পাঠাইবার অন্যমত করিবে না। আমার এই রোকা হুকুমজ্ঞান করিয়া টাকা দিবার ওজর-আপত্য না হয়। এক তাগিদ সহস্র তাগিদ মনে করিবে। কল্য ঐ টাকা জমাখরচ করিয়া লওয়া যাইবে। ফলে টাকা পৌঁছিতে, বিলম্ব না ঘটে। নিবেদন ইতি।"

পত্রখানি শুনে বিবি বড় সন্তুষ্ট হোলেন। প্রকাশ্যে বোল্লেন, "অতি চমৎকার লেখা। বেশ হয়েছে। অনুগ্রহ কোরে আর একটু লিখুন।" বাবু কলম ধোল্লেন। বিবি বোলে দিতে লাগ্‌লেন :—

"পুঃ—নম্বরী নোটের আবশ্যক নাই। খুচরা নোট ও রোক্ টাকা চাই। ওখান হইতে বরং জনেক পদাতিক ইহার সঙ্গে পাঠাইবে।"

বাবু পত্রখানি লিখে ভীখনকে দিয়ে বিদায় কোল্লেন। অনেকক্ষণ ধোরে অনেক রকম কথাবার্ত্তা হলো। ভীখন ফিরে এসে বোল্লে, "খাজাঞ্জীবাবু

শুয়েছেন, এখন টাকা দিতে পার্‌বেন না। জমাখরচ হিসাবনিকাশ হয়ে গেছে। আজ আর টাকা দিতে পার্‌বেন না। কাল দিবেন।” বাবুর মেজাজ অম্‌নি গরম! রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বোল্লেন, “কি!—এত বড় কথা!—আমি নিজেই যাচ্চি।” বাবু সাঁ কোরে বেরিয়ে গেলেন।

. বাবু বেরিয়ে যেতেই একজন লেকে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। লোক্‌টার চেহারা যেন যমদূত! বড় বড়—গোল গোল চোক,—মস্ত মস্ত দাড়ী গোঁপের ঘটা,—মুখখানা যেন অমাবস্যার চেয়েও অন্ধকার।—রং কাল মিস্—লম্বা পুরো পাঁচ হাত। ভদ্র-আনা কাপড় পরা, কিন্তু ভাবে বোধ হলো, লোকটা ছদ্মবেশী.।

লোকটা বিবির সঙ্গে এসে ফিস্ ফিস্ কোরে অনেক কথা কইলে। এত ছোট ছোট কথা যে, বিশেষ চেষ্টা কোরেও শুন্‌তে পেলেম না। বাবুর পায়ের শব্দ হলো, লোকটাও সাঁ কোরে বেরিয়ে গেল।

বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের ভিতর এলেন। বিবিসাহেব তাড়াতাড়ি উঠে রুমাল দিয়ে বাবুর মুখখানি মুছিয়ে দিলেন। ছোট একখানি অর্দ্ধচন্দ্র আকারের হাতীর দাতের পাখা দিয়ে নিজেই বাতাস কোত্তে লাগ্‌লেন; মুখে বোল্লেন, “কি হলো?”

বাবু সদম্ভে চেঁচিয়ে বোল্লেন, “হবে আবার কি? আমি নিজে যখন গেছি,—তখন তার বাবার সাধ্য কি যে, না দিয়ে বাঁচ্‌তে পারে। ব্যাটা বড় পাজি, কালই দূর কোরে দিব;—দিবই দিব! আমার টাকা,—আমার ধন,—আমি খরচ কোর্‌বো, তাতে সে ব্যাটার কি?”

বিবি যেন সন্তুষ্ট হোলেন। আপন আসনে বোসে হেসে হেসে বোল্লেন, “তবে আর বিলম্ব কি?” বাবু তোড়া খুলে টাকা গোণে দিলেন। বিবি আবার নিজে গোণে নিয়ে “লছমন! লছমন” ,বোলে কাকে ডাক্‌লেন। আবার সেই লোকটা এসে উপস্থিত। বিবি তার হাতে সমস্ত টাকাগুলি দিয়ে বোল্লেন, “যাও, এখনি মোক্তারকে টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দাও! বেশ কোরে বোলে দিও, যেন ভাইটী আমার জেলে না যায়।” লছমন ঘাড় নেড়ে—সম্মতি জানিয়ে টাকার পুটুলী আর চারিজনের মাথায় দিয়ে চোলে গেল। নগদ টাকা বড় বেশী নয়, অধিকাংশই খুচরা নোট, নিয়ে যেতে বড় কষ্ট হলো না।

লছমন বেরিয়ে যেতেই আর একটী লোক দরজার কাছে এসে ভয়ে

ভয়ে বোল্লে, “বিবিসাব!” বিবি সেই লোকটার দিকে চেয়ে একটু রাগ জানিয়ে বোল্লে, “না, এখন গাড়ী জুতিস নে, বিলম্ব আছে। লোক্‌টা আম্‌তা আম্‌তা কোরে চলে গেল। বিবি হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, “হুকুম হয় ত, একটা গান—” বাবু বিবির মুখ থেকে ছোঁ মেরে কথাটা উড়িয়ে নিয়ে বোল্লেন, “তা আর জিজ্ঞাসা কোত্তে হয় জান্? বিবিসাহেব ছুটা গাইলেন।

বাবু বড় সন্তুষ্ট হয়ে বোল্লেন, “জান্! তোমার গলা বড় মধুর! চমৎকার গান!” বিবিসাহেব একটু হেসে আবার গান ধোল্লেন। বাবু যেন চোম্‌কে উঠ্‌লেন; চেঁচিয়ে উঠলেন। বোল্লেন, “এ কে রে?” বিবি বোল্লেন, “আমি।” চমৎকার ব্যাপার!

বাবু বোল্লেন, “কি রকম আমি? এমন কর্কশ আওয়াজ, মাথা ধোরে উঠ্‌ছে, এ আওয়াজ তোমার বিবিজান?” বিবিজান পকেট থেকে ছোট একটা বাক্স বার কোরে টেবিলের উপর রেখে বোল্লেন, “এই সুর। যে গান শুনে আপনি মুগ্ধ, সে আওয়াজ আমার নয়,—এই এরই। বাবু অবাক্! আমরা ত অনেকক্ষণই অবাক!

বাবুর মুখে আর কথা নাই। বিবি হেসে বোল্লেন, “বাবু কথা নাই যে? তবে কি আমায় পছন্দ হয় না?” বাবু একটু ম্লানহাসি হেসে উত্তর কোল্লেন, “সে কি? আওয়াজ কি সব সময় সমান থাকে? সকলেই গাইতে পারে? চেহারাটা যাবে কোথা? এমন মুখ, এমন দাঁত, এমন চুল, এমন বয়েস ক’জনার থাকে? চেহারায় যে মেরে রেখেছ।”

বিবিসাহেব বল্লেন, “তাও নয় বাবু, চেহারা আরও ভাল আছে। এই দেখুন! আমরাও দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। বিবি মুখের ভিতর আঙুল দিয়ে দুপাটি দাঁত বার কোল্লেন, শালের ভিতর থেকে দুটো গোল গোল ভাঁটার মত কি বার কোল্লেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেখ্‌তে ষোল বছরের বিবি আশী বছুরী বুড়ী! দাঁত নাই, গাল দুখানি এখন কুঁচ্‌কে পোড়েছে! অবাক কারখানা! বিবি আবার মাথায় হাত দিয়ে খোপাশুদ্ধ চুল টেনে বার কোরে টেবিলের উপব রাখ্‌লেন, সাদা শোণের নুড়ী বেরিয়ে পড়লো! গহনা খুলে,—কাঁচলী খুলে,—ঘাগ্‌রা আঙিয়া খুলে, ষোল বছরের বিবিসাহেব আশী বছুরী বুড়ী হোলেন। বিবির এই সাজ দেখে,—আশ্চর্য্য ভেক বদল দেখে, আমি অবাক!—বড়বৌ অবাক! বড়বাবু ত অবাকই আছেন।

এ সব কি কাণ্ড! এতদিন বাবু বিবিসাহেবের সঙ্গে ব্যবহার কোচ্চেন, এতদিন বিবিসাহেব এখানে আনাগোনা কোচ্চেন,—এঁরা কি এতদিন এর ক্ষুণাক্ষরও জান্‌তে পারেন নাই? আশ্চর্য্য ব্যাপার!

বাবুর মুখে কথা নাই। বিবিসাহেব আপনা হোতেই বোল্লেন, বাবু! রাগ কোর্‌বেন না। আমি অনেকদিন থেকে এই বেশে আছি। বুড়ো বয়সে টাকা না থাক্‌লে বড় দুঃখ পেতে হয়। যাতে সে দুঃখ না পাই, সেই মৎলবেই আমার এই ভেকধারণ। অনেক ঘুরেছি,—অনেক দিন কাটিয়েছি, সুবিধা পাই নাই। আজ এই সুযোগে আমার কার্য্যসিদ্ধি হলো, তবে বিদায় হই।" বিবি দিলচম্পা সাঁ কোরে বেরিয়ে গেলেন। গাড়ী বারান্দায় গাড়ী প্রস্তুত ছিল, সেই গাড়ীতে উঠে সাঁ কোরে বেরিয়ে গেলেন। বিনা বাধায়—বিনা বাক্যব্যয়ে বিবি প্রস্থান কোল্লেন। গড়্ গড়্ কোরে বিবির গাড়ী বেরিয়ে গেল। ক্রমেই শব্দ মিলিয়ে গেল। বাবুর বৈঠকখানা নিস্তব্ধ!

বাবু যেন আড়ষ্ট! মুখে কথা নাই।—যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন। আমরাও যেন অবাক হয়ে গেছি। এত লোকজন থাক্‌তে,—এত আঁটা আঁটির মধ্যে—এমন চালাক চতুর বাবুর সাম্‌নে থেকে একটা মেয়েমানুষ বুড়ী—বিশ হাজার টাকা ঠোকিয়ে নিয়ে গেল, এটা যেন স্বপ্ন!

বাবুর উচিত শাস্তি হয়েছে। উচিত শিক্ষা হয়েছে। যদি এই শিক্ষায় শিখ্‌তে পারেন, তবে মঙ্গল। বাবু কেদারায় বোসে অকূল ভাবনায় যেন ডুবে আছেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূর্ব্বদিক ফর্সা হয়ে এলো। কাককোকিলের ডাক কাণে গেল। ঘরের আলোর জ্যোতিঃ কোমে এলো। আমরা বেশ বুঝ্‌লেম, রজনী প্রভাত।

আর থাকা নয়, দুজনে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলেম। দুজনেই ঘরে শুলেম। তখন কি আর ঘুম হয়?—মনে মনে কেবলই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, বিশ হাজার টাকা! চোকের সাম্‌নে—এতগুলো লোকের চোকে ধূলো দিয়ে একজন বুড়ী, ছুঁড়ী সেজে এসে, এক কথায়—একদমে ঠোকিয়ে নিয়ে গেল, বিশ হাজার টাকা!

অষ্টাদশ চক্র।

—— ঃ০ঃ ——

যেমন গাল, তেমন চড়।

বড়বাবু যেন মুস্‌ড়ে পোড়েছেন। এক দিনে এক থোকে বিশহাজার টাকার গায়ে জল দিয়ে বাবু একবারে দোমে গেছেন। কোথাও যান না, সদাই মুখখানি যেন আঁধার, ভাল কোরে আহার করেন না, সদাই যেন একটা দুর্ভাবনা লেগেই আছে। বাবু এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছেন, কোন্ কাজের কি ফল! কর্ত্তার মৃত্যুর পর একদমে তিন চার মাসের মধ্যে ৫০।৬০ হাজার টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন,—নিত্য নিত্য নূতন আমোদে মেতেছেন, এখন তার প্রতিফল ভাল কোরেই পাচ্চেন! সেই জন্যেই বড়বাবুর এত ভাবনা। বড়বাবুর যেমন গাল, বিবিজান তার উপযুক্ত চড় দিয়ে গেছেন।

একবার মনে হয়, বিবি বিশহাজার টাকা ঠোকিয়ে বড় অন্যায় কাজ কোরেছে। আবার মনে হয়, বেশ উপকারই কোরেছে। এই বিশহাজার টাকায় যে বাবুর চৈতন্য হয়েছে, সেও অনেক পুণ্যের কথা। যদি এমন থোক্ টাকাটা খরচ না হতো, তা হোলে বাবু জান্‌তেও পাত্তেন না, অথচ তলে তলে আরও যে কত টাকা নষ্ট হতো, তার অবধি থাক্‌তো না। বিবিজান বেশ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। একপক্ষে বড় ভাল কাজই কোরেছেন।

ববুর সব বদচাল্ ঘুচে গেছে। এখন কেবল আপনার ঘরেই বোসে বোসে ভাবেন। বড়বৌও সময় বুঝে মুখ ছুটিয়েছেন। আগে বড়বাবু যত মনঃকষ্ট দিয়েছেন, বড়বৌ তার শতগুণ প্রতিশোধ নিচ্চেন। একে এতটা টাকা বরবাদে গেছে, তার চিন্তা, তার উপর আবার বড়বৌয়ের বিষমাখানো লাঞ্ছনা, বড়বাবু যেন কেমনতর হয়ে গেছেন। বুদ্ধি, দর্প, বল, বিক্রম, সব যেন কোথায় গেছে। সাত ডাকে সাড়া নাই, বাড়ীর মধ্যে থাকেন, সাড়াটী পাওয়া যায় না।

আমি এখন আর বড়বৌয়ের ঘরে প্রায়ই যাই না। বড়বাবু প্রায় সর্ব্বদাই ঘরে থাকেন, দুজনে সর্ব্বদাই বিবাদ-ছগড়া চলে, সেই জন্যে আমি আর বড়বৌয়ের ঘরে বড় একটা যাই না। এখন আমাদের আড্ডা হয়েছে

সুশীলার ঘরে। সুশীলার ঘরেই আমি থাকি।—তিনজনে থাকি। আমি, সুশীলা আর সুশীলার নূতন সই। এই তিনজনে প্রায় একত্রেই থাকি, একসঙ্গেই অমোদ-প্রমোদ কোরে কাটাই। তিনজনে বেশ ভাব হয়েছে। তিনজনে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি।

সুশীলার সইয়ের নাম মোহিনী। বড়ঘরের মেয়ে, পিতার বেশ দশ টাকার সঙ্গতিও ছিল। পিতার অবস্থা যখন ভাল ছিল, তখন তারা এলাহাবাদে থাক্‌তেন। একমাত্র মেয়ে। মোহিনীর পিতা মোহিনীকে বড়ই ভালবাস্‌তেন। লেখা পাড়া শিখিয়েছেন, সূচের কাজ শিখিয়েছেন, গান-বাজনা শিখিয়েছেন, নাচ-তামাসাও শিখিয়েছেন, মেয়েটীকে সৎ-শিক্ষায় শিক্ষিত কোত্তে ত্রুটি করেন নাই। ফলও হয়েছে। কিন্তু যতই ফল হোক, সময় ত সকলের সমান যায় না! সময়ক্রমে মোহিনীর পিতার সমস্ত বিষয় নষ্ট হয়ে গেছে, মোহিনীর মাতারও মৃত্যু হয়েছে। বিষয় নাই,—সম্পত্তি নাই,—লোকজন নাই, কাজেই মানসম্ভ্রম নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। মোহিনীর পিতা মানীলোক, তাই তিনি মানরক্ষার জন্য এলাহাবাদ থেকে নির্জ্জনে—গোপনে এখানে এসেছেন। যেমন তেমন পাত্রে ত বিবাহ দিতে পারেন না, মাতৃহীনা কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবনা না ভেবে একটা ন্যাকাবোকা কুৎসিৎ পাত্রে ত দিতে পারেন না, তাই উপযুক্ত পাত্রের জন্য মোহিনীর পিতা আজও অপেক্ষা কোচ্চেন। সেই কারণেই পোনের বৎসরের মোহিনী আজও অবিবাহিতা। চারি-দিকে পাত্রের অনুসন্ধান হোচ্চে,—ঘটক-ঘটকী আনাগোনা কোচ্চে, একটী ভাল বিষয়ওয়ালা পাত্র পেলেই মোহিনীকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে মোহিনীর পিতা কাশীবাসী হবেন স্থির কোরেছেন। এ সব কথা আমরা মোহিনীর মুখে শুনেছি। আমাদের পাশের বাড়ীতেই মোহিনীরা এসেছে। সমবয়সী দেখে—মোহিনী সুশীলার সঙ্গে সই পাতিয়েছে, সেই হোতে আনাগোনা—দেওয়া খাওয়া চোল্‌ছে। আমরা তিনটীতে সেইজন্য এখন একত্রেই থাকি।

মোহিনী রূপসী। মোহিনীর যেমন চেহারা, আমাদের বাড়ীতে তেমন চেহারা কারও নয়। সুশীলার চেয়েও—কি রং, কি গড়ন, সকল বিষয়েই মোহিনী শ্রেষ্ঠ। কথায়-বার্ত্তায়—হাস্য পরিহাসে মোহিনী দিব্বি পাকা-পোক্ত! মোহিনীর অজানিত বিষয় কিছুই নাই। যে, কোন কথাই কেন

উত্থাপন কোরো না, মোহিনী যেন তা জেনেই রেখেছে। এই সব গুণে মোহিনী আমাদের বাড়ীতে বেশ পসার কোরেছে। সকলেই মোহিনীর কথাবার্ত্তায় সন্তুষ্ট।

বড়বাবু এতদিন মোহিনীকে দেখেন নাই, আজ নূতন দেখ্‌লেন। অমনি বড়বাবুর মুণ্ডু ঘুরে গেল, অবার যেন স্বভাব পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। বড় বাবুর স্বভাব আবার যেন কেমনতর বিগ্‌ড়ে গেল।

লোকের যে স্বভাব অনেকদিন হোতে হৃদয়ের উপর একাধিপত্য করে, সে স্বভাব সহজে পরিবর্ত্তন হয় না। যদিও কোন কারণে স্বভাবের একটু আধটু পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সে ক্ষণকালের জন্য। একটা স্বভাবের বহুদিন উপাসনায় প্রাণ যখন সেই স্বভাবময় হয়ে যায়, শত চেষ্টাতেও তখন সে স্বভাবের আর পরিবর্ত্তন হয় না। বাবু যে এই ক'টা দিন চুপচাপ কোরে আছেন, সে কেবল টাকার শোকে, স্বভাবের পরিবর্ত্তনে নয়।

যে সমস্ত পাষণ্ডগণ একটী কপর্দ্দকের বিনিময়ে বারাঙ্গনাচরণে আপনাদিগের জীবন বিক্রয় করে,—যাদের জীবন বারাঙ্গনার সেবার জন্য, যাদের উপার্জ্জন বারাঙ্গনার বিবিয়ানার জন্য,—যাদের ধর্ম্ম বারাঙ্গনার পবিত্রচরণ, প্রশংসা বারাঙ্গনার সুমধুর পিতৃমাতৃ উচ্চারণ, তাদের মন কি সহজে পরিবর্ত্তন হয়? যারা শালগ্রামশিলার উপবীত বিক্রয় কোরে বারাঙ্গনার পূজা দিয়ে থাকে,—যারা স্ত্রীকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ কোরে বারাঙ্গনাকেই গৃহলক্ষ্মী কোত্তে চায়, তাদের মনের গতি কি সহজে পরিবর্ত্তন হয়? বড় বাবুর মনের গতিও হয়েছে ঠিক এই প্রকার।

মোহিনীকে দেখে বড়বাবুর স্বভাব আবার বিগ্‌ড়ে গেল। আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে মোহিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমিও মোহিনী-সংক্রান্ত সমস্ত কথাই খুলে বোল্লেম। বাবু লজ্জার মাথা খেয়ে আমার সাক্ষাতে স্পষ্টই বোল্লেন, "হরিদাসি! এখন প্রকাশ কোরো না। চুপি চুপি চেষ্টা দেখ। আমি বিবাহে প্রস্তুত আছি। যদি পার, হরিদাসি! আমার জন্যে বিশেষ চেষ্টা কোরে যদি ঘটাতে পার, তোমাকে বাউটীসুট গয়না দিব।—দেখ, চেষ্টা দেখ। আগে প্রকাশ কোরো না, ঠিক্‌ঠাক হয়ে গেলে,—যোগাড় ঠিক কোরে তার পর প্রকাশ করা যাবে। বিবাহও গোপনে হবে, কেহই জান্‌তে পার্‌বে না! পৃথক বাড়ী নিয়ে

সেইখানে বিবাহ হবে। বড়বৌ জান্‌বে না,—মা জান্‌বে না,—বোনেরাও কেউ জান্‌তে পার্‌বে না; জান্‌বে কেবল আমি আর তুমি। বিবাহ হয়ে গেলে প্রকাশ করা যাবে। তখন বাধা দিয়ে কেউ কিছু কোত্তে পার্‌বে না। দেখ, যোগাড় দেখ। তুমি বেশ চালাক-চতুর আছ, তোমা দ্বারাই এ কাজ সুসিদ্ধ হবে। টাকার জন্যে পেছিয়ে যেয়ো না! টাকা যা লাগে দিব। তুমি বরং মোহিনীকে বুঝিয়ে বোলে পাঁচটা গুণের প্রশংসা কোরে তার মন টলাবার চেষ্টা দেখো!”

বাবুর কথায় আমি সম্মতি জানালেম। মনে মনে জান্‌লেম, বাবু আমার উপর সন্তুষ্ট হোলেন। এখন কথা এই, আমি এ কাজ কি কোরে করি? বড়বৌ এক জ্বালায় জ্বালাতন হয়েছেন, আমি আবার কি তাঁর শত্রু এনে ঘর-দাখিল কোর্‌বো? জাতের মিলই বা হয় কৈ? বড়বৌ আমাকে বিশ্বাস করেন—ভালবাসেন, তাঁর সুখের পথে কাঁটা দিতে আমি পারি কৈ? মনে মনে যুক্তি স্থির কোল্লেম, না, এ কাজ করা হবে না। বাবু প্রত্যহই তাগাদা করেন। আমিও যা তা বোলে কাটিয়ে দি।

বাবুতে মোহিনীতে একদিন দেখা-সাক্ষাৎ হলো। মোহিনী আমাকে বোল্লে, “সই দিদি! আজ দাদাবাবুর সাম্‌নে পোড়ে গেছি। লজ্জায় মাথা হেঁট কোরে পালিয়ে এলেম। দাদাবাবুর বেশ চেহারা কিন্তু যেন রাজপুত্র!” বড়বাবু মোহিনীর কথা দিব্যি শুন্‌তে পেলেন। তাঁর উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। আমাকে আর কোন কথা বোল্লেন না।

প্রায় একমাস, মোহিনী আমাদের বাড়ী এলো না। লোক পাঠিয়ে জান্‌লেম, তারা এখানে নাই। মোহিনীর সংবাদ এই পর্য্যন্ত। বড়-বাবুকেও আর বড় একটা বাড়ীতে দেখ্‌তে পাই না। তিনি আজকাল আবার বাইরে বাইরেই থাকেন।

একদিন আমি আর সুশীলা একখানা বাঙ্‌লা বই পোড়্‌ছি, বেলা তখন প্রায় একটা কি তারও বেশী, এমন সময় মোহিনী হাস্‌তে হাস্‌তে সেই ঘরে এসে উপস্থিত! আমি মোহিনীকে দেখেই আহ্লাদে তাকে জোড়িয়ে ধোরে বিছানায় এনে বসালেম। মোহিনীর সিঁথাব সিঁদুর দেখে আনন্দিত হোলেম। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “মোহিনি! কোথায় বিয়ে হলো?

বর কেমন?—গয়না কি কি দিয়েছে?" মোহিনী চোটপাট উত্তর কোল্লে, "দিব্যি বর,—অনেক গয়না দিয়েছে,—এই বাড়ীরই বর। নূতন সম্পর্কে সই এখন যে আমার ঠাকুরঝি!" মোহিনী এই কথা বোলে হেসে গোড়িয়ে পোড়্লো। সুশীলা ত অবাক! আমি মাথায় হাত দিলেম। সব কথা বুঝে নিলেম। বড়বৌয়ের কপাল ভেঙেছে বুঝ্লেম! বড় বাবু যা বোলেছিলেন, কাজেও ঠিক তাই কোরেছেন। বিবাহ মন্দ নয়। পশ্চিমের সঙ্গে দেশী ব্রাহ্মণের বিবাহ সম্বন্ধ এই নূতন দেখ্লেম।

তখনি তখনি বাড়ীর ভিতর একটা গোল উঠ্লো। সকলে তাড়াতাড়ি মোহিনীকে দেখ্তে এলেন। বড়বৌ দরজা এঁটে কাঁদ্তে বোস্লেন। গিন্নী এসে বোল্লেন, "তা কোরেছে কোরেছে, তাতে আর দোষ কি? দুটো বিয়ে আর কি কেউ করে না? বেশ বৌ! আমার কুন্দুরের এমনি একটী বৌ হলেই আমার মনের সাধ মিটে যায়!" গিন্নীর এই রকম ভাব দেখে আর কেউ কোন কথা বল্তে সাহস কোল্লেন না।

বড়বাবু এলেন। গিন্নীর কাছে হাসতে হাস্তে বোল্লেন, "মা! আমি আবার বিয়ে কোরেছি।" গিন্নী আশীর্ব্বাদ কোরে বোল্লেন, "তা বেশ কোরেছ। এখন মতিগতি ফিরে যাক, বৌ নিয়ে ঘর কর। টাকাগুলো বাইরে উড়িয়ে পুড়িয়ে না দিয়ে ঘরে লক্ষ্মী এনেছ, তা বেশ কোরেছ।"

মোহিনীর জন্য পৃথক ঘর বন্দোবস্ত হলো। তখনি তখনি ঘর-সাজানো হলো। দেমাকে মোহিনীর আর মাটীতে পা পড়ে না। বাবু এখন সেই ঘরেই রইলেন।

বড়বৌ আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেছেন। একদিনেই তাঁর চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে, চিন্তে পারা যায় না। সেদিকে বড় একটা কারো দৃষ্টি নাই। নূতন বৌকে নিয়েই সকলে বিব্রত!

রাত যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা টেরও পেলেম না। অনেক রাত পর্য্যন্ত বাড়ীতে একটা সমারোহ হলো, সেই সমারোহে পোড়ে অনেক রাত জেগেছিলেম, তাই রাতের খবর কিছুই জান্তে পারি নাই। সকালে উঠেই বড়বৌয়ের ঘরে গেলেম। আমার কেমন স্বভাব, সুখীর সুখ দেখা অপেক্ষা দুখীর দুঃখ দেখ্তে—তার দুঃখে যোগ দিতে—প্রাণ খুলে আপন দুঃখের

কথা জানাতে বড় ভাল লাগে। তাই সুখী নূতন বৌয়ের কাছে না গিয়ে দুঃখী বড়বৌয়ের কাছে গেলেম। দেখ্‌লেম, ঘরে কেউ নাই! মনে ভাব্‌লেম, হয় ত কোথায় গেছেন, এখনি আস্‌বেন। এই ভেবে বোসে রইলেম। ক্রমে বেলা হলো, তখনো খোঁজ নাই; দশটা বাজে, তখনো না। মনে বড় সন্দেহ হলো! সমস্ত বাড়ী খুঁজে এলেম, কোথাও নাই। তখন গিন্নীকে সংবাদ দিলেম। তৎক্ষণাৎ চারিদিকে অনুসন্ধান হলো, কোথাও পাওয়া গেল না। তবে বড়বৌ গেলেন কোথা? অভাগিনী তবে এখন কোথায়? স্ত্রীলোকের যত কষ্ট আছে, সপত্নীকষ্টতার মধ্যে প্রধান। সেই সপত্নী-কণ্টকের আঘাত সহ্য কোত্তে হবে বোলে বড়বৌ ত কোন দুর্ঘটনা ঘটান নাই? প্রাণপণে অনুসন্ধান কোল্লেম, বড়বৌ বাড়ীতে নাই। বড়বাবু একটু বিরক্ত হয়ে বোল্লেন, "অত খোঁজার দরকার কি? যেখানে গেছে থাক। ইচ্ছা হয় আস্‌বে, না আসে না আস্‌বে। তোমাদের তাতে মাথা-ব্যথা কেন?" বাবুর ধম্‌কে সবাই নিরস্ত হোলেন। হতভাগিনীর আর কোন অনুসন্ধানই হলো না।

মনে বড় কষ্ট হলো। হায়! আজ কর্ত্তা থাক্‌লে কি এ কাণ্ড হতো? তা হোলে কি বড়বৌ এমন নিরুদ্দেশে থাক্‌তেন? বড়বৌয়ের ঘরে এসে আপন মনে খানিকক্ষণ কাঁদ্‌লেম। কেন জানি না, বড়বৌয়ের শূন্যঘরের দিকে চেয়ে মনের ভিতর যেন ফাঁক হয়ে গেল, আপনা হোতে চোক ফেটে জল বেরুলো। আপন মনেই খানিকক্ষণ কাঁদ্‌লেম।

কাঁদ্‌চি,—আর ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ছি। চাইতে চাইতে অন্যমনস্কভাবে চাইতে চাইতে—দেয়ালের দিকে নজর পোড়্‌লো। সম্মুখ দেয়ালে খড়ী দিয়ে বড় বড় কোরে লেখা আছে:—

"যাতনায় প্রাণ, হয়েছে পাষাণ, থাকো প্রাণ প্রাণ নিয়ে।
সঁপিনু তোমারে, সপত্নীর করে, পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে॥"

লেখা দেখেই চিন্‌লেম, বড়বৌয়ের লেখা। বড়বৌ যে কি দুঃখেই এ বাড়ী ত্যাগ কোরেছেন, তা এই লেখাতেই জান্‌তে পাল্লেম। হায়! হায়! বড়বৌ আজ কোথায়? তাঁরই সংসার,—তিনিই মূলাধার,—তিনিই বাড়ীর এখন গিন্নী, সেই বড়বৌ আজ কোথায়? বড়বাবু! ধন্য তোমার কঠিন প্রাণ!—পাষাণ হোতেও পাষাণ!

মোহিনীর এখন একাধিপত্য! বড়বাবুকে এখন কাণে ধোরে বসাচ্চে, কাণে ধোরে উঠাচ্চে। মোহিনীর প্রেম-কুলপাতার লোভে বাবু দিবারাত্রি প্যাঁ প্যাঁ কোরে বেড়ান। বাবুর কোমরে শিক্‌লি বেঁধে মোহিনী বেশ নাচাচ্চে! বাবু এখন মোহিনী-মন্ত্রে মোহিনীর উপাসক। মোহিনী ত মোহিনী। কত মায়াই যে জানে, কত রকম পেঁচপরণের কথাই যে কয়, তার মধ্যে ভারী ভারী উকিলীবুদ্ধিও প্রবেশ কোত্তে পারে না। বাবুর আর আত্মজ্ঞান নাই। তিনি মোহিনীর চোকে দেখেন, মোহিনীর মুখে খান, মোহিনীর কাণে শুনেন। বাবুতে আর বাবু নাই। বাবু এখন মোহিনীময়! শয়নে—স্বপনে বাবু এখন মোহিনীর চরণ ধ্যান কোচ্চেন।

মোহিনীর প্রতাপে বাড়ীশুদ্ধ লোক কম্পিত! মোহিনীর অহঙ্কার কত? আগে তাকে যতটা ভাল বোলে ভেবেছিলেম, এখন আর সে ভাব-টুকু দেখ্‌তে পাই না। মোহিনী আমাদের সঙ্গে বড় একটা কথা কয় না, বড় মিশে না। দিন-রাত কেবল শরীরের যত্ন, বেশভূষা আর পড়াশুনা নিয়েই থাকে। বাবু চব্বিশ ঘণ্টা শুয়ে শুয়ে কেবল মোহিনীর প্রেম-সাগরে পোড়ে হাবুডুবু খান।

একদিন কথা উঠ্‌লো, বাজারসরকার বড় বদ্‌লোক। মোহিনী যে জিনিস আন্‌তে ফরমাস্ করে, সে সেই জিনিসই দেরীতে আনে। আম্‌লা নাই, চুলে চার আঙুল পুরু ময়লা ধোরেছে, সেই দিন—তখনি আন্‌তে বলা হয়েছে, তবু বাজারসরকার আনে নাই। এমন লোক রাখ্‌তে মোহিনী সম্মত নয়। সে বড়বাবুকে বোল্লে, "দেখেছ, তোমার বাজার-সরকার বড় বেয়াদব। কোন কথা আমলেই আনে না। অন্যলোক নিযুক্ত কর, না পাও, আগে এলাহাবাদে আমার যে বাজারসরকার ছিল, তাকেই আনাই। দেখ্‌বে কেমন লোক! কেমন তরিবৎ!" বাবু বোল্লেন, "আমিও অনেকদিন ওকে তাড়াবো তাড়াবো মনে কোচ্চি। তা বেশ, তুমি পত্র লিখে তাকেই আনাও। পত্র যেতে যদি বিলম্ব হয়, না হয় একটা লোকই পাঠিয়ে দাও।" মোহিনী সম্মত হয়ে পত্র লিখ্‌লে। বাজারসরকার আন্‌তে এলাহাবাদে তখনি একজন লোক ছুট্‌লো।

লোক এলো। বাবু সঙ্গে কোরে বাড়ীর ভিতর এনে সেই নূতন বাজারসরকার বাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় কোরিয়ে দিলেন। বাজার-সরকারটী বাবু!—মস্ত বাবু! আমাদের বড়বাবুর চেয়েও বাবু! মাথায়

লম্বা চৌড়া সিঁথি কাটা, বড় বড় চওড়া চওড়া সাড়ী পরণে,—ভাল ভাল পাকা ছিটের জামা গায়,—চকচকে জুতা পায়, ট্যাঁকে আবার একটা টাঁক-ঘড়ী! এমন বাবু আমাদের বাজার-সরকার।

বাজার সরকারের নাম হরিমোহন মুখুজ্জে। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের মধ্যে। দাড়ী-গোঁপের খুব ঘন পত্তন আছে। চেহারাটী বেশ মানানসই। সরকার বাবু কথাবার্ত্তাতেও বেশ। আমাদের বড়বাবু তাঁকে সরকারবাবু বোলে ডাক্‌চেন দেখে, অগত্যা আমরাও তাঁকে সরকারবাবু বোলে ডাক্‌তে সুরু কোল্লেম।

সরকারবাবু আছেন। এক দুই কোরে প্রায় তিন মাস আছেন। তাঁর প্রশংসায় বাড়ী পুরে গেছে।—বিশেষ নূতন বৌয়ের মুখের কাছে। মোহিনী মাঝে মাঝে গর্ব্ব কোরে বলে, "আমি যেই বড় পাকা মেয়ে, তাই এমন লোকটীকে এত কম মাইনেতে কৌশল কোরে রেখেছি। তা না হোলে অমনতর একটী লোক একশ টাকা না দিলে যাওয়া যায় না।" আমরাও দেখি, সরকারবাবু বেশ চালাকচতুর। তিনমাস পরেই নূতন বৌয়ের সুপারিসের জোরে সরকারবাবুর বেতন বৃদ্ধি।

সরকারবাবুর সঙ্গে মোহিনীর বড় ভালবাসা আছে। কাজের অবসর পেলেই সরকারবাবু মোহিনীর ঘরে বোসে থাকেন। বাবু থাক্‌লেও থাকেন, না থাক্‌লেও থাকেন। হাস্য-পরিহাস করেন,—গল্প-গুজোব করেন, শুয়ে বোসে থাকেন। বাড়ীতে রাষ্ট্র,—ছেলে বেলা থেকে সরকারবাবু মোহিনীর বাড়ীতে ছিলেন, তাতেই তত লজ্জাসরম নাই, ঢাকাঢাকি নাই। আমার কিন্তু মনে সন্দেহ। হলোই বা ছেলেবেলার আলাপী, হলোই বা ছেলেবেলার ভালবাসা, তাই বোলে এখন বয়সকালে—একঘরে দুজনে থাকা ভাল দেখায় কি? বয়সকালে আপন বাপভেয়ের সঙ্গেও একা থাক্‌তে নাই, এ ত পরপুরুষ! কোন সুবাদসম্পর্ক নাই।

সরকারবাবুর উপর মোহিনীর বেশী বেশী টান দেখে,—দিন দিন মাইনে বৃদ্ধি দেখে আমার সন্দেহটা আরও যেন বেড়ে গেল। কাকেও কিছু না বোলে গোপনে সন্ধান নিতে লাগ্‌লেম।

সরকারবাবু এই সংসারে এক বৎসরমাত্র এসেছেন। এর মধ্যেই তাঁর তিনবার পদবৃদ্ধি হয়েছে। এখন আর তিনি বাজার-সরকার নন, সদরের প্রধান মুহুরী। বুড়ো সরকার পঁচিশ বৎসরকাল সেই এক

দানাপানী খেয়ে কাটালে, আর এই নূতন সরকারবাবু এক বৎসরের মধ্যে প্রধান মুহুরী হোলেন। বেতন ১২৲ টাকা থেকে এক বৎসরেই একেবারে পঞ্চাশ! এতে আর সন্দেহ না হবে কেন?

আরও তিন মাস গেল। কোন সন্ধান পেলেম না। অনুসন্ধানে আছি,—চেষ্টায় আছি,—গোপনে গোপনে—তলে তলে খবর নিচ্চি, তবুও কোন ফল হোচ্চে না।

বাবু একদিন বাড়ীতে নাই, মফঃস্বলে গেছেন। বেলা প্রায় ১২টা। বৈশাখ মাস, ঘরে থাক্‌তেও কষ্ট হোচ্চে। জল খেয়ে খেয়ে পেট ঢাক কোরে ফেলেছি, তবুও তৃষ্ণা নিবারণ হোচ্চে না। গরমে ঘর যেন ভাপ্‌সে উঠেছে। বাতাস নাই,—তাতে আরও প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি কোচ্চে। ঘরের দরজাটী পর্য্যন্ত খুলিবার যো নাই। আমি একা আপন ঘরে শুয়ে কত রকমই ভাব্‌ছি। ভাব্‌তে ভাব্‌তে মোহিনীর কথা মনে এলো! মনে ভাব্‌লেম, এই সময় একবার দেখে আসি। যেমন মনে হলো, অম্‌নি উঠ্‌লেম। এ রোদে ঘরের বা'র হওয়া সহজ নয়, কিন্তু কেমন যে ঝোঁক চেপে গেল, তত রোদেও দৃক্‌পাত কোল্লেম না।—বেরুলেম।

ধীরে ধীরে—পা টিপে টিপে মোহিনীর ঘরের কাছে গেলেম। দরজা বন্ধ, জানালাও বন্ধ। ঘরটী দুবার তিনবার প্রদক্ষিণ কোল্লেম, কোন দিকে একটু ফাঁক পেলেম না। মোহিনীর যে দিকে খাট, সেই খাটের নিকটেই বড় জানালা। সেই জানালায় গিয়ে কাণ পেতে রইলেম। অনেকক্ষণ রইলেম, কথা শুন্‌তে পেলেম না। ঘরে কিন্তু মানুষ আছে। খাটের উপরে এপাশ ওপাশ কোল্লে যে একটু শব্দ হয়, সেই শব্দ লক্ষ্য কোরেই বুঝ্‌লেম, ঘরে মানুষ আছে। কিন্তু একজন না দুজন? একা মোহিনী,—না মোহিনী আর সরকারবাবু?

অনেকক্ষণ পরে ফিস্‌ফিস্ কোরে কথার আওয়াজ কাণে গেল। বেশ বুঝ্‌লেম, ঘরে দুজন। মনে বড় কৌতূহল হলো। চারিদিক চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর একটী জানালায় একটী সামান্য টাকা প্রমাণ গোলাকার ছিদ্র দেখ্‌তে পেলেম। উৎসাহে উৎসাহে সেই ফাঁকে একটী চোক দিয়ে দেখ্‌লেম। প্রথমটা দেখ্‌লেম, ঘোর অন্ধকার! বেশীক্ষণ রোদের দিকে চেয়ে, তার পর ঘরে এলে ঘরটা যেন আঁধার বোলে বোধ

হয়। এ ঘর তাতে আবার বদ্ধ। কাজেই প্রথমটা কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। অনেকক্ষণ পরে বেশ দেখ্‌তে পেলেম। যা দেখ্‌লেম, তাতেই আমি অবাক! যা সন্দেহ কোরেছিলেম,—যা মনে ভেবেছিলেম, ঠিক তাই। মোহিনী আর সরকারবাবু এক বিছানায় শুয়ে—মুখামুখি হয়ে ফিস্‌ফিস্‌ কোরে কথাবার্ত্তা কইচে!—সর্ব্বনাশ!

আমি ঘরে ফিরে এলেম। কাকেও কিছু বোল্লেম না, কারও কাছে ভাঙ্‌লেম না, আপন মনেই এ কথা চেপে রাখ্‌লেম। বড়বাবু এখন মোহিনী-গত প্রাণ! মোহিনীর নাম এখন তাঁর জপমালা, আবার সরকারবাবু মোহিনীর জপমালা। তাই সরকারবাবু এমনতর বাবু! বড়বাবুর উপর টেক্কা দিয়ে সরকারবাবু তাঁর যেমন গাল তেমনি চড় মেরেছে।

এ সব কাণ্ড কি? যতই দেখ্‌ছি, ততই যেন আশ্চর্য্য জ্ঞান হোচ্চে। এ সব ব্যাপার কি? একজনকেও কি ভাল হোতে নাই?—একজনও সতী নামে পরিচিত হোলে কি দোষ আছে? মোহিনীর আবার এ কি চরিত্র?

গোপনে গোপনে মোহিনীসংক্রান্ত কথা অনেক শুনেছি। শুনে শুনে কেবল মনের সঙ্গে গেঁথে রেখেছি। কাকেও দেখাই নাই,—কাকেও বলি নাই,—কারো কাছে প্রকাশও করি নাই।

মোহিনী যেমন যেমন আত্মপরিচয় দিয়েছে, সে সবই প্রবঞ্চনা। ঐটুকু মেয়ে, কিন্তু ফিকিবফন্দিতে—বদমায়েসীতে একজন পাকাপোক্ত গুরুঠাকুরুণ! সদ্বংশে যাদের জন্ম মা বাপ যাদের সৎ, তাদের সন্তান প্রায়ই খারাপ হয় না। তবে এ বাড়ী যে কেন এমন,—তাও আবার ভেবে পাই না। মোহিনীর পরিচয়ে শুনেছি, মোহিনীর পিতা ব্রাহ্মণ। তাঁর নিবাস বঙ্গদেশের কোন গ্রামে। পূর্ব্বে মোহিনীর পিতা একরকম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ, তখনি সেই গ্রামের এক কায়স্থকুলবধূকে বাহির কোরে পশ্চিমদেশে পালিয়ে আসেন। বরাবর এলাহাবাদেই আসেন, সেইখানেই থাকেন। লেখাপড়া জানা ছিল, চাকরীর জন্যে বড় ভাব্‌তে হলো না। এলাহাবাদে দুজনে বেশ সুখেই ছিলেন। সেই সংসর্গে মোহিনীর জন্ম। মোহিনী যখন তিন বছরের, মোহিনীর কায়স্থমাতা তখন ইহ-সংসার ত্যাগ করেন। মোহিনীর পিতা এতদিন এলাহাবাদেই ছিলেন। তাঁর সংকল্প ছিল, যে কোন উপায়ে

কন্যার দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ কোরে শেষের দিন ক'টা কাটাবেন। এখন এই মৎলবে বড় বড় জায়গায় এমনি কোরে টোপ ফেলে বেলে বেড়াতেন। মেয়েকে ভাল বেশভূষায় ভূষিত কোরে—বড় বড় টাকা-ওয়ালা বুড়ো-বাপের লায়েক ছেলেদের মন চুরি কোত্তে পাঠাতেন। এমন অনেকবার হয়ে গেছে। তার পর এই বড়বাবুর নজরে পোড়ে মোহিনীর পিতার সকল বাসনা সিদ্ধ হয়েছে। মোহিনী এর মধ্যেই পিতাকে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কাশী পাঠিয়েছে। মোহিনীর জন্মকোষ্ঠী এই!

শুনেছি সব কিন্তু প্রকাশ করি নাই। জাত যাহার ত সম্ভাবনা নাই। মোহিনী ত আর রাঁধ্‌তে যাবে না? তার হাতে ত আর খেতে হবে না? তবে আর ভয় কি? এ ভয় অপ্রকাশ রাখার উদ্দেশ্য নয়; কেবল কতদূর গড়ায় সেইটে দেখ্‌বার জন্যেই এ সব কথা গোপন রেখেছি।

বাবু এলেন। এক সপ্তাহের পর বড়বাবু বাড়ী এলেন। মোহিনীর যত্ন দেখে কে? এত দাসদাসী,—চাকর-চাকরাণী, মোহিনী তবু নিজেই বাবুর পা ধুইয়ে দিলে, নিজেই পাখা ধোরে বাতাস কোল্লে, নিজ হাতে তামাক পর্য্যন্ত সাজ্‌লে। বাবু গোলে একবার 'দ্রব' হয়ে গেলেন। বোল্লেন, "আঃ—থাক্ না!" মোহিনী কতই ভালবাসা জানিয়ে বোল্লে, "সে কি!—আমার কষ্ট! তোমার জন্য যদি আমায় প্রাণ দিতে হয়, সেও ত আমার সৌভাগ্য।" বাবু তখন কেদারায় বোসে তামাক খাচ্চেন। লজ্জা নাই, কাকেও ভ্রুক্ষেপ নাই, মোহিনীকে অত লোকের মাঝে আপন কোলে বোসিয়ে—হেসে হেসে প্রেমে গদগদ হয়ে বোল্লেন, "তোমার মুখ দেখে—মাইরী মোহিনি, তোমার মুখ দেখেই আমার সমস্ত কষ্ট জল হয়ে গেছে। এই রকম না হোলে কি আর আয়েস আছে। সেটা গেছে—আপদ চুকে গেছে। না জান্‌তো দুটো কথা,—না জান্‌তো আদর,—না জান্‌তো খাতির-যত্ন। কেবল দিনরাত প্যান প্যান কোরেই কাটাতো। এমন না হোলে কি সংসারে মন বসে?—ভালবাসা হয়?" বাবু সদম্ভে গর্ব্বিত হয়েই যেন এই কথা ক'টী বোল্লেন। কথা শেষ হোলে ঘন ঘন আলবোলা টান্‌তে লাগ্‌লেন। ঘন ঘন টানে তামাকের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

আমি বুঝ্‌লেম, মোহিনী কি মায়াবিনী! বড়বাবুকে মোহিনী যেন

পোষা মেষ বানিয়েছে! বড়বাবুর আর নড়ন চড়ন নাই। মোহিনীর মোহিনীমায়াকে শত সহস্র ধন্যবাদ!

একদিন বড়বাবু আর মোহিনী দুজনে কথাবার্ত্তা হোচ্চে, আমি সেই ঘরের পাশ দিয়ে সুশীলার ঘরে যাচ্চি। বড় বড় থোক থোক টাকার কথা কাণে গেল;—ফিরে এলেম। এমন থোক থোক টাকার মরসুমে বাজার-দরটা জানা বড় আবশ্যক বিবেচনা কোল্লেম। ফিরে এসে আবার আড়ি পেতে রইলেম। আড়িপাতা এক রকম আমার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে পাপ হয় হোক্, নিন্দা হয় হোক্, আমি কিন্তু আড়ি পেতে শুনতে ছাড়ি না। আগে কত কথাই হয়ে গেছে। আমি যখন শুনলেম, তখন মোহিনীর কথা। বড়বাবু তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে তামাক টানচেন, মোহিনী বাবুর কোলে মাথা রেখে দুই হাতে গলাটী জোড়িয়ে আব্দারের সুরে বোলছে, "আমার বড় ভয় করে। বিধাতা কখন যে কি করেন, তা ত বলা যায় না। ঈশ্বর না করুন, যদি তোমার ভাল মন্দই হয়, তা হোলে আর আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। হয় ত অভিমানে আমি মোরেই যাব। তোমার সাধের স্ত্রী হয়ে—পাঁচজনের পাঁচকথা শুনে ঝাঁটানাথি খেয়ে যে পোড়া পেটে দুমুটো ভাত দিব, তা কখনই পারবো না। যে রায়বাঘিনী,—এক-দিনেই আমাকে দূর কোরে দিবে। তোমার যে গুণধর ভাই, দেখলে এখনো আমার বুক শুকিয়ে যায়। সে ত একদিনও আমাকে তিষ্ঠুতে দিবে না। ছোঁড়া আমার উপর ভারী চটা। বলে কি 'দাদা রোজ রোজ বে কোরে রাঙা টুকটুকে বৌ আনচে, আর আমার বেলা যেন বজ্রাঘাত হয়। সব একদিনে সায়েস্তা কোরবো!' সে ত এম্‌নি কোরে শাসিয়ে রেখেছে। তাতেই আমার বড় ভয়!—বল, আমার একটা উপায় কোরবে? আমাকে কাঁদাবে না,—আমাকে ভাসাবে না? বল, সত্য কোরে বল?"

বড়বাবু আলবোলার নল ছুড়ে ফেলে দিয়ে মোহিনীকে তুলে আদর কোরে বোল্লেন, "বল কি মোহিনি! তোমাকে তাড়িয়ে দিবে? আমি থাকি না থাকি, চিরকাল বাড়ীর সকলেই তোমার গোলাম হয়ে থাকবে,—বাঁদী হোয়ে থাকবে। আমি সে পথ কি না কোরে যাব?"

"কবে কোরবে? ভালমন্দ একটা ঘোট্‌তে কতক্ষণ?" বাবুর কথায় মোহিনীর এই উত্তর। বাবু একটু ভেবে বোল্লেন, "আজই হবে। ও

কি মোহিনী? তোমার চেখে জল? কেন?—ভয় কি তোমার? চুপ কর। আমি এখনি উকীলবাড়ী যাচ্চি। আজই কাজ নিকেশ কোরে আসছি। তোমার চোখে জল!” বাবুর আর ধৈর্য্য রইল না। তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে বেরুলেন। আমি অমনি সামনে পোড়ে গেছি। বাবু আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন, “হরিদাসি! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?” আমি থতমত খেয়ে বোল্লেম, “না দাদাবাবু! আমি সুশীলার ঘরে যাচ্চি।” বড়বাবু “যাও” বোলে চোলে গেলেন।

আবার সরকারবাবু সাম্‌নে। কাণ্ডটা পড়্‌তামত বেশ চোলেছে। সরকারবাবু মোহিনীর ঘরে ঢুক্‌লেন, আমি আবার সেই জানালায়।

সরকারবাবু ঢুক্‌তেই মোহিনী হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, “অকাট্য চোট! ঠিক্‌ ঝেড়েচি! চমৎকার কৌশল! সরকারবাবুর বেশ বুদ্ধি!” মোহিনী হেসে গোড়িয়ে পোড়্‌লো। সরকারবাবু মোহিনীর হাসির ধমকে যেন ম্লান হয়ে পোড়্‌লেন। চোক দুটীতে ভাল কোরে চেয়ে বোল্লেন, “সে কি কি বিবিসাহেব! কথাটা স্পষ্ট কোরেই না হয় বোলে ফেলুন! আর এত দখ্খানী কেন” মোহিনী সরকারবাবুর কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অথচ বড় বড় কোরে বোল্লে, “আজ মাসের সংক্রান্তি। বোকারাম! এটাও বুঝ্‌তে পার না?” সরকারবাবু আরও অপ্রতিভ হোলেন। হেসে হেসে বোসে গোড়িয়ে গোড়িয়ে মোহিনী রসের তরঙ্গে সাঁতার দিলে। শেষ একটু পরে বোল্লে, “সমস্ত ঠিক। বাবু উকীলবাড়ী গেছেন, আজই লেখা-পড়া শেষ হবে। যদি পার ত সন্ধ্যার পর আড়াল থেকে শুনে নিও। চমৎকার কৌশল বেরিয়েছে!—এক কথায় কাজ শেষ!”

ক্রমেই নূতন নূতন রহস্য প্রকাশ হোচ্চে! মোহিনী এতক্ষণ বড়-বাবুর কাছে যা বোল্লে, তা শুনে তখন অনেকটা বিশ্বাস হয়েছিল। এখন দেখ্‌লেম, মোহিনীর সে সব কথা আন্তেরিক নয়, কেবল হাঁসিল কর্‌বার মায়াফাঁদ! না জানি, আরও কত ভয়ানক কথা শুন্‌তে পাব ভেবে অপেক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম, কিন্তু ফল হলো না। সরকারবাবু সে দিন সকাল সকাল বেরিয়ে গেলেন, আমি সুশীলার ঘরে এলেম।

আছি সুশীলার ঘরে, এসেছি সুশীলার ঘরে, কিন্তু আমার মন পোড়ে আছে, মোহিনীর সেই জানালায়। বাবু একটার সময় বেরিয়ে গেছেন, প্রতিজ্ঞা কোরে গেছেন, আজই উইল কোরে আস্‌বেন। এখন একবার

উইলখানি দেখ্‌তে মন বড় ব্যাকুল হলো। কখন সন্ধ্যা হয়, তারই অপেক্ষায় রইলেম।

সন্ধ্যা হলো। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালা হলো। আমি নিজের ঘরে এসে প্রদীপ জ্বেলে কখন বড়বাবু আসেন, তারই প্রতীক্ষা কোরে রইলেম। রাত্রি প্রায় আট্‌টার সময় বড়বাবু ঘরে এলেন। আমিও সেই জানালায় উঁকি মেরে দেখি, পশ্চিমের জানালায় সরকারবাবু। এও এক আজব তামাসা! অদ্ভুত ধাঁধাঁ।

বড়বাবু ঠাণ্ডা হোলেন, জল খেলেন, তামাক খেতে লাগ্‌লেন, এমন সময় বাতাস দিতে দিতে মোহিনী বড়বাবুর দিকে চেয়ে—নির্ঘাম মুখের ঘাম সযত্নে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হলো?" বড়বাবু হেসে বোল্লেন, "যা হবার, তাই হলো। আমি যখন স্বয়ং গেছি,—তখন আর কি না হয়ে থাক্‌তে পারে? লেখাপড়া হয়েছে, রেজেষ্টরী হয়েছে, সাতদিন না হোলে দলিল ফেরত দিবার হুকুম নাই, তবুও টাকার জোরে সত্ত সত্ত দলিল ফেরত এনেছি, সমস্ত ঠিক, এই লও।" এই বোলে বড় একখানা কাগজপোরা খাম বড়বাবু মোহিনীর সাম্‌নে ফেলে দিলেন। মোহিনী বোল্লে, "তা আমি ও কি করবো? কোথায় হারিয়ে টারিয়ে যাবে, তুমি তোমার দলিলের বাক্সে বরং রেখে দাও।" বাবু বোল্লেন, "তাতেই বরং হারিয়ে যাবে। অনেক দলিল, তার মধ্যেই হারাতে পারে। তোমার নিজের লোহার সিন্দুকে রেখে দাও।" মোহিনী আর দ্বিরুক্তি কোল্লে না;—বোল্লে, "উইলে কি লেখা আছে?" ববু নল ত্যাগ কোরে খামের ভিতর থেকে উইলখানা টেনে বার কোরে প্রদীপের আলোতে ধোরে বোল্লেন, "পাঠপত্র আর শুনে কি হবে, মূল উইলের বর্ণনাটা শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে। এই শোন;—

"যেহেতু আমি শ্রীযজ্ঞেশ্বর তেওয়ারি পিতার নাম ৺বিশ্বেশ্বর তেওয়ারি মোকাম মথুরা, পেসা মহাজনী তেজারতি ও কারবার ও গয়রহ। কস্য উইলসূত্রে স্বীকারনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে এতদ্দারা আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমার পৈতৃক ভোগদখলী নিম্ন তফশীলের লিখিত বিষয় আয়ের আমি শ্রীযজ্ঞেশ্বর তেওয়ারি ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ রুদ্রেশ্বর তেওয়ারি একমতি দখীলকার আছি। শ্রীমান ভায়াজীবন্রের নাবালগহেতু আমি স্বয়ং তাহার অংশের অলি অছি আছি। আমি এতদ্দারা স্বীকার

করিতেছি যে, আমার অবর্ত্তমানে আমার সম্পত্তি ও ২ নং পৃথক তফশীলস্থিত তাবৎ বিষয় এবং পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ও জ্যেষ্ঠোত্তরের ১ চিহ্নিত সম্পত্তি আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী সতীধর্ম্মপরায়ণা শ্রীমতী মোহিনীসুন্দরী দেবীর উপর বিনা ওজর আপত্তিতে অর্শাইবে। যদি কথনো আমার সন্তান-সন্ততি জন্মে, তাহা হইলেও ঐ সম্পত্তিতে আমার এই উইলের বলে শ্রীমতীর বিনা অনুমতিতে তাহাদের কোন দাবী দাওয়া রহিবে না বা থাকিবে না। আমি স্বেচ্ছায় সুসম্মতি ও সুস্থশরীরে এই উইলপত্র লিখিয়া দিতেছি। আমার অবর্ত্তমানে আমার পত্নী মহাশয়া স্বধর্ম্মে থাকিয়া সমস্ত বিষয়ে আমরণ কাল ভোগদখল করিবেন। আর স্বধর্ম্মত্যাগিনী বা আমার ভদ্রাসনে না রহিলেও এই উইলের লিখিত বিষয়ে তিনি বঞ্চিতা হইবেন না। আমার এই উইলের লিখিত বিষয় সম্পত্তিতে উক্তা শ্রীমতী দখলের মোজেহাম ও আপত্য হইলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। আমার ওয়ারীসানগণ এই উইলের প্রতিকুলে কোন ওজর আপত্য উত্থাপন করিলে তাহা এককালে বাতিল ও নামঞ্জুর নইবেক। আমার স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তিতে উক্ত শ্রীমতীই একমাত্র বাজেহাম উত্তরাধিকারিণী হইয়া ভোগদখল করিতে রহিবেন।' দস্তবদস্ত বেবাক রোবাকে ও হাজাসুখায় তাহার তত্তৎ বিষয়ের সত্বাধিকারীত্বের বিঘ্ন ঘটিবে না। এতদর্থে আমি শ্রীব্রজেশ্বর তেওয়ারী সুস্থশরীরে সাক্ষীগণ শ্রীনটবর ঘোষ ও শ্রীহরেরাম মিশ্রি ও শ্রীবিশম্ভর চৌবে ও শ্রীফকির মহাম্মদ খাঁ ও শ্রীদিগম্বর শাস্ত্রী প্রভৃতি সাক্ষী মজকুরের হামেলী মতে আমার পক্ষীয় উকীল শ্রীরাজচন্দ্র তলাপাত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু বদরীদাস লাহা বাবুজীয়ায়েন সম্মুখে এই উইল দস্তখৎ করিলাম, ইতি—

জায়—		তপশীল নং ২	
নিজ মোকামের		বিলাতী আম,	
রোকড় ক্যাশ		দানী কারবার	
মূলধন বাদ ব্যাজ		বিঃ জর্জ্জ জর্ডম	
ও নাভানী	কোং ১৯৭৮৫০৷৷৵১০	কোং মূলধন	২২৭৫০৲
কোম্পানির কাগজ		স্বনামে রোকা	
১ হইতে ২২ কেতার		ড়ের কারবার	
কাত সুদ ৪৷০ টাকা		মোঃ সহর	
হিসাকে সঠিক আয়	১৪৯৯২৷৷৹	বেনারস	২১৭৫০৲

মোকাম বৃন্দাবন কদমতলার সুতা- গুদাম ও কাপড়ের কারবার মূলধনের অংশিদারগণের বাদ	গহনা সোণা রূপা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারবারের ল- ভ্যাংশ হইতে সোণারূপার মূল্য ৩৫০০৲
৮৪২০।/১০	৪৮০০০৲

মোঃ লক্ষ্ণৌয়ের তিসির
কারবার বনাম গঙ্গানন্দ
লালার অংশ বাদে ৩৪১২৲
নগদ গচ্ছিত কোং রোক ১৩১০০০৲

মোট ৩৫৯৬৭৫॥০

এই টাকার অর্দ্ধাংশ
মবলগে ১৭৯৮৩৭৸০ টাকা
ও জ্যেষ্ঠোত্তর কোং ১০০০৲ টাকা

মোট১৮০৮৩৭৸০ টাকা

মোট মুল অংশ ১৭৯৮৩৭৵০
জ্যেষ্ঠোত্তর ১০০০৲
স্বোপার্জ্জিত ৪৮০০০৲

মোট ২২৮৮৩৭৸০

পিতার তহবিলে মজুত
২২ লক্ষ টাকার অর্দ্ধাংশ ১১০০০০০৲ টাকা

মবলগে ১৩২৮৮৩৭৸০ মাত্র।

এই টাকায় মোহিনীসুন্দরী দেবী উত্তরাধিকারিণী হইলেন।"

বাবু এই পর্য্যন্ত পোড়ে বোল্লেন, "কেমন মোহিনি! হয়েছে ত?" মোহিনী আহ্লাদে ফুটিফাটা হোয়ে উইলখানি লোহার সিন্দুকে পুরে চাবী দিলেন।

অ ন্য কথা আরম্ভ হলো। আমরা প্রস্থান কোল্লেম। মোহিনীর এক-মাত্র কথায় আজ সকলের কপাল ভাঙ্‌লো।

একদিন সকালে মোহিনীর এলাহাবাদের ধর্ম্মমায়ের বাড়ী থেকে দু-জার

খাবার এলো। মোহিনী আহ্লাদ কোরে খাবারের ভার ঘরে তুল্লে। বাবু ঝনাৎ কোরে লোক দুজনকে পাঁচ পাঁচ টাকা বক্‌সিস দিলেন। লোক দুটী তখনি চোলে গেল। বাবু থাক্‌বার জন্যে অনেক জিদাজিদী কোল্লেন, তারা কিছুতেই থাক্‌লো না। যাবার সময় বোলে গেল, "দিদিমণি! ঐ ছোট তিজেলের খাবার তোমার আর বাবুর জন্যে তৈয়ার হয়েছে। ঐ আধসের কি তিনপো খাবার তৈয়ার কোত্তে দশটাকা খরচ পোড়েচে। গতরের মেহনৎ ত আছেই। বাবু খেয়ে কি বলেন, তার খবর পাঠিও।" এই বোলে লোক দুটী তখনি চোলে গেল।

বৈকালেই মোহিনীর বড় অসুখ হলো। পেট বেদনা ধোরে মোহিনী যায় আর কি! আমরা সকলেই মোহিনীর ঘরে গেলেম। মোহিনী বিছানায় পোড়ে কাটা পায়রার মত ছট্‌ফট্‌ কোচ্চে। নিশ্বাস ফেল্‌তে কষ্ট হোচ্চে,—দম্‌ বন্ধ হয়ে আস্‌ছে, চোক-দুটী লাল হয়ে গেছে, বড়বাবু ত ভেবেই সারা হয়ে গেছেন। ডাক্তার আন্‌তে সরকারবাবু গেছেন। দেরী হোচ্চে দেখে বড়বাবু ঘর আর বা'র কোচ্চেন। আমরা সশঙ্কিত হয়ে মোহিনীর সেবাশুশ্রূষা কোচ্চি।

ডাক্তার এলেন। বড়বাবু হাতে ধোরে অনেক বোল্লেন। টাকা যা লাগে নিয়ে এখনি রোগটা সেরে দিন, বড়বাবুর এইটীই যেন প্রাণের ইচ্ছা। কিন্তু তাও কি কখনো হয়? একটা রোগ এসে জুট্‌লে একদিনেই কি ছাড়্‌তে চায়? ডাক্তরবাবু বড়বাবুকে অভয় দিয়ে, কোন চিন্তা নাই, সামান্য পীড়া মাত্র, এই রকম পাঁচ কথায় বুঝিয়ে রোগ পরীক্ষা কোল্লেন। পাঁচ সাতটা যন্ত্র দিয়ে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করা হলো। রীতিমত দর্শনী নিয়ে ডাক্তারবাবু প্রস্থান কোল্লেন। সরকারবাবু ঔষধ আন্‌তে ডাক্তারবাবুর গাড়ীতেই রওনা হোলেন।

প্রায় দুঘণ্টার মধ্যেই ঔষধ এসে উপস্থিত। বড়বাবু শিশির গায়ের কাগজ পোড়ে তখনি ঔষধ খাওয়াতে আরম্ভ কোল্লেন। সন্ধ্যার সময় একটু উপশম হলো। বাবুর দেহে এতক্ষণে যেন প্রাণ এলো। আমরা এক্‌টু উপশম দেখে যে যার ঘরে উঠে গেলেম।

রাত যখন প্রায় ৯টা, তখন বড়বাবুর বড় বড় আওয়াজ কাণে গেল। বড়বাবু বড় বড় কোরে বোল্‌চেন, "এও কি কখনো হয়? তুমি খাবে না, এতবড় অসুখ তোমার, আমি কোন্‌ মুখে ঐ গুলো খাব? হোক্‌

না ভাল খাবার, তুমি কিছু না খেলে আমি ওর একবিন্দুও মুখে দিব না।”

সেই ভাল খাবারের কথা। তাড়াতাড়ি আমি আবার সেই জানালায়। আর একটা নূতন কথার সূত্রপাত দেখে আমি আবার সেই জানালার পাশে এলেম। মোহিনী কাঁদো কাঁদো হয়ে বোলচে, “আমার এমনি পোড়া কপাল, এম্‌নি হতভাগিনী আমি যে, একটা দিনের তরেও সুখ পেলেম না। আমার এই যন্ত্রণা, তোমার পায়ে পড়ি, আর আমায় যন্ত্রণা দিও না। খাও, একদিন থাক্‌লে সমস্তই ফেলে দিতে হবে। অর্দ্ধেক খাও, অর্দ্ধেক রাখ। আমি না হয় কাল খাব। এখনি না খেলেই কি নয়? অসুখ সারুক, তার পর খাব। তুমি এখনি খাও। আমার সাম্‌নে বোসে এখনি খাও। আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখ, যদি না খাও।” বাবু অগত্যা সেই খাবারের অর্দ্ধাংশ আগে আলাদা রেখে অর্দ্ধাংশ নিজে খেলেন, কত প্রশংসা কোল্লেন। মোহিনীর অনুরোধে খাবারের প্রশংসাপত্র যথাস্থানে তখনি পাঠান হলো। সেদিনকার ঘটনা এই পর্য্যন্ত।

দুদিন বেশ গেল। মোহিনী সেরে উঠেছে। তার আর কোন অসুখ নাই। খাবার খেয়েছে কি না, তা দেখি নাই। বাকী বাক্সে খাবার মোহিনী পরদিন সকলকেই ভাগ কোরে দিলে। সকলেই খেয়ে সুখ্যাতি কোল্লেন।

তৃতীয় দিনে বাবুর যেমন ভেদ, তেমনি বমি! আমরা ত আর নাই! একেবারে যেন আড়ষ্ট হয়ে পোড়েছি! চার দিকে একটা মস্ত গোল উঠেছে। ডাক্তার কবিরাজে বাড়ী পুরে গেছে, ঔষধ খাওয়ান হোচ্চে, কিন্তু সবই নিস্ফল! এত চিকিৎসা সব ভেসে যাচ্চে। বাবুর ভেদবমি আর বন্ধ হোচ্চে না। একদিন একরাত সমান তোড়ে ভেদবমি হলো। হতে পায়ে খাল্‌ ধোত্তে লাগ্‌লো, দৃষ্টিশক্তি লোপ হয়ে এলো, কথা জড়িয়ে এলো, চোকের কোণে কালি পোড়ে গেল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে নাভিশ্বাস! আমরা চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্‌লেম। মোহিনী কেঁদে জলে ঝাঁপ দিয়ে মোত্তে ছুঠোছুটি আরম্ভ কোল্লে, দশজনে তাকে ধোরে সান্ত্বনা কোত্তে লাগ্‌লো। গিন্নী আপ্সা আপ্সী কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। এতদিনে বড়বাবুর ভবের খেলা সাঙ্গ হলো!

বিধাতার মনে এতও ছিল! বিধাতারই বা দোষ কি? যে যেমন কাজ করে, বিধাতা তার উপযুক্ত শাস্তি বা পুরস্কার দিয়ে থাকেন। বড়বাবু যেমন

লোক, তার উপযুক্ত ফল হাতে হাতে পেলেন। যেমন গাল, তার উপযুক্ত চড় খেলেন। শেষে ধনে প্রাণে মারা গেলেন।

আহা! এ সময় বড়বৌ কোথায়? এতদিন অভাগিনী কি প্রাণে বেঁচে আছে? এক দিনের জন্য কেউ মুখের কথাটা জিজ্ঞাসা কোল্লে না, একদিনের জন্য সন্ধানটা নিলে না, মর্ম্মাহতা সেই বড়বৌয়ের শাপেই বড়বাবু বুঝি অকালে প্রাণ হারালেন। বাবুর পাপের—বাবুর নিষ্ঠুরতার প্রতিফল আজ হাতে হাতে হলো। বড়বাবু অচিরে ভোগ কল্লেন, যেমন গাল, তেমনি চড়!

ঊনবিংশ চক্র।

এও এক রাসলীলা।

আর সে কাল নাই। বিশ্বেশ্বর তেওয়ারির সেই অতুল বিষয়সম্পত্তি, অতুল মানসম্ভ্রম, অতুল খ্যাতিযশঃ,—সকলি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই গেছে। বাড়ীতে পুরুষমানুষের নামও নাই। কেবল মেয়ের মহল। বড়বাবুর মৃত্যু হোতে এখন ঘরে ঘরে রাসলীলা আরম্ভ হয়েছে। এই এক বৎসরের মধ্যে সব নূতন ভাব,—সব নূতন কাণ্ড,—সব যেন ভোজের বাজী হয়ে পোড়েছে। কারো ভয় নাই,—মাথার উপর মুরুব্বি নাই,—সকলেই আপন মনের মতে চোলেছে। এ সব আর কত সহ্য হয়? কতবার মনে কোরেছি, এ পাপ পুরী থেকে সোরে দাঁড়াই,—সংস্রব ত্যাগ করি, কিন্তু উপায় নাই, তাই কষ্টে সৃষ্টে কোন গতিকে আছি মাত্র। কারো কোন কথায় থাকি না,—কারো সঙ্গে মিশি না,—কারও ঘরে যাই না।—অবলম্বনের মধ্যে সুশীলা। সুশীলা আর আমি, দুজনে দুজনের অবলম্বন হয়ে—দুজনে দুজনের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে, দুজনে দিন রাত কেবল এদের কাণ্ডটা দেখি।—দেখে শুনে মনে মনেই রাখি; প্রকাশ করি না।

ছোটবাবু রুদ্রেশ্বর। তিনিও আর বড় বাড়ীতে আসেন না। কোথায় থাকেন, কি করেন,—কোথায় খান,—কোথায় শোন, তার খোঁজখবর কেই রাখে না। মাঝে মাঝে এসে, মার ধর কোরে কিছু কিছু টাকার যোগাড় কোরে আবার চোলে যান। বাড়ীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত।

মোহিনী একেবারে মাথার কাপড় ফেলেছে। আপন দর্পে—সগর্ব্বে সরকারবাবুকে নিয়ে বড়বাবুর ঘরে প্রেমসাগরে হাবুডুবু খাচ্চে। গান চোল্‌চে,—মদ মাংস চোল্‌চে—হাসির হর্‌রা উঠ্‌ছে, কাকেও ভ্রূক্ষেপ নাই। যাই হোক্, শাশুড়ী ত আছেন; মোহিনীর কাকেও ভ্রূক্ষেপ নাই,—কারো দিকে দৃক্‌পাত নাই। আহা! বড়বাবু, বড়বৌ এখন কোথায়? বড়-বাবুর সেই সাধের ঘরে আজ এ কি কাণ্ড হোচ্চে! মোহিনী, আজ এ কি ব্যাপার আরম্ভ কোরেছ! একবার ভেবে দেখ্‌লেও কান্না পায়!

শৈলবালা এই সেদিন বৃন্দাবন থেকে যে কাণ্ডটা কোরে এলো, স্পষ্ট চোকের সাম্‌নে একটা জীবহত্যা কোরে এলো, কত লোক হাসাহাসি, চোর ধরাধরি হলো, এতটা ঢলাঢলি হলো, সে সব যেন গ্রাহ্য নাই। বড়বাবুর মৃত্যুর পর ৩ তিনি মাস কেবল ঘরে ছিলেন। আজ প্রায় চার মাস হলো, ন-দিদি শৈলবালা কাশীবাসিনী হয়েছেন। মাসে মাসে এখান থেকে টাকা যাচ্চে। শুন্‌লেম, তিনি সেখানেও একা নাই। কোথা হোতে সেখানেও আবার কোন বিষণরাম, আবার কোন্ ভগ্নীপতি জুটেছে! তিনি খোলা প্রাণে কাশীধামে বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে আছেন।

সেজ-দিদি কিরণবালাও সামান্য ঢলাঢলি কোচ্চেন না। তিনি যখন ন-দিদির সঙ্গে—রামসরকারের সঙ্গে বৃন্দাবনবাসিনী হন, সেই সময় তাঁর গর্ভ হয়। তখন—বড়বাবুর মৃত্যুর সময়, কেউ জান্‌তে পারে নাই। তখন নূতন—দু-তিন মাস বই ত নয়, ততটা কেউ লক্ষ্য করে নাই। শেষে সব প্রকাশ হয়ে পড়ে। আজ তিন মাস হলো, সেজদিদির মেয়ে হয়েছে। রামসরকারের অপার কৃপায় সেজদিদি একটী কন্যারত্ন কোলে পেয়েছেন। সুখের সীমা নাই!"

জামাইবাবু তখন ছিলেন। সেজ-দিদি যখন বৃন্দাবন যান, জামাইবাবু তখন এখানে ছিলেন। পাড়ার লোকের মনে তবে কেন সন্দেহ হবে? কিন্তু আমরা ত গোড়ার খবর জানি;—বেশ জানি, জামাইবাবু এখানে

থাক্‌লেও সেজ-দিদির সঙ্গে তাঁর ভাশুর ভ্রাতৃবধূ সম্পর্ক! আমাদের তবে বিশ্বাস হবে কেন? আমরা সব জানি। ছেলেপুলে নিয়ে রামসরকার আছে ভাল,—সেজ দিদিও আছেন ভাল। যে কষ্ট,—কেবল গিন্নীর আর আমাদের।

আরও তিন মাস গত। গিন্নী ষষ্ঠীপূজায় জামাই বাবুকে আন্‌লেন। শ্যামা এ বাড়ীর যন্ত্রী,—মন্ত্রী। শ্যামাকে দিয়ে গিন্নী জামাইবাবুকে অনেক টাকার লোভ দেখালেন, অনেক সাধ্যসাধনা কোল্লেন। জামাইবাবু যেমনই হোন, তিনি পুরুষ ত! তাঁর বড়ই অসহ্য হয়েছে। টাকার মায়া তাঁকে সহজে দমন কোত্তে পার্‌বে কেন? তিনি চড়া চড়া কথায় অনেক রকম মিষ্ট ভৎর্সনা কোল্লেন। শেষে বোল্লেন, যদি তাঁর পরিবার তাঁর সঙ্গে যান, তা হোলে সকল অপরাধ মার্জ্জনা কোরবেন। গিন্নী এ কথায় রাজী হোলেন।

জামাইবাবুর মনে তখন যা ছিল, সে সব কথা শেষে বুঝ্‌তে পাল্লেম, তখন কিন্তু ততটা প্রকাশ হয় নাই। আমরাও তখন জান্‌তে পারি নাই শেষে যেমন জেনেছি, তেমনি শেষের কথা শেষেই বেল্‌বো।

সে দিন গেল, একটা মেয়েলী বাধা তুলে সেজদিদি সে দিনও কাটালেন, জামাইবাবু সে দিনও সেজদিদির ঘরে স্থান পেলেন না। জামাইবাবু এসে পর্য্যন্ত সেজ-দিদির মুখ যেন আঁধার হয়ে গেছে! সে হাস্য পরিহাস নাই—সে তুচ্ছকথায় হো হো হাসি নাই,—সে দন্ত-দর্প নাই, যেন কতই অনর্থ ঘোটেছে। রামসরকারের সঙ্গে কেবল ফিস্‌ফিস্ হোচ্চে, মৎলব আঁটা আঁটি হোচ্চে,—কেবল ফিকির-ফন্দির তরজমা হোচ্চে।

আজ আর কাটাবার যো নাই। গিন্নী সেজদিদির উপর হাড়ে হাড়ে চোটেছেন। তিনি বোলেছেন, আজ যদি জামাইবাবুকে সেজ-দিদি ঘরে না নেন, তা হোলে তিনি সেজদিদিকে বাড়ী থেকে দূর কোরে দিবেন। এই কথা শুনে সেজদিদির যেন ভয় হয়েছে। তিনি আজ আর "না" বোল্‌তে পাল্লেন না! শ্যামা জামাইবাবুকে ঘরে নিয়ে গেল।

বহুদিনের পর স্ত্রীপুরুষে কি রকম কথাবার্ত্তা হয়,—কি কি কথা—কোন্ ধারণে কে কি বলেন, এ সব শুন্‌বার জন্যে আমি তৈয়ার হয়ে আছি। সুযোগ হোলেই হয়। আড়ি পেতে এদিক ওদিক কোরে বেড়াচ্চি,—এমন সময় দেখ্‌লেম, শ্যামা জামাইবাবুকে ঘরে দিয়ে গেল। আমিও অমনি সাঁ

কোরে জানালায় মুখ দিয়ে দাঁড়ালেম। দেখি, ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়। সেজদিদি শুয়ে আছেন, পাশেই মেয়েটী ঘুমিয়ে রয়েছে। জামাইবাবু এসে বিছানায় বোস্‌লেন। মুখে কোন কথাই নাই। সেজদিদিও নীরব। বড় মন্দ তামসা নয়। অনেকক্ষণ গেল, কেউ আর কথা কইতে সাহস করেন না। শেষে অনেকক্ষণ পরে জামাইবাবু কথা কহিলেন। সেজদিদির দিকে চেয়ে জামাইবাবু বোল্লেন, "কিরণ! ঘুমিয়েছ কি?" সেজদিদি নীরব। আবার কতক্ষণ গেল। জামাইবাবু আবার বোল্লেন, "কিরণ! কথার উত্তর দেও না কেন? ঘুমিয়েছ কি?" সেজদিদি একবার পাশ ফিরে ছোট কোরে উত্তর কোল্লেন, "না।" জামাইবাবু একটু সোরে গিয়ে সেজদিদির হাতখানি ধোরে তুলে বসালেন। বোল্লেন, "ঘুমাও নাই যদি, তবে কথা নাই কেন? আমার এমন কি অপরাধ?" সেজদিদি নাকিসুরে গেঙিয়ে গেঙিয়ে উত্তর দিলেন, "বড় শরীর অসুখ কোরেছে—তাই।" এই বোলে সেজদিদি আবার শুলেন। জামাইবাবু যেন একটু গরম হোলেন। একটু চেঁচিয়ে জোরে বোল্লেন, "তা অসুখ হবে না কেন? নিত্য নূতন নূতন নাগর নিয়ে রাসলীলা হয়, তা আর অসুখ হবে না? আদুরে মেয়ে, বড় ঘরের মেয়ে, যা কর, তাই শোভা পায়। আমরা যেন তোমাদের গোলাম হয়েই জন্মেছি। এত কেন?"

এইবার সেজদিদি উঠে বোসলেন। রেগে চোক ঘুরিয়ে বোল্লেন, "তা বটেই ত! আমি রাসলীলা করি?—আমি নাগর নিয়ে থাকি? আমাকে এই কথা? এত বড় কথা তোমার? আমাকে অসতী বল? আমাকে এমন কথা?" জামাইবাবু রাগের হাসি হেসে বোল্লেন, "কুলের ধ্বজা! এটী তোমার কে? কার মেয়ে এটী? তোমার কোন্ স্বামীর ঔরসে এ মেয়ের জন্ম?" সেজদিদি সমান তেজে উত্তর কোল্লেন, "তোমার। কেন, জান না? যখন বৃন্দাবনে যাই, তখন তুমি কোথায়? কোন চুলোয় গিয়েছিলে? মনে নাই? সব ভুলে গেছ?" জামাইবাবু হেসে বোল্লেন, "বেশ!—বেশ! তোমাদের বাড়ীতে ছিলেম বোলেই কি তোমার গর্ভের সংবাদ রেখেছি? আজ তিন বৎসর পরে তোমায় আমায় এই সাক্ষাৎ। এক বাড়ীতে থাক্‌লেই বা কি কোরে তোমার গর্ভ হবে? এ কি "উড়ো খই গোবিন্দায় নম" বলার কাজ? স্বামীর বাতাসে কি স্ত্রীর গর্ভ হয় নাকি? আর মিছে চাপ দেও কেন? যা কোরেছ—বেশ কোরেছ,

আমারও ভাগ্য ভাল, আমি বিনা কষ্টে কেবল তোমার দয়ায় সন্তানের মুখ দেখ্‌লেম। যা হবার হয়েছে, এখন চল, কাল বাড়ী যাই। আমি ঢের সোয়েছি, আর না। অনেক ঢলাঢলি কোরেছ, সে সব আর তুমিও মনে কোরো না, আমিও কোরবো না। এখন চল, বাড়ী যাই।” জামাই-বাবুর মনের গতি দেখে, তাঁর কথার ভাবভঙ্গী দেখে] আমি ত অবাক হয়ে গেছি! সেজদিদি এমন কাজটা কোল্লে, তাতে রাগের নামও নাই। স্ত্রীর অপবাদে স্বামীর মনে যে কি কষ্ট হয়, তা ভাব্‌তেও ভয় হয়, কিন্তু জামাই-বাবুর সে ভাবটা বড় বেশী বোলে বুঝ্‌লেম না।

জামাইবাবুর কথায় সেজদিদি উত্তর কোল্লেন, “এখন আমার শরীর অসুখ। আশ্বিন মাসে এসে নিয়ে যেও। এখন গেলে প্রাণে মারা যাব। সে যে দেশ, যেমন জল হাওয়া, একদিনেই মারা যাব। আর খড়ো-ঘরে থাক্‌তে গেলে ত তখনি জ্বর হবে। নিয়ে যাবে, কিন্তু রাখবে কোথা? খাওয়াবে কি? আর কিছু দিন যাক। বরং কিছু নিয়ে যাও, ভাল কোরে ঘর-দরজা কর,—খাওয়ার সংস্থান কর, তার পর নিয়ে যেও। নিয়ে যাওয়া ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না?”

জাম্যইবাবু একটু উন্নতস্বরে বোল্লেন, “তা আমার যাই থাক, যখন তোমাকে আমি বিবাহ কোরেছি, তখন আমি যেখানে নিয়ে যাব, তোমাকে সেইখানে যেতে হবে। এতদিন কিছু বলি নাই, এখন আর চুপ কোরে থাক্‌বো না। তুমি যাতে যাও, তাই কোর্‌বো।” সেজদিদি বল্লেন, “তবে কালই যাব। তুমি যাবে—” কথা এই পর্য্যন্ত। সেজদিদি শুয়ে শুয়ে পাথার হাওয়ায় প্রদীপ নিবালেন। জামাইবাবু অগত্যা শয়ন কোল্লেন, ভা:ব বুঝ্‌লেম। আমি চেলে এলেম। সুশীলা আমার অপেক্ষায় এতক্ষণ আমার ঘরেই জেগে ছিল, তাকে এসে সব কথা খুলে বোল্লেম। শেষে দুজনে একত্রেই শয়ন কোল্লেম।

শেষরাত্রেই ঘুম ভেঙে গেল। সেজদিদির ঘর থেকে যেন এক্‌টা গোঙানী গোঁ গোঁ শব্দ আমার কাণে গেল। তাড়াতাড়ি ভয়ে সুশীলাকে তুলে বসালেম। সব কথা বল্লেম। সুশীলা সেই শব্দের দিকে লক্ষ্য কোরেই যেন কেমনতর হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠ্‌বার উপক্রম কোল্লে। আমি তাকে বুঝিয়ে রেখে—সাহস দিয়ে বেরুলেম। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, প্রভাত হবার আর বেশী বিলম্ব নাই। ঘরে কিন্তু তখনো

অন্ধকার আছে। পূর্ব্বে বোলেছি, সেজদিদির ঘর আমার ঘরের চারি পাঁচখানা ঘরের পরেই, সুতরাং সেজদিদির ঘরের জানালায় পাশে গিয়ে দাঁড়াতে আমার বেশী বিলম্ব হলো না।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শুন্‌লেম,—সেই গোঁ গোঁ শব্দেই বুঝ্‌লেম, জামাইবাবুর আওয়াজ। বুকের ভিতর ধড়াস্ কোরে উঠ্‌লো! গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো! নীচের দিকে চেয়ে দেখি, দুজন লোক সাঁ কোরে বেরিয়ে গেল। দূরের লোক, চিন্‌তে পাল্লেম না। জমাইবাবুর গোঙানী আরও বাড়্‌তে লাগ্‌লো। জানালা থেকে দরজার কাছে এসে দেখ্‌লেম, দরজা খোলা। ঢুক্‌তে সাহস হলো না। আবার ফিরে এসে জানালায় দাঁড়ালেম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফর্সা হয়ে গেল। দূরে গিন্নীর আওয়াজ পেলেম। বাড়ীর সকলে জেগেছেন দেখে, তাড়াতাড়ি আপনার ঘরে পালিয়ে এলেম। চুপি চুপি সব কথা সুশীলাকে বোলে—দুজনে পরামর্শ এঁটে কপট নিদ্রায় পোড়ে রইলেম।

বাড়ীর ভিতর ক্রমেই গোল উঠ্‌লো। মেজদিদি সুরবালা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে আমার দরজায় জোরে জোরে ঘা দিতে লাগ্‌লেন। আমরা যেন কতই ঘুমিয়েছি, আর তখন ভয়েও কথা সোর্‌চে না, অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খুল্‌লেম। মেজদিদি ঘরের ভিতর ঢুকেই বোল্লেন, "হরিদাসি! সর্ব্বনাশ হয়েছে! বিপ্রদাসকে কে খুন কোরেছে! রক্তে ঘর থৈ থৈ কোচ্চে। কিরণকে খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না, মেয়েটা বিছানায় পোড়ে কাঁদ্‌ছে! কি সর্ব্বনাশ! কেঁপে মোলেম! এখন উপায় কি হরিদাসি? কি হবে হরিদাসি? এখনি দারোগা-বক্‌সীতে বাড়ী পুরে উঠ্‌বে যে! এখনি আমাদের বেঁধে নিয়ে যাবে যে! কি সর্ব্বনাশ! জাত গেল,—মান গেল, সব গেল! হায়! হায়! বাবার সঙ্গে সঙ্গে সব গেল!—দাদার সঙ্গে সঙ্গে সব গেল!—হায় হায়! কি হলো!"

মেজদিদি ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। মেজদিদি লোকটা নিতান্ত সেকেলে। বড় ভালমানুষ। তিনি কেঁপেই সারা হোলেন। সুশীলাও প্রায় সেই রকম। মেজদিদিকে ঘরে বোসিয়ে রেখে সেজদিদির ঘরে গেলেম। তখনো এক একবার গোঁ গোঁ শব্দ হোচ্চে। ভাবে বোধ হলো, মৃত্যুর বড় বেশী বিলম্ব নাই। সমস্ত বিছানা রক্তে ভিজে

গেছে! ঘরের ভিতর গিন্নী, আর দাসীরা হা-হুতাশ কোচ্চেন। ঘরে ঘরে সেজদিদিকে খোঁজা হোচ্চে। দেওয়ানজী ভিতর থেকে দরজা বন্ধ কোরে দিয়েছেন। পাছে হঠাৎ কোন লোক বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে, তাই সাবধান!

আমি ত আর নাই! রক্তের কাণ্ড দেখে, আমি আড়ষ্ট হয়ে গেছি। বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি, বিপদের বড় বাকী নাই। এমন একটা মস্ত হাঙ্গামা আরম্ভ হবে। মেজদিদি আর রামসরকারকে যখন পাওয়া যাচ্চে না, তখন বেশ বুঝ্‌লেম, এ কাণ্ড তাদেরই। উঃ!—কি সর্ব্বনাশ! এত ঢলাঢলিতেও ক্ষান্ত হলো না?—সর্ব্বনাশী শেষে এই সর্ব্বনাশ কোল্লে? মনে বড় ভয় হলো।—ঘরে এলেম।

মেজদিদি উঠে গেছেন। সুশীলা আড়ষ্ট হয়ে বোসে আছে। দুটী চোকের জলে বুক ভেসে যাচ্চে,—মুখে কিন্তু কথা নাই। আমাকে দেখে সুশীলা আরও কেঁদে উঠ্‌লো।

সুশীলাকে সাহস দিয়ে বুঝিয়ে বোল্লেম, "ভাই! যা হবার, তা হয়ে গেছে। এখন উপায়? এখনি এসে পুলিসের লোকে বিষম হাঙ্গামা আরম্ভ কোর্‌বে। একবার সেই ঢলাঢলি,—তখন টাকার জোরে পার পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এবার আর আছে কি? এখনি সকলকেই একত্রে বেঁধে নিয়ে যাবে! পুলিসের অত্যাচার শুনেই পেটের ভাত চাল হয়ে গেছে। না জানি অদৃষ্টে আরও কত আছে।" আমার কথা শুনে সুশীলা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, "তবে উপায়? চল ভাই, আমরা পলাই। মামার বাড়ী যাই। এখানে থাকলে এখনি ধোরে নিয়ে যাবে।" সুশীলার যুক্তিই সারযুক্তি ভাব্‌লেম। এখানে আর এক দণ্ডও থাকা নয়। যখন একটা আশ্রয়স্থান আছে,—যখন সুশীলার মামার বাড়ী আছে, সুশীলার খাতিরে আমিও আশ্রয় পাব। এই যুক্তি স্থির কোরে সুশীলাকে বোল্লেম, "তবে আর বেশী দেরী করা হবে না। পুলিসের লোকজন এসে পোড়্‌লে আর বাড়ীর বাহির হওয়া যাবে না। যাও, যা পার, এখনি নিয়ে চল, চোলে যাই। কাপড় চোপড়—কি ভারী জিনিসের দরকার নাই, গোপনে যেতে পারে, এমন কিছু টাকা যদি নিতে পার, তারই চেষ্টা দেখ, কিন্তু এখনি।" সুশীলা তার নিজের ঘরে গেল। আবার তখনি ফিরে এলো। এক পুঁট্‌লী টাকা আমার হাতে দিয়ে

বোল্লে, "বাবা এই টাকা আমাকে দিয়েছিলেন।" টাকাগুলি সাবধানে বেঁধে নিয়ে খিড়্‌কী দিয়ে দুজনে শ্রীহরি !

বেলা তখন প্রায় সাতটা। সকলেই সেজদিদির ঘরে, আমাদের কেউ দেখ্‌তেও পেলে না। আমরা দুজনে সেই বেলা সাতটার সময় পালালেম।

রাস্তায় বেরিয়ে একখানা গাড়ী ভাড়া কোরে দুজনে পালালেম। রাস্তায় যেতে যেতে কেবলই মনে হোতে লাগ্‌লো, আজকে এই যে কাণ্ডটা হলো, যে সর্ব্বনাশ ঘোট্‌লো, এও—এক রাসলীলা !

বিংশ চক্র।

—:০:—

মামার বাড়ী।

আমরা বেলা তিনটের সময় বৃন্দাবনে এলেম। বৃন্দাবনেই সুশীলার মামার বাড়ী। যমুনার অতি নিকটে প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী। বেলা তিনটের সময় আমরা সেই দোতলা মামার বাড়ীতে পৌঁছিলেম। গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মামার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। মামী নাই,—কেবল এক বিধবা মাসী, একটী মেয়েমানুষ, আর পুত্রবধু এব বাড়ীর পরিবার। পুরুষের মধ্যে মামা নিজে—আর এক মামাত ভাই। এ ছাড়া, চাকর-চাকরাণী অনেক আছে ! মামা এখানকার একজন বড়দরের মহাজন।

মামার বাড়ীতে যেতেই সকলে পরিচয় পেয়ে আদর-যত্ন কোল্লেন। মামা নিজে নিকটে এসে বাড়ীর সকলের কুশল জিজ্ঞাসা কোল্লেন। যেগুলি বল্‌বার, তাই বোল্লেম, আর আর কথা গোপনে রইলো। মামার আজ্ঞামত তখনি মাসীরা ভাত রাঁধ্‌লেন। পাঁচটার মধ্যেই আহার হয়ে গেল।

মামা যেন একটী কুম্‌ড়ো। আড়ে দীর্ঘে সমান। যেমন মোটা, তেম্‌নি বেঁটে। হেঁটে যান কি গড়াতে গড়াতে যান, তা সহজে বুঝা

যায় না। চোক দুটী যেন লাল লাল ভাঁটা, বোঁ বোঁ ঘুরচে। মাথায় টাক, বড় বড় জুল্‌পী, মোটা এক তাড়া গোঁপ। বয়স পঞ্চাশের নীচে নয়।

মামার এক ছেলে। নাম ত্রিপুরারিচরণ। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। ত্রিপুরারির চেহারা "বাপ কা বেটার" অনুরূপ। তবে কমের মধ্যে কেবল মোটায়, চোকে আর রঙে। ত্রিপুরারি দোহারা,—মোটা নয়, চোক-দুটী ছোট, আর রং একটু উজ্জ্বল। বড়ই বাবু! বাবুগিরির চটক, পোষাকের ঘটা, বাইরের বাহার এত যে, ত্রিপুরারিকে লোকে সোজা চোকে দেখে বলে, এমন রূপ,—এমন চেহারা প্রায় হয় না। কিন্তু একটু সন্ধান কোরে দেখ্‌লে চেহারার গুণ পোষাকের ঘাড়ে চেপে পড়ে!

মামার বিধবা ভগ্নীর বয়স পঞ্চাশেরও উপর। আর একটী স্ত্রীলোকের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। ইনি এ বাড়ীর কে, জানি না। এঁকে সকলে ভয় করে,—খাতির করে,—মান্য করে, এই পর্য্যন্ত। কর্ত্তার সঙ্গে এঁর বড় ভাব। এতেই মনে মনে একটা সম্বন্ধ ঠিক কোরে নিলেম। এঁর নাম বড় কেহই জানে না। রাণীবৌ বোলেই ইনি পরিচিত।

ত্রিপুরারির পরিবারের বয়স প্রায় সতেরো। রংটী বেশ টক্‌টোকে। ঠোঁট দুখানি পাতলা, চাউনিটী বড় সরল, বড় লম্বাও নন, বেঁটেও নন। চেহারায় তিনি সুন্দরী। নামটা বড় খট্‌মটে—নীলাঞ্জনময়ী। সকলে তাঁকে নালাবউ বোলেই ডাকে।

এখানেও আমরা একটী ঘর পেলেম। মস্ত দোতালা বাড়ী, ঘরের অভাব কি? বাহিরের ঘরের একদিকে মামার কারবারের ঘর, আর একদিকে ত্রিপুরারির বৈঠকখানা। এই দু-ভাগের ঠিক মাঝখান দিয়ে বাড়ীর ভিতর আস্‌বার সদর দরজা। দু-ভাগের মাঝে সদরে যাবার যেমন রাস্তা, অন্দরে আস্‌বারও তেমনি পথ। আর এই ঘরের অপর দিকের ঘরগুলি অন্দর। এতেই সকলের শয়ন হয়,—রান্না হয়,—বসা উঠা হয়, ভাঁড়ার থাকে, সব হয়। আর এই ঘরের নীচেকার একধারে প্রায় কুড়িটী ঘর বড় বড় তালাবদ্ধ। সেখানে জনমানবও যায় না। মামার নিষেধ আছে।

আমরা একটী ঘর পেলেম। দুটীতে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই থাক্‌লেম। মামা বড় ভালবাসেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সুশীলার চেয়েও আমার প্রতি তাঁর টান্ বেশী বেশী। গদীঘর থেকে এসে, জল খেয়ে, আমাদের

কাছে বসেন,—কত গল্প করেন, কত উপদেশ দেন,—কত ভূতের গল্প করেন, কত সাহসের কথা বলেন। যখন গদীঘরে লোক না থাকে, গদীঘরের পাশদরজা থেকে দেখে আমরা গদীঘরেও যাই, আবার চোলে আসি। মামার ভালবাসায় সব ভুলে গেছি। বড় সুখেই আছি।

ত্রিপুরারির সঙ্গে বড় দেখা হয় না। তিনি যখন আসেন, তখন আমরা সোরে দাঁড়াই, তবুও তাঁর দৃষ্টির হাত ছাড়াতে পারি না। সম্পর্ক পাকা হোলেও তাঁর চাউনিকে আমরা বড় ডরাই। নীলাবউ বড় মন্দ লোক নন। কথা-বার্ত্তায় বেশ, তবে একটু বাবুগিরী আছে। সব সময় তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। দিনের অধিক সময়ই তিনি বেশভূষা নিয়েই থাকেন। কাণাকাণিতে প্রকাশ, তাঁদের স্বামী-স্ত্রীতে তেমন সদ্ভাব নাই। তবে এ কথার কোন নিদর্শন আমি এ পর্য্যন্ত পাই নাই।

প্রায় একমাস আছি। আমাদের বাড়ী থেকে যমুনার সুস্নিগ্ধ কাল-জলের ছোট ছোট ঢেউগুলি বেশ দেখতে পাওয়া যায়। আবার যমুনার জলে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লেও আমাদের মামার বাড়ী বেশ নজর হয়। আমরা প্রায়ই দুজনে বৈকাল হোলে গা ধুতে যাই। যমুনা এখানে উজান বয়। প্রবাদ আছে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুন্‌তে যমুনা এখানে উজান বোয়ে ছিলেন। যমুনার মত পরিষ্কার স্নিগ্ধজল আমি আর কোথাও দেখি নাই। সমস্ত দিনের শেষে একবার জলে নাম্‌লেই সমস্ত দিনের কষ্ট দূরে যায়,—শরীর শীতল হয়, মনের মধ্যে যেন স্ফূর্ত্তি দেখা যায়, এই জন্যে আমরা দুজনে বৈকালে যমুনায় গা ধুতে যাই। সুশীলার বড় অসুখ হয়।—অনভ্যাসেই হোক, আর অসহ্যতেই হোক, মাঝে মাঝে সুশীলার শরীর অসুখ হয়, সব দিন তার যাওয়ার কিন্তু কামাই নাই। সুশীলা যায় আমোদে—আমার সঙ্গে;—আর আমি যাই জ্বালা জুড়াতে, গায়ের আগুনের সঙ্গে মনের আগুন নিবাতে। সেই জন্য সুশীলার কোন কোন দিন যাওয়া ঘটে না, আমি কিন্তু রোজই যাই।

একদিন আমি একা গা ধুতে গেছি। বেলা বড় বেশী নাই। আমি গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়ে কত রকম ভাব্‌ছি। যমুনায় যেমন ছোট বড় অসংখ্য ঢেউ যাতায়াত কোচ্চে, আমার হৃদয়েও তেমনি অসংখ্য ছোট বড় চিন্তার ঢেউ যাওয়া আসা কোচ্চে, তাই চুপটী কোরে গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়ে আপন মনে কত রকম ভাব্‌ছি।

ঘাটের উপরেই একটী বড় প্রাচীন বট গাছ। গাছটী অনেক দিনের। যমুনার জল উপর পর্য্যন্ত যাতে না উঠ্‌তে পারে, সেই জন্যে যে সব পাথরের সারি কোরে দেওয়া আছে, সেই সারি এই বুড়ো বটগাছটীর নীচের এক পাশ দিয়ে চোলে গেছে। গাছের নীচে ছোট ছোট অনেকগুলি চূড়া। চূড়াগুলি ঠিক পাহাড়ের চূড়ার মত। কোনটী পাঁচ হাত, কোনটী সাত হাত, কোনটী বা আট নয় হাত। এইরূপ উঁচু-নীচু অনেকগুলি চূড়ার জন্যে সেই স্থানটী চমৎকার দেখাচ্চে।

যখন যমুনায় প্রথম আসি, তখন এই গাছের তলায় একটী যুবাপুরুষ দেখি। যুবাপুরুষের গায়ে সৈনিকের পোষাক,—মাথায় তাজ, কোমরে একখানি ছোরা! লোকটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি জলে নেমেছিলেম। চাইতে চাইতে দেখি, সেই লোকটী একবারে গাছের উপরে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় হয়েছে, এমন সময় সৈনিকপুরুষ গাছের উপরে কেন? চিরদিন দুর্ভাগ্যের চক্রে ঘুরে ঘুরে এমনতর মনের গতি হয়েছে যে, সকল কাজেই কেমন সন্দেহ হয়। এই লোকটীকে দেখেও আমার তেমনি সন্দেহ হলো। তাড়াতাড়ি উঠ্‌লেম।

উপরে গিয়ে আরও আশ্চর্য্য দেখ্‌লেম। দেখ্‌লেম, গাছের নীচে একটু দূরে একটী যুবা একটী যুবতীর হাত ধোরে প্রেমসম্ভাষণ কোচ্চেন। গাছের উপরকার লোকটী—একদৃষ্টে তাদেরই কাণ্ডটা দেখ্‌ছেন। এমন চাইনি, যেন সাম্‌নের লোক দুটীকে একবারে পুড়িয়ে ফেল্‌বার জন্যই সে লোকটী তেমনতর চাউনিতে চেয়ে আছেন।

কৌতূহল আমার সঙ্গের সাথি। এই কাণ্ডটা দেখ্‌বার জন্যে মনে বড় কৌতূহল হলো। সন্ধ্যা হয়েছে, ক্রমে আঁধার হয়ে আস্‌ছে, সেদিকে দৃষ্টি নাই। তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে একটী—চূড়ার পাশে এসে দাঁড়ালেম, সেখান থেকে বেশ দেখা গেল, কথাও বেশ শোনা যেতে লাগলো।

নিকটে এসে আমি আরো আশ্চর্য্য জ্ঞান কোল্লেম। যুবাকে একটু লক্ষ কোরে দেখ্‌তেই চিনে ফেল্লেম। এ আর কেউ নয়, আমাদের ত্রিপুরারি। এই কাণ্ডটী দেখে মনে আরও কৌতূহল বাড়্‌লো। আরও মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুন্‌তে লাগ্‌লেম।

ত্রিপুরারি যুবতীর হাতখানি ধোরে বোল্‌চেন, "আমার জীবন সার্থক! তোমার ভালবাসা আমি কখনো ভুল্‌তে পার্‌বো না। তুমিই আমার

সব; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ রত্ন আমি নির্ব্বিবাদ ভোগ কত্তে পাচ্ছি না।" যুবতী যেন কতই ভালবাসামাখানো, প্রাণজুড়ানো—মনভুলানো, কথায় বোল্লে, "তা-ভাই! তোমার মনে থাকলেই আমার ঢের। প্রেমের গাছে ত চিরদিনই কাটা আছে। আমি সে কাটা গ্রাহ্য করি না। তোমাকেই সার ভেবে আমি সকল কাঁটা দূর করবো।"

এই রকম কথাবার্ত্তা হোচ্চে, মনে কোল্লেম, গাছের লোকটিকে একবার দেখি! এই ভেবে গাছের দিকে দেখি, কেউ কোথাও নাই। মনে মনে ভাব্তে লাগ্লেম। সে লোকটি তবে গেল কোথা?

আপন মনে তর্ক বিতর্ক কোচ্চি, আর শুন্‌চি। কথা চোল্‌চে, এমন সময় ছোরা ঘুরিয়ে একেবারে সৈনিকপুরুষ দুজনের মাঝখানে! ত্রিপুরারির মুখেও কথা নাই, যুবতীর মুখেও কথা নাই।

মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হয়ে ত্রিপুরারি সৈনিকের হাত চেপে ধোল্লেন; বোল্লেন, "তোমায় যে আমি চিনেছি।—এত কায়দা তোমার? ত্রিপুরারির কথায় সৈনিকপুরুষ ভাল কোরে একবার চাইলেন, একটু চাইতে বেশ বুঝ্‌লেম, সৈনিকপুরুষ নয় আমাদের নীলাবউ!

নীলাবউ রাগে গর্ গর্ কোরে বোল্‌লেন, "তা চিন্‌বে না কেন? আমার সর্ব্বনাশ কোত্তে বোসেছ,—যা খুসী তাই কচ্চো,—যা মনে ধরে, তাই আন্‌চো, আর বাকী রাখচো কি? আজ তোমারি একদিন কি আমারি একদিন। আজ একটা এদিক ওদিক না কোরে আমি ছাড়্‌বো না। আমার বুকের রক্ত অন্যে খাবে? আমার বুকের ধন অন্যে নেবে তা প্রাণ থাক্‌তে সহ্য হবে না। হয় এদিক—না হয় ওদিক, আজ একখানা কোর্‌বো! —কোরবোই করবো!"

নীলাবউ যে রকম চোটেছেন, তাতে একটা দুর্ঘটনা ঘটাও আশ্চর্য্য নয়। তবে সাহসের মধ্যে ত্রিপুরারি তাঁর হাতখানি এখনো ধোরে আছেন।

ত্রিপুরারি বোল্লেন, "আরে রাম কহো! এ আবার একটা কথা? তুমি আস্‌বে তা জানি, তাই একটা পুরুষকে মেয়েমানুষ সাজিয়ে এনেছিলেম। হয় না হয়, দেখ না কেন? এই বোলে ত্রিপুরারি যুবতীর দিকে চাইলেন। যুবতী সেখানে নাই।

এ পর্য্যন্ত আমিও ত্রিপুরারির দিকে চেয়ে আছি, যুবতী কখন যে সোরে পোড়েছে, তার বিন্দুবিসর্গও টের পাই। চেয়ে দেখি যুবতী নাই!

ত্রিপুরারি বোল্লেন, "এই দেখ, লজ্জায় সে চলে গেছে। থাক্‌লে এখনি দেখাতাম। স্পষ্ট—চোকের সাম্‌নে প্রমাণ দিতেম! তুমি যেমন হাবা।" নীলাবউ লজ্জিত হোলেন। রাগটাও যেন কম হয়ে এলো। এখন বাড়ী যাবার কি?

আমি এই অবসরে ছুটে এঁদের আগেই বাড়ী এলেম। একবার সব ঘর খুঁজে দেখলেম, নীলাবউ নাই। আর কোন সন্দেহ রইল না। কাপড় ছেড়ে ছাতে গেলেম।

ছাতে দেখি, মামা আর সুশীলা গল্প কোচ্চেন। আমি যেতেই মামা বোল্লেন, "হরিদাসি! এতক্ষণ তুমি ঘাটে ছিলে? বোকা মেয়ে। ঘাটে যে কত ভয়!—সাবধান! আর কখন রাত কোরো না।" আমি সম্মতি জানিয়ে নিকটে বোস্‌লেম! রোজ যেমন হয়, সেমনি কথাবার্ত্তা হলো। শেষে যথাসময়ে আহারাদি সেরে আমার নিজের ঘরে শুলেম। সুশীলাকে এ সব কথা বোল্লেম না। যদিও বয়সে সে আমার ছোট নয়, তবুও বুদ্ধিতে সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমি অনেক দুঃখকষ্টে পোড়ে, বড় বড় বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে,—কতশত বড় বড় জালিয়াতের কৌশল ভেদ কোরে যেমন পাকাপোক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছি, এই অল্প বয়সে সংসার-সর্ব্বরী কত চক্র অতিক্রম কোরেছি, ভবসংসারের এই গুপ্তকথা দেখে দেখে—সংস্রবে থেকে থেকে আমার যতটা জ্ঞান জন্মেছে, সুশীলার সেটুকু লাভ কোত্তে এখনো অনেক বিলম্ব। এতটুকু সাহস, এতটুকু বল-বুদ্ধি, সুশীলার আজও হয় নাই। কি জানি,—যদি কোন কথা অসময়ে প্রকাশ করে, তা হোলে বিপদ ঘট্‌বার আটক নাই তাই সব কথা সুশীলাকে বলি না। এটিও বোল্লেম না! কেবল এই কাণ্ডের গুপ্তকথা জান্‌বার জন্য মতলব আঁটিতে লাগে্‌লম। মনে মনে কেবল ভাবতে লাগ্‌লেম, সে যুবতীটি তবে কে? কোথায় তার বাস? কি অবস্থা?—ত্রিপুরারির সঙ্গে কি সম্বন্ধ? এ যে পুরুষ নয়, তাই আমার বিশ্বাস, তবুও মনে একটা ধোঁকা লেগে আছে। তাইএই ঘটনার মূল জান্‌তে মন বড় ব্যাকুল হইল।

এই অবসরে মামার গদীঘরের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হয়ে উটেছে। মামার গদীঘরটী তেমন বড় নয়। একদিকে দুটী পুরাতন আলমারীতে গাদা গাদা কাগজ, গাদা গাদা পুরু পুরু বাঁধা খাতা, গাদা গাদা চোতা

কাগজ। একধারে একখানি তক্তোপোষ, তার উপর সতরঞ্চ পাতা সেই তক্তাপোষে বোসে দুজন সরকার দুটি ছাতাধরা কাঠের বাক্সের উপর মোটা মোটা খাতা রেখে লেখাপড়া করে। ঘরের ভিতর একটী সবুজ বন াতমোড়া গোল টেবিল, তারই চারধারে চারিখানি কেদারা, টেবিলের উপর রাশ রাশ মুখখোলা চিঠি। সেই সব চিঠি ছোট বড় নানা আকারের সাদাপাথরের নুড়ি বুকে কোরে টেবিলের উপর জড়মূর্ত্তিতে বিরাজ কোচ্চে। বাতাসের ভ্রুকুটিতে তারা ভয় করে না। এক-দিকে লাল ও কালো কালির দুটী দোয়াত, চারপাঁচটী কলম ও একটি পেন্‌শীলশোভিত কলমদান, আর কতকগুলি সাদা কাগজ-কাটা। মামা এই টেবিল সাম্‌নে রেখে বসেন।

যে সকল চিঠি পাথরের চাপ খেয়ে ম্লানভাবে টেবিলের শোভাবর্দ্ধন কোচ্চে, তাদের অনেকের গর্ভেই নোট! অবাক কাণ্ড! এত টাকার নোট, এমন অযত্নে টেবিলের উপর কেন? আবার ভাব্‌লেম, এটা বুঝি মহাজনী কারবারের দস্তুর।

একদিন গদীঘরে যাচ্চি, আড়াল থেকে দেখ্‌লেম, ঘরে আরও দুজন লোক। কাজেই আর যেতে সাহস হলো না। আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্ত্তা শুন্‌তে লাগ্‌লেম। মামা বোলচেন, যে সব দলীল তিন মাসের মধ্যে শোধ হবে,—যে সব হ্যাণ্ডনোট তিন মাসের মধ্যে মায়সুদ বেবাক টাকা উশুল পোড়্‌বে সেইগুলিই কেবল আপনারা এক লাকে রাখ্‌চেন! এতে আর অভাব কি? বুরা নোট নয়। এককথায় বেবাক টাকা আদায়। বড় বড় লোকের নোট। আমি অধম দরিদ্র লোককে টাকা ধার দিই না! সব রাজা রাজড়া—সব বড় বড় জমীদার বড় বড় মহাজন!" এই সব বোল্‌তে বোল্‌তে ছোট ছোট কাগজে টিকিট লাগানো কতকগুলি ফর্দ্দ সেই চিঠির ভিতর থেকে বার কোল্লেন। লোক দুটীর হাতে দিয়ে বোল্লেন, "দেখুন।"

লোক দুটী এক দুই কোরে সব কাগজ গুলি দেখলেন। দেখে শুনে বোল্লেন, "হঁা, সবই বড়লোক বটে। টাকা দেওয়ার আর কোন আপত্তি নাই। তবে আমাদের উপর একটু দৃষ্টি থাক্‌লেই যথেষ্ট।" লোকটী প্রকৃত মালিক নয়, দালালমাত্র। এটী তাদের এই কথার ভাবেই বুঝলেম।

মামা হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "সে ত বটেই! আপনারা হোলেন

আমাদের ডান হাত। আপনাদের দিয়েই আমাদের সব। টাকাটার প্রয়োজন কিন্তু কাল। বিলম্ব থাক্‌লে টাকার দরকার হতো না। আমার বড় হোসে লিখ্‌লে ৮।১০ দিনে টাকা এসে পোড়্‌তো, কিন্তু সময় নাই, কালই চাই। যিনি টাকা নেবেন, তাঁর কালই দরকার। তিনিও রাজা। তাঁকে কথা দিয়েছি। আমাদের কথা—আর বেদের বাক্য একই। কথার নড় চড় হোলে আমাদের এ ব্যবসা একদিনও চলে না। একটী কথার দাম আমাদের হাজার টাকা। তাঁর দেড়লাকের দরকার। আজকের তাগাদায় কুল্যে এই পঞ্চাশ হাজার এসেছে।" এই বোলে বাকী চিঠী-গুলির ভিতর থেকে কতকগুলি নোট বার কোল্লেন। হাসতে হাসতে বোল্লেন, "শালারা বড় পাজি। বড় বজ্জাতি আরম্ভ কোরেছে। এক্‌টা মোকামের একদিনের তাগাদায় কুল্যে পঞ্চাশ হাজার আদায়! দেখেন দেখি মশায়, ব্যাপারটা কি? এমনতর হোলে কারবার চলা ভার হয়ে উঠ্‌বে।" হাস্‌তে হাস্‌তে অমনি গরম! সরকার দুজনের দিকে চোক পাকিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "এখনি তাগিদ চিঠী পাঠাও। হিসাব নিকাশ কর! তাগাদায় না হয়, নালিশ দাও। এ কাজটা যেন উদ্ধার হলো, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আবশ্যক হয়, তা হোলেও ত এই রকম হবে? লেখ,—এখনি লেখ,—আজই পাঠাও!" সরকার দুজন তটস্থ। মামার কথায় সম্মতি জানিয়ে তখনি তারা আজ্ঞাপালন কোত্তে প্রস্তুত হলো। একটা যেন হৈ হৈ পোড়ে গেল।

লোকদুটী উঠ্‌লেন। মামা উঠে তাঁহাদের খাতির কোল্লেন। বোল্লেন, "কাল সকালেই আমার লোক যাবে। সমস্ত দলিল নিয়ে যাবে। কালই রেজেষ্টারী হবে, আপনাদের ত আর অবিশ্বাস নাই! তবে কারবারের দস্তর বোলেই বোল্‌চি, কেবল দলীলের একটা ফর্দ্দ দেবেন মাত্র।" লোকদুটী সম্মতি জানায়ে প্রস্থান কোল্লেন। আমিও ঘরে এলেম। ভাব্‌তে ভাব্‌তে এলেম, মামার কত টাকা!

মামা যেমন ফর্দ্দ দিলেন, তাতে বোধ হলো, ৭০।৮০ লাকে মামা কাতর নন। মামার কথার ভাবে বরং আরও বেশী বেশী বোলে বোধ হয়। মামার টাকার ওর নাই।—মামা একটা বড়দরের টাকার কুমীর!

পরদিন দলীলপত্র নিয়ে লোক গেল। বেলা ৪টার সময় গাড়ীর এক গাড়ী টাকা, তোড়া তোড়া টাকা এসে ঘরের খালি লোহার সিন্দুক

বোঝাই হলো। আবার সেই রাত্রেই টাকা নিয়ে মামা কোথায় চোলে গেলেন। আমরা মনে ভাব্‌লেম, সেই রাজাকেই টাকা দিতে গেছেন।

তিনদিন পরে মামা ফিরে এলেন। আবার কারবার চোল্‌তে লাগলো। রোজ রোজ কত লোক টাকা নিতে আসে, কত লোক টাকা দিয়ে যায়। মস্ত জল্‌জলাট কারবার, বৃহৎ ব্যাপার! মামার অফুরাণ টাকা!

প্রায় পোনের দিন এই ভাবেই কেটে গেল। মামার অনুমতি অনুসারে আর সন্ধ্যার পর যমুনায় যাই না। যাই না বটে, কিন্তু মনের ভিতর রাতদিন কেবল সেই দিনকার বড় বাবুর কাণ্ড—সেই অপরিচিত যুবতীর কাণ্ড, নীলাবউয়ের কাণ্ডই তোলাপাড়া হোচ্চে। মনে মনে কেবল এই চিন্তা, কিসে সে দিনের কাণ্ডটার আগাগোড়া জান্‌তে পাব। এই কাণ্ডটা দেখে পর্য্যন্ত মনের ভিতর কেবল সেই চিন্তাই জাগ্‌ছে। সন্ধানে সন্ধানে আছি, ত্রিপুরারি কোথায় কখন থাকেন, কোথায় কখন যান, যতদূর পারি তারই সন্ধান রাখ্‌চি। নীলাবউয়ের সঙ্গে ভাব কোরে তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যাই। কৌশলে কতরকম ভাবের কথা তুলি, কিন্তু আসল কথা জান্‌তে পাই না।

মামাকে এ পর্য্যন্ত আমাদের আসার কারণ বলি নাই। মামাও তেমন পীড়াপীড়ি করেন নাই। এখন মামা সব জান্‌তে পেরেছেন। তিনি একদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের কাছে এসে ম্লানমুখে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হরিদাসি! তোমরা মথুরার কোন সংবাদ শুনেছ কি? বিষম বিপদ!" আমি বোল্‌তেই সব কথা বুঝে নিলেম। সুশীলা তাড়াতাড়ি পাছে কোন কথা প্রকাশ করে, এই ভয়ে আমিই মামার কথার উত্তর দিলেম। মনের ভাব গোপন কোরে,—মামার মত ম্লানমুখে,—যেন কিছুই জানি না—এম্‌নিতর ভাব দেখিয়ে বোল্লেম, "কই! আমরা ত বাড়ীর কোন খবরই জানি না! কি বিপদ? মামা! সকলে ভাল আছেন ত? মা ভাল আছেন ত? আর আর সকলে ভাল আছে ত? হয়েছে কি? বলুন?"

মামা একটা মস্ত টানা নিশ্বাস ফেলে উত্তর কোল্লেন, "শারীরিক ভাল বটে, কিন্তু এদিকে বড় সর্ব্বনাশ!—সেজ জামাই বিপ্রদাসকে কে খুন কোরেছে! বিপদের উপর আবার বিপদ!—কিরণকে পাওয়া যাচ্চে না। ছেলেমানুষ ভয় পেয়ে হয় ত কোথায় চোলে গেচে।"

সেজদিদি যে কেমনতর ছেলেমানুষ, তা আমিও জানি, সুশীলাও জানে। মনের কথা মনেই চেপে রেখে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "খুনের কি সন্ধান হয় নাই? অত বড় বাড়ী, চারিদিকে লোকজন, সেই বাড়ীর অন্দরে ঢুকে কোথাকার একজন এসে খুন কোরে চলে গেল, আর সন্ধানই হলো না?" মামা আগের মত ম্লানমুখে বোল্লেন, "না। কোন কিনারা হয় নাই। বাড়ীর সকলকে—চাকর, চাক্‌রাণী, দরোয়ান, আম্‌লা, সকলকেই বেঁধে হাজতে রেখেছে। নূতন শাসন, নূতন আইন-আদালত,—হয় ত কি সর্ব্ব-নাশই কোর্‌বে! আমি এই মাত্র খবর পেলেম। মনে কোরেছি, কালই যাব। আর ত কেউ দেখ্‌বার নাই! যাতে যা হয়, তা ত আমাকেই কোত্তে হবে!—কাণ্ডটা শুনে পর্য্যন্ত আমার পেটের ভাত চাল হয়ে গেছে। করি কি?" মামা অনেক হা-হুতাশ কোল্লেন। আমরাও তাঁর কথার জবাব দিতে লাগ্‌লেম। পরদিন সকালে মামা চোলে গেলেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর একমাস কেটে গেল। বন্যার জলের মত,—চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্তের মত—দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাসিয়ে কাঁদিয়ে একটা মাস মাথার উপর দিয়ে চোলে গেল। আজও মকর্দ্দমার শেষ হলো না। সেজদিদিকে খুঁজে পাওয়া গেল না রাম সরকারের অনুসন্ধান হলো না, মকর্দ্দমাও মিট্‌লো না। গিন্নী, দিদিরা, ছোটবাবু, ঝি, চাকর, গোষ্ঠিশুদ্ধ লোক হাজতে পোচতে লাগ্‌লেন। মামা মাঝে মাঝে যান, আবার ফিরে এসে এই রকম খবর দেন। বেশী দিন কোন স্থানে থাক্‌লে মামার ব্যবসা চলে না, দো-টানায় পোড়ে মামার বড়ই কষ্ট হচ্চে, কি কর্‌বেন, চারা নাই।

দুমাস যেতে না যেতে আবার এক দিন টাকার কাঁড়ি এসে পোড়্‌লো। জান্‌লেম্, যে রাজা টাকা ধার কোরেছিলেন, তিনিই এই টাকা শোধ দিয়েছেন। মামা এ টাকা ঘরে রাখ্‌লেন না। তখনি মহাজনকে খবর দিয়ে দলিলপত্র ফিরিয়ে নিয়ে মায় সুদ সমস্ত টাকা চুকিয়ে দিলেন। মহাজনে মহাজনে বিশেষ খাতিরজমা রইল। পরস্পর আবশ্যকমত টাকার দেনা-পাওনা হোতে লাগ্‌লো। বিশ্বাসেই সংসার যখন চোল্‌চে, তখন এঁদের মত উঁচুদরের দুজন মহাজন পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাস কোর্‌বেন কেন?

আছি বেশ। কেবল যা চিন্তা ত্রিপুরারিচরণ, আর খুন। দুটী চিন্তার একটীও কম নয়, অথচ দুটী চিন্তার কোনটীরই মীমাংসা হোচ্চে না। কাজেই

আমার চিন্তারও বিরাম হোচ্চে না। যত দিন যাচ্চে, ভাবনা যেন ততই বেড়ে উঠছে। চেষ্টাও বাড়্‌চে, কিন্তু ফল হোচ্চে না। দেখি আর কতদিন বিফলে যায়।

ভাবনা চিন্তা এখন এত হোয়েছে যে, এক একদিন ভাবতে ভাবতেই রাত প্রভাত হয়ে যায়। সমস্ত রাত্রের মধ্যে ঘুমাবার পর্য্যন্ত অবসর হয় না। আজও ঠিক সেই রকম হয়েছে। সমস্ত রাত ঘুম হয় নাই, ভোর হোতেই, ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগ্‌তেই বাইরে এলেম।

আমরা ঘর পেয়েছি, আলাদা ঘরেই থাকি। আমাদের ঘরের ঠিক সাম্‌নের দিকের ঘরে ত্রিপুরারি আর নীলাবউ থাকেন। তাঁদের বারান্দা আর আমাদের বারান্দা এক। ছাতখোলা বারান্দা। বারান্দার উপরে ছাত নাই। সমস্ত রাত নিদ্রা হয় নাই, তাই সেই বারান্দায় একটু বেড়াচ্ছি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর বেশ ঠাণ্ডা হোচ্চে,—বড় আরাম বোধ হোচ্চে। আপন মনেই বেড়াচ্ছি। বেড়াচ্ছি,—কিন্তু চিন্তা আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। বেহুঁস হয়েই বেড়াচ্ছি।

কেমন মনের গতি, ভাবতে ভাবতে ত্রিপুরারির কথা মনে পোড়ে গেল। ভাব্‌ছিলেম পাটনার কথা,—মনে উঠেছে পাটনার কথা,—আর একবারে সে ভাবনা উল্‌টে গিয়ে মনে পড়্‌লো ত্রিপুরারির কথা! মনের গতি কখন যে কি হয়, তা যার মন, সেও বোল্‌তে পারে না, পরে তবে তার কি জান্‌বে?

যেমন ত্রিপুরারির কথা মনে হলো, অমনি পায় পায় তাঁর ঘরের দিকে চোল্লেম। দেখ্‌লেম, জানালা খোলা। ভোরের ঠাণ্ডা হওয়ায় মনের সুখে ঘুমুচ্ছে ভেবে, গুটীগুটী জানালায় গিয়ে মুখ বাড়ালেম। অবাক!—অবাক কাণ্ড! কাণ্ডটা দেখে আমি একেবারেই অবাক!—একেবারে জ্ঞানশূন্য!

আর কত যে কেলেঙ্কারী, কত যে লোক হাসাহাসি,—কত যে বদ্‌মায়েসী ফেরাবী, কত যে ঘৃণিত পাপের কাণ্ড দেখ্‌তে হবে;—আর কত যে পাপ, কত যে অধর্ম্ম,—কত যে মনস্তাপ পেতে হবে;—আর কত যে চিন্তা,—কত জনের ভাবনা যে ভাব্‌তে হবে, তার সীমাসংখ্যা নাই। এতদিন যত কাণ্ড দেখেছি,—এতদিন যতগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড চোকের উপর দিয়ে চোলে গেছে, এ কাণ্ডটা সে সব চেয়ে ভয়ানক! সে সব চেয়ে আশ্চর্য্য! ন ভূতো ন ভবিষ্যতি!

জানালায় মুখ বাড়িয়ে দেখি,—মধ্যে নীলাবউ, একপাশে ত্রিপুরারি আর এক পাশে কে একজন অপরিচিত যুবাপুরুষ! নীলাবউ সেই অপরিচিত বাবুটীর দিকে মুখ রেখে অঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন!—তিনজনেই নিদ্রিত! এর বাড়া ভয়ানক কাণ্ড আর কি হোতে পারে? সংসারে অনেক কুলটা আছে,—অনেক কুলকামিনী কুলের ধ্বজা উড়িয়ে স্বামীর মুখ উজ্জ্বল কোচ্চে, অনেক পাপিষ্ঠা পিতামাতার মুখে চুনকালি দিয়ে বৈধব্যব্রতের পরিবর্ত্তে বারাঙ্গনাব্রত অবলম্বন কোরেছে, অনেক লম্পট যুবা পত্নীর প্রেম—মাতা-পিতার স্নেহ, আত্মীয়স্বজনের মায়া কাটিয়ে বারাঙ্গনার শ্রীচরণে জীবন বিক্রয় কোচ্চে, কত দস্যু, কত ডাকাত,—কত গুণ্ডাষণ্ডা—কত জালজালিয়াৎ সংসারের বুকে বোসে সংসারের সর্ব্বনাশ কোচ্চে, এ সবও বরং সহ্য হয়, এ সবও বরং একদিন তাচ্ছিল্য কোরে—হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আজ যে কাণ্ড সাম্‌নে দেখ্‌ছি,—এর মত ভয়ানক কাণ্ড আর যে হোতে পারে, তা ধারণাতেও আনা যায় না।

ভাবতে ভাবতে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক সময় কেটে গেল। রোদ উঠ্‌লো,—এখনি হয় ত এদের নিদ্রাভঙ্গ হবে,—এই ভেবে তাড়াতাড়ি আপন ঘরে ফিরে এলেম। সুশীলা তখনো দেখ্‌লেম, ঘুমুচ্চে। সুশীলাকে আর না ডেকে সতর্ক হয়ে রইলেম। দেখি, এদের কখন ঘুম ভাঙে,—কি ভাবে কোথায় যায়,—নূতন বাবুটীই বা কোথায় যান, এই সব স্থির কোরে বোসে রইলেম। একটু পরেই হুড়ুৎ কোরে দরজা খোলার শব্দ কানে গেল। অমনি আরও সতর্ক হয়ে যেখান থেকে এদের সকলকে বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেম।

নূতন বাবুটী আমাদের কল্পতরু ত্রিপুরারির হাত ধোরে বাইরে বেরুলেন। চারদিকে একবার চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "তবে ভাই আসি। অবশ্য অবশ্য কোরে যেও। বউকে নিয়ে যেও। যেন ভুলো না!" ত্রিপুরারি হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর কোল্লেন, "সে কি কথা! তোমার অনুরোধ কি ত্যাগ কোত্তে পারি! নীলা ত যাবেই।" নীলাবউ ছোট ছোট কোরে ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে বোল্লে, "দেখ্‌বেন, যেন ভুলে যাবেন না। আমাদের কথা মনে থাক্‌বে ত?" নূতন বাবুটী হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "যতদিন জীবন থাক্‌বে।" এই বোলে নূতন বাবুটী সাঁ কোরে বেরিয়ে গেলেন। ত্রিপুরারিও বাইরে গেলে। নীলাবউ আপন ঘরে বোসে কি যে কোত্তে লাগ্‌লো, তা

তখন দেখ্‌তে পেলেম না। এদিকে সুশীলাও জেগে উঠলো। আমি আপনার মনের ভাব গোপন কোরে তাকে যেন ডাক্‌ছি, সে যেন আমার ডাকেই উঠ্‌চে, এই ভাবে নাম ধোরে ডাক্‌তে লাগ্‌লেম। সুশীলা উঠলে দুজনে অনেক কথা হলো। যত কথাই হোক, মনে কিন্তু ত্রিপুরারীর কথা জাগ্‌তে লাগলো। সহজে কি এ চিন্তার অবসান হয়?

সে দিন সেই ভাবেই কেটে গেল। সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১০টা পর্য্যন্ত নূতনবাবুর আশাপথ চেয়ে বোসে রইলেম। বাবুর আর সে দিন পদার্পণ হলো না। ত্রিপুরারী আপন ঘরেই সে দিন একাকী রইলেন। একাকী মানে একজন নয়, ঘরে নীলাবউ ছিলেন, তবে দ্বিতীয় পুরুষের সমাগম না দেখেই আমি ত্রিপুরারির কথায় "একাকী" কথাটা বসালেম। ত্রিপুরারির স্বভাবের উপর এ কথাটা কি দোষের?

পরদিন সন্ধ্যাকালে একখানি পাল্কী খিড়্‌কী দরজায় এসে লাগ্‌লো। পাল্কীখানি যথাসম্ভব লুকিয়েই এখানে এসেছে, কিন্তু আমার চোকের কাছে সে লুকালো খাট্‌লো না। আমি কেবল এই তত্ত্বেই যখন ঘুরছি, তখন আমাকে লুকানো কি সহজ কথা? পাল্কীখানি আস্‌তেই আমি সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখলেম। সুশীলা মামার কাছে ছিল, মামা আমাকে ডাক্‌চেন, এই সংবাদ নিয়ে আস্‌তেই তাকে বিদায় কোল্লেম। বোলে দিলেম, একটু পরে যাচ্চি,—তুমি যাও।

পাল্কীখানি সঙ্গে কোরে সেই নূতনবাবু এসেছেন। নূতন বাবু যথাসাধ্য গোপনে চকিতে নীলাবউয়েরর ঘরে ঢুক্‌লেন। আমিও পা টিপে টিপে ঘুল্‌-ঘুলিতে মুখ দিয়ে শুন্‌তে লাগলেম, দেখতে লাগলেম। ত্রিপুরারি ঘরে নাই। নূতন বাবু এসেই দরজা বন্ধ কোল্লেন। আমি ঘুলঘুলিতে মুখ দিয়ে আছি কি না, সবই দেখতে পাচ্চি। নূতনবাবু দোর বন্ধ কোরেই নীলাবউয়ের হাত দুখানি ধোরে বিছানায় বসালেন। লজ্জার কথা, নূতনবাবু নীলাবউয়ের মুখখানিতে হাত দিয়ে—চাপা গলায় আদর কোরে বোল্লেন, "একটা দিন বড় কষ্টেই কাটিয়েছি। আহা! এ মুখখানি না দেখে কি থাকা যায়।" নূতনবাবু পোড়ারমুখী নীলাবউয়ের মুখ চুম্বন কোল্লেন। আর দেখতে পারি না, আর লজ্জার মাথা খেতে পারি না। আমি চলে এলেম। রাগে সর্ব্বাঙ্গটা যেন গর্‌গর্ কোত্তে লাগ্‌লো। ইনিই না স্বামীর সন্ধানে পুরুষ-বেশে যমুনাকূলে সেই গাছে উঠে বোসেছিলেন?—ইনিই, স্বামীর দুর্ব্ব্যবহার

সহ্য কোত্তে না পেরে ছদ্মবেশে পতির উদ্দেশে যমুনাকূলে সেই চূড়ার মধ্যে ছোরা ঘুরিয়ে রণচণ্ডী সেজেছিলেন? তখন বড় ভাল বোলে ভেবেছিলেম, কিন্তু এখন এ সব কি দেখি?

আর এরই বা দোষ কি? যত দোষ ঐ হতভাগা ছোঁড়ার। গায়ে কি রক্ত নাই? মাগী সতীসাধ্বী, বোল্‌তে নাই—কিন্তু এর স্বভাব দেখে—একে ভদ্রের ঔরসজাত বোলে ত বোধ হয় না! আপন স্ত্রী কেউ কখনো পরকে দিতে পারে? হোক না কেন প্রাণের বন্ধু—হোক না কেন ভালবাসা, হোক না কেন প্রাণের প্রাণ,—তবু এও কি পারা যায়? হয় ত এ কথা সকলে বিশ্বাসই কোর্‌বেন না,—হয় ত এ কথা পাগলের পাগলামি মনে কোরে হেসে—উপহাস বিদ্রুপ কোরে উড়িয়ে দেবেন; বাস্তবিক কথাটাও তাই। এমন কথায় কেউ কি কখনো বিশ্বাস করে? আমি চোকের উপর দেখ্‌চি, তাই যেন বিশ্বাস হয়েছে, কিন্তু এ কাণ্ড দেখ্‌বার আগে যদি একথা শুন্‌তেম, তা হোলে আমারও হয় ত কোনমতে বিশ্বাস হতো না। চোকের সাম্‌নে দেখ্‌চি, স্পষ্ট স্পষ্ট দেখ্‌চি, কাজেই অবিশ্বাস কর্‌বার কোন কারণ নাই।

ত্রিপুরারি এলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ত্রিপুরারি এলেন। দ্বোরে আঘাত কোত্তেই দরজা খুলে দেওয়া হলো। আমি আবার সেই ঘুল্‌ঘুলিতে এলেম।

বাবুর মুখে আর হাসি ধরে না! পোড়ার মুখে যেন দেশের হাসি এসে ভর কোল্লে। ত্রিপুরারি হেসে গড়িয়ে পোড়্‌তে পোড়্‌তে বিছানায় গিয়ে কাৎ হলেন। হেসে বোল্লেন, "ভাই! সব ঠিক ত? ইনি আমায় পাগল কোরে তুলেছেন।" নূতনবাবু হেসে—মিটির মিটির চেয়ে বোল্লেন, "তা না হলে কি আর রক্ষা আছে? ঠিক না কোরে কি আর আসি?" এই রকম অনেক কথা হলো। সন্ধ্যার সময় আমাদের খাবার তৈয়ার হয়, সেই সময়, সকলের খাবার ঘরে ঘরে দিয়ে যায়। যার যখন ইচ্ছা, সে তখনি ঢাকা খুলে খায়। ত্রিপুরারিরও খাবার ঢাকা ছিল। সেই খাবার তিনজনে একত্রে, একপাতে বোসে খাওয়া হলো। এর মুখের খাবার তার মুখে, তার মুখের খাবার এর মুখে, এই রকম এক এক খাবার তিন তিন মুখে ফিরে উদরস্থ হতে লাগ্‌লো। আমোদের যেন সীমা নাই।

আহারাদি শেষ হলো। ত্রিপুরারি বোল্লেন, "একটু দেরি কর।

সেখানে ত আর—আরও দুইজন বন্ধুবান্ধব আছেন ত?—আবার আস্‌তেও ত দেরি হবে?—অনেক রাত হবে। তোমরা একটু দেরি কর,—আমি আস্‌চি।" এই বোলে ত্রিপুরারি উঠ্‌লেন। নিজেই বা'র থেকে দরজা বন্ধ কোরে চোলে গেলেন। এদিকের যা কাণ্ড, তা ত দেখ্‌তেই পেয়েছি, আর ইচ্ছাও নাই। এখন ত্রিপুরারি যায় কোথা, তাই একবার দেখা ভাল। এই মৎলবে ত্রিপুরারির পেছু পেছু—দূরে দূরে গাঢাকা হয়ে চোল্লেম। ত্রিপুরারি আর বেশী দূরে গেলেন না। পশ্চিমদিকের ছাতের উপর পায়চারি কোত্তে লাগ্‌লেন। এও এক অবাক কারখানা! আমি ফিরে এসে আড়ালে দাঁড়ালেম। সংকল্প রইল, আরও যে কি কাণ্ড এরা করে,—আরও যে কত ভয়ানক কারখানা করে, তার মূল পর্য্যন্ত একবার ভাল কোরেই দেখ্‌তে হবে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে ত্রিপুরারি ফিরে এলেন। তাড়া দিয়ে বোল্লেন, "আর বিলম্ব কেন?—চল যাই।" তিনজনে বিনা বাক্যব্যয়ে খিড়্‌কী দিয়ে বেরুলেন। আমিও আমার সংকল্পকে দৃঢ় রেখে এদের পেছু নিলেম। তাঁহারা যখন বেরুলেন, তখন ত্রিপুরারির ঘড়িতে ১১টা বাজ্‌লো। দূরে দূরে আড়ালে আড়ালে আমিও বেরুলেম। নীলাবউ পাল্কীতে—বাবু দুটী হেঁটে—আমিও তাই। এক একবার যাই, আবার রাস্তার নিশানগুলি বেশ কোরে দেখে রাখি,—সেই সব নিশানগুলি প্রাণের সঙ্গে গেঁথে রাখি।

কতদূর এলেম, তা ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। দূরে একটী ছোট একতালা পুরাতন বালি-চূন-খসা, ভাঙা বাড়ীর দরজায় এসে পাল্কী লাগলো। বাবু দুটীও উপস্থিত হোলেন। তিন জনেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। আমি এখন দরজায়।

কোথায় এসেছি,—কতদূর এসেছি,—এ গলির সীমা কোথায়,—কিছুই ত জানি না। এখন করি কি? ফিরে যাই, কি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করি? ভাবতেই—ভেবে স্থির কোত্তে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল।

যুক্তি স্থির হলো। বিপদে আর তেমন ভয় হয় না। অনেক বিপদের ঝড় মাথার উপর দিয়ে গেছে, অনেক দুর্ঘটনার চক্রে ফিরে ঘুরে মনের সাহসও বেড়ে গেছে, তাতেই যুক্তি স্থির কোল্লেম, প্রবেশ করি। বিপদের একটানা সমুদ্রে ভেসেই ত বেড়াচ্ছি,—এর উপর যে বিপদ আস্‌বে, যে দুর্ঘটনা ঘট্‌বে, তাতে ততটা কষ্ট দিতে পারবে না। এই সাহসেই প্রবেশ

কোল্লেম! অন্ধকার দরজা, অজানা পথ, গুটী গুটী—পা টিপে টিপে আন্দাজে আন্দাজে চোল্লেম। দরজা পেরিয়ে—বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই দেখ্‌লেম, একটী ঘরে আলো জ্বোল্‌চে। অনেক রকম সুরে—অনেক লোক অনেক রকম ভাবের কথাবার্ত্তা কইচে। সকলের কথা এক সময়ে উঠে ঘরের মধ্যে একটা মহা চেঁচাচেঁচি পোড়ে গেছে। আমি ধীরে ধীরে সেই ঘরের দরজার পাশের একটী ছোট গলি রাস্তায় দাঁড়ালেম। অতি সাবধানে—অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে এদের কাণ্ডকারখানাটা বেশ দেখতে লাগ্‌লেম।

ঘরের মধ্যে দুখানা তক্তপোষ একত্রে পেতে—তার উপর ঢালাও ফরাশ! ঘরের প্রায় বার আনা স্থান এই ফরাশ জুড়ে আছে। একটী কুলুঙ্গিতে একটী সামান্য মাটীর প্রদীপ টিপ্‌ টিপ্‌ কোরে জ্বোল্‌চে। ফরাশের স্থান সংকুলান হয়ে যে স্থানটুকু অবশিষ্ট আছে, তাতে গোটা কত খেলো হুঁকো, গোটা কত কল্‌কে, আর এক মাল্‌সা আগুন নিয়ে একজন হিন্দুস্থানী চাকর বোসে আছে। বাবুদের ফরমাস মত ঘড়ি ঘড়ি তামাক দিচ্চে।

ফরাশের উপর ত্রিপুরারি, নরপরিচিত সেই বাবুটী, আর চারজন অপরিচিত বাবু, আর নীলাবউ ছাড়া আরও দুটী যুবতী। মোটের উপর চাকর বাদে ঘরের মধ্যে জনসংখ্যা ৯টী। বাবুদের মজলিসে নানারসের ঢেউ উঠ্‌ছে। 'বাবু আর "বাবুনীর" দল গোল হয়ে বোসেছেন। বেশ শ্রেণীবদ্ধ হোয়ে—একজন পুরুষের পর একজন স্ত্রী বোসেছেন! তবে হিসাবে যেখানে অকুলান হোয়েছে, সেখানে পুরুষেরাই গাদাগাদি হয়ে বোসে আছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের ত্রিপুরারি এই গদাগাদির দলে। গোলাকার বাবু চক্রের মধ্যে একখানা বড় থালায় কি কি খাবার, আর দুটী বোতলে জলের মত কি দ্রবদ্রব্য। ভাবে আর অনুমানে বুঝে নিলেম, সে সব মদ! মেয়ে-পুরুষে মদ খাচ্চে। কিছুই বাকী থাক্‌চে না! তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে—কৌতূহলের বশবর্ত্তী হোয়ে দেখ্‌লেম, নীলাবউ অনেক অনুরোধের পর একপাত্র উদরস্থ কোল্লেন।

মদের মত্ততায় একজন বাবু দাঁড়িয়ে উঠে বোল্লেন, "আমাদের দলের মধ্যে ত্রিপুরারিই হোচ্চে খাস্‌ লোক। এর দ্বারাতেই আমাদের এই শ্মশানে গোলাপ ফুল ফুট্‌বে। বিকার—বিকার মহারোগ! বিকারে মানুষ বাঁচে না। আমাদের ত্রিপুরারির বিকার নাই। যদি বিকার থাক্‌তো, যদি সেই মহারোগ হতো, তা হোলে বন্ধুর সাম্‌নে কি কখনো ঐ দেবীকে আন্‌তে

পারে?" ইয়ারেরা হাততালি দিয়ে হাসির লহর তুল্লেন। ত্রিপুরারি হেসে—মাথা চুল্‌কে আহ্লাদে যেন ফুটীফাটা হয়ে উঠ্‌লো।

অনেকক্ষণ এই রকম ইয়ারকিতে কেটে গেল। একটী বাবু পকেট থেকে ঘড়ি বার কোরে বোল্লেন, "রাত আর বেশী নাই। ৫টা বাজে। চল, আজ এই পর্য্যন্ত।" সকলেই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আমিও আগে থেকে সোরে পোড়্‌লেম। জানি খিড়্‌কীর দরজা খোলা আছে। রাস্তার নিশানও মনে আছে। তাহা সকলের আগে তাড়াতাড়ি ছুট্‌তে ছুট্‌তে ঘরে এলেম।

সুশীলা এখন পর্য্যন্ত ঘরে প্রদীপ জ্বেলে কেবল বোসে ভাব্‌চে। এমন সময় আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। সুশীলা অন্যমনস্ক হয়ে ভাব্‌ছিল, আমাকে হঠাৎ ঢুক্‌তে দেখে চোম্‌কে উঠ্‌লো। ভাল কোরে দেখে বোল্লে, "দিদি! তুমি কোথা গেছিলে? এত রাত, খাওয়া হয় নাই, কোথা গেছিলে তুমি?" আমি তাড়াতাড়ি বোল্লেম, "চুপ, চুপ, ও কথা এখন না, কাল বোলবো।" সুশীলাকে বুঝিয়ে শুতে শুতেই রাত প্রভাত!

এই সব কাণ্ড যতই দেখ্‌ছি, ততই যেন আশ্চর্য্য জ্ঞান হোচ্চে। এরা সব করে কি? মথুরা ছেড়ে বৃন্দাবনে এলেম, আশ্রয়দাতা পিতার বাড়ী ছেড়ে মামার বাড়ী এলেম, এখানেও এই সব কাণ্ড! সেখানকার কাণ্ড চেয়ে মামার বাড়ীর কাণ্ডটা যেন আরো জম্‌কালো। ধন্য—মামার বাড়ী!

একবিংশ চক্র।

—:০:—

জাল দলিল।

মামার কারবার বেশ চোল্‌চে। মামা আমাদের ক্রমেই বেশী বেশী ভালবাস্‌চেন। অবসরকালে আমাদের নিয়ে কত গল্প করেন, ছেলে মানুষের মত বায়না করেন, কত আদর করেন, হাসিখুসী রং তামাসা করেন। যখন গদীঘরে থাকেন, তখনো অবসর পেলে ডেকে পাঠান। আমরাও প্রায়

যাই।—লোকজন থাক্‌লেও যাই, না থাক্‌লেও যাই। যাব না কেন? আমরা ত আর বাড়ীর বউ নই, আমরা বাড়ীর ঝিউড়ী, কোথাও যেতে আস্‌তে আমাদের অবার লজ্জা কি?

একদিন গদীঘরে যাচ্চি, দেখি, দুজন বড় বড় ভুঁড়ীওলা মাড়ওয়ারী কেদারা জুড়ে বোসে মামার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইচে। মামার ত আমিরী চাল্—নবাবী কথা,—লম্বা চৌড়া বিষয়ের গল্প,—একগুণকে দশগুণ কোরে বোল্‌চেন! মারওয়ারী দুজন ঘাড় নেড়ে মামার কথায় সম্মতি জানাচ্চে। মামা বোল্‌চেন, "বেশী দিন নয়, তিন মাস মেয়াদ থাক্‌বে, কিন্তু বোধ হয় একটা মাসও যেতে দিব না। মাসের মধ্যেই বেবাক কাবার হয়ে যাবে। মাদ্রাজের দাদাভাই বিষণজী আর কোল্‌কাতার রাজাবাবু, এই দুজনের হুণ্ডি কখানা এসে পোড়্‌লেই একদিনে শোধ হবে। সব হুণ্ডি যদি নাও আসে, যদি অর্দ্ধেক—দশ আনা ছেড়ে ছ-আনা আসে, তা হলেও ত্রিশ লাক। ভাবুন দেখি, যদি ত্রিশ লাক হাতে এলো, তা হলে বিশ লাক শোধ দিতে কতক্ষণ? নেয্য সুদ সওদা আছে ত? সেটাও ত ঘরে উঠ্‌বে? টাকা বসিয়ে রাখা মহা দোষ! টাকা না খাট্‌লে বাড়্‌বে কিসে? আর এদিকে ধরুন, টাকা আপনার ঘরে থাক্‌লেও যা, আমার ঘরে থাক্‌লেও তাই, কেমন?—বলি এ বিশ্বাসটা আছে ত?" মাড়ওয়ারী দুজন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। মামা বোল্লেন, "আপনাকে সে সব হুণ্ডি, বরাতি, বন্ধকী কট নোট দিব, সে সব আঁয়া টাকা। যখন খুস, আদায় হবে। ইচ্ছে কোল্লে এখনি আদায় হয়, তবে তারা চিরদিনকার দেনা লেনার পাত্র, একদিনে কি এমন কাজটা করা যায়? দাদন বন্ধ রাখ্‌বার উপায় নাই বোলেই বোল্‌চি, তা না হলে বিশ লাক টাকা আবার টাকা, তাই আবার বন্ধক রেখে ধার!" মাড়ওয়ারী দুজন সম্মতি জানিয়ে বোলে গেল, "কালই টাকা পাবেন। মোক্তারকে সঙ্গে নিয়ে আমার গদীতে যাবেন। দলিল সব যেন সঙ্গে যায়। আপনাকে টাকা দিব, তাতে আর কথা আছে কি?" বিদায়কালে উভয় পক্ষের শিষ্টাচার প্রদর্শনে ত্রুটি হলো না।

মামা সে দিন আর আমাদের সঙ্গে বড় একটা কথা কইলেন না। আমাদের দিকে চেয়ে একবার হেসেই—আবার গম্ভীর ভাবে কাগজ ঘাঁট্‌তে লাগ্‌লেন। একঘণ্টা পরে কাগজ থেকে চোক তুলে—নাকের

চস্‌মা হাতে নিয়ে বল্লেন, "আজ তোমরা বাড়ীর মধ্যে যাও। বড় কাজ—ভারী ব্যস্ত আছি।" আমরা চোলে এলেম। মামা তখনি আবার হাতের চস্‌মা নাকে এঁটে—কাগজ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

সমস্ত রাতের মধ্যে মামা আর বাড়ীর মধ্যে এলেন না। মামা আর সরকার দুজন গদীঘরেই আহার কোরে সমস্ত রাত কাগজ নিয়ে কাটালেন। সকালেই নেয়ে—যোগেযাগে চাট্টি খেয়ে—এক মোট কাগজ নিয়ে, সরকার দুজনের সঙ্গে মামা বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যাকালে মামা বাড়ী এলেন। লোহার সিন্দুক খোলার ধুম পোড়ে গেল। মামার ঘরে ৭টা লোহার সিন্দুক। সিন্দুকের চাবি আবার একটা আলাদা লোহার সিন্দুকের মধ্যে থাকে! প্রাতে ৯টা পর্য্যন্ত মামা সেই সব সিন্দুক খুল্‌তে—বন্ধ কোত্তে লাগ্‌লেন! এ সব কাজ শেষ কোরে মামা গম্ভীরভাবে বাইরে এসে বোস্‌লেন। আমরা যেমন যাই, তেমনি কাছে গিয়ে বোস্‌লেম। ভাল কোরে কথা কইলেন না। বোসে থেকে থেকে ফিরে এলেম। সাত আট দিন গেল, মামার আর সে গাম্ভীর্য্য ঘুচ্‌লো না। সর্ব্বদাই মামা যেন কোন অকুল ভাবনা ভাবেন।

একদিন আমরা আপনার ঘরে শুয়ে আছি, এক্‌টা গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দুন্‌দাম্‌ শব্দে কপাট ভাঙ্গা, চৌকাট ভাঙ্গা, জানালা ভাঙ্গা, হৈ হৈ শব্দ, মস্ত গোল! মনে ভাবলেম, ডাকাত পোড়েছে! মামার অনেক টাকা। টাকার গুজোব শুনে ডাকাতের দল বাড়ী লুঠ কোচ্চে। আবার ভাবলেম, তাই বা কি কোরে হবে? সমস্ত রাতের পর ভোর বেলা কি ডাকাত পড়ে? তাদের প্রাণের কি ভয় নাই? কাণ্ডটা কি? দেখতে বড় সাধ গেল। সুশীলাকে খিড়্‌কীর দরজায় বসিয়ে রেখে, ফিরে আবার মামার ঘরের দিকে গেলেম। দেখি, লোকে লোকারণ্য! লাল পাগ্‌ড়ীবাঁধা বড় বড় লাঠি হাতে যমদূতের মত চেহারা—সিপাহীর দল এ ঘর ওঘর সন্ধান কোরে বেড়াচ্চে। পিসি, নীলাবউ, বৌ রাণী, সকলেই ধরা পোড়েছেন। মামা আর ত্রিপুরারিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। মামার ঘরে বড় বড় তালা বন্ধ কোরে ৪জন সিপাহী পাহাড়া দিচ্চে। গতিক বড় খারাপ দেখে, এখনি হয় ত আমাকেও ধোর্‌বে ভেবে, সাঁ কোরে নীচে নেমে এলেম। সুশীলা বাড়ী থেকে যে টাকা এনেছিল, তা আমার কাছেই ছিল।

সেই টাকাগুলি নিয়ে একেবারে খিড়্কীতে এসে উপস্থিত হলেম। সুশীলাকে বোল্লেম, "আর দেরি কোরো না। এস পালাই।" এই কথা বোলেই আমি অগ্রসর হলেম। সুশীলা বোল্লে, "কি? হয়েছে কি?" আমি তার দিকে আর না চেয়ে যেতে যেতেই বোল্লেম, "পরে শুন্‌বে! আগে প্রাণ বাঁচাই, শেষে সে সব কথা।" সুশীলা বোল্লে, "তবে যাব কোথা?" আমি বোল্লেম, "যে দিকে চোক্ যায়।" সুশীলা আর কোন কথা না বোলে আমার সঙ্গে এলো! দুজনে দ্রুতপদে পশ্চিম দিকে চোল্লেম।

আমরা যাচ্চি। কোথায় যাচ্চি, তার স্থিরতা নাই, তবুও যাচ্চি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুজন লোকে কথাবার্ত্তা কইচে শুন্‌তে পেলেম। একজন বোল্‌চে, "হাঁহে! দীনবন্ধু পাঁড়েজী অত বড় লোক, এমন ধনী মহাজন, তাঁর বাড়ীতে এ সব হাঙ্গামা,—ব্যাপারটা কি? কথাটা ত ভাল নয়।"

কথাটা শুনে আস্তে আস্তে চল্লেম। বড় দ্রুত যাচ্ছিলেম, বেগ একটু কমিয়ে উত্তরটা কি হয়, শুন্‌তে লাগ্‌লেম। দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর কল্লে, "তা বুঝি জান না? দীনবন্ধু ভয়ানক জুয়াচোর! কেবল ফাঁকা পসারে, শুধু হাঁড়িতে পাত বেঁধে বড় নাম কিনেছিল। টাকা ছিল না, কড়ি ছিল না, কেবল একটা জম্‌কালো নাম কিনে জুয়াচুরী খেলার আসর পত্তন কোরে রেখেছিল। এখন তাই ধরা পোড়ে গেছে। আরে ভাই! ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। গুরুজী বিশ্বনাথজীর সঙ্গে বরাবর লেনাদেনা ছিল। প্রথম প্রথম কম কম টাকা নিয়ে আবার তখনি তখনি শোধ দিয়ে বড় বিশ্বাস জন্মিয়েছিল। শেষে সেদিন কতকগুলো দলিল বন্ধক রেখে একেবারে বিশ লাক টাকা সাইৎ কোরে চম্পট দিয়েছে। যে সব দলিল বন্ধক আছে, সব জাল! যারা কস্মিন্‌কালেও দীনবন্ধুকে চেনে না, সেই সব বড় বড় লোকের নামে জাল দলিল তৈয়ার কোরে এই কাণ্ডটা কোরেছে। রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণের নামের একখানা ত্রিশ হাজার টাকার কট থাকে। তাতে তাঁর জমীদারীর কখানা পরগণা বাঁধা ছিল। রাজার মোক্তার আবার গুরুজীর ভগ্নীপতি কি না, সে আজ কদিন হলো এসেছিল। গুরুজী তাঁকে দেখাতেই সে অবাক হয়ে যায়। রাজার টাকার অভাব কি যে, বন্দক দিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা নেবেন! মোক্তার সেরেস্তায় তদন্ত কোরে জাল দলিল ধরিয়ে দিয়েছে। একখানাতে সন্দেহ হয়েছে বোলে সবগুলি যাচাই হয়।

যাচাই কোরে প্রকাশ পেয়েছে, সব জাল! তাই তাকে ধোত্তে ঘাঁটির লোক, দারোগা, বাড়ী ঘেরাও কোরেছে, কিন্তু আসামী পাওয়া যায় নাই। পাকা ঘাগী কি না, টাকাকড়ি নিয়ে কোথায় সোরে গেছে। কি সর্ব্বনেশে জুয়াচুরী! কত দিনের জোগাড়ে তবে এই কাজটা কোরেছে, একবার ভেবে দেখ দেখি?" প্রথম লোকটী এর উচিত জবাব দিয়ে চোলে গেল।

কাণ্ডটার যেটুকু জান্‌তে বাকী ছিল, তা প্রকাশ হয়ে গেল। সব কথাই জান্‌তে পাল্লেম। এতদিনে জানলেম, মামা একজন জুয়াচোরের গুরুমহাশয়!

এখন আমরা যাই কোথা? প্রাণের মধ্যে ভয় আছে, পাছে ধোরে নিয়ে যায়! যে ভয়ে মথুরা ছেড়ে পালালেম, কত কষ্ট পেলেম, এখানেও আবার সেই ভয়! এখন তবে আমরা যাই কোথা?

কেবল যে যাই কোথা, তাও নয়। মাঝে মাঝে মামার ভাবনাও ভাবচি। কি আশ্চর্য্য! এমন জুয়াচুরী? এত টাকার দলিল কি সবই জাল? যা এতদিন দেখ্‌লেম, যা নিয়ে এত কারকারবার, সে সবই জাল দলিল?

দ্বাবিংশ চক্র।

——:•:——

এইবারই বুঝি গেলেম।

বৃন্দাবন ছেড়ে—গিরিগোবর্দ্ধন ছেড়ে আমরা মাঠের মধ্যে এসে পড়েছি। গিরিগোবর্দ্ধন এক রকম বৃন্দাবনের সীমানা। গিরিগোবর্দ্ধন ছাড়ালেই মাঠ। এখান হইতে একটা পাথরের উঁচু রাস্তা বরাবর দক্ষিণ দিকে চোলে গেছে। আমরা সেই রাস্তা ধোরে চোল্লেম। বেলা তখন বড় জোর ৯টা। খুব হাঁট্‌চি।—প্রাণপণ শক্তিতেই হাঁট্‌চি। এত হাঁট্‌তে বুঝি পুরুষ মানুষেরাও পারে না।

রাস্তা বেশ পরিষ্কার। কেবল দুধারে বড় বড় গাছ, আর স্থানে স্থানে এক একটু বন। বড় বন নয়—ঝোপ। আমরা নিঃশব্দে যাচ্চি।

বৃন্দাবন ছেড়ে অনুমান হলো প্রায় চার ক্রোশেরও বেশী এসেছি। ব
পরিশ্রম হোয়েছে, একটা আশ্রয় পেলেই—একটা লোকালয় দেখ্লে
আশ্রয় নেব, মনে মনে সংকল্প আছে ; কিন্তু রাস্তার যেমন দৌড়
তাতে কতদূরেই যে লোকালয় আছে, তা অনুমানেও আন্তে পাচি
না। পাছে সমস্ত দিন হেঁটেও আশ্রয় না পাই,—পাছে রাত্রে অনাহা
দুটীতে এই রাস্তার ধারে গাছতলাতেই কাটাতে হয়, এই ভয়ে প্রাণপ
চেষ্টায় হাঁটচি। সে কি হাঁটা! প্রায় এক রকম দৌড়।—দৌড়
দৌড়!—ভোঁ দৌড়!

অন্যমনস্কভাবে যাচ্চি, পাছের দিকে ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক শব্দে কি ডেকে
উঠ্লো। পেছুন ফিরে দেখি, একটা ভালুক! গায়ে বড় বড় লোম, ব
বড় দাঁত, প্রকাণ্ড আকার, ঐ রকম বিশ্রী শব্দে ডাক্তে ডাক্তে আমাদে
দিকে আস্চে। মনে মনে ভাবলেম, এইবারেই বুঝি গেলেম!

আমি আগে, সুশীলা আমার পেছু পেছু আস্চে। ভালুকের দৌ
দেখে সুশীলা প্রাণপণে দৌড়াতে লাগ্লো। আমিও যথাসাধ্য দৌড়ালেম
আমি তবু অনেকটা দৌড়াতে পারি, সুশীলা কিন্তু তত দৌড়াতে পারে না
একটু দৌড়াতে না দৌড়াতে ভালুকটা এসে সুশীলাকে জড়িয়ে ধোল্লে
সুশীলা চীৎকার কোরে কেঁদে—আমাকে সাহায্য কোত্তে বোল্লে। আমি
এখন পালাই, কি সুশীলার কাছে যাই?

সুশীলার কাতরতা দেখে একবার দাঁড়ালেম। আবার ভাব্লেম
ভালুকের মুখ থেকে রক্ষা করা আমার সাধ্য নাই। ভালুকের কাছে
গেলে হয় ত আমারও ঐ দশা হবে। আপনার প্রাণরক্ষাই সকলে
আগে উচিত। লোকে আমাকে পাপিষ্ঠা বলুক,—মায়াদয়াহীন বলুক
আমি কিন্তু দাঁড়ালেম না। সুশীলার ভাগ্যে যা হয় হোক, আমা
ভাগ্য নিয়ে আমি আবার দৌড় দিলেম।

কতক্ষণ দৌড়ানো যায়? একে পথ হাঁটার কষ্ট,—তখনি তৃষ্ণা পেয়ে
ছিল, তার উপর আবার দৌড়, আর কতক্ষণ পারা যায়? করি কি
বড় একটা গাছের উপরে উঠে কোটরের ভিতর লুকিয়ে লুকিয়ে সুশীলা
অবস্থা দেখ্তে লাগ্লেম। সুশীলা বেশী দূরে নয়, চীৎকার শোনা
যাচ্ছে,—গাছের উপরে আছি বোলে দেখাও যাচ্ছে। উঁকি দিয়ে দেখ্‌চি
আর কাঁদ্‌চি।

ভালুকটা ঠিক্ মানুষের মত সুশীলাকে জড়িয়ে ধোরে টানাটানি কোচ্চে। সুশীলা নিতান্ত নির্জ্জীব ছিল না। সে চেঁচাচ্চে,—প্রাণপণে চীৎকার কোচ্চে, আর ভালুকের হাতের বাঁধন ছাড়াতে চেষ্টা কোচ্চে।

চারজন লোক ছুটে এলো! খুব বড় বড় লাঠী হাতে চারজন ভোজপুরে জোয়ান ছুটে এলো। অভয় দিয়ে বোল্লে, "ভয় নাই।" একজন এসে হাস্‌তে হাস্‌তে ভালুকটার ল্যাজ ধোরে টান্‌তে লাগ্‌লো। অদ্ভুত সাহস! ভালুকটা সুশীলাকে ছেড়ে দিয়ে মানুষের মত দাঁড়িয়ে রইল। মানুষের মত হেঁটে বেড়াতে লাগ্‌লো। এটা আবার আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার! যেন ভোজবাজী!

সুশীলাকে সঙ্গে কোরে, সকলে আমার দিকেই আস্‌তে লাগ্‌লো। বড় বড় কথায় জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তোর সঙ্গে আর কে ছিল?" এ সব কথা আমি বেশ শুন্‌তে পাচ্চি। তখন এরা প্রায় আমার নিকটেই এসেছে। সুশীলা বোল্লে, সঙ্গে কেবল আমার দিদি ছিলেন।

"কোথা তোর দিদি?"

"পালিয়ে গেছেন।"

"কোন্ দিকে?"

"জানি না।"

একজন লোক সুশীলার হাতখানা ধোরে জোরে জোরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বোল্লে, "বল্ না, আর ঢাকিস্ কেন? সত্যি কথা বল্? কোন্ দিকে গেছে দেখিয়ে দে? তা না হলে এক লাঠিতে—হুঁ—একেবারে সাইৎ কোরে দেব।" সত্য সত্যই লাঠি তুল্লে। সুশীলা যেন আঁৎকে উঠে—ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোল্লে, "ধর্ম্মতঃ বোল্‌চি, আমি তা জানি না। ভালুক-মানুষটার সঙ্গে জড়াজড়ি কোত্তে—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সব ভুলে গেছি। কিছুই আমি দেখ্‌তে পাই নাই।"

একজন বোল্লে, "উঁহুঁ—কথা বড় ভাল নয়। সোজা পথে যায় নাই। সোজা পথে ধরা পড়্‌বার ভয়ে নিশ্চয়ই বাঁকা পথে গেছে।" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে লোকগুলো আমি যে গাছে আছি, ঠিক সেই গাছের তলায় এলো। সেইখানে বোসে হাঁপ জিরুতে লাগ্‌লো। ভয়ে ত আমি কাঠ!

আমার প্রাণ ত উড়ে গেল! একেবারে গাছের সঙ্গে মিশে—নিশ্বাস পর্য্যন্ত যেন বন্ধ কোরে রইলেম। বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ কোত্তে লাগ্‌লো। প্রাণ পদ্মপত্রের জলের মত কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। করি কি?

প্রায় আধঘণ্টা কাল জিরিয়ে—সুশীলাকে নিয়ে তারা বড় রাস্তা হোতে যে একটা সরু রাস্তা বেড়িয়েছে, সেই রাস্তা দিয়ে চোলে গেল। সুশীলা বারম্বার জিজ্ঞাসা কোল্লে,—কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞাসা কোল্লে, হাঁ গা! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চ?" কেউ কোন উত্তর দিলে না। বারম্বার বোল্‌তে একজন লোক জোড়ে তেড়ে উঠ্‌লো। সুশীলা আর দ্বিরুক্তি না কোরে কাঁদ্‌তে কঁদ্‌তে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চোল্লো। বেলা তখন দুপুরের কাছাকাছি।

লোকগুলি অনেক দূর গেলে আমি ধীরে ধীরে নাম্‌লেম। গাছে থাক্‌লে ত আর চোলবে না,—কোথাও আশ্রয় ত নিতে হবে, তাই অগত্যা গাছ থেকে নাম্‌লেম।

দুজনে ছিলেম, আজ একা হলেম। দুজনে একত্রে একপ্রাণ হয়েছিলেম; বিধাতার তাও বুঝি সৈল না! আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি,

এ বিপদ আমার হলে ততটা ভাব্‌তেম না, কিন্তু সুশীলা বিপদের কিছুই জানে না, তার এ বিপদ বড়ই শোচনীয়। না জানি তাকে দস্যুরা কত কষ্টই দেবে। সুশীলা যন্ত্রণায় যখন ত্রাহি ত্রাহি কোরবে, না জানি, তখন আমার নাম কোরে কত দীর্ঘনিশ্বাসই ফেল্‌বে—কত শাঁপই দেবে। হয় ত সেই পাপে আমাকে কত কষ্ট পেতে হবে, সেই পাপে আমার হয় ত নরকেও স্থান হবে না। আমি যেমন দস্যুর চক্রে—বদমায়েসের হাতে পোড়ে বারম্বার যত কষ্টই পাচ্চি, কষ্টের তত্ত্ব জেনেও আমিই ত আবার একজনকে এই কষ্ট দিলেম। আমি সুশীলাকে ত্যাগ না কোল্লে, সে হয় ত এতটা কষ্ট পেতো না। ভালুক ত সাজা-ভালুক! দুজনে থাক্‌লে হয় ত তার হাতে পরিত্রাণ পাওয়া যেতো। এই সব চিন্তা কোরে বড়ই দুঃখ হলো। গাছতলায় বোসে বোসে আপন মনে অনেকক্ষণ কাঁদ্‌লেম।

কেঁদে আর ফল কি? এখানে বেশীক্ষণ থাক্‌লে আবার হয় ত বিপদ ঘোট্‌তে পারে, এই সব ভেবে উঠ্‌লেম। আবার সেই বড় রাস্তা ধোরে চোল্লেম। বেলা তখন প্রায় ১টা।

যাচ্চি, আর সুশীলার কথা মনে হচ্চে। সুশীলা যে ভালুকের প্রথম আক্রমণে চীৎকার কোরে বোলে উঠেছিল, "এইবার বুঝি গেলেম!" সেই কথাটাই বারম্বার মনে হচ্চে। কত ভাবনা আস্‌চে—কত ভাবনা যাচ্চে, সেই ভাবনার মধ্যেই যেন ধাঁ কোরে মনে হোচ্চ, সুশীলার সেই কথা, এইবার বুঝি গেলেম!

ত্রয়োবিংশ চক্র।

অনাথ-আশ্রম।

আপনার মনে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সোজা বাঁধা রাস্তা ধোরে চোলেছি। যে দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই মাঠ,—সেই দিকেই ছোট ছোট বন, সেই দিকেই বড় বড় গাছ। লোকালয়ের চিহ্নমাত্রও দেখা যাচ্চে না। তাই ভয়ে ভয়ে আরও দ্রুতপদে চোলেছি। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর

ক্রমেই অবসন্ন হচ্চে, বারম্বার পায়ে হুঁচোট লাগ্‌ছে, তবুও চোলেছি। রাস্তার যেমন ভাব, তাতে আজ সন্ধ্যার মধ্যে যে আশ্রয় পাব, এমন আশা নাই। তবুও আশায় আশায় ক্রমেই অগ্রসর হচ্চি।

সুশীলাকে ত্যাগ করে পর্য্যন্ত আমার প্রাণের ভিতর যে কি কষ্ট হোচ্চে, তা কথায় প্রকাশ করা যায় না। যাকে এতদিন হৃদয়ের নিভৃতে পুষ্‌লেম, যাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাস্‌তেম, জানি না, কোন্‌ প্রাণে তাকে পরিত্যাগ কোল্লেম। এ কি মনের গতি?—এ কি মনের স্বভাব? মনের গতিই লোকের সুখ দুঃখ, কার্য্য অকার্য্য সকলেরই মূল। মনের যখন যে গতি, কার্য্যে তখনি তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই বোল্‌ছিলেম, পোড়া মনের গতি এক মুহূর্ত্তে কেন এমন পরিবর্ত্তিত হলো? হায়! কেন সুশীলাকে ত্যাগ কোল্লেম? কেন আমিও তার সঙ্গে গেলেম না? দুঃখ হোক, কষ্ট হোক, দুজনে ত একসঙ্গে থাক্‌তেম। তা হোলে আর এ চিন্তা-আগুনে পুড়্‌তে হতো না।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, তখনও চোলেছি। চোলেছি, কিন্তু আশাও পেয়েছি। দূরে কখানা ঘর দেখা যাচ্চে। এই রকম মাঠের মধ্যে এদেশের গরিব লোকদের দু-পাঁচখানা ঘর বেঁধে থাক্‌তে দেখেছি। তাই সাহস হয়েছে, আশা আছে, এদের এখানে রাত্রে অবশ্যই আশ্রয় পাব। অন্ততঃ মাথা গুঁজে থাক্‌তেও পাব। এ সময় এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট, এই ভেবে দ্রুতপদে সেই ঘরগুলির নিকটে এসে পৌঁছিলেম।

ঘরগুলি নয়, একটী বাড়ী মাত্র। নিকটে এসে দেখ্‌লেম, রাস্তার পশ্চিব দিকে রাস্তার পাশে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ; গাছেরতলাটী পাকা বাঁধান। সেই গাছের নীচেই এই বাড়ী। অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বাড়ীর মধ্যে খান চার ঘর প্রাচীরের উপর দিয়ে নজর হয়। বাড়ীর মধ্যে লোকজনের কথা শুনলেম। সাহস হলো, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কর্‌বার আগে সেই বাঁধানো গাছতলায় বোসে একটু জিরুলেম।

বোসে আছি, হঠাৎ বাড়ীর দরজার দিকে নজর পোড়্‌লো। মস্ত দরজা, সেই দরজার উপরে প্রকাণ্ড একখানা কাঠ মারা। সেই কাঠের উপর হিন্দি আর বাংলাতে ছোট বড় অক্ষরে অনেকগুলি কথা লেখা আছে। লেখা দেখে কৌতূহল হলো। পোড়্‌তে সাধ গেলো। একটু নিকটে গিয়ে পোড়ে দেখ্‌লেম। সেই কাঠখানাতে লেখা আছে,—

অনাথ-আশ্রম।

মহা-প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা গণ্ডকেশ্বর সিংহ
রায় বাহাদুরের ব্যয়ে পরিচালিত।

এস—প্রবেশ কর—বাধা নাই।

অন্ধ ও খঞ্জ ও মূক ও বধির ও পীড়িত ও রুগ্ন ও সন্তপ্ত ও আশ্রয়শূন্য ও
অনাথ ও পথিক ও দরিদ্র ও ভিক্ষুক ও ফকির ও যোগী ও ভোগী ও
সন্ন্যাসী ইত্যাদি ইত্যাদি সকলের জন্যই এই—

"অনাথ-আশ্রম"

সর্ব্বদা খোলা আছে।

রাত নাই, দিন নাই, সময় নাই, অসময় নাই,

সর্ব্বদাই খোলা থাকে।

যে যেমন লোক, ব্যবস্থাও তদ্রূপ।

আহার, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য, পাথেয়, পথ-প্রদর্শক, সব ব্যবস্থাই হয়।
পরিচারক, পাচক, পরিদর্শক, চিকিৎসক, সম্বাধক, বণ্টক,
পরিচ্ছাদক, পরিপোষক, বালক-তোষামোদক, স্ত্রী-
তোষামোদক, সকলেই ভদ্র, শান্ত এবং বিনম্র।
বাঙ্গালী, বাঙ্গালিনী, পশ্চিমা, পশ্চিমানী, মুসলমান, মুসলমানী, স্ত্রীগণ,
পুরুষগণ, অকুতোভয়ে আইস, আহার কর, কাপড় লও,
চিকিৎসা করাও, পথ্য পাও।

অনাথ-আশ্রম—অনাথদিগের জন্য!

শ্রীবনবিহারী লাল।

অধ্যক্ষ।

এইগুলি সমস্ত পড়্‌ছি, একদৃষ্টে—এক মনে পড়ছি, কোন দিকে এতক্ষণ দৃষ্টি ছিল না, পাঠ শেষ কোরে দেখি, নিকটেই একজন বৃদ্ধ আমার দিকে হাঁ কোরে অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

লোকটা বৃদ্ধ। বড় বড় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, লম্বা নাক, কোটরের মধ্যে চোক, চোকের কোণে ক্ষীরোদ-সমুদ্র মন্থন হোচ্চে, দাঁতগুলি লম্বা লম্বা ফাঁক। আজন্ম দন্তসংস্কার হয়েছে বোলে বোধ হয় না! বেজায় লম্বা, যেন তালগাছ। পা দুখানি যেন কুলো। পায়ে মাংসের সম্পর্ক নাই, যেন দুখানা গরাণের খুঁটি। গায়েও মাংস নাই। পরণে একখানি ছোট কাপর হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত অতি কষ্টে ঢেকে আছে।

আমার পড়া শেষ হোতেই বৃদ্ধ দাঁত বা'র কোরে বিকট হেসে, হিন্দিতে বোল্লে, "ভিতরে এসো।" আমি দ্বিরুক্তি না কোরে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম।

বাড়ীর মধ্যে বড় ঘর দু-চারখানি। আর ছোট ছোট চালা ঘর সেই প্রাচীরের গায়ে অনেকগুলি। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোরেই দেখ্‌লেম, একখানি বড় ঘরের দাওয়ায় কম্বল পেতে বোসে একজন বাঙালী বাবু একটী হিন্দুস্থানীর সঙ্গে দাবা খেল্‌চেন। আমি প্রবেশ কোত্তেই একবার আড়-চোকে চেয়ে আবার দাবা খেলায় মন দিলেন।

বৃদ্ধ আমাকে একখানি চালাঘরে নিয়ে গেল। আবার সেই রকম দাঁত বা'র কোরে বোল্লে, "যে ক-দিন থাক্‌বে, সে ক-দিনের জন্যে এই ঘর তোমার ঠিক রইল।" এই বোলে সে কোথায় বেরিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে একখানি মাচান। বাঁশের খুঁটার উপর তক্তা পাতা। তার উপর একখানি তোষক, একখানি চাদর আর একটী বালিশ। অতিথির পক্ষে এইরূপ বিছানাই যথেষ্ট। বাসনের মধ্যে একটী বড় ঘটী; আর জল-খাবার জন্য একটী বড় চুম্‌কী। ঘরের কোণে একটী জলের কলসী। এই ঘরের সাজ-সরঞ্জাম এই পর্য্যন্ত।

বৃদ্ধ একটু পরেই ফিরে এলো। একখানি নূতন কাপড় দিয়ে বোল্লে, "কাপড় ছাড়। ঐ কলসীতে জল আছে, হাত মুখ ধোও।" আমি হাতে মুখে জল দিলেম। সমস্ত দিনের পরিশ্রম, হাতে মুখে জল দিতে বড় তৃপ্তি বোধ হলো। একজন চাকরাণী, সিকিখানি খরমুজা, একটুকু চিনি আর একদলা ক্ষীর, জল খেতে দিলে। জল খেয়ে একটু শুলেম। ইচ্ছা ছিল,

চারদিকে বেড়িয়ে একবার ভাল কোরে দেখি, কিন্তু শরীর বড় ক্লান্ত থাকায় আর পাল্লেম না, শুলেম। অমনি তখনি একবারে নিদ্রা।

বৃদ্ধের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি ঘরে প্রদীপ জ্বল্‌চে। বৃদ্ধ, আহারাদির আয়োজন হয়েছে, এই সংবাদ নিয়ে এসেছে। বিলম্ব না কোরে তখনি বৃদ্ধের অনুসরণ কোল্লেম।

একটী পৃথক্ ঘরে একখানি শালপাতে একটী স্ত্রীলোক আমাকে ভাত এনে দিলেন। ভাত দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম কি গা?" আমি বোল্লেম, "হরিদাসী।" আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি জাত?" আমি বোল্লেম, "ব্রাহ্মণ।" স্ত্রীলোকটী বোল্লেন, স্বচ্ছন্দে খেতে পার। আমিও ব্রাহ্মণের মেয়ে।" স্ত্রীলোটী হিন্দুস্থানী। যাই হোক, সে সময়ে আর তত বিচার আচার কোরে কাজ নাই ভেবে আহার কোল্লেম। আহার শেষ হলে, আচমন কোরে আবার সেই ঘরে এসে দরজা দিয়ে শুলেম, কোথা দিয়ে রাত প্রভাত হলো, জান্‌তে পাল্লেম না!

প্রভাতেই ঘুম ভেঙেচে, কিন্তু এখনো বিছানা হোতে উঠি নাই। শুয়ে শুয়ে কত ভাবনাই ভাবছি। আমার ভাবনা যত ভাবছি, সুশীলার ভাবনা তার চেয়েও বেশী। ছেলেমানুষ, কখন বিপদ আপদ জানে না, তারই এই বিপদ!—ধোত্তে গেলে তার বিপদের মূলই আমি! বাড়ী থাক্‌লে দুদিন না হয় কষ্ট পেতো, কিন্তু তাতে ত আর ফাঁসি হতো না? দুদিন টানাছেড়া কোরে অবশ্যই ছেড়ে দিত, তা হলে মায়ের বাছা মায়ের কাছেই থাক্‌তে পেতো। আমার কুমন্ত্রণায় মামার বাড়ী এসেই সুশীলার এই বিপদ!

এই রকম ভাব্‌ছি, এমন সময় সেই বৃদ্ধ একটা বাটীতে একটু তেল দিয়ে বোল্লে, "নাইবে না?—বেলা হয়েছে—ভাত হয়েছে। মিছে আর দেরী কেন?"

তেল মেখে বৃদ্ধের সঙ্গে গেলেম। যেতে যেতে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "হাঁ গা! তোমার নাম কি?" বৃদ্ধ হেসে—একেবারে চারপাটী দাঁত বা'র কোরে বোল্লে, "রামভজন।" কেবল নামটী মাত্র জিজ্ঞাসা কোত্তেই রামভজন তার সুদীর্ঘ জীবনচরিত আরম্ভ কোল্লে। বাড়ী তার পীয়ারনগর, আগবার নিকট। দেশে তার এক ছোট ভাই আছে, এক ছেলে আছে, প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর রামভজন আবার বে কোরেছে, কিন্তু ছোট ভায়ের জ্বালায় রামভজনের ঘরে সুখ নাই। পরিবার রামভজনের উপর ভারি চটা

কনিষ্ঠের প্রতিই সে বেশী অনুকূল, তাই রামভজন মনের দুঃখে দেশ ছেড়ে এখানে কাজ কোত্তে এসেছে। এখানে খোরাক পোষাক আর নগদ পাঁচ সিকা বেতন পায়। তার সিকি পয়সাও ঘরে দেয় না। নিজে ভাল মন্দ খায়,—আর জমায়। পরিবারের কথায় রামভজনের চোকে জল এলো। বানের জল পুকুরে প্রবেশ কোরে যেমন পানাগুলি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, রামভজনের চোকের জলধারা তার চোকের আবর্জ্জনাও সেই রকম ভাসিয়ে নিয়ে গেল। রামভজনের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে সেই বাড়ীর বাইরে, পেছুন দিকে একটা ঘেরা জায়গায় এসে উপস্থিত হলেম। দেখ্‌লেম, বড় একটা টবে জল বোঝাই। রামভজন আমাকে প্রবেশ কোত্তে বোলে দরজায় দাঁড়িয়ে থাক্‌লো। আমি নেয়ে আবার ঘরে এলেম। কাল যে কাপড়-খানি দিয়েছিল, তাই পোরে এ কাপড়খানি ছেড়ে শুকুতে দিলেম। জল খেলেম, তখনি ভাতও প্রস্তুত। আহারাদি সেরে একেবারে ঘরে এসে বোস্‌লেম। আবার সেই চিন্তা! ঘরে কেউ নাই, এক্‌লা আছি, ঘরটী বেশ নির্জ্জন, তাই আবার চিন্তা।

ভাব্‌চি, এমন সময় অনাথ-আশ্রমের বড়বাবু এলেন। আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি নাম বোল্লেম, নিবাস বোল্লেম—উত্তর দেশে, "ঢাকা।" বাবুটী কাগজে সেগুলি লিখে নিয়ে, বোল্লেন, "এখানে কি কোরে এলে? কোন বিপদে পোড়েছিলে কি? সত্য বল, প্রকাশ হওয়ার কোন ভয় নাই। তবে প্রতিকার কোত্তে চাও, তাও আমাদের হাত, না চাও, তাও ভাল। সত্য কথা বল। গোপন কোরো না।" এ কথার কি উত্তর, তা ভেবেই পেলেম না। শেষে বোল্লেম, "না, কোন বিপদে পড়ি নাই।"

"টাকা কড়ি সঙ্গে আছে?"

টাকার কথাটা বলা ভাল নয়। টাকার জন্যে বিপাকে পড়াও আশ্চর্য্য নয়। জগতে যত অনর্থ ঘটে, তার অর্দ্ধাংশ টাকার জন্যে। ভেবে চিন্তে উত্তর কোল্লেম, "না, টাকাকড়ি কিছু আমার নাই।"

"আছে যেন বোধ হচ্চে।" বাবুটী সন্দেহ কোরে বোল্লেন, "আছে যেন বোধ হচ্চে। তা গোপন কর্ব্বার দরকার নাই, সাবধানে রেখো!" এই পর্য্যন্ত বোলে তিনি তখনি যথাস্থানে চোলে গেলেন।

চার দিন কাটালেম। এই চারিদিনে কত গরিব, কত অনাথ এলো, এক বেলা—কেউ বা দুবেলা খেয়ে চোলে গেল। আমিই কেবল চারদিন

কাটালেম। আমার যাবার ত আর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, তাই ততটা চাড় নাই। না তাড়িয়ে দিলে বুঝি যাওয়া হবে না, মনের গতিটেই প্রায় এই রকম।

পাঁচদিনের দিন বৈকালে একটী ভাল পোষাক-পরা বাবু এলেন। বাবুটীর বয়স কম, ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যেই। বেশ চেহাবা। সঙ্গে একজন চাকর এক্‌টা ব্যাগ নিয়ে আছে।

বাবু এসেই বোল্লেন, "মহাশয়! এখানে কি আজ আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে? আমি বৃন্দাবন যাব। গাড়ীতে আস্‌ছিলেম। রাস্তায় ঘোড়ার সর্দ্দি গর্ম্মি হলো বোলে, আর আমার যাওয়া হলো না। প্রায় দু-ক্রোশ রাস্তা হেঁটে আস্‌তে হয়েছে। যদি অনুগ্রহ কোরে একটু স্থান দেন, তা হলে বড়ই বাধিত হই। আমি যদিও এ আশ্রমে স্থান পাবার যোগ্য নই, কিন্তু এখন এক প্রকার আশ্রয়হীন অনাথ হোতেই হয়েছে। কি বলেন?" বাবু উঠানে দাঁড়িয়েছিলেন। আদর কোরে—ভদ্রতা জানিয়ে বোল্লেন, "সে কি মহাশয়!—আশ্রয় পাবেন না, এ কি কথা! আপনাদের মত লোক আশ্রমে আস্‌বেন, সে ত ভাগ্য। আপনারা এলে আশ্রমের সাহায্যের প্রত্যাশা আছে ত?" অভ্যাগত বাবুটী সন্তুষ্ট হয়ে বোল্লেন, "তা ত নিশ্চয়। দরিদ্রকে দানই ত দাতার ধর্ম্ম। তা আমার দ্বারা আশ্রমের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য অবশ্যই হবে। এই কথা বোল্‌তেই বাবু আগ্রহ জানিয়ে, আমার পাশের চালাতেই আগন্তুক বাবুটীকে স্থান দিলেন। তখনি চাকর নিযুক্ত হলো। আহারাদিরও একটু রকমসই বন্দোবস্ত হলো। আশ্রমে যেন এক্‌টা ছোটপাট সমারোহ বেধে গেল।

আমার ঘরে আর এই আগন্তুক বাবুটীর ঘরের মধ্যে একটী দরমার বেড়া মাত্র ব্যবধান। এঘর ওঘর সহজে নজর চলে না। তবে দরমার কাছে দাঁড়ালে বেশ দেখা যায়। আমার ত আড়ি-পেতে-দেখা রোগের মধ্যেই হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকে এতে নিন্দাই করুন, আর যাই করুন, আমি এ স্বভাবটীকে কিছুতেই ত্যাগ কোত্তে পাচ্চি না। ত্যাগ কর্ব্বার ইচ্ছাও নাই। যদি আমার এ স্বভাবটী আপনা আপনি না জন্মাতো, তা হলে এত কাণ্ড দেখ্‌তে পেতেম না, এত রহস্যও প্রকাশ হতো না, এত গুপ্তকথাও শুনতে পেতেম না; হয় ত প্রাণ বাঁচানই ভার হয়ে উঠ্‌তো। লোকে যাই বলুক, আমি এ স্বভাব ত্যাগ কোত্তে প্রস্তুত নই।

স্বভাব ত্যাগ কোত্তে পাল্লেম না। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বাবুটীকে একবার দেখ্‌লেম। বেশ বাবুয়ানা চেহারা। চেহারা দেখলেই বোধ হয়, বাবুর বেশ সংস্থান আছে। বাবু সেই বিছানায় বোসে তামাক খাচ্চেন, চাকরটী তামাক দিয়ে অন্য ঘরে বোসে আছে। বাবু তামাক খাচ্চেন, আর কি একখানা কাগজ দেখ্‌চেন। একদৃষ্টে চেয়ে মনে মনে কাগজখানি পোড়্‌চেন। মাঝে মাঝে এক একবার তামাক টান্‌চেন। এমন সময় আমাদের আশ্রমের বাবু এলেন। আগন্তুক বাবু "আসুন" বোলে সম্ভাষণ কোরে হাতের কাগজখানি মুড়ে রাখ্‌লেন।

আমাদের বাবু বোল্লেন, "মহাশয়! আপনার নামটী কি, শুনে সুখী হতে বাসনা কোচ্চি, যদি অনুগ্রহ কোরে—"

আগন্তুক বাবু বাধা দিয়ে বোল্লেন, "সে কি মহাশয়! নাম শুন্‌বেন, তাতে আর বাধা কি আছে? আপনার যা জান্‌তে ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা করুন। আমি এখনি তার উত্তর দিচ্চি। আমার নাম শ্রীজগদ্বন্ধু শর্ম্মা।"

দুজনে অনেক কথা হলো। আগন্তুক বাবুর কথাগুলি বড় মিষ্ট। কি জানি কেন, এই বাবুটীর কথা শুনে আমার বড় তৃপ্তি বোধ হলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লেম। বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জগদ্বন্ধু বাবু! ও কাগজখানি কিসের?—বৃন্দাবনে কি আপনার কোন বিষয়কার্য্য আছে, না বেড়াতে যাচ্চেন?"

জগদ্বন্ধু বাবু বোল্লেন, "না মহাশয়, তেমন কোন বিষয়কার্য্যের উপলক্ষে আমি বৃন্দাবনে যাচ্চি না। একটী লোক—আমার বিশেষ আত্মীয়, তাঁরই অনুসন্ধানে যাচ্চি। অনেক দিন,—প্রায় আজ পাঁচ বৎসর পথে পথে বেড়াচ্চি! কোনমতে সন্ধান পাচ্চি না। পরম্পর শুনছি, তিনি এখন বৃন্দাবনে আছেন, তাই তাঁর সন্ধানেই যাচ্চি। এ কাগজও সেই সংক্রান্ত।"

"তিনি আপনার কে?" অধ্যক্ষ বাবু আগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তিনি আপনার কে?"

"ক্ষমা কোর্ব্বেন। সেটী প্রকাশ কোত্তে আপত্তি আছে।" জগদ্বন্ধু বাবু উত্তরে এই কথা বোল্লেন, আরও বোল্লেন, "সম্পর্ক গুরুতরই ছিল, কিন্তু এখন সে সম্পর্ক আর নাই। কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরে এতটা অনুসন্ধান। তাঁর বিস্তর সম্পত্তি, তিনি ভিন্ন বিষয় ভোগের অধিকারী আর কেহই নাই। সে সম্পত্তিতে অন্যে অধিকার সাব্যস্ত কোরেছে। শত্রুর শত্রুতা—জ্ঞাতি শত্রু!

সেই শত্রুর হাত হোতে তাঁকে রক্ষা করবো বলেই আমার এত যত্ন।" আর বেশী কোন কথা হলো না। আশ্রমের অধ্যক্ষ বাবু উঠে গেলেন।

কথাটা ভাল বোঝা গেল না। একবার মনে হলো, এ লোকটী হয় ত সুশীলার কেউ হবে। বোধ হয় রুদ্রেশ্বর মারা গেছে, এখন সমস্ত বিষয় সুশীলার উপরেই বোর্ত্তেছে। এ লোকটী হয় ত সুশীলার স্বামী। এই ভেবে মনে কোল্লেম, সব কথা জিজ্ঞাসা করি। যদি সত্য হয়, তা হলে সুশীলার বিপদের কথা ভেঙে বোল্‌বো। আবার ভাব্‌লেম, সুশীলা এখন কোথায়, তা জানি না। আমিই সুশীলাকে সঙ্গে কোরে এনেছিলাম, সুশীলাকে যদি না পাওয়া যায়, শেষ আমাকে নিয়ে এক্‌টা গোল পোড়্‌বে। এই ভেবে আর এ কথায় মন দিলেম না।

যথাসময়ে আহারাদি সেরে ঘরে এলেম। আবার একবার দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লেম, বাবু আহার কোরে শুয়ে শুয়ে পান তামাক খাচ্চেন। এক্‌টু দাঁড়িয়ে দেখে আবার বিছানায় এসে শুলেম।

এখানে আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। সত্য কথায় কি পাপ আছে? আমি সংসারের রীতি নীতির কথা বোল্‌চি না, সংসারের কথা স্বতন্ত্র। সংসারের নিয়ম, চুরি কর, ডাকাতি কর, দুষ্কার্য্য কর, ভয়ানক ভয়ানক পাপে কলুষিত হও, ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রকাশ করো না। যতক্ষণ অপ্রকাশ থাক্‌বে ততক্ষণ তুমি সাধুর শিরোমণি, কিন্তু প্রকাশ হলেই তুমি যমালয় দর্শন কোর্ব্বে! সংসারে যে যত গোপন থাকে, গোপনে রাখে, গোপন করে, সংসার-খেলায় তারই দান, বরাবরই পোয়া বারো; আর যদি তুমি পুণ্য কাজ কোরেও প্রকাশ কর, তা হলেও তুমি ভণ্ড, গর্ব্বিত জুয়াচোর। আমি এ সংসারের রীতি-নীতির অনুসরণ কোত্তে চাই না। আমি সংসারের কে? সত্যশাস্ত্র অনুসারে আমি জিজ্ঞাসা কোচ্চি, সত্য বলার কি কিছু পাপ আছে?—কলঙ্ক আছে? অথবা নিন্দা আছে?

আমার বিশ্বাস, সত্যই অক্ষর-স্বর্গের সেতু। আমি সেই সত্যকে লক্ষ্য কোরে বোল্‌চি, কি জানি আমার মনে কেবল এই বাবুর ভাব্‌নাই উঠ্‌চে। বাবুর নামটী যেন জপমালা হোয়েছে। যতবারই বাবুর কথা শুন্‌চি তত-বারই যেন মনে বড় আহ্লাদ হোচ্চে। এতে যদি পাপ হয়, তবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোর্ত্তে আমি প্রস্তুত আছি।

শুয়েছি কিন্তু নিদ্রা হোচ্চে না। বাবু কে, বাবুর বাড়ী কোথা, বাবু যাবেন কোথা, বাবুর সঙ্গে আমাদের কোন সংশ্রব আছে কি না, এই চিন্তাতেই কেবল ভোর হোয়ে আছি ;—কিছুতেই নিদ্রা হোচ্চে না।

এই রকম ভাব্‌চি, এমন সময় বাবুর ঘরের দিকে একটী মেয়েমানুষের আওয়াজ কানে গেল। অমনি তাড়াতাড়ি এসে দর্‌মার আড়লে দাঁড়ালেম। ঘরে আলো আছে। দেখ্‌লেম, একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী বাবুর বিছানায় [illegible] তীর যেমন রূপ, তেমনি বেশভূষা। কথাগুলি যেন মধুমাখা। [illegible] পরিচিত বাবুর কাছে এ যুবতী কে? আজ ৪।৫ দিন এখানে [illegible] একদিনও দেখি নাই? ব্যাপারটা কি? মনে মনে বুঝলেম, [illegible] কোন গুপ্ত রহস্য আছে। কাণ্ডটা ভাল কোরে দেখ্‌তে হলো। [illegible]।

[illegible] এতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন। যুবতীর করস্পর্শে বাবু যেন চোম্‌কে উঠলেন! থতমত খেয়ে, ভাঙা ভাঙা স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনি কে? আমি এ ঘরে আছি, তা কি আগে জান্‌তে পারেন নাই?"

যুবতী অধরে মধুর হাসি হেসে কটাক্ষ কোরে বেল্লেন, "জানি বোলেই ত এসেছি। আমার আজ বড় সৌভাগ্য, তাই অনেক দিন পরে আপনার চরণ দর্শন কোল্লেম।" বাবু আরও যেন আশ্চর্য্য জ্ঞান কোরে বোল্লেন, "কৈ, আপনাকে ত আমি চিনি না? আপনি বোধ হয় আমাকে অন্য কোন পরিচিত লোক বিবেচনা কোরেছেন?"

"না, তা না। এতদিন পরিচিত ছিলেন না, আজ পরিচয় নিতে এসেছি। এতদিন চিন্‌তেন না, আজ চিনুন।" যুবতী এই বোলে বাবুর হাতখানি ধোরে আরও নিকটে গিয়ে বোসে হাসতে হাস্‌তে বোল্লেন, "আজ আমাকে দয়া কোত্তে হবে। আপনার নিকটে আজ রাত্রে আমি থাক্‌তে চাই, আমার বাসনা পূর্ণ করুন।"

কি সর্ব্বনাশ! এমন লজ্জাহীনা স্ত্রীলোক জগতে আছে বোলে কখনো কল্পনাতেও ভাবা যায় নাই। অপরিচিতের কাছে স্পষ্টাক্ষরে প্রেমভিক্ষা! একি কেউ কখন পারে?"

বাবু চোম্‌কে উঠ্‌লেন। এতক্ষণ শুয়েছিলেন, উঠে বোসে বোল্লেন, [illegible]আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি অন্য স্থানে যান, আমার নিদ্রার ব্যাঘাত [illegible]র্ব্বেন না। আমার স্ত্রী আছে।"

পাপিষ্ঠা সে কথা কানে না তুলে আরও কেলেঙ্কারী আরম্ভ কোল্লে! অশ্লীল হাবভাব দেখিয়ে—কত কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি কোরে বোল্লে, "সে কি চাঁদ! এই কি পুরুষ মানুষের মত কথা হলো? উপযাচিকাকে তাড়িয়ে দিতে চাও? তা হবে না।" পাপিষ্ঠা নিজেই শয়ন কোল্লে। বাবু বিছানা ত্যাগ কোরে দূরে দাঁড়ালেন। ভাবে বোধ হলো, যেন বড় রেগেছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বোল্লেন, "এ কি কাণ্ড! তুমি যতই চেষ্টা কর, এমন কুলটাকে কখনই আমি এ ঘরে স্থান দিব না। আমি এখনো বোল্‌চি, এখনি চোলে যাও। না হোলে তোমাকে অপমান কর্‌তে কুণ্ঠিত হবো না। যাও, এখনি যাও, এখনো বল্‌চি যাও।"

পাপিষ্ঠাও তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে বোল্লে, "আচ্ছা! তুমি বাসনা পূর্ণ না কর, এখনি তিন-শ টাকা গণে দাও। তা না হোলে তোমার সর্ব্বনাশ হবে। দাও, এখনি দাও, তা না হোলে এখনি তোমাকে জব্দ কোরে ছাড়্‌বো। তখন হাজার টাকা ব্যয় কোরেও পার পাবে না।"

বাবু আগেকার মত চড়া মেজাজেই বোল্লেন, "তুমি আমার কি কোর্ব্বে?"

"কি কোর্ব্বো? অবস্থা খুলেই বলি, এখানে আর ত তুমি সাক্ষী পাবে না। এই শোন, তুমি জোর কোরে আমার সতীত্ব নষ্ট কোচ্চ বোলে চীৎকার কোর্ব্বো! এই আশ্রমের বাবুর আমি পরিবার হোয়ে তোমার সর্ব্বনাশ কোর্ব্বো। সব গড়া আছে। বাবু বোল্‌বেন, আমি পরিবারের তুমি সতীত্ব নষ্ট কোরেছ। সতীত্ব নষ্ট কোল্লে কি সাজা হয় জান ত? দাও, ভাল চাও ত টাকা দাও, নৈলে এই আমি চেঁচালেম।"

বাবু ভীত হোলেন; বোল্লেন, "উঃ! এত সাহস তোমার? আচ্ছা, তবে দাঁড়াও।" এই বোলে বাবু ব্যাগ থেকে টাকা গণে দিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে তিন তিন-শ টাকা জলে গেল! বাবুর এই টাকাগুলি যাওয়ায় আমার বড়ই কষ্ট হলো, কিন্তু কি করি, উপায় নাই। বেশী জোর জারী কোল্লে শেষে হিতে বিপরীত হবে। কাজেই এখানে চুপ কোরে থাকাই ভাল বোলে মান্‌লেম।

বেটীর কি সাহস! এদের চক্রও ত কম নয়! মনে করেছিলেম, অনাথ-আশ্রম, প্রকৃতই অনাথ-আশ্রম, কিন্তু এখন দেখ্‌চি, এ ত অনাথ-আশ্রম নয়, এও এক দস্যুর খর্পর! এই ভয়ানক ডাকিনীচক্রের নামই কি অনাথ-আশ্রম?

চতুর্ব্বিংশ চক্র।

—:০:—

ঐ—ঐ—ঐ খুন!!!

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হলো না।—আমারও না, বাবুরও না। ভাব্‌চি, বাবুও ভাব্‌চেন। ব্যাপারটা বড় সহজ নয়। একটা সামান্য স্ত্রীলোক বাবুর কাছ থেকে তিন তিন-শ টাকা ঠকিয়ে নিয়ে গেল? বড় ভয়ানক কথা! তাই বাবুও ভাব্‌চেন, আমিও ভাব্‌চি। আবার ভাব্‌চি, বাবুর ভাবনায় আমি এত ভাবি কেন?

রাত প্রভাত হলো। আশ্রমের বাবু তামাক খেতে খেতে খড়ম পায়ে দিয়ে ঠক্ ঠক্ কোরে বাবুর দরজায় এসে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। বাবু উত্তর দিচ্চেন, তবুও ডাকের নিবৃত্তি নাই। বাবু চেতন, কিন্তু এ লোকটার ইচ্ছা, বাবু ঘুমান, আমি ডেকে তুলি। ডাকের ধাঁজে তার মৎলবটা এই রকম বোলেই বোধ হলো?

দরজা খোলা ছিল, বাবু ডাক্‌তে ডাক্‌তে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। তখন তার জ্ঞান হলো, বাবু চেতন। লোকটা যেন অপ্রস্তুত হয়ে বোল্লে, "চেতন আছেন, কতক্ষণ ঘুম ভেঙেচে?"

"সমস্ত রাত ঘুম ভেঙেই আছে।"—উদাসমনে যেন তাচ্ছিল্যভাবে বাবু এই উত্তর দিলেন। লোক্‌টা আরো যেন অপ্রতিভ হলো। দে তোর হাসি হেসে, মেড়ে বার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কেন মশায়! এমন কথা বোল্‌চেন কেন? বেশী কষ্ট হয়েছে কি? রাত্রে কি ভাল নিদ্রা হয় নাই?"

"ভাল কেন, মোটেই না। একবার বিছানায় পাশও দিই নাই।" এ উত্তরটী আগের মত হলো। আশ্রমের বাবু দাঁড়িয়ে উঠে বোল্লেন, "সে কি মশাই? ঘুম হয় নাই? তবে বড় কষ্টই গেছে? তা হয়েছে হয়েছে, এখনি স্নান করুন, একটু জল খান, একটু ঘুমুন।" এই বোলে একজন চাকরকে তেল আন্‌তে আদেশ কোল্লেন।

বাবু রেগে উঠে বোল্লেন, "এখানে? এখানে আবার স্নান? এ ডাকাতের আড্ডায় আবার স্নান? যদি প্রাণে বাঁচি, যদি জীবন নিয়ে ফিরে যেতে

পারি, তবে এই জমীতে পায়খানা তৈয়ার করাবো।”—বাবু এই বোলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। নিজের চাকরকে ডেকে বোল্লেন, “এখনি বেরিয়ে এসো, এখনি রওনা হও, এক তিলও বিলম্ব না হয়।” বাবু চারকরকে এই হুকুম দিয়ে নিজে বেরিয়ে গেলেন। চার পাঁচজন লোক বাবুর পাছু পাছু ছুট্‌লো। চাকরটাকে একজন ধোরে রাখ্‌লে।

অনেক বকাবকি, বুঝানো পড়ানোর পর বাবুকে নিয়ে লোক ক’জন ফিরে এলো। অধ্যক্ষ বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “মহাশয়! হয়েছে কি? ব্যাপার কি!” বাবু জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সব কথা বোল্লেন। অধ্যক্ষ বাবু অবাক! কুলটা বেটি বোলে গেছে, অধ্যক্ষ বাবুর সঙ্গে তার জোটপাট আছে, কিন্তু এখন অধ্যক্ষ বাবু যেন অবাক হয়ে গেলেন। বোল্লেন, “কি সর্ব্বনাশ! কে সে হারামজাদী? কোথা সে পাজী বেটী? চাকরগুলোও হয়েছে তেমনি। কোথা থেকে একটা মাগী এসে এতগুলো টাকা মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে গেল, আর এই সব ধনুর্দ্ধর চাকরেরা নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুম দিলে? সব ব্যাটাকে দূর করে দাও। জুতোর আগায় তাড়াও! যত বেইমান, পাজী, শূয়ার কি জানা,—” অধ্যক্ষ বাবু রেগে তিনটে হোয়েছেন। তাঁকে আবার থামানো ভার হয়ে উঠ্‌লো। অধ্যক্ষ বাবু বোল্লেন, “দেখ দেখি কাণ্ডটা! এতে আশ্রমের নিন্দা, আমার নিন্দা। উঃ! ইচ্ছা হোচ্চে, হুঁ—বেটাকে যদি এখন পাই, তা হলে তাকে আস্ত গোর সই করি। আঃ! আঃ! এ আপশোষ রাখি কোথা?” অধ্যক্ষ বাবুর এই রকম গৌরচন্দ্রিকায় বাবু যেন নিরস্ত হলেন। অধ্যক্ষ বাবু আমাদের বাবুকে বোল্লেন,—(মনের দশাও হয়েছে তেম্‌নি! জগবন্ধু বাবুকে আমাদের বাবু বলে পরিচয় দিচ্ছি!) “ছি! যা হবার হয়েছে, এখন আপনি কখনই যেতে পার্ব্বেন না। আজ থাক্‌তেই হবে। টাকা আর কাছে রাখবেন না। আমার কাছে দিন। আবার যখন যাবেন, নিয়ে যাবেন, কাল সকাল ভিন্ন যাওয়া হবে না।” বাবুর বেশ বিশ্বাস হয়েছে, তিন বিনা বাক্যব্যয়ে ব্যাগটী অধ্যক্ষের হাতে দিলেন। অধ্যক্ষ ঘাড় নেড়ে বোল্লেন, “তা হবে না! গণে দিন। কি জানি! মনে কিছু কোর্ব্বেন না, আমি ভালই বোল্‌চি।” বাবু ব্যাগ খুলে টাকায় জোট্টে ১৭৫৩৷৶১৫ গোণে দিলেন। অধ্যক্ষ বোল্লেন, “এই এখন ঠিক হলো। আর

কোন গোল থাক্‌লো না। বেশ হলো।" এই বোলে টাকাগুলি সাবধানে আপনার ঘরে রেখে এলেন। বাজে কাগজগুলি ব্যাগের মধ্যেই রইল। ব্যাগ থাক্‌লো চাকরের কাছে।

তার পরেই আহারাদির ধুম পোড়ে গেল। আহারাদির পর বাবুকে নিয়ে দাবা খেলা হলো। বাবু সব কথা ভুলে গেলেন। বাবু এই ভৈরবীচক্রে পোড়ে—ঘোর মায়ায় পোড়ে যেন ভেড়া বোনে গেলেন। কাল রাত্রে যে কাণ্ড ঘোটে গেছে, সে সব তাঁর মনেও নাই। এই সব খেলায় ধূলায়—আমোদ আহ্লাদে সন্ধ্যা হলো।

অধ্যক্ষ খাতির জানিয়ে বোল্লেন, "বাবুর কাল সমস্ত রাত নিদ্রা হয় নাই। সকাল সকাল আহারের আয়োজন কর। ভাল বিছানা দাও। মশারী খাটিয়ে দাও, বেশী গরম হলে একজন পাখা করুক।" এই রকম ব্যস্থা কোরে অধ্যক্ষ বাবু আর আর পারিষদযের বোল্লেন, "বাবু বড় ভাল লোক,—বড় অমায়িক।"

অধ্যক্ষের বন্দোবস্তের সব কাজগুলি শেষ হলো। বাবু শয়ন কোল্লেন। আমরা একটু পরে আহারাদি কোরে শয়ন কোল্লেম। শয়ন কর্ব্বার পূর্ব্বে একবার দরমার আড়াল থেকে দেখলেম, বাবু অঘোর নিদ্রায় অচেতন।—ঘরে আর কেউ নাই।

মনের ভিতর যেন একটা ধোঁকা লেগেছে। বেশ জানতে পেরেছি, কাল যে বেটি বাবুর কাছে ফাঁকি দিয়ে এতটা টাকা নিয়ে গেল তার সঙ্গে অধ্যক্ষের অবশ্যই যোগ সাজগ আছে। তা না হলে, বাইরের লোকের সাধ্য কি—ক্ষমতা কি যে, এত লোকের মধ্যে এই কাণ্ডটা কোত্তে পারে? আবার ভাবচি, এ কাণ্ডের অধ্যক্ষই যদি মূলাধার হয়, তবে বাবুকে আবার এত খাতির যত্ন কোরবে কেন? যত্ন কোরে রাখবে কেন? অধ্যক্ষের মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই ত? অন্য কোন ভয়ানক কাণ্ড কর্ব্বার জন্যে ত অধ্যক্ষ এই খাতির-যত্ন করে নাই? মনে বড় সন্দেহ হলো! একটু সজাগ হয়ে থাকলেম। আছি,—ভাবচি, মনের সন্দেহ আর যাচ্চে না।

শুয়ে আছি,—ভাবছি।—এমন সময় বাবুর ঘরে যেন মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি দরমার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেম। দেখেই আমি ত অবাক। যা মনে কোরেছি তাই! বাবুর ঘরে

আবার সেই পাপিনী! বেশ আজ অন্য প্রকার। মেয়েমানুষ, মালকোঁচ্চা কাপড় পরা, গায়ে একটা কোর্ত্তা, এলো চুল, হাতে এক-খান লকলকে ছোরা। দেখেই ত আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল! যা যা ঘোটবে, তা যেন সামনে স্পষ্ট স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলেম! গা কাঁপ্‌চে, গলা শুকিয়ে গেছে, গলদ্‌ঘর্ম্ম হোচ্চে, দাঁড়াতে পাচ্চি না, তবু দেখচি!

পাপিষ্ঠা পা টিপে টিপে বাবুর নাকের কাছে হাত দিলে, বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা কোরে দেখ্‌লে; বেশ কোরে দেখে—প্রদীপটে নিবিয়ে দিয়ে তখনি বেরিয়ে গেল। ঘর ঘোর অন্ধকার!

বাবুকে বাঁচাবার কি কোন উপায় নাই? যদি চেঁচাই,—তা হলেই বা উপায় কি? আমাদের দুজনকে যদি এরা বলপূর্ব্বকই কেটে ফেলে, তা হলেই বা রক্ষা করে কে? তবে পাপ কাজটা বোলেই—এতে প্রাণের মধ্যে একবার ভয় এসে উদয় হয় বোলেই, এরা এ কাজটা গোপনে কোচ্চে। চেঁচিয়ে কোন ফল নাই। অন্য উপায় করা চাই। এখন আস্তে আস্তে গিয়ে যদি বাবুকে তুলি, তা হলে রক্ষা হলেও হতে পারে। পাপিষ্ঠা ফিরে আস্তে না আস্তে যদি কোন শক্তিকে পালাতে পারা যায়, তা হলেই নিস্তার। আমার ঘরের এক কোণে একখানা হাত তিন লম্বা গরাণের রোলা কাঠ পোড়ে ছিল, সেই-খানা হাতে কোরে আস্তে আস্তে বাবুর ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। এমন পর্য্যন্ত মনে থাকলো, যদি কোন উপায় না দেখি, তা হলে একেবারে মরিয়া হয়ে বেটীর মাথায় গরাণের এক ঘা লাগাবো! শেষ যা থাকে অদৃষ্টে তাই হবে; আমার সাম্‌নে বাবুকে মারবে, প্রাণ থাক্‌তে তা সইবে না।

ঘরের মধ্যে ঢুকেছি মাত্র, এমন সময় পায়ের শব্দ পেলেম। প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা ভাব হলো। করি কি?—ডাকি—কি মারি, কি চেঁচাই, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না।

পাপিষ্ঠা ঘরে মধ্যে এসে উপস্থিত। তখন করি কি, আঁধারে আঁধারে গরাণের রোলাখানা বাবুর মাথার উপর হোতে পা পর্য্যন্ত ধোরে নিজে সেই মাচার নীচে রইলেম। পাপিষ্ঠা এসেই ঠিক বাবুর মাথার কাছে দাঁড়ালো। ছোরাখানা তুল্‌লে! আমার প্রাণ যেন কেঁপে উঠলো! উঃ! কি সর্ব্বনাশ! পাপিষ্ঠা ছোরাখানা বেশ কোরে

বাগিয়ে ধোরে সাঁ কোরে একটা কোপ মারলে! কাঠে বেধে ছোরার ঘা ঠক কোরে উঠলো! আমার মুখে যেন আপনা আপনি বেরিয়ে গেল, ঐ—ঐ—ঐ খুন! বাবু আঁ—আঁ কোরে উঠে বোসলেন। পাপিষ্ঠা কোণের দিকে ছোরাখানা ছুড়ে ফেলে পালাবার যোগাড় দেখলে। ছোরাখানা যে ফেলে দিলে, কেবল শব্দ শুনেই বুঝলেম, পাপিষ্ঠা পালাবার যোগাড় কোচ্চে দেখে, আমি তাকে জড়িয়ে ধোল্লেম। বাবুকে বোল্লেম, "ভয় পাবেন না। একে এসে ধরুন। আমি প্রদীপ জ্বালচি!" বাবু যেন কেমনতর হয়ে গেলেন। চাকরটা সজাগ ছিল, সেও এসে উপস্থিত হলো। ঘরের মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি! হয়েছে কি?" আমি বোল্লেম, "পরে বোল্‌বো, তুমি একে এসে ধরো, বেশ কোরে মুখ চেপে ধোরো!"—চাকর এসে ধোল্লে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠা কোন কথা বলে নাই। এখন বোল্লে, "বাঃ!—ধরাধরি কেন? বাবুর সঙ্গে আমার ভালবাসা আছে।" আমি বোল্লেম, "ভালবাসা যদি ছিল, তবে তুমি মারতে এসেছিলে কেন? পাপিষ্ঠা ধীরে ধীরে ভাঙা ভাঙা কথায় বোল্লে, "তামাসা কোরে—ভয় দেখাতে এসেছিলেম।" আমি এ কথা কাণে না তুলে, চাকরকে মুখ চেপে ধোরতে বোলে প্রদীপ জ্বালতে গেলেম। আমার ঘরে গন্ধকের দেকাটি ছিল, বাইরে মালসা করা আগুন ছিল, আলো জ্বালতে কোন কষ্ট হলো না। যখন আমি আলো জ্বালি, তখন দুজন লোককে সাঁ কোরে বেরিয়ে যেতে দেখলেম। গাটা যেন কেঁপে উঠলো।

ঘরে এসে বাবুর চাদর দিয়ে পাপিষ্ঠার মুখ বাঁধলেম। মাচার পায়ার সঙ্গে বাঁধলেম। এতক্ষণে বাবুর চৈতন্য হলো। বাবু আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনি কে? আপনিই কি আমার প্রাণদান কোরেছেন?" আমি বোল্লেম, "সে পরিচয় পরে পাবেন, এখন চলুন, আমরা পালাই। একটু পরে—এরা সকলে টের পেলে প্রাণ বাঁচানো ভার হবে। আর দেরী কোর্ব্বেন না।"

টাকা পোড়ে রইল,—বাবুর ব্যাগটি নিয়ে পাছ দরজা দিয়ে আমরা শ্রীহরি কোল্লেম। ঘরে আলো জ্বলতে লাগ্‌লো। পাপিষ্ঠা বাঁধাই থাকলো। যখন আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, তখন চাকরটা বোল্লে, "হাঁগা মা! ঐ শালী বুঝি বাবুর গলায় ছুরি মারতে গেছিলো, তা বেটীকে কেবল বেঁধেই রেখে এলেম? উহুঃ,—কিছু শিক্ষে না দিলে নয়।" এই বোলে

চাকরটা পেছিয়ে পোড়লো। আমি বোল্লেম, "বাপু! আর শিক্ষা দিয়ে কাজ নাই। এখন প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা কর, পাপীর শাস্তি ভগবান দেবেন।" চাকরটা শুনলে না। সে রেগে বোল্লে, "ভগবানই যদি শাস্তি দেবে, তবে এমন ভালমানুষ বাবুর গলায় ছুরি মার্তে গেলে, ভগবান কিছু বোল্লে না?" বেটীর মাথায় তখন বজ্জর ভেঙে পড়লো না? আপনারা চলুন, আমি এখুনি আস্চি।" আমি নিষেধ কোল্লেম, বাবু নিষেধ কোল্লেন, চাকরটা শুন্লে না। যেন মরিয়া হয়েই ছুটে চোলে গেল। আমরা যাচ্চি, আর পেছুন ফিরে দেখচি।—অনেকক্ষণ পরে চাকরটা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো। হাতে দেখি রক্ত-মাখানো সেই ছোরা! আমি বোল্লেম, "তাকে কি খুন কোরে এলে?" চাকরটা হাঁপাতে হাঁপাতে বোল্লে, "একেবারে খুন করি নাই, শালীর নাক কেটে এনেছি। আর ছোরাখানা আন্লেম, যদি শালারা আসে, তবে এ দিয়েই শালাদের নিকেশ কোর্ব্বো।" সত্য সত্যই চাকরটা কাটা নাক দেখালে।

অনেক দূর এসে পোড়েছি। রাতও প্রভাত হয়েছে। বৃন্দাবনের দিকে যাই নাই, আমি যেদিকে আস্ছিলেম, সেই দিকেই আস্চি।

রাত প্রভাত হলো। বাপু হাঁপ ছেড়ে বোল্লেন, "আপনি আমার জীবন দান কোরেছেন। ঐ সেই যে বোলেছিলেন, ঐ—ঐ—ঐ খুন! সে কথা যেন এখনো আমার কানে বাজ্চে। আমি এখনো যেন স্পষ্ট স্পষ্ট শুন্তে পাচ্চি, "ঐ—ঐ—ঐ খুন!!!"

পঞ্চবিংশ চক্র।

অপূর্ব্ব মিলন।

বেলা প্রায় একটার সময় আমরা তিনজনে মর্শানে এসে পৌঁছিলেম। মর্শানে বোলে কোন গ্রাম সেখানে দেখ্লেম না। এটী মশান ষ্টেসন। ষ্টেসন হাতে এক ক্রোশ দূর গ্রাম। আমরা গ্রামে গেলেম না, ষ্টেশনের নিকটেই খান কতক দোকান আছে, আমরা সেই দোকানেই আশ্রয় নিলেম। এত

বেলা পর্য্যন্ত স্নান-আহার হয় নাই, তাই তাড়াতাড়ি স্নান কোরে আহারের আয়োজন হলো।

এখানে তেমন খাবার জিনিস পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তাও একগুণ জিনিষের চারগুণ দর। নিতান্ত বিপাকে না পড়্লে এখানে কেউ থাকে না, বিক্রীও তেমন নাই। তাই যে সব হতভাগা বিপাকে পোড়ে এদের এখানে বাসা নিতে যায়, তাদেরই ঘাড় ভেঙ্গে যত ক্ষতিপূরণ করে। আমরাও আজ বিপাকে পোড়েছি, কাজেই তাদের ক্ষতিপূরণ কোর্‌তে বাধ্য হোলেম।

অবশ্য স্নান কোরে জলযোগ কোল্লেম। চাকরণা রন্থই আরম্ভ কোল্লে। একথা শুনে অনেকে হয় ত মনে কোর্ব্বেন, এদের জাত নাই। এরা-হিন্দু নয়। ছি ছি! চাকরের রান্না ভাত খায়! কথাটা কিন্তু প্রকৃত তা নয়। এদের নিয়ম, একজন দোবে চোবের বংশধরকে রাখ্‌লে, তার দ্বারাই চাকরের কাজ, সইসের কাজ, রন্থয়ের কাজ, ঝিয়ের কাজ, খানসামার কাজ, সকল কাজই নির্ব্বাহ হয়। যাদের কাজ কম, তারা এমনি ধরণের লোকই রাখেন। যে চাকর, সেই বামুন, পৃথক লোকের আবশ্যক করে না। আমাদের চাকর-বামুনটী দোবে মহারাজ! তাই তার হাতে খেতে কোন আপত্তি হলো না।

বাবুর সঙ্গে এ পর্য্যন্ত কোন কাজের কথা হয় নাই। জলযোগের পর দুজনে বোসে এখন সেই সব কথা আরম্ভ হলো। বাবু আমাকে বোল্লেন, "আপনি আমার জীবন রক্ষা কোরেছেন!—অতি আত্মীয়তেও এমন নিজের প্রাণ হাতে কোরে—নিজের প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পরের প্রাণ রক্ষা করে না। আপনি তাই কোরেছেন। আপনি আমাকে জীবন দিয়েছেন। এ সূত্রে আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বার আমার অধিকার নাই। আপনি যেই হোন, আপনি দয়াময়ী জীবনদাত্রী বোলে জেনে রাখাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তবুও যৎসামান্য কিছু জিজ্ঞাসা কোর্‌তে চাই। বোধ হয়, বেয়াদবী মাপ কোর্ব্বেন।" বাবুর নম্রতা দেখে,—বাবুর সদাশয়তা দেখে আমি মোহিত হোলেম। প্রকাশ্যে বোল্লেম, "সে জন্য আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। প্রাণরক্ষায় মনুষ্যের সাধ্য নাই। ঈশ্বরই রক্ষাকর্ত্তা, মনুষ্য কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। সেজন্য আপনি এতটা কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে আমাকে লজ্জিত কোর্ব্বেন না।

আপনি যা জিজ্ঞাসা কোর্ব্বেন করুন, আমি অবশ্যই তার উত্তর দিব। কোন চিন্তা কোর্ব্বেন না।"

বাবু আবার সেই রকম সুধামাখা কথায় বোল্লেন, "নামে প্রয়োজন নাই। জিজ্ঞাস্যর মধ্যে কেবল জাতি, অনাথ-আশ্রমে কেন, আর কোথায় যাবেন।" আমি বোল্লেম, "জাতিতে আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, অনাথ, তাই অনাথ-আশ্রমে। আমার আর কেউ নাই। তাই যেখানে থাকি, সেইখানেই আমার নিবাস। এখন যে কোথায় যাব, তারও স্থিরতা নাই। বিধাতা যেখানে নিয়ে যাবেন,—সেইখানেই যাব।" আমার উত্তর শুনে বাবু যেন আশ্চর্য্য জ্ঞান কল্লেন;—বোল্লেন, "যেখানে বিধাতা নিয়ে যাবেন, আপনি সেইখানেই যাবেন?" আমি বোল্লেম, "হাঁ।"

বাবু একটু চিন্তা কোরে কোল্লেন, "আপনার ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবুও এইমাত্র বল্‌চি, আপনি আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করুন, আমার বাড়ীতে চলুন। আমার লোক নাই, আপনি আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত আমার সংসারে থেকে কর্ত্তৃত্ব কোর্ব্বেন।"

আমি ত পরের আশ্রয়ে জীবন কাটাচ্চি, অবশিষ্ট জীবনও হয় ত এই ভাবেই কাটাতে হবে। তবে বাবুর আশ্রয় পরিত্যাগ করা কেন? বাবুকে ত্যাগ কোর্‌তে আমার ইচ্ছাও নাই। হয় ত আপনা হতেই আশ্রয় প্রার্থনা কোর্‌তে হতো, তা না হয়ে বাবু স্বয়ংই যখন এ প্রস্তাব কোরেছেন, তখন সম্মত হওয়াই ভাল। আমি বোল্লেম, "সে আপনার অনুগ্রহ। আমার কোন আপত্তি নাই।" বাবু বোল্লেন, "বড়ই সন্তুষ্ট হলেম। আপাততঃ আগ্রায় চলুন। আমার সঙ্গে যা টাকাকড়ি ছিল, সমস্তই ত গেছে। একটী পয়সাও নিকটে নাই। এমন কি, এখানকার এই সমস্ত খরচের জন্য এই অঙ্গুরীটী বিক্রি কোর্‌তে হবে। চলুন, তবে আগ্রায় যাই। সেইখানে আমার এক বন্ধু আছেন। সেইখানে থাকবেন। তিনি পরিবার নিয়ে আছেন, আপনার কোন কষ্টই হবে না। তাঁর কাছে টাকা নিয়ে আমি আবার বৃন্দাবনে যাব। আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছি, অনাথ-আশ্রমকে পাইখানায় পরিণত কর্ব্বো, সেটীও আমার কর্ত্তব্য হয়েছে। বেশী পাপকার্য্যে প্রশ্রয় দিতে নাই। বিলম্ব হবে না; এক মাসের মধ্যেই ফিরে আস্‌বো। এর মধ্যেই বাড়ীতে সংবাদ দিয়ে খরচপত্র আনাব, তারপর বাড়ীতে যাবেন।"

আমি বোল্লেম, "আপনি যা বল্‌চেন, তাতেই আমার সম্মতি আছে। আপনাকে টাকার জন্যে অন্য উপায় দেখ্‌তে হবে না। আমার কাছেই টাকা আছে। তাতেই এখানকার খরচ চোল্‌তে পার্ব্বে।" সুশীলার টাকাগুলি সব আমার কাছেই ছিল। এখনো আছে। বাবু আরও যেন আহ্লাদিত হয়ে বোল্লেন, "তবে আমাকে সকল প্রকারে রক্ষা কোত্তেই এসেছেন। ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ! আপনার এ উপকার জন্ম-জন্মান্তরে পরিশোধ কর্‌তেও পার্ব্বো না। আমার এখনি বেরুতে ইচ্ছা হচ্চে, কিন্তু কি করি, এখন গাড়ী নাই। আর: আধঘণ্টা পূর্ব্বে এখানে এসে পৌঁছিলে আজই যাওয়া যেতো।" বাবু যেন বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন, আনন্দে যেন অধীর হয়ে উঠেছেন।

আমি কৌতূহলের বশেই জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বৃন্দাবনে আপনার কি প্রয়োজন?" বাবু একটু ম্লান হয়ে—একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে উত্তর কোল্লেন, "সে অনেক কথা। দুর্ভাগ্য আমার, তাই আজ পাঁচ বৎসর পথে পথে বেড়াচ্চি! জ্ঞাতিশত্রু বিষয়ের লোভে আমার স্ত্রীকে কোথায় পাঠিয়েছে! আমার শ্বশুরের অগাধ সম্পত্তি। তিনি আমার স্ত্রীর নামেই উইল কোরে গেছেন। তাঁকে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞাতিরা সেই বিষয়ে একাধিপত্য কোচ্চে। আমার স্ত্রী—তাঁর ছোট খুড়ী মহাশয়ের বাসায় ছিলেন, সেখান হতে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে দেশে রটিয়ে দিয়েছে, আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এ সকলই মিথ্যা। আমি চারিদিকে গোয়েন্দা পাঠিয়েছি, নিজেও অনুসন্ধান কোরে বেড়াচ্চি, কোনমতেই দেখা পাচ্ছি না। আজ সন্ধান পাই, অমুক স্থানে আছেন, তাড়াতাড়ি সেখানে যাই, আবার শুনি, তিনি সেখানে নাই, অমুক স্থানে গেছেন। এই রকম ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েও সন্ধান কোর্‌তে পাচ্চি না। স্থানে স্থানে ছদ্মবেশেও কতদিন কাটিয়েছি। একদিন সন্ধান পেলেম, তিনি কাশীতে আছেন; অমনি তখনি কাশী রওনা হলেম। সকল বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান কোর্‌তে পাব বোলে সন্ন্যাসীর বেশ ধোর্‌লেম। ভিক্ষার ছলে বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান কোল্লেম,—হতভাগ্যের ভাগ্যদোষে সকলি নিষ্ফল হলো, একদিন আমাদের আশ্রমে আমার স্ত্রীর অবিকল অবয়ব-বিশিষ্ট এক অপরিচিতা আসেন,—মনেও সন্দেহ হয়, কিন্তু কি করি, লজ্জায় কোন কথা প্রকাশ করিতে পারি না। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে

আবার অন্য স্থানে রেখে এলেম, কিন্তু কেমন যে লজ্জা, সন্দেহটা আর দূর হলো না। সন্ন্যাসবেশ ত্যাগ কোরে যেখানে সেখানে তেমনি বেশে পথে পথে সন্ধান কোরে বেড়াচ্চি। আজ সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল আমার প্রতি সমান দুঃখই প্রসব কোচ্চে। আজ এক সপ্তাহ হলো, একজন গোয়েন্দা বোলেছে, তিনি এখন বৃন্দাবনে একজন খোট্টা মহাজনের বাড়ীতে আছেন। তাই সেইখানে সন্ধানে যাচ্চি। দেখি, বিধাতা কি করেন।" বাবু এই পর্য্যন্ত বোলে আবার একটী নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন। মাথাটী নীচু কোরে বসে কি ভাবতে লাগলেন।

বুকের মধ্যে ধড়াস্ কোরে উঠ্‌লো। গা হাত পা কেঁপে উঠ্‌লো! চোকে যেন আঁধার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম! গলা শুকিয়ে গেল, কেমনতর হয়ে গেলেম! বৃথা সন্দেহ, এ বাবুটী তবে কে? প্রাণের মধ্যে বুঝেছি, কিন্তু মুখ ফুট্‌ছে না! মনে মনে যেন ভাসাভাসা—আব্‌ছা আব্‌ছা বুঝেছি, মুখে কিন্তু তা বোল্‌তে পাচ্চি না। কেমনতর প্রাণের ভিতর যেন হু হু কোচ্চে! প্রাণের যেন কতটা ফাঁক হয়ে গেছে! আমাতে যেন আর আমি নাই। সুখের বিষয়, বাবু এখন নিজের ভাবনায় বিব্রত, আমার এ ভাব তিনি দেখ্‌তে পেলেন না। হলো ভাল।

মনে মনে দৃঢ়তা অবলম্বন কোল্লেম। এক্‌টা যুক্তি স্থির কোরে মনকে দৃঢ়তার বাঁধনে বাঁধলেম। আরও একটু পরীক্ষার আবশ্যক। শুকনো গলা শানিয়ে নিয়ে—মনে মনে বারম্বার তরজমা কোরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আর একটী কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চি,—মনে কিছু কোর্ব্বেন না। আপনার স্ত্রীর নামটী কি, শুন্‌তে পাই না?" বাবু মাথা না তুলেই বোল্লেন, "শ্রীমতী হরিদাসী দেবী।"

আমি অচৈতন্য!—অচৈতন্য, কিন্তু অজ্ঞান নই। যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌চি!—যেন কত দুঃখের কান্না কাঁদচি—কত সুখের হাসিই হাস্‌চি। সুখে দুঃখে যেন কেমনতর হয়ে গেছি। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হলো। বোসে বোসেই যেমন অচৈতন্য,—আবার বোসে বোসেই তেমনি জ্ঞান!

আবার প্রাণের ভিতর সেইরূপ আন্দোলন। আনন্দে বিষাদে সুখ দুঃখে—যেন কেমনতর হয়ে গেলেম। কথা সোরলো না, মাথা ঘুরতে লাগ্‌লো। কত কথা—কত ভাব—কত আনন্দ—কত দুঃখ আপনা আপনি মনের ভিতর উদিত হলো। এতদিনে সুখের মুখ দেখ্‌লেম।

কত কষ্ট পেয়েছি, সে সকল কথাও মনে এলো। অনাথ-আশ্রমে যে সর্ব্বনাশ হোচ্ছিল, সে কথাও মনে হলো। ভেবে চিন্তে স্থির কোল্লেম, এখন কোন কথা প্রকাশ করা হবে না; আগে বাড়ী যাই, তখন সকল কথা বল্‌বো।—আপনার পরিচয় দিব।—সকল কথা শুন্‌বো। বৃন্দাবনে যান বা না যান, অনাথ-আশ্রমের পাষণ্ডদের শাস্তিটে বড় আবশ্যক। মনে মনে স্থির কোল্লেম, একটা ফন্দি খাটিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়া বন্ধ কোরে—কেবল অনাথ-আশ্রমের পাষণ্ডদের শাস্তি দিয়েই বাড়ী নিয়ে যাব। এই রকম মনে মনে যুক্তি এঁটে রাখ্‌লেম। আর কোন কথা কইলেম না। দেশের পরিচয় জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌বো, মনে মনে ভাব্‌চি, এমন সময় পাচকের মুখে উচ্চরিত হলো, আমাদের অন্ন প্রস্তুত। বাবু আগে আহার কোল্লেন। শেষে আমি আহার কোর্ত্তে গেলেম। জিজ্ঞাসার আর অবসর হলো না।

ভাতের চেহারা দেখেই আমার আত্মাপুরুষ উড়ে গেল! মা লক্ষ্মী মাথায় থাকুন, কিন্তু ভাতের চেহারা দেখে ক্ষুধা গেল। লাল রং, এক একটা ভাত যেন লম্বা লম্বা কাঁটা। আলু ভাতে, দাল ভাতে আর ঘি। ঘিয়ের গন্ধ শুঁকে বমি এলো, কিন্তু মনে তখন আমার এত আনন্দ যে, সেই সামান্য ভাতে ভাত দিয়ে সব ভাতগুলি দিব্যি তৃপ্তির সহিত খেলেম। যখন আহারাদি শেষ কোরে এলেম, বাবু তখন বিশ্রাম কোচ্চেন।

আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। দুঃখ-কষ্ট,—যাতনা-বিষাদ—কিছুই আর নাই। আমার সুখ-তরণী যেন আনন্দ-সাগরে ভাস্‌চে। হৃদয়ে আনন্দ যেন ধোরচে না। এখন ভাব্‌চি, আমার মত সুখী আর কে আছে?

যে জিনিস সহজে মিলে, যে জিনিস বিনা চেষ্টায় আয়ত্তের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়, সে জিনিস মূল্যবান হলেও তার উপর অধিকারীর দৃষ্টি কম হয়। সেদিকে তাঁর যেন ততটা যত্ন থাকে না। আর যে জিনিস যত্নে কোরে—আয়াস স্বীকার কোরে সংগ্রহ কোর্ত্তে হয়,—যে জিনিস পাবার জন্যে অনেক দুঃখ-কষ্টের বোঝা মাথায় বইতে হয়, অনেক দুর্ঘটনার চক্রে পোড়ে ঘুরে ঘুরে সারা হতে হয়,—যন্ত্রণার একটানা সমুদ্রে পোড়ে হাবু ডুবু খেয়ে যে জিনিষ সংগ্রহ কর্ত্তে হয়, সে জিনিস

অন্যের পক্ষে সামান্য হালেও—সে জিনিস প্রকৃত সুলভ হোলেও, অধি-কারীর যত্ন তার উপর বৃদ্ধি পায়। অধিকারী সে জিনিসটী বড়ই সাবধানে রাখেন;—চোকে চোকে রাখেন, সে জিনিসের কথা বুক চিরে বুকের ভিতর লিখে রাখেন। আমারও আজ তাই হয়েছে। যাঁর জন্যে এত কষ্ট, আজ আমার সেই বহু আয়াসের ধন—হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন, আমি পেয়েছি। তিনি আজ আমার সম্মুখে! এ আনন্দ রাখবার স্থান নাই। মনে মনে কত কথাই উঠ্‌চে, কত ভাব-তরঙ্গ কত ভাবেই যে খেলা কোচ্চে, কত সুখের ছবিই যে দেখ্‌চি, তার আর সীমা-সংখ্যা নাই। মনে মনে এক্‌টা গর্ব্ব হয়েছে, আমার মত সুখী কে?

গত রাত্রের পরিশ্রমে বাবু বড় ক্লান্ত ছিলেন, অকাতরে ঘুমুচ্চেন। আমি পাশে বসে আঁচলের বাতাসে তাঁর গাঢ় নিদ্রা গাঢ়তর কোচ্চি আর মনে মনে সেইরূপ প্রাণ ভোরে দেখ্‌চি। আহা! এমন সুখ যে অদৃষ্টে ঘোট্‌বে, তা এতদিন কল্পনাতেও আনি নাই। বিবাহ হয়ে পর্য্যন্ত স্বামীর মুখ দেখি নাই হয় ত তখন বাল্যকালে দেখে থাক্‌লেও মনে নাই! আমার ত মনেও ছিল না যে, নিশ্চয়ই আমার বিবাহ হয়েছে। কিন্তু, এখন সকল সন্দেহ দূরে গেছে। আর কোন ভাবনা নাই, কোন চিন্তা নাই। আজ সংসার-সর্ব্বরী আমার সম্মুখে বসন্তের পূর্ণিমা। এমন আনন্দভোগ ক'-জনের ভাগ্যে ঘটে? আমার অদৃষ্ট,—আমার অদৃষ্টের গুণে আজ এই বিপদরাশির মধ্যেও অপূর্ব্ব-মিলন!

ষড়বিংশ চক্র।

হায় হায়! পেয়ে হারালেম।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হলো। হাত-মুখ ধুয়ে, ঘুমের ঘোরটা ভেঙে গেলে, বাবু আপনা আপনি বোল্‌তে লাগলেন, "আঃ! অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। শরীর বড় অসুখ কোচ্চে। দিনে ঘুমান একে-বারেই অভ্যাস নাই, তাতে আরও কষ্ট হচ্চে।" এই বোলে বার দুই

হাই তুলে চাকরকে ডেকে বোল্লেন, "রাত্রে কি খাওয়া হবে? সকাল সকাল তার যোগাড় কর!"

সন্ধ্যার এক্‌টু আগে একখানি গাড়ী এলো। অনেকগুলি লোক নাম্‌লো, আমি ঘরের দাওয়ায় বোসে গাড়ী দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। গাড়ী চোলে গেল। যারা নাম্‌লো, তারা ষ্টেসনের বাইরে এসে কেউ বা চোলে গেল, কেউ বা বাসা নিতে দোকানদারের সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌লো, কেউ বা বাসা নিলে। লোকগুলিকে দেখ্‌ছি, এমন সময় দেখি, দশ বারোজন লোক এক্‌টা দল বেঁধে কি বোল্‌তে বোল্‌তে গোলমাল কোর্‌তে কোর্‌তে আস্‌চে। চেয়ে দেখেই অবাক হয়ে গেলেম। তাদের মধ্যে মাষ্টারবাবু!

মাষ্টার বাবুকে দেখে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। মাষ্টার বাবুর চরিত্র—মাষ্টার বাবুর কাণ্ড আমি সকলই জান্‌তে পেরেছি। অনেক কৌশলে—দৈবের সাহায্যে একবার মাষ্টার বাবুর হাত হতে পরিত্রাণ পেয়েছি। আবার সেই মাষ্টার বাবু! সাহস আছে—বাবু আছেন বোলে আমার অনেকটা সাহস আছে, কিন্তু এদের যে দল, তাতে এদের হাতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন কথা। তাই এ সাহস থেকেও নাই। মাষ্টার বাবুকে দেখে ভয়ে ভয়ে ঘরের ভিতর ঢুক্‌তে যাব, এমন সময় তাঁর চোকে চোকে নজর পোড়ে গেল। মাষ্টার বাবু রাম কি গঙ্গা কিছুই না বোলে সরাসর দ্রুতপদে চোলে গেলেন। আমি ভাবলেম, রাম! এ যাত্রা বাঁচলেম!

মাষ্টার বাবু চোলে গেলেন। দূর হতে স্পষ্টই দেখতে পেলেম, সত্য সত্যই মাষ্টার বাবু অনেক দূর চোলে গেলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গের লোকেরা ঘুত্তে ঘুত্তে আমাদের সামনের ঘরেই বাসা নিলে! গোলমাল আরম্ভ কোল্লে! গাঁজা-তামাকের ধূম লাগিয়ে দিলে। আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলেম—মাষ্টার বাবু নাই। কতকটা সাহস পেলেম। ওস্তাদ না থাক্‌লে চেলারা তেমন জারিজুরি কোত্তে পারে না, এটা অনেক দিন থেকেই জানা আছে।

এদিকে আমাদেরও আহারের আয়োজন হলো। সকলের আহারাদিও শেষ হলো। বাবু বোল্লেন, "যদি আপত্তি থাকে, আপনি ঘরে থাকুন। আমি বরং বাইরে শুই।" মনে মনে হাস্‌লেম। এক ঘরে শুতে যে

কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে, এটা যুক্তিতেই এলো না। কেবল লোক দেখানো সাধুতা জানিয়ে বোল্লেম, "তেমন কোন আপত্তি নাই। তবে—" বাবু আমার কথার ভাব বুঝে বোল্লেন, "তবে আপনি ঘরেই থাকুন। বাইরে বেশ হাওয়া আছে, আমি বাইরেই থাকি।"

বাবু বাইরে শুলেন। চাকরও বাইরে থাক্‌লো, আমিই একা কেবল ঘরে। শুতে শুতেই সকলেই নিদ্রিত, আমিই কেবল জেগে। ঘুম হলো না, মাষ্টার বাবুর উপযুক্ত শিষ্যদের কাণ্ডটা দেখবার জন্যে—ব্যাপারটা জান্‌বার জন্যে, কান খাড়া কোরে আছি। চারদিকের সকলেই ঘুমিয়েছে, কারো কোন সাড়াশব্দ নাই, দস্যুদের কথা বেশ শোনা যাচ্চে। আগে যে কি কথা হয়েছে, তা শুন্‌তে পাই নাই। এখন বেশ শুন্‌তে পেলেম।

একজন বোল্‌চে, "কখনো সে নয়। তাকে আমি বেশ চিনি, এক দিন আধ দিন নয়—তিন চার মাস এক সঙ্গে বাস কোরেছি, আমি আবার তাকে চিনি না? সে নয়। আমি হলপ কোরে বোল্‌তে পারি, কখনই সে নয়।" আর একজন বসা গলায় ঘেঙিয়ে ঘেঁঙিয়ে তাড়াতাড়ি বোল্লে, "ঠিক তারই মত আর লোক থাকে না? ও সব ভুয়ো কথা। শাগ্‌গির এক পাত্র দেনা ভাই? আঃ—তামাকটা পুড়িয়ে ফেল্লি যে?—চোঁয়া গন্ধ ছেড়েছে, দে দে দে!" লোকটা থাম্‌লো। এতক্ষণ যেন ঝড় বোয়ে যাচ্ছিল, আর একজনের এক্‌টা বাঘাতাড়ায় লোকটা চেপে গেল। এই ফাঁকে একবার একজন খোনা নাকিস্বরে আরম্ভ কোল্লে, "উঁ হুঁ হুঁ! নির্য্যাস সেঁই। আঁমিওঁ চিঁনি বাঁবাঁ! এঁ বাঁস্‌তো ঘুঁ ঘুঁ, সঁব জাঁনে।—হেঁ হেঁ হেঁ।" আর একজন তোৎলা বোলে উঠ্‌লো, "হোঃ হোঃ হোঃ! হোরিদা দাসিই—সব বটে।" এই সব নল-নীল-গয়-গবাক্ষদের নানা ছাঁদের কিচির মিচির শুনে একটু হাস্‌লেম, কিন্তু কতক্ষণ? আমাকে নিয়েই যখন এদের কথাবার্ত্তা, তখন হাসি কতক্ষণ থাকে? এরি মধ্যে একজন লোক আমরা ঘুমিয়েছি কি না, তাই দেখে গেল। আমিও আস্তে আস্তে উঠে—কাকেও কিছুই না বোলে—চুপি চুপি তাদের ঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম। ঘরের পাশেই একটা বেশ ঝাক্‌ড়া মৌয়া গাছ। আমি সেই গাছের ছায়ায় কায়া লুকিয়ে মনোযোগ দিয়ে এদের কথাবার্ত্তা শুন্‌তে লাগ্‌লেম।

ঘরের ভিতর মদ চোলচে, গাঁজা চোল্‌চে, তামাক ত আছেই।

খাবারের মধ্যে এক ধামা বরাদ্দ মুড়ি-কড়াই, সের দুই আন্দাজ তেলে-ভাজা ছোলা, আর খান্ কুড়ি বেগুনি। মাতালের দল এই মুড়ি-কড়াই দিয়ে মনের খোসে মদ খাচ্চে,—গল্প কোচ্চে,—কেউ বা কবির গান ধোরেছে,—কেউ বা ঘাড় নীচু কোরে নীরবে বোসে আপন মনে মদ খাচ্চে, আর ঢুল্‌ছে। একজন জিজ্ঞাসা কোল্লে, "সেবারে তুই খুব বেঁচে গেছিলি। কিন্তু আমি তখন সেই ডাকমারা মোকর্দ্দমায় দারোগা সাহেবের গুতোর চোটে পেঁড়োয় গিয়ে পীর সেজিছি। তুই যে কি কোরে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছিলি, সে সব কথা শোনা হয় নি। হরে, পেল্লাদে, ছোটুলাল, জেন্দারে, খোসালে, মসালে, সকল শালাই ধরা পোড়ে গারোদ ঘরের কড়ি গুণ্‌ছে। মৌলবী সাহেব ডাকাত ঠেকানো গোরা সাহেবের কড়া হুকুমে ছ ছ বছর ঠুকেছে। বাপ মায়ের দয়ার জোরে আমিই কেবল জাল ছিঁড়লাম। যদি বেঁচে এলাম, তবে শুনি। বল ভাই।"

যাকে জিজ্ঞাসা কোচ্চে, সে লোকটী একটী ছোটদরের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে যেন নিতান্ত দুঃখিত হয়ে বোল্লে, "আর রক্ষে! সেবার যেন ধর্ম্মে ধর্ম্মে প্রাণ রক্ষে হয়েছিল, কিন্তুন্ এবার?" আগের লোকটী আশ্বাস 'দিয়ে বোল্লে, "আরে, তার জন্যে এত ভাবনা কেন? যখন সর্ব্বেশ্বর নিজে আছে, তখন এক্‌টা হবেই। বল্, এখন তোর সেই কথা বল্।" এবারে সে লোকটী উত্তরে বোল্লে, "সে বড় মজার কথা ভাই। শম্ভুবাবুকে চিন্‌তিস ত? তার নাকি ভারি টাকা। আমাদের ঘেটেল বাবু একদিন কি আবিশ্যকে তার কাছে হাজার কতক টাকা চেয়ে পাঠায়। ব্যাটা পাজীর পা ঝাড়া কি না, গুমোর কোরে বোলে-ছিল, দেবো না। ঘেটেল বাবুর তাতে অপমান বোধ হলো। আমাদের কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বরকে খবর দিলে। আমি আর উমো দুজনে গেলাম। ঘেটেল বাবু বোল্লে, তোরা যদি তিন দিনের মধ্যি শোম্বা শালার মরা খবর আন্‌তি পারিস্, তোদের দুজনকে পঁচিশ টাকা সেরোপা দেব!" আমরা সেই লোবে লোবে গিয়ে শালারে মল্লিকির হাটে ঘের্‌লাম। শালার সঙ্গেও দুজন খুব টন্‌কো পা'ক ছিল। আমরা ঘিরতেই পা'ক দুজন লাঠি ভেঁজে দাঁড়ালো। জানিস্ ত উমোর কত্তি জোর, তিন পেঁচেই ক্যাৎ। শালারে তকোন ধোরে—মুখ বেঁধে রাণীমহল্লায় আসলাম।

মেরে ফ্যালবার ইচ্ছে ছিল না। শালার লম্বাচৌড়া কথা শুনে, আমাদের ফাঁসি ঝুলোবে বোলে ভয় দেখালে বোলে, দু-পাঁচ ঘা পাৎলা গোচ দিতিই কাজ গুচিয়ে গেল। তকোন করি কি, উমো শালা ত তিন ভাঁড় তাড়ি ঠুসে কোথায় সট্‌কালে। আমি পড়লাম ফাঁপোরে। একটা বাক্সোর মধ্যি শালারে পুরে মাথায় কোরে বেরোলাম। ঢের ঘুর এসে দেখ্‌লাম, দোতালার উপর থেকে একটা মেয়ে নোক একগাছা দড়ী নামাচ্চে আর তোল্‌চে। তোরা যে তার সাননের বাড়ীতি ছিলি, ত্যাকোন তা জান্‌তাম না। আমি সেকেনেই এক্‌টা বুদ্ধি খেটিয়ে সেই দড়ায় বাস্‌কোডা বেঁদে দিয়ে সোরে পড়্‌লাম। আর আমারে ত্যাকোন পায় কে? ঘেটেল বাবু কিন্তুন্ বড় ভাল লোক। যেতি মোত্তর বেবাক টাকা গুণে দিলে।”

একজন জিজ্ঞাসা কোল্লে, “যাদের বাড়ী সেই বাক্সো পাওয়া গেল, তাদের কি হলো?” লোকটা উত্তর কোল্লে যে, “যেমন চেরকাল হোয়ে থাকে, তাই হলো। পুলিসের লোকে দিন কতক খুব তাড়াহুড়ো কল্লে, বাড়ীওলাদের মাস তিনেক গারোদে পচালে। শেযে ক’ টাকা জরিপানা, না কি কোরে খালাস দেলে।”

এক্‌টা রহস্য প্রকাশ হলো। যে কথাটা শুন্‌বার জন্যে এতদিন ধুক ধুকানী ছিল, সেটা জান্‌তে পাল্লেম। আরো জান্‌লেম, সেই কাশী হতে এরা এতদিন পলাতক অবস্থাতেই আছে। কুসুমকে যে কোথায় রেখেছে, তার কিছুই সন্ধান পেলেম না।

কথা হচ্চে। অনেক কথা হলো। শেষে আবার আমার কথায় একজন বোল্লে “আরে আমি গোড়া থেকেই ত বোল্‌চি, সে ছুঁড়ি এখানেই আছে। আহা! এমন রূপ আর কোথাও দেখি নি। আমাদের অগম্য স্থান ত আর নেই? কত দেখ্‌লাম—কত গেল, কিন্তু এমন চেহারাটী কখনো দেখি নাই। যদি একদিনও পাই, তাবুও জীবন সার্থক। যেমন-চোক, তেমনি রং, তেম্‌নি চেহারা! বয়েসও বড় জোর—সতের।

সব কথা শুন্‌চি, হঠাৎ পেছুন দিকে একটা শব্দ হলো। যেমন সেই দিকে চাইব, অম্‌নি তখনি সাঁ কোরে এক্‌টা লোক এসে আমাকে ধোরে ফেল্লে। চেঁচাতে যাব, চীৎকার কোরে বাবুকে তুল্‌বো, তারও উপায় নাই, সাঁ কোরে আর একজন লোক এসে আমার মুখ চেপে

খোল্লে। টেনে রাস্তায় আন্‌লে। সুড় সুড় কোরে সব লোকগুলি একত্র হলো। অম্‌নি আমাকে নিয়ে পলাতক!

আমার অদৃষ্টে হলো কি? এতদিন পরে যে সুখ-চন্দ্রের দর্শন পেলেম, মনে কোল্লেম, এতদিনে বুঝি দুঃখনিশির অবসান হলো, কিন্তু বিধাতার তাও সইল না। হায় হায়! আমি পেয়ে হারালেম?

রাস্তায় মাষ্টার বাবু এলেন। এতক্ষণ কোথা ছিলেন জানি না, এখন এসে যোগ দিলেন। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "হরিদাসি! এত-দিন কোথা ছিলে তুমি? অপরাধ কি আমাদের?—কেন আমাদের ছেড়ে গেলে? এ কি ছেলেমি তোমার? থাক্, সে কথায় আর এখন কাজ নাই। এখন চল।"

মাষ্টার বাবুর কথায় উত্তর কি দিব? মনের মধ্যে এখন যা হচ্চে, আমার প্রাণের আজ যে যাতনা, তা প্রকাশ কর্ব্বার ভাষা নাই।

যাচ্চি, বাধ্য হয়েই যাচ্চি। দুটী চোকের জলে পথ দেখ্‌তে পাচ্চি না। বারম্বার পায়ে আঘাত লাগচে, তবুও যাচ্চি। বাবু রইলেন, পরিচয় দিলেম না, প্রকাশ কোল্লেম না। হতভাগিনী আমি, আমার কপালে শেষে এই ছিল? যত যাই, ততই মনে হয়, প্রাণের কেবল এই একই কথা—হায় হায়!—পেয়ে হারালেম!

সপ্তবিংশ চক্র।

—:o:—

এমন দিন কি হবে?

তিনদিন ক্রমান্বয়ে হেঁটে আমরা একটী বড় সহরে পৌঁছিলেম। সহরের নাম হাতারাস। এখানে শুন্‌লেম, অনেক বড় বড় লোকের বাস। বড় লোকের মধ্যে বাঙালী খুব কম। এখানে বেশ বাসা পাওয়া যায়। খালি বাড়ীর সংখ্যাই এদিকে অধিক। লোকে বাড়ীই বা করে কেন,—আর ফেলেই বা রাখে কেন, এর কারণ কিছুই পেলেম না।

কেবল একটা গুজোব আছে যে, বিদ্রোহের সময় ইংরেজ বাহাদুরের গোরারা এই সকল দেশ ছারখারে দিয়েছে। এই সকল বাড়ী লোকজনে পূর্ণ ছিল, সেই মহাবিদ্রোহের পর হতেই এই সকল বড় বড় বাড়ী শূন্য পোড়ে আছে। কথাটা কতদূর সত্য, তা ঈশ্বরই জানেন, কিন্তু গুজোবটা সত্য বোলেই আমার বিশ্বাস হলো।

খালি বাড়ী যখন এখানে বিস্তর, তখন বাসা পাওয়া বড় কষ্টের বিষয় নয়। ভাড়াও সামান্য। আমরা মাসিক ৫৲ টাকা ভাড়ায় একটা দোতালা বাড়ী ভাড়া পেলেম। বাড়ীর নীচের ঘর সকল পোড়ে আছে। নীচের ঘরগুলি যেমন অন্ধকার—তেমনি দুর্গন্ধ। কতকগুলি ঘর পুরাতন, চাবীতালা বন্ধ, কতকগুলি খোলা। তাতে দেশের স্বাধীন ষাঁড়ের দল কায়েক মোকাম সাব্যস্ত কোরে নির্ব্বিবাদে বসবাস কোচ্চে। উপরের ঘরগুলি তেমন অপরিষ্কার নয়, তবে লোকজন না থাকলে, সম্ভবমত যতটুকু অপরিষ্কার হয়, ঘরগুলি ততটুকু অপরিষ্কারই আছে।

ঘরগুলি পরিষ্কার কোরে আমরা সেই ঘরেই রইলেম! তিন দিন পরেই মাষ্টার বাবুর আর পাঁচজন অনুচর এসে হাজির হলো। উপরে চারিটী ঘর। একটীতে আমি, একটীতে মাষ্টার বাবু, আর একটীতে অনুচরেরা রইল। ৩৲ টাকা বেতনে একজন রসুয়ে ব্রাহ্মণ, আর ১৲ টাকা মাত্র বেতনে একটী ঠিকা চাকরাণী নিযুক্ত হলো। বাবুর টাকার অভাব নাই, তিন দিনেই চলনসই সমস্ত দ্রব্যাদি কিনে লওয়া হলো। আমরা সকলেই এই বাড়ীতে রইলেম।

কতদিন এখানে থাকতে হবে, তা বিধাতাই জানেন। তবে এদিকে যে রকম বন্দোবস্ত দেখছি, তাতে এখানেই যে এরা বেশী দিন থাকবে, তা বোধ হয় না। এরা সব পলাতক আসামী! পুলিসের চোকে ধূলো দিয়ে, তাদের সজাগ-দৃষ্টিকে রম্ভা প্রদর্শন কোরে সোরে প্োড়েছে! একেবারে নিরুদ্দেশ! এখান থেকে কাশী অনেক দূর। দেশ ছেড়ে এসেও এদের কিন্তু ভয় ঘুচে নাই। দিনে কেউ কোথাও যায় না, একেবারেই বেরুতে নিষেধ। সর্ব্বদাই যেন চঞ্চল। এতে কোরে বোধ হয়, বেশী দিন এরা এখানে থাকবে না। থাকা না থাকায় আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যেখানেই নিয়ে যাক, সেখানেই ত আমাকে যেতে হবে। কেবল ভাবনা আর দুর্ঘটনাকে আশ্রয় কোবে সমস্ত জীবন

কেবল ভেসে ভেসেই ত বেড়াতে হবে। যখন পেয়ে হারিয়েছি, তখন একেবারেই হারিয়েছি। এ জীবনে সুখের আশা আমার নাই!

একদিন সকালে চারিদিকে বাজনা শুন্‌তে পেলেম। প্রথমেই ভাবলেম, বিবাহ! তখনই আমার মনে হলো, চারিদিকেই তবে বাজনা কেন? এতই কি ধূম?—ঘরে ঘরেই কি বিবাহ? অসম্ভব! কান পেতে শুন্‌লেম, বাজনার সঙ্গে গান! যাত্রা নয়, বটকিরি গান নয়, পুরুষ-মানুষের গান নয়, স্ত্রীলোকের মিহিসুর। বাজনা ক্রমেই নিকটে এলো। মাষ্টার বাবুর নিষেধ না শুনে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেম। দেখলেম, খুব লম্বা লম্বা ঘোম্‌টা দেওয়া—ফাগ আবীর ভরা—ভাল ভাল গয়না কাপড়পরা হিন্দুস্থানী কুলকামিনীরা হেল্‌তে দুল্‌তে আগে আগে চলেছেন;—সেই সব ঘোমটার মাঝে মুখ লুকিয়ে চীৎকার কোরে গান গাইতে গাইতে চলেছেন। পাছু পাছু পুরুষেরা দোয়ারকী কোচ্চে; খমক, মৃদং, মন্দিরা, করতাল, খঞ্জনী আরও কত রকম অজানা যন্ত্র বাজাতে বাজাতে চলেছে। আশ্চর্য্য আচার বিচার! পুত্রবধূ, ভগ্নি, মামী, পিসি, কন্যা এরা সকলে গাইছে; আর শ্বশুর, দাদা, বোন্‌পো, ভাইপো এরা সকলেই বাজাচ্ছে। রকম রকম তামাসা কোচ্চে, ফাগ পিচকারী আদান প্রদান হচ্চে, আনন্দের সীমা নাই। এ সকল কথা মাষ্টার বাবুর মুখে শুন্‌লেম, আরও শুন্‌লেম, পর্ব্বটার নাম হোরি।

চমৎকার আদব কায়দা। রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার কোরে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্চে, তাতে সম্ভ্রমের লাঘব হচ্চে না। যখন ঘোম্‌টা আছে, তখন আর লজ্জা কি? লজ্জা বোলে কোন একটা জিনিস নাই। লজ্জা কেবল অভ্যাস। যে দেশে যে যে বিষয়ে লজ্জা কর্ব্বার নিয়ম আছে, লোক সেই দেশের চাল-চলনের সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জা কোরতে শিক্ষা করে। যার যেমন অভ্যাস, সে তেমনি লজ্জাশীলা। এর প্রধান দৃষ্টান্ত আমিই স্বয়ং।

এক সপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যার সময় মাষ্টার বাবু নির্জ্জনে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তখনি তার ঘরে হাজির হলেম। মাষ্টার বাবু আদর কোরে বসিয়ে আমাকে বোল্লেন, "হরিদাসি! তোমাকে এনেছি বোলে হয় ত তুমি মনে মনে কত রকমই ভেবেছ। মনে কিছু করো না। কোন মন্দ ভাব ভেবো না। তোমাকে আমি বড় ভালবাসি।

তোমাকে সর্ব্বদা দেখতে ভালবাসি কি না, তাই তোমাকে কাছে রাখতে চাই। কোন মন্দ ভাব ভেবো না। ভাল, আর এক কথা। তোমার সঙ্গে সেই ষ্টেশনের বাজারে যে লোক্‌টী ছিলেন, তাঁকে কি তুমি জান? তাঁর কি কিছু পরিচয় পেয়েছ?" আমি সব কথা খুলে বোল্লেম। সকলই সত্য বোল্লেম। তখন আর গোপন কর্ব্বার আবশ্যক বিবেচনা কোল্লেম না। আশা হলো, অবশিষ্ট পরিচয় হয় ত মাষ্টার বাবুর কাছে পাব। এই ভেবে সকল কথা—যতটুকু পরিচয় জেনেছি, ততটুকু বোল্লেম। মাষ্টার বাবু বোল্লেন, "ওহো হো! বড় ভুল হয়েছে। আমরা ভেবেছিলেম, সে কোন দুষ্ট লোক, তোমাকে হয় ত ফাঁকি দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। এই ভেবেই তোমাকে তার হাত থেকে উদ্ধার কোরেছিলেম। যদি ঘুণাক্ষরে জান্‌তে পাত্তেম, তা হলে কি এমন হয়? ওহো! তাই! মস্ত ভুল। সেই জন্যেই তুমি বুঝি অত ভাব? মাঝে মাঝে—গোপনে গোপনে কাঁদ? আমি ত এতটা জানি না, তা তখনি কেন বোল্লে না? যাই হোক, যা হবার তা ত হয়ে গেছে, এখন ত আর উপায় নাই। আজই—এই রাত্রেই আমি লোক পাঠাচ্চি। যেখানে হোক তাঁকে সঙ্গে কোরে আন্‌বে। এখানে নয়, কাল আমরা আগ্রায় যাব। আমার লোক তাকে সেইখানে নিয়ে যাবে। আমার প্রতিজ্ঞা, সত্য কোরে বোল্‌ছি হরিদাসি—আমার প্রতিজ্ঞা, তোমাকে তাঁর হাতে দিয়ে—তোমাকে সুখী কোর্ব্বোই কর্ব্বো।"

মাষ্টার বাবুর কথায়—হাতে যেন স্বর্গ পেলেম। সম্মুখে যেন স্বর্গের ছবি দেখতে লাগলেম। আনন্দে কেঁদে ফেল্লেম। মাষ্টার বাবুর পা দুখানি ধোরে বোল্লেম, "আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমার—" আর কথা কইতে পাল্লেম না। মাষ্টার বাবু তখন আরও কত আশ্বাসের কথা—সুখের কথা শুনালেন। কত বুঝিয়ে বিদায় কোল্লেন।

আপনার ঘরে এলেম। সমস্ত রাত কেবল ভেবেই কাটালেম। মনে মনে কত সুখের ছবি আঁকলেম। আবার অদৃষ্টের দিকে চেয়ে মনে হলো, যেমন হতভাগিনী আমি, আমার পোড়া অদৃষ্টে এমন দিন কি হবে?

অষ্টাবিংশ চক্র।

অবাক কারখানা!—আজব তামাসা!

সকালেই আমরা রওনা হোলেম। এখানকার বাড়ীওয়ালাকে ভাড়াপত্র চুকিয়ে দিয়ে আমরা সকলেই রওনা হোলেম। কেবল একজন লোক জগদ্বন্ধু বাবুর অনুসন্ধানে গেছে। তিনি হয় ত বৃন্দাবনে যাবেন, এ কথাও সেই লোকটীকে বোলে দিয়েছি। ঈশ্বরের কাছে সুফল প্রত্যাশায় প্রার্থনা কোরে আমরা বেরুলেম। ৩.৪ দিনে আমরা আগ্রায় পৌঁছিলেম। আসবার সময় এলাহাবাদের ষ্টেশন দেখে মনে বড় ভয় হয়েছিল। হরিশঙ্কর বাবুর সঙ্গে মাষ্টার বাবু যে ভয়ানক জুয়াচুরি কোরেছেন, সে সকল কথা মনে পোড়্‌তে বড় ভয় হলো! তখনি গাড়ী আবার চল্লো। তখনি তখনি মনের ভয়ও দূরে গেল।

আগ্রা পশ্চিম দেশের একটী প্রধান সহর। বিশেষ এখানকার তাজমহলই প্রসিদ্ধ। তাজমহল দেখ্‌তে কত দেশের কত লোক আসেন, শুন্‌তে পাই। মনে রইল, যদি ঈশ্বর দিন দেন,—যদি তাঁকে পাই, যদি আমার এই জীবন-মরুভূমে শান্তি-সরসী দেখ্‌তে পাই, তবেই মনের সাধে একবার তাজ-মহলের শোভা দেখ্‌বো।

আমরা ষ্টেশন থেকে বরাবর দক্ষিণদিকে গেলেম। যে রাস্তা দিয়ে গেলেম, তার নাম শুন্‌লেম, জিন্দ ঘাটের রাস্তা। আমরা সেই রাস্তা দিয়ে চোল্লেম। মাষ্টার বাবু বোল্লেন, "অতি নিকটেই বাসা। এইটুকু হেঁটেই বেশ যাওয়া যাবে।" এই জন্যেই আর গাড়ী কি একা ভাড়া হলো না। গাড়ী এখানে খুব কম, এক্কার ভাগই অধিক। এক্কা একটীমাত্র ঘোড়ায় টানে। দুখানি চাকা কেবল কাঠের, আর সব বাঁশের সাজ-সরঞ্জাম। দুখানি চাকার উপর যেন একটী ছোট মাচা। গাড়োবান ভিন্ন পিঠে পিঠ দিয়ে দুই চাকায় দুজনের এক একখানি পা ঝুলিয়ে দিয়ে আর একখানি পা মুড়ে বোস্‌তে হয়। আমি এক্কায় একবারমাত্র

গিয়েছিলেম। এত কষ্ট যে, ঝেঁকুনীতে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়েছিল! চার পাঁচ দিনে গায়ের ব্যথা সারে না। এই রকম এক্কাই এখানে বেশী।

বড় রাস্তা দিয়ে আমরা সকলে চোল্লেম। মাষ্টার বাবু বোলেছিলেন, নিকটেই বাসা, কিন্তু প্রায় একক্রোশ এসেও বাসার দেখা পাই না। পথ হাঁটা আমার অভ্যাস আছে, তাতেই বেশী কষ্ট হলো না। এতদূর এসে মাষ্টার বাবুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, মাষ্টার বাবু! বাসা আর কত-দূর?" মাষ্টার বাবু সদর রাস্তার উপরেই একটা বড় দরের পুরাতন বাড়ী দেখিয়ে বোল্লেন, "ঐ যে—নিকটেই।" আমরা যথাস্থানে পৌঁছিলেম। বাড়ীটা খুব বড়। নীচের যে ঘরগুলি, তাতে নানা রকমের দোকান! মণিহারী, দরজী, মুদী, খাবার, হরেক রকম জিনিস পত্রের দোকান। উপরের ঘরে লোকজন আছে। আমরা সকলে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম! সদর দরজার পর ছোট একটী উঠান, তার পরেই আবার উপরে উঠ্‌বার সিঁড়ির দোর। সে দোরটী বন্ধ দেখে মাষ্টার বাবু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, "নানী বুড়ী! নানীবুড়ী ঘরে আছিস?" একটী মেয়ে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়ে দেখে আবার ফের ঘরের মধ্যে ঢুকলো। একটু পরেই একটী বুড়ী একমাথা পাকাচুল চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালো। চাউনীতে তেমন জোর নাই। প্রাণপণ দৃষ্টিতে ভাল কোরে দেখে—জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেরে মিন্সে তুই, নাম ধোরে ধোরে ডাকাডাকি কোচ্চিস? নাড়ী কাটতে দেখেছিলি না কি? যা, তফাৎ যা! এখানে কি দরকার? বাড়ী টাড়ী ভাড়া নেই। অন্য যায়গায় দেখ! মাষ্টার বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "আমি গো আমি।" নাম ধোরে ডাকতেই বুড়ী হাড়ে হাড়ে চোটেছে। বিরক্ত হোয়ে বোল্লে "আহা হা! আমি গো আমি! কি আমার সাত পুরুষের গুরুঠাকুর গো, কে তোকে চেনে? যা, চোলে যা, তোর আর আত্মতায় কাজ নাই।" মাষ্টার বাবু এবারে নিজের পরিচয় দিয়ে বোল্লেন, "আমি গো, অচেনা লোক নয়। আমি সর্ব্বেশ্বর।" বুড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কোন্ সর্ব্বেশ্বর? কোথাকার সর্ব্বেশ্বর! কিসের সর্ব্বেশ্বর? বাবু একটু রেগে উত্তর কোল্লেন, "তোমার বাবা সর্ব্বেশ্বর! কাশীর সর্ব্বেশ্বর!" বুড়ি ফোগ্‌লা দাঁত বার কোরে একগাল হেসে বোল্লে, "কে?—বাবু? আ আমার পোড়া কপাল! তুমি দাঁড়িয়ে? আমি বলি কোন হতভাগা

বুঝি বাসা দেখ্‌তে এসেছে। চোকে দেখ্‌তেও পাই না, এদানি আবার কানেও একটু যেন বাতাসবাধা মত হয়েছে। এখন গঙ্গা লাভ কোল্লেই বাঁচি।" এই রকম পাঁচ-কথায় নিজের দুর্দ্দশার সঠিক বর্ণনা কোর্ত্তে কোর্ত্তে বুড়ী দোর খুলে দিলে। আমার দিকে চেয়ে বোল্লে, "বাবা সর্ব্বেশ্বর! এ মেয়েটী কে? মাষ্টারবাবু বোল্লেন, "আমারই একজন। পরে শুন্‌বে। এখন তেতেপুড়ে এলেম, ঠাণ্ডা হই। সব কথাই এর পরে শুন্‌তে পাবে।" বুড়ী আমাদের বসিয়ে রেখে—চেঁরিয়ে পাড়াটা মাথায় কোরে তুল্লে। "ও বামা,—ও শ্যামা,—ও আহ্লাদী" একটানে এমন কত লোকের নাম কোরে ডাকাডাকি কোর্ত্তে লাগ্‌লো। "বাবু এসেছেন,—সঙ্গে মেলা লোকজন এসেছে, তোরা সব গেলি কোথা?" এই সকল কথায় চেঁচাচেঁচি কোত্তে লাগ্‌লো। বুড়ীর চুল পাকা, দাঁত পড়া, কিন্তু গলাটী যেন কাঁসা!

বুড়ীর চীৎকারে তিন চারিজন চাকরাণী এসে হাজির হলো। আমাদের স্নানের—জলখাবারের জোগাড় কোরে দিলে। রাস্তার কষ্ট, আমরা তখনি নেয়ে—জল খেয়ে শুয়ে পোড়্‌লেম। এক ঘুমেই বেলা একটা।

মাষ্টার বাবু ডাকাডাকি কোরে ঘুম ভাঙালেন্। ভাত হয়েছে, পরিবেশন হয়েছে, সমস্ত প্রস্তুত। সকলেরই আহার হয়েছে। আমিই কেবল বাকী। তাড়াতাড়ি উঠে—হাত-মুখ ধুয়ে একজন চাকরাণীর সঙ্গে অন্য ঘরে গেলেম;—দেখ্‌লেম, সেখানে সমস্তই প্রস্তুত। নিয়মিত আহার কোরে আবার সেই ঘরে এলেম। এ ঘরে এখন কেবল মাষ্টার বাবু, আমি আর সেই নানী বুড়ী।

মাষ্টার বাবুর সঙ্গে নানীবুড়ীর যে ভাবে কথাবার্ত্তা হলো, তাতে বেশ বুঝ্‌লেম, এদের পরস্পরের বেশ জানা শুনা আছে। মাষ্টার বাবুর কীর্ত্তি-কারখানা বুড়ীর অজানা নাই! তাতেই বোধ হলো, এ বাড়ীর বুড়ীও একজন পাকা ঘাগী। বুড়ীর কথার যেমন আঁটা আঁটি, কথার যেমন বাঁধাবাঁধি, তাতে যে সে একজন ভয়ানক লোক, তাও বুঝ্‌তে বাকী রইল না। মাষ্টার বাবুর যেখানে যে যে আলাপী আছে, তারা যে প্রায়ই সেই ধরণের লোক, তাতে আর সন্দেহ কি আছে?

এদের কতক কথা আমার সাম্‌নেই হলো। বেলা পোড়্‌লে আমাকে

সেই ঘরের ভিতর বোসিয়ে রেখে দুজনে ঠাণ্ডায় ছাতের উপরে গেলেন। রাত ৯টা পর্য্যন্ত অনেক পরামর্শ আঁটা আঁটি হলো।

৯টার পর দু-জনে নেমে এলেন। এদিকে আহারের আয়োজন হলো। সকলের আহার শেষ হলো। মাষ্টার বাবুকে বুড়ী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "এ মেয়েটীকে কোন্ ঘর দেবে? টেরের ঘর দেবে কি? না আর কোন একটা? মাষ্টার বাবু বোল্লেন, "কেন? সে ত বেশ ঘর! খারাপ ঘরে শুতে কষ্ট হবে। সেই ঘরই দাওগে যাও!" কথাটা যেন কেমন কেমন লাগ্‌লো। ভাব্‌লেম, মন যার কু, সে কেবল কু-চিন্তাই করে। দূর কর,—এ সব কিছু নয়। মনকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বুড়ীর সঙ্গে শোবার ঘরে গেলেম।

ঘরটী দিব্য সাজানো। সাজানো মানে যে চারিদিকে কতকগুলো জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো, তা নয়। ঘরটী বেশ পরিষ্কার। সমস্ত মেঝে একখানা বড় বড় ফুলকাটা সতরঞ্চী দিয়ে মোড়া। মাঝে—ঠিক ঘরের মাঝে একখানি চমৎকার পালঙ। তাতে পুরু গদি, ধোপদস্ত চাদর, সাদা সাদা বালিশ। ঘরের চারিদিকের দেয়ালে চারজোড়া দেয়ালগিরি। পালঙখানির চার কোণ চারগাছি চামড়া-মোড়া মোটা দড়ী দিয়ে কড়ির সঙ্গে ঝুলানো। বোস্‌লেই—কি শুলেই দিব্যি দোলা লাগে। আপনা হতেই ঘুম আসে। আবার সেই টাঙানো দড়ীতে চারিখানি বড় বড় আড়ানী পাখা বাঁধা। শুলে যেমন পালংখানি দুল্‌তে থাকে,—যেমন দড়ী চারিগাছি দোলে, তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে, সেই দড়ীবাঁধা আড়ানী পাখা চারিখানিও আপনা হতে সেই দড়ীর দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক নড়ে, দিব্যি হাওয়া লাগে। চমৎকার ঘর! শুয়ে সুখ আছে। আমি যেমন শুলেম, অমনি পালঙ দুল্‌তে লাগ্‌লো, আয়েসের সীমা নাই। আমার এত যে চিন্তা, এত যে ভাবনা, তবুও শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম।

হঠাৎ ছ্যাঁৎ কোরে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের ঘোরে উঠে বোস্‌লেম। বোধ হলো, পালংখানি আমাকে নিয়ে যেন জড়সড় কোরে নীচে নেমে যাচ্চে। প্রথমে বিশ্বাস হলো না, স্বপ্ন বোলে বিবেচনা হলো। তাড়াতাড়ি—ভয়ে ভয়ে ভাল কোরে চোক মুছে, ভাল কোরে চেয়ে দেখ্‌লেম, সত্য সত্যই আমাকে নিয়ে পালং নীচে নেমে যাচ্চে।

মেঝের মধ্যে এমন ফাঁক ত ছিল না? তবে কি ভৌতিক কাণ্ড? ঘরের আলো উপর হতে অল্প অল্প নজর হোচ্চে। আমি পালঙ-শুদ্ধ যেন পাতালের ভিতর চোলে যাচ্চি! ভয়ানক অন্ধকার!—কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না!—ঠক ঠক কোরে গা কাঁপ্‌ছে!—এতদিন উপরেই ছিলেম, যখন যে বিপদে পোড়েছি, তখন মানুষের মুখ—পৃথিবীর মুখ দেখ্‌তে পেয়েছি! এখন একবারে পাতালের ভিতর চোল্লেম যে। পালাবার উপায় নাই,—পালং হতে লাফিয়ে পড়্‌বার সুবিধা নাই। করি কি? চুপ কোরে রইলেম। আপনার অদৃষ্টের উপর আপনার ভবিষ্য অদৃষ্টের ভার দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম।

সড় সড় কোরে ক্রমান্বয়ে নেমে পালংখানি থাম্‌লো। বোধ হলো, যেন মাটীতে ঠেকেছে। আস্তে আস্তে পালঙ থেকে পা বাড়িয়ে দেখ্‌লেম। মাটী পেলেম। চারি দিকে কোথায় কি আছে, সকল দেখ্‌বার জন্যে পালং থেকে নাম্‌লেম, অমনি ঝম কোরে একটা শব্দ হয়ে পালংখানা উপরে উঠে গেল। চমৎকার কাণ্ড!—অদ্ভুত ব্যাপার!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌লেম। মনের ভিতর তখন কত কি ভাবনাই এলো, কত রকম চিন্তাই কোল্লেম, এখন তা প্রকাশ কোত্তে পাচ্চি না। প্রাণের ভিতর যেন থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগলো। বুক শুকিয়ে গেল! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেম। এখন করি কি?

দাঁড়িয়ে আর ফল কি? দূরে একটু আলো দেখ্‌তে পেলেম। সেই আলো লক্ষ্য কোরে চোল্লেম। যেখানে দাঁড়িয়েছিলেম, তার দুটী দরজা পেরিয়ে দেখ্‌লেম, চার পাঁচটী ঘর। সব ঘরেই আলো জ্বোল্‌চে। ছোট ছোট খাটিয়ায় এক একটী মেয়ে শুয়ে ঘুমুচ্চে! আমি আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। এক দুই কোত্তে কোত্তে সব ঘর বেড়ালেম। সব ঘরেই সেই রকম মেয়েরা শুয়ে আছে দেখলেম! চার পাঁচ বৎসর হতে ১৩।১৪ বৎসর বয়সের প্রায় ২০।২৫টী মেয়ে ঘুমুচ্চে। ঘুরে ঘুরে এ সব দেখে একটী মেয়ের খাটিয়ায় বোস্‌লেম। এ মেয়েটীর বয়স কিছু বেশী। প্রায় পোনের ষোল।

অনেকক্ষণ বোসে কাটালেম। ঘরের উপর ফাঁক আছে। এ ফাঁক ছাতের নয়। ছাতের নীচে সারি সারি ছোট ছোট ফাঁক।

সেই ফাঁক দিয়ে আলো দেখা গেল। অনুভবে বুঝলেম, রজনী প্রভাত।

মেয়েরা একে একে উঠতে লাগলো। আমি যার খাটিয়ায় বোসে-ছিলেম, তার আগেই ঘুম ভাঙলো। সে অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রইলো। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি কে গা?" আমি বোল্লেম, "সে কথা পরে বোল্‌বো। আগে আমার কথার উত্তর দাও! তোমরা কে—এখানে তোমরা কেন?—তোমাদের উপরের বাড়ীতে যারা আছে, তারা তোমাদের কে? সত্য বলো, ভাল হবে। আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই এসেছি।" শেষের কথাটি কেবল প্রলোভন। মেয়েটী বোল্লে, "এখানে যতগুলি মেয়ে দেখচো, এদের সঙ্গে উপরকার লোকদের কোন সম্বন্ধ নাই। ওরা আমাদের শত্রু। ছেলে-বেলায় কৌশল কোরে—টাকা দিয়ে—নানা উপায়ে আমাদের সব ধোরে এনে এখানে রেখেছে। অনেক দিন আমরা এখানে আছি। এ সব কথা অনেকে জানে না। যারা খুব ছেলে-বেলায় এসেছে, তারা জানে, উপরের বুড়ী আর বাবুরাই তাদের আপনার জন। আমি আট বছর বয়সে এখানে এসেছি। আমার বাপ, মা, ভাই সকলই ছিল। ঝিয়ের সঙ্গে গঙ্গা নাইতে এসেছিলেম। ঝি তার বোন্‌ঝিকে দেখার নাম কোরে এই বাড়ীতে এনেছিল, শেষে এরা ধোরে এখানে রেখেছে। আমি কত কাঁদলেম, কত মিনতি কোল্লেম, কেউ সে কথা কানে তুল্‌লে না। শেষে এইখানেই আছি! মাঝে মাঝে—প্রায় নূতন নূতন মেয়ে আসে। আমদানী যেমন,—রপ্তানি তেমন নয়। আমি যখন প্রথম আসি, তখন এখানে বড় জোর দশটী মেয়ে ছিল। আজ সেই দশটী মেয়ে ২৮টীতে দাঁড়িয়েছে। নিয়ে যায় খুব কম। পোনের যোল বছর বয়স না হোলে কাকেও বাইরে বার করে না। বয়েস হোলেই তাকে আলাদা ঘরে রাখে, এক একজন লোক সেই ঘরের ভিতর সর্ব্বদা থাকে, সেখানে কি করে? মেয়েরা কেউ বা চুপ কোরে থাকে, কেউ বা কাঁদে,—কেন কাঁদে, তা জান্‌তে পারি না। সেই ঘরে কিছু দিন রেখে—তার পর কোথায় নিয়ে যায়, জানি না। যে মেয়ে বাইরে গেছে, সে আর কখনো ফেরে নাই। তবে বাইরের কথা আমরা কি কোরেই বা জান্‌বো?

কি সর্ব্বনাশ! পরের মেয়ে-ছলে বলে, কৌশলে, কোথায় বা টাকা-কড়ি দিয়ে এনে এখানে এমন গুপ্তভাবে রাখা, আবার বয়স্থা হোলে নিয়ে যাওয়া, কথাটা বড় ভাল লাগলো না। মনে মনে সিদ্ধান্ত কোল্লেম। কি সিদ্ধান্ত কোল্লেম, তা আর প্রকাশ কোর্‌বো না। আমি পূর্ব্বেই ত জেনে রেখেছি, বুড়ী একজন পাকা ঘাগী;—এখন সেই কথা—কথায় কথায় মিলে যাচ্চে। আরও এ ঘটনার কাণ্ড-কারখানা জান্‌বার জন্যে একটু ভাবভঙ্গী কোরে বোল্লেম, "বটে!—এমন কাণ্ড? কোন ভয় নাই। যখন এসেছি, তখন তোমাদের আর ভয় থাক্‌বে না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তোমরা খাও কোথা?—এখানেই কি রান্না হয়?" মেয়েটী বোল্লে, "না, এখানে রান্না হয় না। খাওয়ার সময় হোলে খাবার নিয়ে দুজন লোক সেই পালঙে চোড়ে নীচে নেমে আসে। আমাদের খাওয়া হোলে আবার চোলে যায়।" আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমরা সমস্ত দিন কি কোরে কাটাও?" মেয়েটী উত্তর কোল্লে, "অনেক কাজ কোত্তে হয়। দাল বাছ্‌তে হয়, কাপড়ে রং কোত্তে হয়, ঢালা পিতল কাঁসার বাসন, মেজে ঘোষে পরিষ্কার কোত্তে হয়, গান শিখ্‌তে হয়, আরো অনেক কাজ কোত্তে হয়। একজন লোক রোজ রোজ দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করায়। কাজ শেষ হোলে সেগুলি নিয়ে যায়, আবার নূতন এনে দেয়। একজন ওস্তাদ নাচ গান শেখায়। এক্‌টু বস্‌বার অবকাশ নাই। বোস্‌লে বা এক্‌টু জিরুলে মারে,—গাল দেয়,—বেশী বেশী অপরাধ হোলে ভাত পর্য্যন্ত বন্ধ করে।"

মেয়েটীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হোচ্চে, এমন সময় এক্‌টা লোক এসে উপস্থিত। অমনি সকলের কথা বন্ধ।—সকলে জড়সড় হয়ে—আড়ষ্ট হয়ে চুপ কোরে রইলো। লোকটী এসেই আমাকে বোল্লে, "এস, তোমার থাক্‌বার জায়গা ঠিক কোরে দি।" আমি সঙ্গে চোল্লেম। এক্‌টা ঘরের চাবী খুলে লোক্‌টা বোল্লে, "যাও, ভিতরে গিয়ে একখানা তোষক, আর এক্‌টা বালিশ নিয়ে এসো।" আমি অগত্যা তাই কোল্লেম। ঘরের ভিতর রাশ রাশ তোষক বালিশ, তারই ভিতর একটু পরিষ্কার দেখে একটী তোষক আর একটী বালিশ নিলেম। পাশেই পাঁচ সাতখানা খাটিয়া পোড়েছিল, লোকটী তারই একখানা নিয়ে যে ঘরে আমি বোসেছিলেম, সেই ঘরের একদিকে যে জায়গাটুকু ছিল, সেইখানে খাটিয়া পেতে দিলে;—বোল্লে,

"এই তোমার বিছানা। এইখানেই তুমি থাক্‌বে।" এই বোলে মেয়েদের দিয়ে একটা বারাণ্ডায় গেল। সার সার বোসিয়ে মেপে মেপে ভাঙা দাল বাছ্‌তে দিলে। নিজে মুরুব্বীধরণে গরম মেজাজে একখানা টুলের উপর বোসে ঘোরতর কড়া চাউনিতে তদারক কোত্তে লাগ্‌লো। আমি এই নূতন বিছানায় বোসে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম।

অদৃষ্টচক্রের এত পরিবর্ত্তন প্রায় হয় না! স্বর্গে উঠ্‌তে উঠ্‌তে একেবারে রসাতলে পতন, এ কার ভাগ্যে হয়? ধোত্তে গেলে এ সর্ব্বনাশের মূলই আমি। নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছি। যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো,—যখন সত্য পরিচয় পেলেম, তখন প্রকাশ কোল্লেম না কেন? পাপীর শাস্তি ঈশ্বর দিতেন, আমি ত তাঁকে নিয়ে দেশে যেতে পাত্তেম। বিষয় না পাঁই, ভিক্ষা কোরে খেলেও ত আমার সুখ ছিল? আমার বুদ্ধির দোষেই আজ এই সর্ব্বনাশ হলো। লোকে কষ্ট পায় কেবল নিজের বুদ্ধির বিপাকে।

আপনার মনে শুয়ে শুয়েই ভাব্‌ছি, আর এক একবার বারাণ্ডার দিকে চেয়ে মেয়েদের অদৃষ্টের বিষয় ভাব্‌ছি। আমি এ পর্য্যন্ত সুখী ত কাকেও দেখ্‌তে পেলেম না। যেখানে যাই, সেইখানেই দুঃখ, কষ্ট, মনস্তাপ। যারা দুর্ভাগ্য, যারা অত্যাচারের জ্বালায় জ্বালাতন, তাদের দুঃখ ত আছেই, কিন্তু যারা লোককে দুর্ভাগ্যের চক্রে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, যারা অত্যাচার করে, তারাই কি সুখী? তাও নয়। তাদের আবার মনস্তাপ বেশী বেশী। তারা যত অত্যাচার,—যত দুষ্কার্য্য,—চত কুৎসিত ব্যবহার করে, তারই চিন্তায় তারা খাক্ হয়ে যায়। রাত দিন তাদের বুকের ভিতর রাবণের চিতা জ্বল্‌তে থাকে। তবে তারাই বা কিসে সুখী?

কত প্রকার ভাব্‌চি কত রকম ভাবের চিন্তা প্রাণের ভিতর আনা-গোনা কোচ্চে, তার আর অবধি নাই। মেয়েদের কষ্ট দেখে আরও কষ্ট হোচ্চে। এক একবার তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচি। দেখচি, হঠাৎ একদিকে নজর পোড়ে গেল। চেয়ে দেখি, মেয়েদের মধ্যে আর দুটী মেয়ে!—এত কষ্ট—এত যাতনা, সব যেন ভুলে গেলেম। প্রাণের ভিতর যেন আনন্দের তুফান উঠ্‌লো। মেয়ে দুটী আর কেউ নয়,—যাদের জন্য এত ভাবনা, তারই একটী সুশীলা, অপর কুসুম।

মনে কোল্লেম, তখনি এদের গলা ধোরে কেঁদে প্রাণের যাতনা মিটাই,

কিন্তু তখন তা হলো না। যে রকম কাণ্ড-কারখানা,—যে রকম এদের কু-মৎলব, তাতে যদি জান্‌তে যে এরা পরিচিত, তা হোলে হয় ত একস্থানে থাক্‌তেও দিবে না। হয় ত আবার কোন্ দেশে নিয়ে যাবে। কাজ কি এখন প্রকাশ কোরে? এর পর সময় বুঝে দেখা কোরবো। এখন আর দেখা কোরে কাজ নাই। যদি দেখা হয়ে যায়, এই জন্যে আবার সাধ্যমত লুকিয়ে রইলেম। আমি যে বুদ্ধি খাটালেম, পাছে তারা সে পথে না যায়, এই ভয়েই আপাততঃ আমার এই আত্ম-গোপন।

ক্রমে বেলা হলো। মেয়েরা ছুটি পেলে। লোকটী পরিষ্কার দালগুলি বস্তাবন্দী কোরে চোলে গেল। সেই সময় দেখ্‌লেন, সুশীলা আর কুসুম আমাদের পাশের ঘরে প্রবেশ কোল্লে। দেখা করার বেশ সুবিধা হলো।

মেয়েরা তাড়াতাড়ি নাইতে গেল। আমিও সঙ্গে গেলেম। বড় একটী নল উপর দিক থেকে নীচের দিকে ঝুলানো আছে। নলের গোড়ার দিকে একটী পেঁচ। টিপ্‌লেই আপনা আপনিই জল পোড়তে থাকে। মেয়েরা সকলেই একে একে নেয়ে এলে। আমিও নাইলেম। স্নান কোরে ফিরে এলেম। আহারাদি সম্বন্ধেও সেই মেয়েটী যে রকম বোলেছিল, ঠিক সেই রকমেই নির্ব্বাহ হলো।

বৈকালে আবার গান-বাজনার ধূম পোড়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই রকমেই কেটে গেল। সন্ধ্যা হোতেই ওস্তাদজী চোলে গেলেন। একজন চাকরাণী এসে ঘরে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেল। তখনি—সেই সন্ধ্যার সময়েই ভাত এলো। সকলেরই আহারাদি শেষ হলো। সকলেই শয়ন কোল্লে। আমিও শুলেম, ঘুমুলেন না। মনে মনে সংকল্প থাক্‌লো রাত্রে সকলে ঘুমুলে সুশীলা আর-কুসুমের সঙ্গে দেখা কোর্‌বো। এই সংকল্পে বিছানায় শুলেম বটে, কিন্তু ঘুমুলেম না।

ছোট ছোট মেয়েরা সমস্ত দিন পরিশ্রম কোরেছে, তারা শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পোড়লো। আমি আস্তে আস্তে উঠে পাশের ঘরে গেলেম। সুশীলা দেখি, জেগে আছে। আমাকে দেখেই জিজ্ঞসা কোল্লে, "কে?" আমি কোন উত্তর না দিয়ে তার বিছানায় গিয়ে বোস্‌লেম। সুশীলা একটু চেয়েই কেঁদে উঠলো। আমি তার মুখে কাপড় দিয়ে নিবারণ কোল্লেম। বোল্লেম, "সুশীলা!—এ সে সময় নয়, এখন চুপ কর। জেনে রাখ, আমি

পাশের ঘরে আছি। দিনে লোকের কাছে প্রকাশ কোরো না যে, তুমি আমাকে চেন। আরও জেনে রাখ, শীঘ্রই তোমার উদ্ধার হবে।” এই বোলে কুসুমকে তুল্লেম। কুসুম ঘুমিয়ে পোড়েছিল। তাকে তুলে সকল কথাই বোল্লেম। সে ত একেবারেই অবাক! এক দিনে বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়, চার দিকে মেয়ের দল, প্রকাশ হোতে পারে। এই ভেবে সে দিনের মত ফিরে এলেম। বিছানায় এসে শুয়ে শুয়ে কেবল এই অদ্ভুত কাণ্ড ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। আজ যে সকল কাণ্ড দেখ্‌লেম, সকলই আশ্চর্য্য, সকলই অদ্ভুত—সকলই অবাক কারখানা!—আজব তামাসা!

ঊনত্রিংশ চক্র।

—:o:—

এক দমেই দেশ ছাড়া।

প্রায় কুড়ি দিন এখানে আছি। আমাকে এখনো কোন কাজ কোত্তে হয় নাই। বোসে বোসেই এই কুড়ি দিন এই কাল পাতালগৃহেই কাটালেম। সুশীলার কাছে সকল কথাই বোলেছি। সেই ভালুকের আক্রমণ থেকে এখানে আসা পর্য্যন্ত আমার জীবনে যে যে ঘটনা ঘোটেছিল,—যে সমস্ত ভয়ানক ভয়ানক ঘটনায় আমাকে লিপ্ত থাক্‌তে হয়েছিল,—যে সকল গুপ্ত কথা এই সময়ের মধ্যে আমি জান্‌তে পেরেছি, সকল কথাই সুশীলার নিকট প্রকাশ কোরে বোল্লেম। আর সুশীলার জীবনে এই সময়ে কি কি ঘটনা ঘোটেছে, সেটী শুন্‌বার বড় ইচ্ছা ছিল। জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, দস্যুরা সুশীলার প্রতি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে নাই। আমার অনুসন্ধানে সুশীলাকে ধোরে নিয়ে তারা নানাস্থানে বেড়িয়েছে! শেষে হতাশ হয়ে এখানে এনে রেখেছে। সুশীলার ধর্ম্ম নষ্ট কোত্তে দস্যুরা অনেকটা যত্ন কোরেছিল, কত প্রলোভন দেখিয়েছিল, শেষে না পেরে অগত্যা তাকে এখানে রেখেছে। কুসুমের অদৃষ্টেও এইরূপ ঘোটেছিল। কাশীতে যে দিন সেই ডাকাত পড়ে, যে দিন সকলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়, কুসুম সে দিন সেই বাড়ীতেই ছিল। ডাকাতদের চীৎকারে

ভয় পেয়ে কুসুম বাড়ীর বা'র হয় নাই। পালিয়ে গিয়ে চোরা-কুঠুরীতে লুকিয়ে ছিল। ডাকাতেরা সে ঘরের সন্ধান জান্‌তো না, কাজেই কুসুম নিরাপদে সেই দিন সেই ঘরেই ছিল। মাষ্টার বাবু, তাঁর অনুচরেরা, ডাকাতদের তাড়া খেয়ে দেশ ছেড়ে তখনো পলায়ন করে নাই, নিকটেই ছিল। ডাকাতেরা চোলে গেলে তারা আপনাদের অবশিষ্ট জিনিষ-পত্র যা কিছু ছিল, তাই চুপি চুপি সংগ্রহ কোত্তে এসেছিল। কুসুম তখন চোরা-কুঠুরী থেকে বেরিয়ে দেখা দেয়। তারাও তাকে সঙ্গে কোরে কাশী হোতে পালিয়ে এখানে আসে। কুসুমকে আপনার শয্যা-সঙ্গিনী কোত্তে মাষ্টার বাবুর বিশেষ চেষ্টা ছিল, কোনমতে না পেরে এখন তাকে এই পাতালের গারদে রেখেছে। এমন আশা দিয়েছে, যদি কখনো মনের গতি বোদ্‌লে যায়,—যদি আবার মাষ্টার বাবুর কথায় সম্মত হয়, তবে তখনি কুসুম মুক্ত হবে,—আবার সুখের সাগরে ভাস্‌বে,—রাজরাণী হয়ে থাকবে।

প্রকাশ পেয়েছে যে, কাশীতে মাষ্টার বাবু ও ঘেটেল বাবুর অনুচরেরা শম্ভু বাবুকে খুন কোরেছে সংবাদ পেয়ে—নিমকের চাকরেরা প্রভু-হন্তার সমুচিত শিক্ষা দিতে মাষ্টার বাবুর বাড়ী লুঠ কোরেছিল। মাষ্টার বাবুর অনেক ধন নষ্ট হয়েছে, কিন্তু কাহারও প্রাণ-হানি হয় নাই।

এদিকের ব্যাপার এই পর্য্যন্ত। এখন কি উপায়ে উদ্ধার হই? এ বড় শক্ত কারাগার। বাড়ীর কোন ঘরে আটক কোরে রথ্‌লে, পালাবার তত অসুবিধা হয় না। যতই শক্তাশক্তি থাকুক, কখনো না কখনো উদ্ধার হবার আশা থাকে, কিন্তু এই পাতালপুরীর গারদের যেমন কড়াকড়, তাতে জীবনে কোন কালে মুক্তি পাবার আশা নাই। অন্য লোক আসা বন্ধ, কেবল আসে চারজন। একজন সকালে কাজ কোত্তে, আর খাবার দিতে দুইজন বোকা গোচের ব্রাহ্মণ। এরা দুজন ত বোকার অগ্রগণ্য, মনুষ্যের মধ্যে তাদের গণ্য করা আর না করা দুই প্রায় একই কথা। আর আসে সেই নানী বুড়ী।—লোকের মত লোক। এই কয়জনকার হাত থেকে উদ্ধার হওয়া বড়ই অসম্ভব। বড়ই শক্ত কথা!—বড়ই কঠিন ব্যাপার!

নানী বুড়ী বিড় পাকা লোক। কথায় মিষ্টতা আছে—যে কথাটী বলে, তার বাঁধুন আছে,—কথার মধ্যে এক একটা শক্ত শক্ত অভিসন্ধি

আছে। কেমন কোরে বনের পাখী ধোরে আন্‌তে হয়, কেমন কোরে জংলা পাখী ধোরে ভাল ভাল বুলি ধরিয়ে দাও কোত্তে হয়, নানী-বুড়ী তা বেশ জানে। খাবার দিয়ে ব্রাহ্মণ দুজন চোলে যায়, কিন্তু নানীবুড়ী বোসে থেকে আমাদের তিনজনকে খাওয়ায়।—"এটী খাও, ওটী খাও" কোরে খাওয়ায়!—না খেলে স্নেহমাখা ভর্ৎসনা করে। খাওয়া হয়ে গেলে—পা ছড়িয়ে বোসে অন্য মেয়েদের দিয়ে পাকাচুল তোলায়, আর আমাদের সঙ্গে অনেক রকম সুখের গল্প করে। অমুক দেশের রাজকন্যা—গোপনে এমন কোরে প্রণয় কোরেছিল, অমুকের মেয়ের স্বামীর ঘরে সুখ ছিল না, শেষে অমুক বড় লোকের আশ্রয়ে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে,—কত সোণা দানা পোরে সুখে কাল কাটাচ্চে। নানী বুড়ীর গল্পের মধ্যে কেবল এই কথা। এই গল্পের ভিতর যে কত রকম গুপ্ত অভিপ্রায় আছে, তা বুঝ্‌তে আর বাকী নাই। নানীবুড়ীর কাছে সেটী কিন্তু প্রকাশ করি না। গল্প শুনি, মাঝে মাঝে মনোযোগের নিদর্শন স্বরূপ 'হুঁ' দিয়ে যাই।

আরও এক মাস গেল। নানী বুড়ীর জ্বর হলো। একজন নূতন স্ত্রীলোক নানী বুড়ীর এই কার্য্যভার গ্রহণ কোরে—খাবার নিয়ে উপস্থিত হলো। তখনি তখনি আলাপ-পরিচয় হলো। ভাবে বোধ হলো, এ লোকটী এ বদ্‌মায়েস দলের নয়। মনে মনে একটু দয়াধর্ম্ম আছে। এ লোকটীর সঙ্গে আলাপ কোরে মনের ভিতর যেন একটু আশা পেলেম।

এ স্ত্রীলোকটীর নাম শুন্‌লেম, লছিমন। লছিমন সধবা। তাঁর স্বামী এই দলের একজন চাঁই। লছিনন বড় ঘরের মেয়ে। জাতে আগে ছিল ব্রাহ্মণ, এখন হয়েছে ছত্রি। লছিমনের পিতা বঙ্গদেশের কোন স্থানে কর্ম্মোপলক্ষে গিয়ে সেইখানেই বাস করেন। এর পিতার অনেক ধন ছিল; ডাকাতে ধনের সন্ধান পেয়ে লছিমনের পিতাব বাড়ী আক্রমণ করে,—যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করে। লছিমনের বয়স তখন দশ বৎসর। মেয়েটীর চেহারায় ডাকাতের দৃষ্টি পড়ে। ধনের সঙ্গে তারা লছি-মনকেও নিয়ে আসে। চার পাঁচ বৎসর এখানে রেখে দলের একজন তাকে বিবাহ করে। যে বিবাহ করে, সে ছত্রি, কাজে কাজেই লছিমন এখন ছত্রি। লছিমন স্বামীকে এ দুষ্প্রবৃত্তি হোতে নিবারণ কোত্তে বিস্তর চেষ্টা কোরেছিল, কোন ফল হয় নাই। কাজেই এক রকম

বাধ্য হয়ে সেও এইখানে আছে। স্ত্রীপুরুষেই এক কাজেই নিযুক্ত আছে। লছিমন এই সকল কথা অকপটে আমাদের কাছে প্রকাশ কোল্লে। এই জন্যই আমরা বুঝ্‌তে পাল্লেম, লছিমন পাষাণহৃদয় দস্যুর দলে থাক্‌লেও তার প্রাণে দয়াধর্ম্ম—স্নেহমমতা আছে। আর এই স্নেহদয়া আছে বোলেই মনে মনে সাহস হয়েছে। কেবল সুযোগ অনুসন্ধান কোচ্চি।

একদিন দেখি, বৈকালে ভাল ভাল খাবার সঙ্গে কোরে হাস্যমুখী লছিমন এল। আমাদের সঙ্গে বেশ ভাবপ্রণয় হয়েছে কি না, তাতেই আমরা হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি ভাই! আজ যে বড় সকাল সকাল?—খাবারের যে বড় তদ্‌বীর, আমাদের আজ খানা না কি?" লছিমন হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "তোমার না হোক আর আর সকলের বটে। বড় বাবুর সেজবৌয়ের ছেলে হয়েছে। তাই আজ সকলকে ভাল কোরে খাওয়াতে হুকুম দিয়েছেন। আজ উপরে ভারি গোল। লোকগুলো সকাল থেকে কেবল মদ খাচ্চে। ছেলে বুড়ো সব মাতাল! সকলেই গড়াগড়ি!—তবু মদের ধূম চোল্‌চে। আমাদের কর্ত্তাটী ত মদে মূর্ত্তিমান! আরও সকালে আস্‌তেম—একসঙ্গে গল্প কোত্তেম, তা হলো না। মদ খেয়ে কর্ত্তাটী বড় গোল বাধিয়েছিল, হুঁস ছিল না। দুঃখের কথা বোল্‌বো কি, তাকে ঘরে রেখে—ঘুম পাড়িয়ে তবে এলেম। কারও জ্ঞান নাই। যে যেখানে পোড়েছে, সে সেইখানেই 'পড়ে অচৈতন্য!" ব্যাপারটা শুনে মনের ভিতর একটু আশা হলো। সুশীলা, কুসুম, দুইজনেরই আহার শেষ হলো। বাকী থাক্‌লেম কেবল আমি। লছি-মনকে আদর কোরে বোল্লেম, "আজ ভাই তোমার নিমন্ত্রণ!—দুজনে এক সঙ্গে আজ খাব।" লছিমন যেন খুব আনন্দিত হলো। বোল্লে, "আগে জান্‌লে আরও বেশী কোরে খাবার আন্‌তেম।" আমি উত্তরে বোল্লেম, "যা আছে, তাতেই আমাদের দুজনের যথেষ্ট হবে।"

কথায় কথায় রাত হলো। আমি লছিমনকে সঙ্গে নিয়ে একটী নির্জ্জন ঘরে গেলেম। সেইখানে দুইজনে সমান ভাগে খাবার ভাগ কোরে নিয়ে দুজনেই খেতে বোস্‌লেম। খেতে খেতে কাতরভাবে বোল্লেম, "লছিমন! আমাদের কি চিরকাল এই ভাবেই থাক্‌তে হবে? আমাদের উদ্ধারের আর কি কোন উপায় নাই?" সরলা লছিমনের হৃদয় যেন কাতর হলো। আমার প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌লে। একটী দীর্ঘ-

নিশ্বাস ফেলে বোল্লে, "তা কি কোরে বোল্‌বো? বাবুর যদি দয়া হয়, তবেই উদ্ধার, তা না হোলে আর কারো সাধ্য নাই যে, তোমাদের উদ্ধার করে। এখানে যেমন কড়াকড়, তাতে একটী পাখী পালিয়ে যাবার যো নাই, মানুষ ত দূরের কথা। আমরা ত উপর দিয়েই যাই আসি। মূল রাস্তাও সেই। আর বাড়ীর দক্ষিণ দিকে এক রাস্তা আছে। এই বাড়ীর ভিতর যে চোরাকুঠুরী আছে, তারই মধ্যে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে মাটির ভিতর ঘুরে ঘুরে আর একখানা বাড়ীর ঠিক এম্‌নি এক চোরাকুঠুরীতে উঠেছে। সেখানকার চোরাকুঠুরীর চাবী বন্ধ। সেখানেও পাহারা। তোমরা যে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবে, তার কোন পথ নাই। বোল্‌তে কি, এরা এক একজন নামজাদা বদ্‌মায়েস। এদের কাণ্ড-কারখানা বুঝে উঠা সকলের সাধ্য নাই। তা না হোলে এমন কোরে মানুষের সর্ব্বনাশ কোরে আজও নিরাপদে কি থাকতে পারে? তুমি কাশীতে ত ছিলে? সেখানকার কাণ্ড ত সব দেখেছ? যখন ডাকাত পড়ে, তখন কি কৌশলে যে তারা পালিয়ে যায়, তা জান ত? এই কথার সূত্রে আর একটী কথার সূত্রপাত হলো। বিশেষ চেষ্টা কোরেও যে বিষয় বুঝ্‌তে পারি নাই, আজ লছিমনের কাছে তার সন্ধান পাব ভেবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "জানি। এরা যখন ছবিখানার ভিতর ঝাঁপিয়ে পোড়ে পালাতে আরম্ভ কোল্লে ছাদ থেকে তখন আমি সবই দেখ্‌তে পেয়েছিলেম, কিন্তু ভাই, তার ভিতরের কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই। সেই অদ্ভুত অদ্ভুত কাঁচের কারখানা দেখে আমি ত হতবুদ্ধি হয়ে আছি। এতদিন ভেবে কিছুই ঠিক কোত্তে পারি নাই। তুমি কি সে সকল জান?

লছিমন চোক ঘুরিয়ে—পূর্ব্বের সুরে বোল্লে, "তা আর আমি জানি না? ও বড় মজার ঘর। ঐ যে জাহাজ ডোবা ছবিখানার উপর ঝাঁপিয়ে পোড়ে পালাতে দেখেছ, সেই ছবির পাছেই গুপ্ত দ্বার! ছবিখানা দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা নাই। দোরে ঝুলানো। এমন ভাবে ঝুলানো আছে যে, তা বুঝতেই পারা যায় না। কেউ যখন পালায়, তখন সেই ছবিতেই হাতের আঘাত কোল্লেই সাঁ কোরে সোরে যায়, লোকটী ভিতরের গুপ্ত সিঁড়িতে ঝাঁপিয়ে পোড়তে না পোড়তে কব্জার জোরে আবার তখনি আগের মত হয়। ছবির নীচে আবার একখানি

সরু লম্বা অস্ত্র আছে। ভিতর হোতে টিপে দিলেই তথন যে ঢুকতে যায়, সেই কাটা পড়ে। যে ছবিখানিতে তুমি বারম্বার নূতন নূতন ছবি দেখেছ, আবার সে ছবি মিলিয়ে গিয়ে তার যায়গায় আবার আর একখানি নূতন ছবি দেখেছ, সেখানি চৌকা ছবি নয়, গোল। যে দিকটা সাম্‌নের দিকে আছে, তারই বা'র হতে অতি সামান্য দূরে চারধারে চারখানা কাজ করা কাঠের তছবিদান। তাতেই—সেই তছবিদানের ভিতর যে ছবির যে অংশটুকু পড়ে, চারকোণা দেখা যায়। তাতেই স্পষ্ট বোধ হয়, একখানি সাধারণ চারকোণা ছবি ঝুলানো আছে। আসলে কিন্তু গোল ছবি। সেই গোলের ভিতর বড় একটী দাণ্ডা আছে, সেই দাণ্ডার গায়ে তার জড়ানো। দাণ্ডার গায়ে গায়ে লম্বা লম্বা ছবি জোড়া। আগে সেই ছবির মাঝের দাণ্ডাটীতে তার জড়ানো থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলিও ঘোরে। লোকে এ সকল দেখতে পায় না, কাজেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করে। যে কাঁচখানিতে একটী লোক অনেক দেখায়, সেটী আর কিছু নয়, কেবল পল তোলা। কাঁচখানিতে যতগুলি পল আছে, ততগুলি মানুষের ছায়া পড়ে, কিন্তু এমন পল কাটা যে, সহজে বোঝা যায় না, দেখলে ঠিক যেন সোজা কাঁচ। আবার যে কাঁচখানির কাছে দাঁড়ালে মানুষ দেখা যায় না, সে আর কিছুই নয়, সে কাঁচখানি ঘষা। আর ঠিক দ্বোরের উপরে এমন একখানি ভিতর ঘষা ফাঁক বেরিয়ে থাকে যে, তারই জন্যে ঘরের ভিতর মানুষ দেখা যায় না। দ্বোরের ধারের কাঁচখানির পিঠে অবিকল ঘরের ছবি লাগান আছে। তাতেই অবিকল ঘরই বাইরে দাঁড়িয়ে দেখা যায়। ঘরের ভিতর যারা থাকে, তারা কাঁচের আড়ালে থাকে, কাজেই দেখা যায় না। আবার দ্বোরের ভিতর দিয়ে একখানা লোহার দ্বোর উপরে তোলা থাকে। ইচ্ছা হোলেই—সেই জাহাজ ডোবা ছবির পেছুন থেকে টানলেই হড়াৎ কোরে দরজায় পড়ে। ঘরের ভিতর আর কারও ঢোকবার সাধ্য থাকে না, আর ঘরের ভিতরের লোকও বেরুতে পারে না। যে ঘরের কথা তুমি জান্‌তে চেয়েছিলে, সে ঘরের গুপ্ত কথা এই। এত কড়াকড় তবে আর তোমরা কি কোরে উদ্ধার হবে? তোমাদের মনের যে কষ্ট, তোমরা যে কত কষ্টে আছ, তা সকলই আমি জানতে পাচ্চি, কিন্তু কি করবো ভাই! আমার ত কোন হাত

নাই। যদি কোন উপায় কোত্তে পারতেম, তা হোলে এখনি তোমাদের উদ্ধার কোরে—তোমাদের কষ্ট নিবারণ কোত্তেম. কিন্তু উপায় ত নাই।”

কথায় কথায় অনেক রাত হোয়েছে। নিরুপায় হয়ে কেবল বিশেষ ব্যগ্রতা জানিয়ে বোল্লেম, “তুমি ইচ্ছা কোল্লেই আমাদের এই বিপদে পরিত্রাণ কোত্তে পার। যদি দয়া কোরে একটু কষ্ট স্বীকার কর, তা হোলেই আমাদের উদ্ধার হয়। তুমি কি ততটা কষ্ট স্বীকার কোরবে?” লছিমন অবলীলাক্রমে উৎফুল্ল হোয়ে উত্তর কোল্লে, “এখনি।—আমি এ পর্য্যন্ত কারও কখনো উপকার করি নাই। কিন্তু তোমাদের উদ্ধার কোত্তে আমার বড়ই ইচ্ছা। জানি না, আমার মন কেন এমনতর হোয়েছে। তোমাদের কষ্টে আমার প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে। আমি নির্ব্বোধ, উপায় স্থির করবার ক্ষমতা আমার নাই। যদি কোন উপায় তোমরা স্থির কোত্তে পার, দেখ, তোমরা যা বোল্‌বে, আমি তাই কোত্তেই প্রস্তুত আছি।” সত্য সত্যই লছিমনের চোকে যেন জল দেখা গেল। লছিমনের নিঃস্বার্থ উপকার চেষ্টা দেখে মনে মনে ভাবলেম, ঈশ্বর! এমন সরলাকে ডাকাতের সহধর্ম্মিণী কোরেছ কেন? এমন প্রস্ফুটিত গোলাপ-কুসুম মরুভূমে নিক্ষেপ কোরেছ কেন?

দুজনেই ভাবতে লাগ্‌লেম। কোন উপায় আর স্থির কোত্তে পারি না। লছিমন উঠ্‌লো। উঠে দাঁড়িয়ে বোল্লে, “একটী উপায় আছে। এখন তা শুনে কাজ নাই। এখনি আমি আস্‌ছি। যদি পরমেশ্বর রাজী থাকেন, তবে যা হয় এক্‌টা উপায় হবেই হবে।” এই বোলে সে চোলে গেল। বরাবর একটী ঘরের ভিতর ঢুকে চোরাকুঠরীর সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আমি তার আগমনপথ চেয়ে বোসে রইলেম। মনের মধ্যে যে কত ভাবনাই এলো, কত রকম চিন্তাই যে কোত্তে লাগ্‌লেম, তার আর সীমা সংখ্যা নাই! এতদিন যতগুলি ঘটনা ঘোটেছে, যতগুলি বিষাদ-বিপদের ঝড় মাথার উপর দিয়ে চোলে গেছে, সকলি মনে হলো। মর্শানের ব্যাপার মনে হোতে—তাঁর কথা মনে পোড়্‌তে প্রাণের ভিতর যেন কেমনতর হোয়ে গেল। একেবারে যেন হতাশ হোয়ে পোড়্‌লেম। আবার একটু দৃঢ়তা অবলম্বন কোরে করযোড়ে মনে মনেই বোল্লেম, “ভবগান! আর কত কষ্ট দেবে? এত কষ্ট দিয়ে—এত যন্ত্রণার আগুনে পুড়িয়ে—এত বিষাদের ঝড়ে

ত্রাহি ত্রাহি ডাকিয়ে তবুও কি তোমার বাসনা পূর্ণ হয় নাই প্রভু! আর কত কষ্ট এ অদৃষ্টে অবশিষ্ট আছে? দয়াময় তুমি! আমার প্রতি দয়া-গুণের যথেষ্ট পরিচয় দিলেন যে!”

হঠাৎ একটী শব্দ হলো। চেয়ে দেখি, একটি লোক সঙ্গে কোরে লছিমন এসেছে। যে লোকটী সঙ্গে এসেছে, তার খুব জঁাকালো চেহারা। মালকোঁচ্চা কাপড় পরা, গালপাট্টা, গায়ে বুকবন্দ মেরজাই, কোমরে তরোয়াল, হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। লছিমন এসেই চুপি চুপি বোল্লে, “এটী আমার ধর্ম্মছেলে। চোরাকুঠুরীর পাহারার ভার এরই উপর! চাচিও আজ এর কাছে। যদি বাইরে ধরা না পড়, তা হলে বেরিয়ে যেতে পার। এস,—দেখি,—সাহস কর,—আর দুজনকে ডেকে আন। তিনজনে শীগ্‌গির এসো। রাত আর বড় বেশী নাই।” মনে বড় আনন্দ হলো। উদ্ধার হতে পারি আর নাই পারি, কিন্তু লছিমনের এই নিঃস্বার্থ উপকার আমি এ জীবনে কখনো ভুলতে পার্‌বো না। আনন্দে অধীর হোয়ে বোল্লেম, “ভাই! তুমিই আমাদের জীবন দান কোল্লে। আজ তুমি যা কোল্লে, এর পুরস্কার ঈশ্বর অবশ্যই দিবেন।” লছিমন আমার আশীর্ব্বাদ কাণেই না তুলে বোল্লে, “আর বিলম্ব কোরো না। ডেকে আন।” আমি তাড়াতাড়ি কুসুম আর সুশীলাকে তুলে সঙ্গে আসতে বোল্লেম। কোথায় নিয়ে যাচ্ছি,—তখন সে কথা প্রকাশ কোল্লেম না।

লছিমনও আমাদের সঙ্গে চোল্লো। আমরা পাঁচজন চুপি চুপি সেই সুড়ঙ্গ পথে নাম্‌লেম। বড় অন্ধকার। এদের যাওয়া আসা অভ্যাস আছে, তত কষ্ট হোচ্চে না, কিন্তু আমরা তিনজনে প্রাণটী হাতে কোরে খুব সাবধানে নামতে লাগলেম। সুড়ঙ্গের দরজা হোতে মোটা একগাছা লোহার শিকল নীচে পর্য্যন্ত ঝুলানো আছে। সেই শিকলটী বেশ করে ধোরে—তার উপরে শরীরের ভার রেখে অতি কষ্টে একেবারে আর একটী বাড়ীর চোরাকুঠুরীর ভিতর নেমে এলেম। লছিমনের ধর্ম্মছেলে চাবী খুলে দিলে, আমরা বাইরে বেরুলেম। একেবারে রাস্তায় নয়, আর একটী বাড়ীতে। চোরাকুঠুরী হোতে বারাণ্ডায় এলেম। লছিমন সজল নয়নে বোল্লে, “যাও ভাই, আর বিলম্ব কোরো না। এদিকে রাতও আর বেশী নাই। আড়াই প্রহর রাত হয়েছে, তিন প্রহরের

সময় পাহারা বদলী হবে। এই বেলা বেরিয়ে যাও। সাহস করো, মনে মনে খুব বল বাঁধো, যাও, আর দেরী কোরো না। তোমাদের যতই দেরি হোচ্চে, ততই আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। যাও ভাই, যাও। হয় ত আর দেখা হবে না। তোমরা দেশে যাও, সুখে থাক, একবার একবার আমার নাম মনে কোরো!—যাও, আর দেরী কেন?” লছিমনের সহৃদয়তা দেখে—তার চোকের জল দেখে, আমার বুকে শেল বিঁধ্‌তে লাগ্‌লো। একবার মনে হলো, আর পালিয়ে কাজ নাই। হাস্যমুখী স্নেহময়ী লছিমনের সঙ্গেই জীবনের বাকী ক'টা দিন কাটাই? আবার ভাবলেম, লছিমনকে ত সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাব না। নানীবুড়ী সেরে উঠ্‌লেই আবার এ কাজ তারই হাতে যাবে। তবে আর ফল কি? লছিমনকে জড়িয়ে ধোরে প্রাণের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বোল্লেম, “তুমিই আমাদের প্রাণ দিলে, তোমার নিজের বিপদকে বিপদ জ্ঞান না কোরে, পরের প্রাণ রাখ্‌লে। যতদিন জীবন থাক্‌বে, ততদিন তোমাকে ভুল্‌বো না! মাতাপিতা—জ্ঞাতিবন্ধু, আত্মীয়-স্বজন,—পুত্র-কন্যা, এমন কি, স্বামী পর্য্যন্ত ভুল্‌লেও তোমাকে কখনো ভুল্‌বো না।” এই রকমে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা বেরুলেম্।

বেরুচ্চি, এমন সময় লছিমনের ধর্ম্মছেলে হাত জোড় কোরে লছিমনকে বোল্লে, “মা! আমার উপায়? আমায় বাঁচাবার কি পথ কোল্লে? এরা যে এখান দিয়ে গেছে, তা নিতান্ত খোকাতেও বুঝ্‌তে পার্‌বে। তবে আমার উপায়?” কথাটা শুনে লছিমন যেন দম্ খেলে। আমরা বেরুচ্ছিলেম, দাঁড়ালেম্। কি জানি,—আমাদের প্রাণ রক্ষা কোত্তে কি আর একজন বিপদে পোড়্‌বে?

লছিমন একটু ভেবে বোল্লে, “তার জন্য তোমার ভাবনা নাই। তোমাকে দোরের কাছে বেঁধে রাখ্‌ছি। তুমি বোল্‌বে, কোথা থেকে চারজন লোক এসে—আমার হাত পা বেঁধে—মুখ বেঁধে চাবী ছিনিয়ে নিয়ে গেছে; তার পর তারা কোথায় গেছে, কিছুই জানি না। জ্ঞানই ছিল না।” বোল্‌তে বোল্‌তে লছিমন দ্বার-রক্ষককে বেঁধে ফেল্লে। আমাদের দিকে চেয়ে বোল্লে, “তোমরা আর দাঁড়িয়ে কেন? যাও—যাও, এখনি পাহারা বদল হবে।—তাদের সাম্‌নে পোড়্‌লে আর রক্ষা থাক্‌বে না। এত চেষ্টা সকলি বিফল হবে।” ব্যগ্র

হয়ে বোল্লে, “যাও,—শীগ্‌গির যাও,—দেরী কোরো না, পালাও, পালাও।” সজল নয়নে লছিমনের দিকে চাইতে চাইতে দ্রুতপদে আমরা বাড়ীর বা'র হোলেম। লছিমন তখনো দাঁড়িয়ে; আমরা দেখ্‌চি আর চোল্‌চি, হঠাৎ পেছুনদিকে কতকগুলি লোকের জোড়া জোড়া পায়ের শব্দ শুন্‌লেম। চেয়ে দেখি, আটদশজন লোক “কোন্‌ হ্যায়, কোন্‌ হ্যায়” বোলে ছুটে আস্‌ছে। ভয়ে ভয়ে লছিমনের দিকে চেয়ে দেখি, অস্পষ্ট দেখ্‌তে পেলেম, তখনো সে দাঁড়িয়ে, হাতছানি দিয়ে ডাক্‌চে। বিপদ দেখে করুণাময়ী লছিমনের দিকে ফিরে যেতে না যেতে তারা এসে ঘিরে দাঁড়ালো। লছিমন অতি দুঃখে কপালে ঘা মেরে দরজা বন্ধ কোরে দিলে। এক বিপদ যেতে না যেতে আমরা আবার আর এক বিপদে পোড়্‌লেম।

লোকগুলি ঘিরে দাঁড়িয়া জিজ্ঞাসা কোল্লে, “তো কউন হোই রোইণ্ডি?” কথাটা এত তাড়াতাড়ি বোল্লে যে, বুঝ্‌তে কষ্ট হলো। কুসুম আর সুশীলা দুজনেই ভয়ে যেন আঁৎকে উঠ্‌লো। একজন বাঙালা-জানা লোক আমার কাছে এসে—দাঁত মুখ খিঁচিয়ে—মুখের কাছে হাত নেড়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, “কে তুই? কোথা যাচ্ছিস্‌? তোরা বদ্‌লোক, এত রাতে কোন্‌ আদমীর কাছে গেছিলি? সচ্‌ বল—ঝুটা বলিস্‌ না।” আমি কোন উত্তর কোত্তে পাল্লেম না। যেন বাক্‌রোধ হয়ে এলো। কথা 'কইতে পাল্লেম না। লোকটা অপর সঙ্গীদের সঙ্গে কি ইসারা কোরে বজ্রমুষ্টিতে আমাদের হাত ধোল্লে। অমনি হিড়হিড় কোরে টেনে নিয়ে চোল্লো। কোথায় নিয়ে যাচ্চে, কি উদ্দেশে নিয়ে যাচ্চে,—কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না। কুসুম, সুশীলা, দুজনেই সজলনয়নে আমার দিকে চেয়ে রইল। তাদের কষ্ট দেখে আমার কষ্ট যেন শতগুণে বৃদ্ধি হলো,—বুক যেন ফেটে যেতে লাগ্‌লো। তাহাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে পাল্লেম না। ঘাড়টী নীচু কোরে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। জোর কোরে কোন ফল হবে না ভেবে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যে দিকে তারা নিয়ে যায়, সেই দিকেই চোল্লেম। ধন্য বিধাতা! এমন অদৃষ্ট বুঝি আর কারও নাই! এত যন্ত্রণা বুঝি আর কেউ পায় না। আচ্ছা দেখি,—কত দিনে বিধাতার মনের বাসনা পূর্ণ হয়! দেখি, আর কত দুঃখ কষ্ট অবশিষ্ট আছে। আর ভাবি

না, আর আশা নাই। নিরাশায় গা ঢাল্‌লেম। মনের আশা-বন্ধন সকল ছিঁড়ে ফেল্লেম। বিবাদ, যাতনা, অত্যাচার, অ নাবার, দুঃখ-কষ্টের ভীষণ আঘাত অকাতরে সহ্য করবার জন্যে বুক পেতে রইলেম। দেখি, বিধাতার মনে আর কত বাসনা আছে! একটা জীবনে মানুষ যে, কতবার—কত রকম বিপদে পোড়্‌তে পারে, কত দুঃখের বোঝা মাথায় বইতে পারে, কতবার যন্ত্রণার—মর্ম্মোচ্ছ্বাসের ঝড়ে ত্রাহি ত্রাহি কোরে, কষ্টের প্রাণ কতদিনে দেহ ত্যাগ করে, তার পরীক্ষা আজ আমা হতেই হবে। বিধাতা! তোমার ইচ্ছা এখন অকাতরে পূর্ণ কর। আর ক্ষমা ভিক্ষা করি না।

প্রহরীরা আমাদের সঙ্গে কোরে একটা বড় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। অন্ধকারে চিন্তে পাল্লেম না। প্রহরীরা আমাদের জোর কোরে এক্‌টা ঘরে পুরে বাইরে তালা লাগিয়ে চোলে গেল। আমরা যে বন্দিনী সেই বন্দিনী হ'লেম। তিন জনে গলাগলি হয়ে বোসে হাপুসনয়নে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। মনে মনে কত ভাবনাই উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আগে কারাগারে ছিলেম বটে—বন্দিনী ছিলেম বটে, কিন্তু জানাশুনা ছিল!—ধোর্‌তে গেলে সে একরকম সুখের কারাগার। কিন্তু আজ আমরা প্রকৃতই বন্দিনী। আমি বন্দিনী, আমার সঙ্গে—আমার পরিচয়ে আমার জন্যে এই দুটী সরলাও বন্দিনী।

আমরা যে ঘরে আছি, তারই সম্মুখ দিয়ে লোকের চলাফেরাধ শব্দ শুন্‌তে পেলেম। নাগ্‌রা জুতার মস্‌ মস্‌ শব্দ কানে গেল। আঁধার ঘর একটু ফর্সা ফর্সা বোধ হলো, অনুভবে বুঝ্‌লেম, রাত আর নাই, কাল রজনী প্রভাত!

আছি। তিনটীতে মুখামুখি হয়ে বোসে আছি।—দূরে মাষ্টার বাবুর আওয়াজ কানে গেল। একটু যেন সাহস বাড়্‌লো। ঘরের মধ্যে থেকেই উৎসাহে উৎসাহে চীৎকার কোরে ডাক্‌লেন, "মাষ্টার বাবু! সর্ব্বেশ্বর বাবু!" মাষ্টার তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুল্‌লেন। দেখেই যেন অবাক হোয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে শেষে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে? হরিদাসী? তুমি এখানে?" সত্য কথা বলা হবে না, মনে মনে তখনি তখনি একটা মনগড়া কথা স্থির কোরে বোল্লেম, "মাষ্টার বাবু! বড় সর্ব্বনাশ হয়েছিল। আমরা শুয়েছিলেম, কিছুই

জানি না, কোথা হতে চারজন বিকট চেহারার লোক এসে আমাদের মুখ বেঁধে হিঁচড়ে টেনে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে নামিয়ে দিলে। টেনে টেনেই একটা ঘরে নিয়ে তুল্লে। দেখলেম, সাম্‌নে একটা লোক হাত পা বাঁধা পোড়ে আছে। লোক চারজন দরজা খুলে আমাদের টেনে বা'র কোল্লে। হাতের মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে একখানা চকচকে তরোয়াল দেখিয়ে চুপি চুপি বোল্লে, যে দিকে আমরা যেতে বলি, সেই দিকে এসো—কোন দিকে চেয়ে দেখ না। কোন কথা মুখে বার কোরো না। যদি চেঁচাও, কি কারে ডাক, তখনি এই তরোয়াল দিয়ে দুখানা কোরে ফেল্‌বো।" এই বোলে তারা আগে আগে চোল্লো আমরাও প্রাণের ভয়ে তাদের পেছু পেছু চোল্লেম। খানিক দূর আস্‌তেই অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ পেলেম। লোক চারজন সাঁ কোরে পালিয়ে গেল। আমরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম, এমন সময় সেই লোকগুলা এসে পোড়লো। আমাদের উপরে গরম মেজাজে তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে কত কি জিজ্ঞাসা কোল্লে। শেষে ধোরে এনে এখানে এই ঘরে আটক কোরে রাখ্‌লে। সমস্ত রাত আমরা এই ঘরে কয়েদ আছি।" মাষ্টার বাবু চিন্তিত হোয়ে আর একজনকে বোল্লেন, "দেখে এসে, বার কুঠুরীতে কে পাহারায় ছিল, কি অবস্থায় আছে, সকল জেনে এসো। তাকে বরং নিয়ে এসো।" একটীর উপর এই হুকুম-জারী কোরে আর একজন বয়স্যকে বোল্লেন, "ব্যাপার বুঝেছ কি? বড় সোজা নয়! সন্ধান পেয়েছে। তল্পী গুটানই ভাল।" এই বোলে মাষ্টার বাবু আমাদের বোল্লেন, "এস, তোমাদের যে আটক কোরে রেখেছে, সে এক রকম ভালই কোরেছে। বাজে লোক এসেছিল, এখনি বিপদ ঘটাতো।" এই বোলে মাষ্টার বাবু আমাদের সঙ্গে নিয়ে উপরে গেলেন। তখনি আহারাদির যোগাড় হলো। মাষ্টার বাবু পাঁচটী কার্য্যদক্ষ অনুচরকে সজ্জিত হোতে অনুমতি দিলেন। বেলা পাঁচটার সময় আমরা ষ্টেশনে এসে মশুরীতে রওনা হোলেম। মাষ্টার বাবু পেটের কথা প্রকাশ কোল্লেন না। বোল্লেন, "আমার বড় শরীর অসুখ। পাহাড়ে থাকলে শরীরটেও সুধ্‌রে যাবে, তোমরাও নিরাপদে থাকবে।" আমরা সম্মত হোলেম। গোপনে মাষ্টার বাবুকে জগদ্বন্ধু বাবুর কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। তিনি বোল্লেন, "এখনো কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

তিনি বৃন্দাবনে গেছেন। সেখানেও লোক গেছে। সন্ধান পেলে তাঁকেও সেখানে নিয়ে যাবে।" আর কোন কথা কইলেম না।

আমার এক মনগড়া কথায় মাষ্টার বাবু এক দমে দেশ ছাড়া হোলেন। যারা পাপকার্য্য করে, তাদের মনে সদাই শঙ্কা!—সেই শঙ্কার জন্যই বাবু হলেন—একদমে দেশ ছাড়া!!

ত্রিংশ চক্র

কামিনী-কঙ্কণ।

তের দিন আমরা মশুরীতে পৌঁছিলেম। আস্‌বার সময় বড় কষ্ট পেয়েছিলেম। রাস্তায় এক বেলা আধ বেলা কোন কোন স্থানে থেকে শরীরটে শুধরে নেওয়া হয়েছিল, তবুও এখানে এসে দশ পনের দিন গায়ের ব্যথা মোত্তে লাগলো। আগ্রা হোতে এলাহাবাদ দিয়ে সাহারানপুর পর্য্যন্ত রেল গাড়ীতে গিয়েছিলেম। এটুকু যেতে ততটা কষ্ট হয় নাই। তার পর এখান থেকে ফতেপুর পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ ক্রোশ রাস্তা ঘোড়ার গাড়ীতে আস্‌তে এক দিন লেগেছিল। ফতেপুরে এক দিন থেকে সহর দেখা হয়েছিল। ফতেপুব মন্দ সহর নয়। এখান থেকে রাজপুর ১৬ ক্রোশ। কখন গাড়ী—কখন বা হেঁটে দুদিনে এখানে এলেম। এখান থেকে ক্রমান্বয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা। রাস্তা যদি সোজা সমান হয়, তা হলেও বরং হাঁটা যায়, কিন্তু এ রাস্তা পাহাড়ের গায়ে এঁকে বেঁকে উঠেছে। একজন ভিন্ন দুজন লোক পাশাপাশি যাবার উপায় নাই। এ রাস্তা এমন ভয়ানক যে, যদি কোন গতিকে পা পিছলে যায়, তা হোলে একেবারে দু' তিন শ' হাত নীচে পোড়তে হবে। ভয়ে ভয়ে, পা টিপে টিপে, খুব সাবধানে এ চার ক্রোশ রাস্তা এলেম। চার ক্রোশের পর এখানে একটী ছোট বাজার আছে। জিনিস পত্র বড়ই দুর্ম্মূল্য। এক পয়সার জিনিসের দাম এখানে চার পয়সা। সকালে রাজপুর থেকে বেরিয়ে এই চার ক্রোশ আস্‌তে আমাদের সন্ধ্যা হোলো, অগত্যা সে

দিন এই বাজারেই থাকলেম। শুন্‌লেম, আর বেশী রাস্তা নাই, বড় জোর চার ক্রোশ মাত্র। এখানে তিন রকম যান পাওয়া যায়। ঝাঁপান, দাণ্ডি আর ডুলি। কতকগুলো পাহাড়ী লোক পিঠে মোড়া বেঁধে তার উপর লোক বোসিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে যায়, সেই যানের নাম ঝাঁপান; আর দুইজনে একখানা চৌকির মত কাঠের মঞ্চ নিয়ে যায়, তার দু দিকে দুটী কাঠের দাণ্ডা আছে। আরোহীকে সেই দাণ্ডা দুটী সবলে ধোরে বোসে থাকতে হয়। এর নাম দাণ্ডি। আর ডুলি আমাদের দেশের অনুরূপ। আমরা এখান হোতে ডুলিতেই চোল্লেম। সকালে বেরিয়ে বেলা দশটার সময় আমরা মশুরী পাহাড়ে পৌছিলেম। পাহাড়ের উপর দিব্য বাজার, কোটাবাড়ী, খোলার বাড়ী, পাহাড়ের উপর বেশ সহর। বড় বড় বাবুভায়ারা গ্রীষ্মকালে এখানে এসে আরাম করেন। বড় লোকের থাকবার উপযুক্ত ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। মাষ্টার বাবুর টাকার অভাব নাই, তিনি মাসিক ৭০৲ টাকা ভাড়ায় একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিলেন। একজন বাবু এসেছেন বোলে চারিদিকে একটা গোলমাল পোড়ে গেল। চাকর, বামুন, খানসামা দলে দলে উমেদার আস্‌তে লাগ্‌লো। দোকানদার, মাংসওয়ালা, ঘিওয়ালা, দুধওয়ালা দলে দলে এসে জিনিসের উৎকৃষ্টতা প্রতিপন্ন কোরে বাবুর অনুগ্রহ প্রার্থনা কোল্লে। বাবু এক এক দলের এক এক জনের আবেদন গ্রাহ্য কোল্লেন! এখানে খাবার বড় সস্তা। খাদ্যদ্রব্য বড় সুলভ। দশ পয়সা মাংসের সের, টাকায় তিন সের উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি, আট সের আটা, পয়সা পয়সা আলুর সের, সকল জিনিসই সস্তা। আমরা থাকলেম ভাল। মশুরীর এমন জল হাওয়া যে, প্রবাদ আছে, এখানে লোহার কড়াই পেলে জীর্ণ হয়। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হোক, কতকটা বটে।

স্থানটী বড় রমণীয়। আমাদের ছাদে উঠ্‌লেই পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্য সব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। দূরে দূরে পালে পালে হরিণ চোরে বেড়াচ্চে, দলে দলে ময়ুর ময়ুরীরা পেখম্‌ ধোরে কেমন মনের আনন্দে নেচে বেড়াচ্চে; যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই সবুজ মেঘের ন্যায় দেখা যায়। দূরের নির্ম্মল আকাশের সঙ্গে—পাহাড়ের রঙ বেশ মিলিয়ে গেছে। আকাশ যেন সীমাহারা হোয়ে পাহাড়ের গায়ে মিশে গেছে। বড় চমৎকার দৃশ্য! সন্ধ্যার সময়, আকাশে নক্ষত্র উঠ্‌লে বোধ হয়, ঠিক যেন পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য নক্ষত্র

ফুল ফুটে রয়েছে। দিনে বেশী রোদের সময়, পাহাড় ঘেমে টস্ টস্ কোরে জল পড়ে। সেই ফোঁটা ফোঁটা জল একত্রে একস্থানে একটী ছোট নালা হয়, সেই রকম পাঁচ সাতটী নালা একত্র হয়ে একটী খাল হয়, তখন তার কুল্‌কুল্ ধ্বনিতে প্রাণ পুলকে পূর্ণ হয়। আবার যখন কতকগুলি খাল একত্রিত হয়ে নদীতে পরিণত হয়, তখন সে জলের ডাকে কানে তালা লাগে। স্রোতের তোড়ে কত গাছ-পালা ভেসে যায়।

আমাদের বাড়ীর সামনেই একটী বাগান। বাগানটী ফলের আর ফুলের। কোন সুদক্ষ ব্যবসায়ী বহুযত্নে এই বাগানটী প্রস্তুত করে ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়া আমরাই নিয়েছি। একে ত মানুষের যত্ন, তার উপর আবার স্বভাবের কৃপা। বাগানটী যেন স্বভাব সুন্দর। স্বভাবের মূর্ত্তিময়ী প্রতিমা! বাগানটীতে প্রবেশ কোল্লেই মনে হয়, স্বভাব-সতী তাপিতের তাপ হরণ কর্‌বার জন্যই এই উদ্যানটীকে ফুলভূষণে ভূষিতা করেছেন। দিনে যতই ভাবনা ভাবি, যতই চিন্তা করি,—বৈকালে এই বাগানে এসে সকল কষ্টের যেন অবসান হয়। আপনা ভুলে যেন আমিও এই স্বভাবের সঙ্গে মিশে যাই। স্বভাবে আমাতে যেন কোন পার্থক্য থাকে না। দুঃখকষ্ট ভুলে যাই, অবস্থা ভুলে যাই, হৃদয়ে কেবল এই স্বভাব চিত্র লেগে থাকে। চির-সন্তাপিত প্রাণের নিভৃত স্থানগুলিতে যেন স্বভাবসুন্দরী সুখের :কুসুম ফুটিয়ে দেন!—হৃদয়-কারাগার অন্ধকার দেখে স্বভাব-সুন্দরী যেন তাঁর প্রিয়তমা কন্যার সুখের জন্যই সেখানে শান্তিদীপ জ্বেলে দেন। আপনা ভুলে সেই স্বভাবের সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবে যাই। স্বভাবের স্বভাব পেয়ে যেন সেই স্বভাবে গঠিত হই। স্বভাবের সঙ্গে সেই জন্যই কোন পার্থক্য বুঝ্‌তে পারি না।

বাগানটী তত বড় নয়। পাহাড় কেটে স্থানটুকু সমতল কোরে নিয়ে তাতেই এই বাগান প্রস্তুত হয়েছে। বাগানের তিনদিকেই পাহাড়। এক-দিকে আমাদের বাড়ী। মাষ্টার বাবু সকলের জন্যই এই বাগান ভাড়া নিয়েছেন, তিনি প্রায়ই এখানে আসেন না। বাগানটী এখন আমা-দেরই ভোগ-দখলে। বাগানের যা সুখ, তা এখন কেবল আমরাই ভোগ কচ্চি।

বাগানের চারিদিকে আম, কাঁটাল, লিচু এই সকল ফলের গাছ। পাহাড়ে পাথরের উপর গাছ, তবুও বেশ চেহারা!—একটীও মরা নয়, সকলগুলিই ডাল পালায়—সবুজ পাতায় শোভিত! এই গাছের পরেই

ফুলের বাগান। গোলাপ মল্লিকা, বনচাঁপা, বনহিঙ্গুল, দেল্‌খোস চামেলী, বেলা, চম্পালিয়া, এ সকল গাছ টবে—কেয়ারী করা। আর করবী জবা, গাছচাঁপা, ভুঁইচাঁপা, কাঠমল্লিকা, হাম্বিরা, হিন্দুরা, জানমতি, এ সকল গাছ এই সব কেয়ারীর পরে—মাটীতে এক রকম অযত্নে পোড়ে আছে। ফুলের গাছের মাঝে মাঝে এক একটী পরিষ্কার স্থানে গোলাকার কোরে কামিনী গাছ। কামিনীর ডালগুলি ছেঁটে ছেঁটে ঠিক একটী যেন কামিনীকুঞ্জ তৈয়ার হয়েছে। চারিদিকে কামিনী গাছ, মধ্যে পরিষ্কার স্থানটুকুতে পাথরে গাঁথা—বস্‌বার আসন। গোলাকার কামিনী গাছের সেই কুঞ্জ দেখে আমিই তার নাম দিয়েছি, কামিনী-কঙ্কণ! আমরা সন্ধ্যার সময়ে বাগানে বেড়িয়ে যখন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখনি কামিনী-কঙ্কণের মধ্যে বোসে বিশ্রাম করি। পর্ব্বতের শীতল বাতাস কামিনীর সুবাসে সুবাসিত হয়ে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা দেখায়! মন যেন সেই সুবাসে ডুবে যায়। সংসারে বোসে স্বর্গসুখ উপভোগ করি। বাগানের ঠিক মাঝখানে ছোট একটী পুষ্করিণী। পুষ্করিণীতে মাছ দেখা যায় না, কেবল লাল, নীল, শ্বেত, হরিৎ পদ্ম। পদ্মের একটী নাম শুনেছি পঙ্কজিনী। পাঁকেই পদ্মের জন্ম—পাঁকেই পদ্মের বৃদ্ধি, তাই পদ্মের অন্যতম নাম পঙ্কজিনী; কিন্তু এখানে সে কথা খাটে কৈ? পাহাড়ের উপরে পুষ্করিণী, এখানে পাঁক কোথা? এই সন্দেহের আর মীমাংসা হলো না। আর একটী সন্দেহ নীলপদ্ম! যখন লঙ্কাপতি রাবণকে নিধন কর্‌বার জন্য রামচন্দ্র অকালে মহামায়ার উদ্বোধন করেন, সেই সময় নীলপদ্ম আনবার জন্যে হনুমান আদিষ্ট হয়। ভারতবর্ষের কোন স্থানে নীলপদ্মের অনুসন্ধান না পেয়ে হনুমান মানসরোবর থেকে নীলপদ্ম এনেছিল। এদেশে কি তবে ভারতবর্ষ নয়? অথবা বাঁদরের বাঁদুরে বুদ্ধিতে কথা হয় ত স্মরণই ছিল না!

বাগানটীতে কত শান্তি—কত আনন্দ—কত বসন্ত যে অহঃরহ বিরাজ কোচ্চে, তা একমুখে প্রকাশ করা যায় না। আমরা তিনজনে এখন সেই সকল শান্তি ভোগ কোচ্চি। সুখে আছি, কিন্তু যখন মনে হয়,—পূর্ব্বকথা যখন স্মরণ হয়, তখন প্রাণের ভিতর হু হু কোরে উঠে—এই সকল সুখ-শান্তির পরিবর্ত্তে তখনি বিষাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। এত সুখেও তখন আমি সুখ পাই না। একমনে কেবল ভাবি।

মনের গতি কখন যে কেমন হয়, তা বোধ হয় স্বয়ং বিধাতাও স্থির কোত্তে

পারেন না। মানুষের জীবনে কখন্ সুখ, কখন্ যে দুঃখ ঘটে,—কখন্ হর্ষ, কখন্ যে বিষাদ ঘটে,—তা কে স্থির কোত্তে পারে? আজ যে সময় মন পুলকিত থাকে,—অভিনব আনন্দে প্রাণ পুলকপূর্ণ থাকে, কাল আবার ঠিক সেই সময় নয়ন জলে বুক ভাসাতে হয়। আজ যে সময়ে আনন্দের উচ্চ হাসি,—কাল হয় ত সেই সময় যাতনার শ্রবণভেদী করুণ চীৎকার; আজ যে সময় নিশ্বাস বায়ু মধুর মধুরতর হয়ে কণ্ঠলগ্ন স্বামীর সুখনিদ্রা গাঢ়তর করে, কাল আবার সেই নিশ্বাস মর্ম্মদাহের উচ্ছ্বাসে উষ্ণ হয়ে নিকটের লোককে দগ্ধ করে। তাতেই জানি, লোকের মনের গতি সকল সময়ে সমান থাকে না।

প্রত্যহই বৈকালে বাগানে আসি। তিনজনে কখন চারিদিকে বেড়াই, কখন বা সেই কামিনী-কঙ্কণের ভিতর পাথরের শীতল বেদীতে বোসে আমোদ প্রমোদ করি, গল্প গুজোব হয়। আজও তিনজনে এসেছি, আজও সেই স্থানে এসে বোসেছি,—কিন্তু মনে আজ আমার শান্তি নাই কেন? কত প্রকার চিন্তাই যে আস্‌ছে,—থেকে থেকে কত রকম ভাবনার ঝড়ই যে মনের ভিতরে বইচে, তার আর সীমাসংখ্যা নাই। লোকের মনে শান্তি দিতে পারে, এখানে এমন উপকরণ বিস্তর আছে, কিন্তু কি জানি আমার মনের এই বোঝা আর নাম্‌চে না। আমার এ যন্ত্রণার—এ চিন্তার আর অবসান হচ্চে না। যেখানে ছিলেম, সেখান হতে উঠে পুকুরের ধারে বোস্‌লেম। পুকুরের চারধারেও বেদী আছে। আমি একা সেই বেদীতে এসে বোস্‌লেম।

পুকুরের শোভা দেখে প্রাণের যেন কতকটা ভার কমে গেল। এমন শোভা খুব কমই দেখা যায়। স্নিগ্ধ সমীরণ ফুলবাসে সুবাসিত হোয়ে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের সৎকার কোচ্চে।—সম্মুখে পুষ্করিণীপূর্ণ ফুল্ল-পদ্মিনীর অসীম লাবণ্য দেখে চক্ষু সার্থক হচ্চে। যদি এ সময় চিন্তা না থাক্‌তো, যদি এ সময়ে তিনি থাক্‌তেন, তা হলে হয় ত গর্ব্ব কোরে বোল্‌তে পাত্তেন,—আমি যেমন সুখে আছি, এ সুখ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু হায়, এ চিন্তার কি অবসান আছে?—এ যন্ত্রণার কি বিরাম আছে? বিধাতা যদি সুখভোগ কোত্তে দিবেন, তা হলে এমন কোরে ঘটনাচক্রে পোড়ে পথে পথে বেড়াব কেন? তিনি আমার জন্যে পথে পথে পাঁচ বৎসরকাল নিয়ত অনুসন্ধান কোর্‌বেন কেন? আমার প্রতি যার অগাধ প্রেম, সেই পতিসেবা এ

পোড়া ভাগ্যে ঘট্‌লো না কেন? অতুল সম্পত্তিতে অধিকার থাকৃতে পরের দ্বারস্থ হলেম কেন? পরের আশ্রয়েই বা প্রতিপালিত হ'ব কেন? মনে বেশ জানি, আমার এ চোকের জল আর ফুরাবে না। এ যাতনার আর বিরাম হবে না। সমস্ত জীবন বিষাদকেই বুকে কোরে কাটাতে হবে। বিধাতার বাসনাও তাই। এ পর্য্যন্ত এ পোড়া অদৃষ্টে ঘোট্‌চেও তাই।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলাটুকু কেটে গেল। বাগানের বড় বড় গাছের পাখীরা দূরে চোর্‌তে গিয়েছিল, তারা সকলেই আপন আপন বাসার দিকে চোল্লো। আপন আপন সুরে কিচমিচ কোরে—সন্ধ্যার আগমন-বার্ত্তা কোত্তে কোত্তে উড়ো বাতাসে ভর কোরে বাসার দিকে চোল্লো। ভগবান মরীচিনালী সমস্ত দিন কর্ত্তব্যকার্য্য শেষ কোরে অস্তগমনের আয়োজন কোল্লেন। তাঁর অনুপস্থিতকালে প্রিয়তমা কমলিনী, কি কোরে কাটান,—তাই দেখ্‌বার জন্যে পর্ব্বতের আড়ালে থেকে উঁকি দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন! কমলিনী প্রাণনাথের বিরহে ম্লান হোয়ে মাথাটী নিচু কোল্লেন। নলিনীর সুখের কাল উপস্থিত। সে আহ্লাদে বাতাসের উপর সওয়ার হয়ে দুলে দুলে যৌবনের গর্ব্ব দেখাতে লাগলো। সমস্ত দিন কমলিনী প্রাণনাথকে হৃদয়ে রেখে সুখের সাগরে ভেসে-ছিলেন, এখন প্রাণনাথের অনুপস্থিতি দেখে—পরপুরুষের ভয়ে জড়সড় হয়ে ঘোম্‌টা দিলেন! লম্পট্ ষট্‌পদ এতক্ষণ কেবল কমলিনীর পত্র-কুঞ্জের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কমলবন্ধুর প্রখর তেজে ঘেঁস্‌তে পারে নাই,—এখন অবসর বুঝে কমলিনীকে অভিসারে প্রবৃত্তি দিতে লাগ্‌লো। সূর্য্য বড় রাগী।—যার প্রতি রাগ করেন, তাকে তখনি সদ্য সদ্য পুড়িয়ে মারেন। ভ্রমররাজ তা বেশ জানে,—তাতেই এতক্ষণ সাহস কোরে কমলিনীর কাছে ঘেঁস্‌তে পারে নাই। এখন সময় বুঝে গুন্ গুন্ কোরে কমলিনীর প্রেমমধু প্রার্থনা কোত্তে লাগলো। সাধ্বী ভ্রমরের প্রস্তাব গ্রাহ্যই কোল্লেন না। ভ্রমর নাছোড়বান্দা। সে জোর কোরে কমলিনীর অবগুণ্ঠিত বদনে দংশন কোরে ভোঁ কোরে পালিয়ে গেল। কমলিনী পরপুরুষস্পৃষ্টা হোয়ে মনস্তাপে শুকিয়ে গেলেন। ঘেটু, শালুক, পাঁপড়া প্রভৃতি ছোট ছোট জলজ-কুসুমগণ—এই অবসরে শত্রুতা সাধনে নিযুক্ত হলো। আপনারা আহ্লাদে ফুটে উটে—যৌনবতী মধুমতীর দুর্দ্দশা

দেখে ঘৃণার হাসি হাস্‌তে লাগলো। প্রাণনাথের সমাগম সময় নিকটবর্ত্তী দেখে রজনীদেবী বিলাসভূষণে ভূষিতা হোতে লাগলেন। রংদার আস্‌মানতারা কাপড় পোরে মাথায় সেঁজোতারারূপ সিন্দুর পোরে হাস্‌তে হাস্‌তে দেখা দিলেন। সন্ধ্যাসতী প্রিয়সখীর বিলাসভূষণ বাড়াবার জন্যে খদ্যোতের ঝাড় জ্বেলে দিলেন। বড় বড় মোটা মোটা তারারা আকাশের গায়ে উঁকি দিয়ে রজনীদেবীর প্রেমসজ্জা দেখ্‌তে লাগলো। প্রকৃতিসতী রজনীদেবীর প্রিয়সখী, তিনিও রজনীর শোভা বাড়াবার জন্যে চারিদিকে কুসুম ফুটালেন,—পরিশ্রান্ত নিশাকরের শান্তি হরণের জন্য সুবাসিত সান্ধ্যসমীরণ নিয়োজিত হলো। নিশানাথ—এই এলেন, এই এলেন বোলে এক্‌টা সাড়া পোড়ে গেলো। রজনীর প্রিয়দূতী পাপিয়া আকাশে উড়ে রজনীনাথের আগমন পথ পানে চেয়ে চেয়ে—"চোক গেল—চোক গেল" শব্দে ব্যথা জানাতে লাগলো। রজনীনাথের বিলম্ব দেখে দিগঙ্গনাগণ ভীষণ যন্ত্রণা প্রকাশ কোত্তে লাগলো। ঝিল্লীগণ ঝিঁ ঝিঁ রবে নিশানাথকে আহ্বান কোত্তে লাগলো। রজনীনাথের আগমন কাল অপেক্ষায় সকলেই সারা হোয়ে গেল। কাল কারো কিছু হাত ধরা নয়, তবে সত্যবাদী কাল রজনীর হাতে ধোরে—তিনি সত্য কোরে বোলে গিয়েছিল, "রজনি! কাল আবার তোমাব কান্তকে তোমার করে অর্পণ কোর্‌বো।" রজনীকে এই বোলে বুঝিয়ে কাল নিশানাথকে অস্তাচলে নিয়ে গিয়েছিল, রজনী এখন সেই কালের প্রতীক্ষায় সেজেগুজে বোসে আছেন। নিশানাথের তবে এত বিলম্ব কেন?

ফর্সাটুকু কেটে গেল! আস্তে আস্তে আকাশের গায়ে নিশামণি দেখা দিলেন। নিশানাথ বড়ই স্ত্রৈণ!—তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে এসে প্রিয়তমা রজনীর গায়ে ঢোলে পোড়লেন। প্রকৃতিসতী হো হো কোরে জ্যোৎস্নার হাসি হাস্‌লেন। বাতাসের গায়ে ঢোলে ঢোলে পোড়ে ছোট ছোট ফুটন্ত-কুসুম-কুমারীরা হেসে হেসে গড়িয়ে পোড়তে লাগলো। চারধারে এক্‌টা যেন আনন্দের তুফান উঠ্‌লো, আকাশে পাখীর গতায়াত বন্ধ হলো। কেবল পেচকরাজ বড় বড় ভূড়ীওয়ালা বাবুদের মত থপ থপ কোরে টাণ্ডা হাওয়ায় কোঠর থেকে বেরুলেন; বাদুড় প্রভৃতি নিশাচর পাখীরা ছোট বড় গাছে, পাকা ফলের কাছে ঊর্দ্ধপদ অতিথি সেজে আতিথ্য স্বীকার কোল্লে।

পবন বড় লম্পট! তিনি আপনার দূত মধুকরকে ফুটন্ত মধুমতী কুসুম-কামিনীদের কাছে প্রেমভিক্ষা কোরে পাঠালেন। মধুকর দুকুল রাখা লোক! পবনের ভোগের আগে প্রসাদ পাওয়া অভ্যাস। পবনের দূত হোয়ে এসে সে এখন নিজেরই ঘটকালী আরম্ভ কোল্লে; নিজের শ্রবণ-সুখধর গুন্ গুন্ গুন্ ন্ গুন্ ন্ গুন্ শব্দে সিন্ধু-ভৈরবী আলাপ কোরে—হেলে দুলে উড়ে বোসে নিজের গুণের পরিচয় দিতে লাগলো! তরলবুদ্ধি সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমেরা কেউ কেউ মধুকরের চাটুবাক্যে বিশ্বাস কোরে কুলমান খোয়ালে; ভবিষ্যৎ না ভেবে—মধুকরের বাহ্য-ভৈরবে মুগ্ধ হোয়ে প্রেমসাগরে সাঁতার দিলে; শেষে হুলের ঝালে তারা হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হলো। যারা একটু পাকা-পোক্ত, যারা আজ নূতন ফোটে নাই, ফুটে যারা দুদিন রয়,—সেই সকল স্থিরযৌবনারা পরিণাম দেখে বেশ চেতে গেছে; মধুকরের কথা তারা হেসে উড়িয়ে দিলে, মধুকরের সেখানে বড় একটা জারিজুরি খাটলো না।

কালিকা মল্লিকাসুন্দরী নব-পরিণীতা। তিনি সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ কোরেছেন; তাঁর হৃদয় এখন বিলাস কানন,—কত আশা ভরসা তাঁর হৃদয়ে, কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা প্রকাশ করবার সাহস নাই। মল্লিকা বড়ই লজ্জাশীলা; তাঁর বুক ফাটে, তবু মুখ ফুটে না! মনে মনে কিন্তু স্বামীর শ্রীমুখখানি দেখিবার সাধ আছে। স্বামী ষট্‌পদ, এঁদিকে প্রণয়িনীর যৌবনসাগরে জোয়ারের টান ধোরেছে দেখে, ভোঁ কোরে শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত! ভ্রমররাজ মল্লিকার কাছে এসে—ঘেঁসে বোসে—হেসে হেসে অতি মধুর—মধুব্রতব গুন্ গুন্ স্বরে প্রেমভিক্ষা চাইলেন। লজ্জাশীলা মল্লিকা লজ্জায় ঘোম্‌টা টেনে দিলেন। ঘোম্‌টার ভিতর চোক লুকিয়ে আড়ে আড়ে চাইতে লাগলেন। ভ্রমর-রাজ্যের ভাগ্যে এরূপ সুখ দুঃখ অনেক ঘটেছে; তিনি বিচলিত হলেন না। আরও নিকটে বোসে প্রণয়িনীর গোলাপী গণ্ড চুম্বন কোল্লেন। আনন্দে অধীরা হয়ে মল্লিকা সুন্দরী—বাহ্যিক রাগ দেখিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায়—কেঁপে কেঁপে বোল্লেন, "আঃ ছি! কর কি?" ভ্রমর-প্রবর সে কথা হাসির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে বোল্লেন, "মধুমতি!—রাগ কেন? তোমার প্রেমের মধু দাও।" ভ্রমর যত সাধ্য-সাধনা—যত অনুনয়-বিনয় কোল্লেন,—মল্লিকা ঘাড় নেড়ে নেড়ে ততবারই অস্বীকার কোল্লেন। তাঁর প্রাণের ভিতর যেন লজ্জার জমাট

বেঁধে গেল। ভ্রমর তখন রাগ কোরে—ভোঁ কোরে উড়ে গিয়ে ঠান্‌দিদির বাড়ী দেখা দিলেন।

বৃদ্ধা তগরমণির সুবাস গেছে,—রূপ গেছে,—গুণ বড় ছিল না; তবু যা ছিল তাও নাই। তবে খোলা প্রাণে সেকেলে ধরণের রসিকতাটুকু করা আছে। নব বিবাহিত নাতি-নাতিনীদের রসিকতা শিক্ষার ভার আজও তগরমণির উপর। ভ্রমর ভোঁ করে ঠান্‌দিদির বাড়ীতে গিয়ে উড়ে বোস্‌লেন। ঠান্‌দিদির দোতালায় ঘর। সেইখানে গিয়ে মনের ব্যথা জানালেন। তগরমণি ভেবে চিন্তে বোল্লেন, "ছেলেমানুষ, দুদিন পরে আপনা হতেই সেরে যাবে। তা কি কোরবো ভাই, ছুঁড়ীরা নীচে খেলা কোচ্চে, দোতালা হতে নেমে যাওয়া ত আমার সাধ্য নাই। বুড়ো হাড়ে তত আর সয় কৈ? মল্লিকার সঙ্গে যুগলমিলন করা আমা হতে আর হয় না। তবে যদি এখানে যুগল মিলন কর, আমি প্রস্তুত আছি! কেন হে! বুড়ো বলে কি এখন মনে ধরে না? মনে কোরে দেখ, এককালে এই বুড়িই ছুঁড়ি ছিল, এই পায়ে ধোরে মাথায় টাক পোড়েছিল, যৌবন গেছে, তবুও আমি সেই আছি!" ভ্রমররাজ দেঁতো হাসি হাস্‌লেন। মনে ভাবলেম, বুড়ীর আশাও কম নয়! প্রকাশ্যে বোল্লেন, "ঠান্‌দি!" তোমার মধু কৈ?" ঠান্‌দিদি বড়ই রসিকা। বোল্লেন, "তোমার জিনিস তুমি খুঁজে নাও!" ভ্রমররাজ রেগে গিয়ে তগরমণির শাখা-শয্যার উপর সবলে পোড়্‌লেন। সখা পবনদেব সময় বুঝে সহকারিতা কোরে বন্ধুর মুখ রক্ষা কোল্লেন। জোর বাতাসের গোটাকত ঝাপটা খেয়ে তগরমণি অনিচ্ছাসত্বেও ফুললীলা সাঙ্গ কোত্তে বাধ্য হলেন।

ভেবে দেখ্‌লেম, সকল জাতের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সমান। মানুষে আর ফুলে বেশ মিলে গেল। আরও মনোযোগ দিয়ে ফুলময়ী বালিকাদিগের কাণ্ডটা দেখতে লাগলেম।

পবন বড় কারো খাতির রাখে না। যেটুকু রাখেন, তাতেও স্বার্থ আছে। তবে তাঁর নিজের ক্ষমতার পরিচয় না দিয়ে প্রসাদ পেতে বড় ভালবাসেন। কোন্ ফুলটী ঝোরে পোড়্‌লো, পবন তার গায়ের মধুর ছিটা ফোঁটা খুঁজে সেটুকু গ্রহণ কোল্লেন। আমোদ কোরে তাকে কত নাচালেন, আদর কোল্লেন। কোন পাতাটী পোড়লো, তাকে গাছতলা থেকে উড়িয়ে নিয়ে তফাতে রেখে এলেন। গাছটীর তলদেশ

যেন অপরিষ্কার না হয়। পবনদেব লবণবাহী বলদ। প্রভেদের মধ্যে তারা লবণের আস্বাদ মোটেই ভোগ কোত্তে পায় না, ইনি ছিটাফোঁটা পান।

এই সব দেখতে রাত অনেক হয়ে গেছে। কালের ঘড়ী শৃগালের "ক্যা হুয়া" "ক্যা হুয়া" রবে এক প্রহর রাত ঘোষণা কোল্লে। ঘড়ী কেনা সকলের কিছু পোষায় না। আর এদেশে এমন ধরণের ঘড়ী ছিল না। হালে ইংরেজের সঙ্গেই যেন ঘড়ীর আমদানি হোয়েছে, কিন্তু বিধাতা গরীব দুঃখীদের জন্যে এই অত্যাশ্চর্য্য স্বভাব-ঘড়ি সৃজন কোরে রেখেছেন। সাধারণ লোকের ঘণ্টা মিনিটের প্রয়োজন করে না। তারা একটা প্রহরের নিশানা পেলেই মনে মনে দণ্ডের হিসাব অনুমানে আনতে পারে। তাই বিধাতা প্রহরে প্রহরে ঘোষণা কোত্তে এই অদ্ভুত জীব-ঘটিকা সৃজন কোরেছেন।

স্বভাবচিত্রে এতদূর নিবিষ্ট আছি যে, এত রাত হয়েছে, যেন হুঁস নাই। এখন শৃগালের শব্দে যেন চমক ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি উঠ্‌লেম। সন্ধ্যা যখন হয়, তখন সুশীলা, কুসুম, দুইজনেই আমার পাশে বোসে ছিল। এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলেম, এখন পাশের দিকে চেয়ে দেখি, তারা নাই। মনে ভাব্‌লেম, আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে হয় ত তারা দুজনে কমিনী-কঙ্কণের ভিতর লুকিয়েছে। এই ভেবে সাম্‌নের কামিনী-কঙ্কণের দিকে চাইলেম। দেখ্‌লেম সত্য সত্যই একটা লোক। তাড়াতাড়ি পা টিপে টিপে গিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নাই। অগত্যা আবার ফিরে এলেম। এসে কেবল দাঁড়িয়েছি, আবার দেখি, ঠিক সেই স্থানে এবার দুজন লোক! সন্দেহ হলো, গুটি গুটি আবার সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালেম। দেখ্‌লেম, বড় দাড়িওয়ালা, সমস্ত শরীর কালো জামায় ঢাকা, বড় বড় দুজন বিকটাকার লোক সাঁ কোরে একদিকে বেরিয়ে গেল। প্রাণের ভিতর চোম্‌কে উঠলো। মনে মনে ভাব্‌লেম, এরা হয় ত বাড়ী গেছে। এই ভেবে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে যাচ্চি, এমন সময় সুশীলা রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এলো! হাঁপাতে হাঁপাতে বোল্লে, "দিদি! সর্ব্বনাশ হয়েছে। কুসুমকে দুজন চোরে ধোরে নিয়ে গেল!"

আমি চোম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায়?—কোথায়? কোন্ দিকে নিয়ে গেল?" সুশীলা পশ্চিম দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বোল্লে,

ঐ দিকে। আমরা দুজনে ঐ দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেম। ঝোপের আড়ালে দুজন লোক আড়ি পেতে ছিল। আমরা অন্যমনস্কভাবে কথা কইতে কইতে যেমন কাছে গেছি, অমনি ধাঁ কোরে ধোরে ফেল্লে। আমি নিকটেই ছিলেম, আমাকে কেউ কিছু বোল্লে না। কুসুমের কোমরে ধোরে একজন অনেক টানাটানি কোল্লে, কুসুমও প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা কোল্লে, কোন ফলই হলো না! আর একজন ধাঁ কোরে কুসুমের মুখ বেঁধে ফেল্লে। শেষে দুজনে ঘাড়ে কোরে নিয়ে চোলে গেল।" সুশীলার কথা শুনে আমার ত প্রাণ উড়ে গেল! দুজনে বাসায় এলেম। আমাদের ভাবভঙ্গী দেখে মাষ্টার বাবু এসে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি গা? হয়েছে কি?" আমি সমস্ত কথা খুলে বোল্লেম। মাষ্টার বাবু বোল্লেন, "হুঁ!—বুঝ্‌তে পেরেছি। শালারা এখানেও এসেছে। আমিও আজ তিন চারদিন মানুষের

সাড়া পাচ্চি। আর এখানে থাকা ভাল হয় না। আচ্ছা, হরকন্! যাও ত, ব্যাপারটা কি জেনে এসো ত? হরকনের নামে পশ্চিম দেশ কাঁপতো, হরকনের নাম কোল্লে সে লোকের আর ভয় থাকতো না। সেই বীরবর হরকন্ সন্ধান নিতে—পিঠে ঢালসড়কী বেঁধে রওনা হলো। আমরা দুজনে গলাগলি হয়ে কাঁদ্‌তে বোস্‌লেম।

আমাদের মত দুর্ভাগ্য নিয়ে বোধ হয় আর কেউ জন্মায় না। একটা না একটা বিপদ কি লেগেই আছে। তবে যে মাঝে মাঝে একটু আধটু সুখের ছবি দেখি, সেটুকু কেবল রসান। মাঝে মাঝে সুখের মুখ না দেখলে কষ্টভোগ করা যায় না, সুখের মুখ না দেখলে সে সুখ লাভ কোত্তে চেষ্টা থাকে না, তাই চতুর চূড়ামণি বিধাতার চাতুরী-জালের ফাঁক দিয়ে একটু আধটু সুখের ছবি নজরে পড়ে। জীবনে কেবল দূর থেকে সুখ দেখা, আর কাঁদা, কাজের মধ্যে এই দুই।

হরকন্ ফিরে এলো। এসে বোল্লে, "না কত্তা, সন্ধান হয় না। তবে নোক যে নেগেছে, তার ঢেক ঢেক চারা পাওয়া গিয়েছে। তবে হঠাৎ ঢুকতে পাচ্চে না।" হরকন্ অনেক দিন বাঙ্গালা দেশে ছিল। গল্পে শুনেচি, নোদের ডাকাত বৈদ্যনাথ বাবুর দলে হরকন্ ঘাটির পাইক ছিল। হরকন্ বেশ বাঙ্গালা জানে অনেক সময় সে বাঙালী সাজেই থাকে। জাতে কিন্তু হিন্দুস্থানী।

মাষ্টার বাবু বোল্লেন. "হরকন্! তা আমি আজ চার দিন জান্‌তে পেরেছি। আর থাকা নয়। যদি পেছু একটা হাঙ্গামা না থাকতো, তা হলে ভয়ের কারণ ছিল না, কিন্তু পুলিশ বাদী। কাজ হবে না। সব ফাঁস হয়ে যাবে। তাতে কাজ নাই। চল, এখান থেকে সরা যাক। এবার চল, কলিকাতায় যাই। সেখানে মিস্তিরজা আছে। সকল কাজ—সেখানে হবে। কোন গোল হবে না। তুমি যাও। সকলকে গুছিয়ে নিয়ে যাবে। টাকাকড়ি যার যার কাছে যা আছে, সব কুড়িয়ে নিয়ে আস্‌তে বোল্‌বে।" হরকন্ বোল্লে, "এই কথাই অাচ্ছা!" যুক্তি স্থির রইল।

মনে মনে ভাব্‌লেম, লোকের যাতে সুখ, তাতেই দুঃখ। যে কামিনী-কঙ্কণের শীতল ছায়ায় প্রাণ পুলকিত হতো, সেই কামিনী-কঙ্কণ হইতেই দস্যুর হাতে কুসুমকে হারালেম। মনে স্থির রইল,

আর না। আর কখন কামিনা-কঙ্কণের নাম মুখেও আন্‌বো না। চিরদিনের জন্যে হৃদয় থেকে একেবারে মুছে ফেল্লেম,—কামিনী-কঙ্কণ।

একত্রিংশ চক্র।

এরই নাম বুঝি শান্তিরক্ষা ?

রাত্রে সমস্ত আয়োজন ঠিক হইল। তখনি বাড়ীওয়ালাকে ডেকে বাগান ভাড়া, বাড়ী ভাড়া, চাকরদের বেতন সব কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেওয়া হ'লো। প্রথম হইতেই দেখ্‌চি, মাষ্টার বাবু যেখানে যেখানে থাকেন, সেখানে তাঁর বেশ পসার হয়। লোকে জানে,—এমন লোক প্রায় মেলে না। দেনাপাওনায় এমনতর খাড়া লোক অতি কম! সমস্ত গোল চুকিয়ে এমন ভাবে আয়োজন ঠিক রইল যে, কাল সকালেই রওনা হওয়া যায়।

এই সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ কোত্তে রাত বারটা বেজে গেল। বারটার পর সকলের শয়ন হলো। আমার নিদ্রা নাই। সুশীলা ছেলেমানুষ, কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে সেও ঘুমিয়ে পোড়লো। চেতন থাক্‌লেম কেবল আমি। নিদ্রা নাই—কেবল আমার। রাতটে জেগেই কাটালেম। সকালেই মাষ্টার বাবুর ঘুম ভেঙেছে। তখনি আমাদের সকলকে তুলে দিলেন। হাত মুখ ধুয়ে—তখনি রওনা হওয়া গেল। মাষ্টার বাবু আগে আগে যাচ্চেন, আমরা তাঁর পশ্চাতে। সদর দরজার যেতেই দুজন সিপাহীর সঙ্গে দেখা হলো। তারা সেলাম কোরে বোল্লে, "জেরা সবুর। মাষ্টার বাবু জোরে জোরেই বোল্লেন, "কি দরকার? এখনি বল? আমরা আর এখানে থাক্‌বো না। দেশে যাব।" লোক দুটী বোল্লে, "এনেসপাত্তর সাহেবকা হুকুম, সবুর।" বাবু তেরিয়া মেজাজে ঘাড় বাঁকিয়ে বোল্লেন, "কোথাকার তোর ইন্‌স্পেক্টর? আমি তার কথা গ্রাহ্য করি না। আমি চোল্লেম।" বাবু একটু অগ্রসর হলেন। তখনি একজন সিপাহী জোড়া পা ফেলে—বুক ফুলিয়ে

এসে হাজির। সিপাহীদের পেছুনে দুজন ভুঁড়ীওয়ালা বাঙালী আর এক জন লাল মুখ সাহেব। এতগুলো লোকের হঠাৎ আগমনে মাষ্টারবাবু দমে গেলেন। বুঝ্‌লেম, পুলিশের হাঙ্গামা। যে ভয়ে বিশ্বেশ্বর তেওয়ারীর বাড়ী থেকে পালিয়ে এলাম, যে ভয়ে পরিত্রাণ পেতে গিয়ে আজ পর্য্যন্ত কত বিপদই ভোগ কচ্চি, আজ আবার সেই পুলিশের হাঙ্গামা। প্রাণ উড়ে গেল! মুখ শুকিয়ে গেল! নীরবে শুন্‌তে লাগ্‌লেম। মাষ্টার বাবুর ধন্য সাহস! মুখ শুকিয়েছে, বুক কাঁপ্‌ছে, ঠক্ ঠক্ কোরে পা কাঁপ্‌চে, কিন্তু মুখসাপট কমে নাই। তিনি সমান জোরে জোরেই উত্তর প্রত্যুত্তর কোচ্চেন। একজন বাঙালী ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনার নাম কি?"

মাষ্টার বাবু বোল্লেন, "আপনারা কে? কাকে খুজ্‌চেন, তা না বোল্লে, আমি আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।"

বাবুটী তখনো নরমে নরমেই জিজ্ঞাসা কোচ্চেন। তিনি বোল্লেন, "সাহেব ঠগী-কমিশনর। ডাকাতী নিবারণ করা, ডাকাত ধরা আমাদের কাজ। সর্ব্বেশ্বর ওরফে নানা নামধারী ডাকাত-সর্দ্দার এই বাড়ীতে আছে, অনুসন্ধানে জানা গেছে। আপনি যদি তিনিই হন, বেরিয়ে আসুন, না হন, তিনি কোথায় বলুন?"

বাবু লম্বাচৌড়া কথায় ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বোল্লেন, "কে সর্ব্বেশ্বর? কোথাকার সর্ব্বেশ্বর? চিনি না। এ বাড়ীতে আমি ভিন্ন আর কেউ ছিল না। আমার আগে ছিল কি না জানি না। সেখানে সন্ধান করুন। আমি রওনা হয়েছি। বিলম্ব হ'লে ঢের টাকা ক্ষতি হবে। তখন আপনাদের পক্ষে উচিত আইন কোর্ত্তে কুণ্ঠিত হব না। ভদ্রলোক, যারা কিছুই জানে না, তাদেরই উপর আপনাদের যত জুলুম।"

বাবুটী আর একজন লোককে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন? ইনিই কি তোমার জাল-জামাই সেজে—মেয়ে ঠকিয়ে নিয়ে এসেছিলেন?" আমি ত চোম্‌কে উঠলেম। চেয়ে দেখি, ঘনশ্যাম বাবু! কি সর্ব্বনাশ! এবার আর রক্ষা নাই! আমাকে দেখ্‌লেই চিন্‌বে! আজ মাষ্টারবাবুরও যে গতি, আমারও সেই গতি! মাথা ঘুরতে লাগলো, দাঁড়াতে পাল্লেম না—বোসে পোড়্‌লেম! চেয়ে দেখ্‌তে সাহস হলো না, কিন্তু কথাবার্ত্তাগুলি শুনতে লাগ্‌লেম।

ঘনশ্যাম বাবু বেশ কোরে দেখে বোল্লেন, "হাঁ! এই বটে।" মাষ্টারবাবু চেঁচিয়ে উঠে বোল্লেন, "খবরদার! জান তুমি, ভ্রমে পোড়ে মারা যেও না।" ঘনশ্যাম বাবু মাষ্টার বাবুর ধমকে যেন ভেবড়ে গেলেন। আম্‌তা আম্‌তা কোরে—মাথা চুল্‌কে বোল্লেন, "তা মশায়, আপনি আমার সর্ব্বনাশ কোরেছেন। আমি গরীব মানুষ, আমার ক্ষমতা কি? জামাই বাবাজীর টাকা, আর আমার পরিশ্রম। আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন বাবা?"

ঘনশ্যামবাবুকে একটু সঙ্কুচিত দেখে মাষ্টারবাবুর বল আরও বেড়ে গেল। তিনি অনেক ভয় দেখালেন। ইন্‌স্পেক্টর বাবুও সাহস কোল্লেন না। সাহেব এতক্ষণ খাড়া দাঁড়িয়েছিলেন। কেবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাষ্টার বাবুর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। দেখে দেখে, ছুটে এসে ধাঁ কোরে বাবুর বুকে এক জোড়া লাথি মাল্লেন। বাবু ছিট্‌কে পোড়লেন, বুক দিয়ে হু হু কোরে রক্ত বেরুতে লাগ্‌লো। সাহেব আবার লাথি তুল্‌তেই বাবু বোল্লেন, "দোহাই সাহেব, আমি সব এক্‌রার কোচ্চি।" সাহেব হুকুম কোল্লেন "বাঁড শালে লোগ কো।" হুকুম পাওয়া মাত্র সিপাহীরা সকলেই ধাঁ ধাঁ কোরে বেঁধে ফেল্লে। আমরা দুজনে দুজন সিপাহীর হেপাজাতে রইলেম।

সাহেব লম্বা লক্‌লকে বেত হাতে কোরে পায়চারী কোত্তে কোত্তে বোল্লেন, "কবুল বিগড় ছোড়েগা নেই। টোন্ শালা বড় দুষ্ট।" বাবু বোল্লেন, "হুজুর মা বাপ। সবই জানেন। আমার এজাহারে সবই প্রকাশ পাবে—আমি নির্দ্দোষী।"

সাহেব আবার মহা রাগত হয়ে সিপাহীদের ধমক দিয়ে বোল্লেন, "শুয়ার কা জানা! জল্‌দী বাঁড। এককাট্টা পাড়িমে লে চলো। সব সিদা করো গা। উল্লুক সেটান।" আজ্ঞামতই কার্য্য হলো। আমরা সকলেই সিপাহীর পাহারায় ফাঁড়িতে চোল্লেম। বিধাতার মনে এতও ছিল।

ফাঁড়ি ঘরে গিয়ে আমাদের কোত্তে দিলে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা স্বীকার না করি, ততক্ষণ কোতের হুকুম। কোত একটী অন্ধকার ঘর। মশা, আর্‌সুলা পিপ্‌ড়ে বোঝাই। আমরা সেই ঘরে রইলেম। সুশীলা ত কেঁদেই আকুল। অদৃষ্টের দোষ দিয়ে তাকে বুঝিয়ে

রাখ্‌লেম। মাষ্টারবাবু এত মার খেয়েছেন, তবুও স্বীকার করেন নাই। তাঁর হুকুম, "প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু স্বীকার করা হবে না।" আমরা প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, "না। আমরা প্রাণ দেব, তবু প্রকাশ কোর্‌বো না।"

সে রাত আমরা কোতেই কাটালেম। সমস্ত দিন—সমস্ত রাত অনাহারে গেল। জলবিন্দুমাত্রও উদরস্থ হলো না। সকাল বেলা ৮।৯ টার সময় একদল সিপাহী এসে সুশীলাকে নিয়ে গেল। সুশীলা ত কেঁদেই অস্থির। মাষ্টারবাবু সিপাহীর হাতে পাঁচটী টাকা, দিয়ে বোল্লেন, সিপাহিজি! দেখো, যেন মারাধরা না হয়।" সিপাহিজী টাকা পাঁচটী সাবধানে কাপড়ের ভাজে লুকিয়ে রেখে নম্রভাবে বোল্লে, "কোন ভয় নাই, বাবু সাহেব! সব মিটে যাবে।" মাষ্টারবাবু সুশীলাকে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ কোরিয়ে দিলেন। আমিও সান্ত্বনা কোরে বিদায় কোল্লেম। রোরুদ্যমানা সুশীলাকে নিয়ে সিপাহী চোলে গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমার ডাক হলো। আমিও সিপাহীর সঙ্গে চোল্লেম। দেখি, একটী ঘরে দুজন লোক। একজন :আল্‌বোলার নল মুখে দিয়ে চোক বুজে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ তামাক টান্‌চেন। মাঝে মাঝে লালচোকে চেয়ে মুহুরার সঙ্গে কথা কইচেন। দূরে একটী কোণে সুশীলা দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌চে। সিপাহী আমাকে যথাস্থানে পেস্ করে বাইরে গেল, মুহুরা আর দারোগাবাবু দুজনে বেশ কোরে আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন, "তোমার নাম কি?" আমি ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম, "আমার নাম হরিদাসী।"

"কি জাত? সর্ব্বেশ্বর তোমার সম্বন্ধে কে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে। সর্ব্বেশ্বর আমার কেউ নয়।"

"কেউ নয়!"—দারোগাবাবু যেন আশ্চর্য্য জ্ঞান কোরে—ঝেড়ে উঠে বোল্লেন, "কেউ নয়!—ও—হয়েছে! ঠিক কথা! সর্ব্বেশ্বর তোমাকে কতদিন রেখেছে?—"

কথার ভাব বুঝে মনে বড় কষ্ট হলো;—বোল্লেম, "সর্ব্বেশ্বর আমার ধর্ম্ম-পিতা।" বাবু হেসে বোল্লেন, "তোমাদের আর সে ভয় কি? রেণ্ডি লোক এমন সম্বন্ধ মুখে বোলে থাকে! সময়ে বোধ হয় ততটা সম্বন্ধ বিচার থাকে না। ভাল; কতদিন-সর্ব্বেশ্বরকে তুমি সুখী কোরেছ? বেশ চেহারা তোমার।

এমন চেহারায় তুমি বোধ হয় বেশী বেশী টাকা রোজগার কোরেছ। বলো, ঠিক কথা বলো! আমি কাতর হয়ে—দুঃখে কষ্টে যেন জ্ঞানশূন্য হয়ে বোলে উঠ্‌লেম, "আমার যা কোত্তে হয় করুন। কোন কথার আমি উত্তর দিব না। মেয়াদ দিন, অপমান করুন, ফাঁসী দিন, তাতেও আমি প্রস্তুত। আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেও আমি উত্তর দিব না।"

দারোগাবাবু হেসে—ভুঁড়ি নেড়ে—অবজ্ঞাভাবে এক চোকে চেয়ে মুহুরীকে বোল্লেন, "লোকটা পাকাঘাগী। ঢের চালচুল শেখা আছে। বড় পাকা লোক, কথার কায়দা জানে।" এই পর্য্যন্ত বোলে আমার দিকে গরম নজরে চেয়ে বোল্লেন, "দেখ, আমারা তোমার ও রকম রাঁড়কান্না শুনতে চাই না। আমরা পুলিসের লোক, ও রকম চোকরাঙানী দেখে ভয় পাবার ছেলে আমরা নই। স্পষ্ট কথা, এখনো আমাদের হাত আছে। সাহেবের কাছে গেলে পেঁজ-পয়জার দুই-ই হবে। জাত যাবে, টাকা যাবে, শেষে বুঝেছই আর কি? কেন সাহেবকে জাত দিবে?—স্বীকার কর, আমাদের কাছে বেশ সুখে থাকবে। আমরা পুলিসের লোক, মুলুক লুটে এনে তোমাকে দিব। খুব সুখেই থাকবে। স্বীকার কর, সব গোল মিটিয়ে দি। তুমি সর্ব্বেশ্বরের কাছে যে টাকা পাও, আমরা তার চারগুণ বেশী দিব। তবে আর তোমার অমত কি?"

ঘৃণায়—লজ্জায়—অপমানে আমি যেন কেমনতর হয়ে গেলেম। মাথা ঘুর্ত্তে লাগ্‌লো, শরীর গরম হয়ে গেল। জ্ঞান হোয়ে বোল্লেম, "এখনো বোস্‌ছি, আপনারা শান্তিরক্ষক, ডাকাতী নিবারণ কোত্তে এসে এই রকম ডাকাতি কোচ্চেন। এই বুঝি আপনাদের শান্তিরক্ষা? এখনো বোল্‌ছি, আর আমাকে এমন কথা বোল্‌বেন না। সাবধান হয়ে যা জিজ্ঞাসা কোত্তে হয় করুন, তা না হোলে আপনাদের ভদ্রস্থতা নাই। নিশ্চয়ই জানবেন, আপনাদের—"

বাবু হো হো হেসে—চোক ঘুরিয়ে—চোক পাকিয়ে বোল্লেন, "বিলম্ব আছে। তুমি সহজে পোষ মান্‌বে না। সহজে সায়েস্তা হবে না তুমি। আচ্ছা, সবুর কর একটু, দেখাচ্চি। কে আছিস রে?"

একজন সিপাহী সেলাম কোরে দোরে দাঁড়ালো। দারোগাবাবু গোঁফ ফুলিয়ে হেঁকে হেঁকে হুকুমজারী কোল্লেন, "সর্ব্বেশ্বরকে নিয়ে আয়!" সিপাহী চোলে গেল! বাবু ঘন ঘন তামাক টান্‌তে

লাগ্‌লেন। মুহুরী বোল্লে, "বড় ভাল দাঁও এটা; কমে ছাড়া হবে না। আপনি বড় দয়ালু লোক, এখানে দয়া দেখাবেন না। চুক্তির ভার আমার উপর দিবেন। কেমন কোরে চুষে নিতে হয় দেখ্‌বেন। সাহেবকে মোহর কতক দিলেই চোল্‌বে। ও আর বুঝ্‌বে কি? নূতন কাকে গু খেতে শিখেছে, আজও পেট মোটা হয় নাই। এই সময়ই ঘর দাখিল করার বেশ সুবিধা। কি বলেন? দারোগাবাবু ঘাড় নেড়ে—হেসে বোল্লেন, "তুমি এ সব কাজে পাকা আছ বটে। বেশ, তুমিই কর। শুধু টাকাতেই কাজ চোল্‌বে না। এমন * * * বুঝেছ ত?—প্রায় মেলে না, এ দুটোকে বাগাতে পাল্লে, বুঝেছ ত?—বড় ভাল হয়। সাহেবকে চার খাওয়াতে পাল্লে ত পোয়া বারো!—প্রসাদটা দিলে গরম ধাত নরম হয়ে যাবে। তখন দেখ্‌বে, হাতে মাথা কাটবো।—কি বলো?—এ না কোল্লেই নয়। জোগাড় চাই। ভয় করার কোন দরকার নাই। জোরজুলুম—যাতে হয় কর! সাহেব আমাদের, যত বিপদ হোক সব ভেসে যাবে। সাহেবী কলমের মুখে দেশকে দেশ উড়ে যাবে। কুচ পরওয়া নেই। দারোগাবাবু এই সব কথায় মুহুরীকে উপদেশ দিচ্চেন, এমন সময় সর্ব্বেশ্বরবাবু হাজির!

দারোগাবাবু প্রথমটা বেশ ভদ্রতা জানিয়ে বোল্লেন, "সর্ব্বেশ্বরবাবু! আপনার বাড়ীতে যা হয়েছে, সে আর ধোরবেন না।—মনেও কিছু কোরবেন না। সাহেবটা বড় বদরাগী, তাতে ক্ষমতা পেয়েছে বেশী, ধাঁ কোরে লোকের অপমান কোরে বসে। কি কোরবো, উপরেও আপীল চলে না। সাহেব যে রিপোর্ট দেয়, ঠিক তাই বাহাল থাকে। আমরা বারম্বার দেখে অবাক হয়ে গেছি। কতজন, সাহেবের বিপক্ষে বড় আদালতে মকর্দ্দমা এনেছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সাহেবের এত ক্ষমতা যে, যে কোন লোককে হোক, মেয়াদ দিতে পারে। তাতে, তার বিপক্ষে কোন মকর্দ্দমা আস্‌তে পারে না। উপরের হুকুমই এই রকম। স্বভাব না বুঝে উপযুক্ত কি না সেটা পরীক্ষা না কোরে, বানরের হাতে খন্তা দিয়েছে, কাজেই এই রকম হচ্চে। সাহেবের ইচ্ছা, আপনাকে আস্‌থাস্ চালান দেয়, আর আপনাদের সকলকে দ্বীপান্তর দেবার জন্যে মেজেষ্টার সাহেবকে অনুরোধ করে। তা যে মেজেষ্টার, আমাদের সাহেবের অনুরোধ কখনই অগ্রাহ্য কোরবেন না।

আপনি ভদ্রলোক, এখনো পথ থাকতে যদি মিটাতে চান, তা হোলে আপনাদের জন্যে আমরাও না হয় হাতে ধোরে দেখি। ভদ্রলোকের কোন অনিষ্ট আমরা থাকতে সহজে ঘোটবে, সেটা বড় কলঙ্কের কথা ত তাতেই বোলচি, মিটিয়ে ফেলাই ভাল। কি বলেন?

মাষ্টারবাবুও যথেষ্ট ভদ্রতা দেখিয়ে বোল্লেন, "সে আপনাদের অনু-গ্রহ; আপনারা যদি মনে করেন, তা হোলে না হয় কি? আর নির্দ্দোষীর শাস্তিতে ভদ্রলোকের কষ্ট ত হোতেই পারে। আপনি যে রকম মিটাতে চান, বলুন। সাধ্যপক্ষে আমি তাতে অসম্মত হব না। মাষ্টারবাবুর কথায় দারোগাবাবু যেন সন্তুষ্ট হোলেন;—হেসে বোল্লেন, "বড় বেশী নয়। সাহেবের মদ মুর্গীর খরচ বোলে পাঁচটী হাজার। আর আমাদের যা আপনার ইচ্ছা, তাই দিতে পারেন! তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আপনি বড়লোক, আমাদের ভার আপনার উপর।" বাবু একটু থেমে আবার বোল্লেন, "হুঁ—আর একটী কথা।—এ মেয়ে দুটী আপনার কে? কোন সম্বন্ধ আছে কি?"

বাবু সর্ব্বেশ্বর একটু থেমে বোল্লেন, "না। তেমন গুরুতর সম্বন্ধ কিছুই নাই, তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধ আছে। মেয়েদের খবরে কি প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন আছে।"—দারোগাবাবু একটু হেসে বোল্লেন, "প্রয়োজন আছে। তা আপনার সঙ্গে এদের ত তেমন কোন আত্মীয়তা কি বংশগত সম্বন্ধ নাই, তবে আর ক্ষতি কি? ধর্ম্ম সম্বন্ধ আবার সম্বন্ধ, তার আবার কথা! আপনি ভদ্রলোক, সব কথাই খুলে বলা ভাল। মেয়ে দুটীর প্রতি সাহেবের নজর পোড়েছে। আমরা অনেক বুঝিয়ে দেখেছি, সাহেব আমাদের কথা একেবারেই শুন্‌লে না। জিদ কোরে বোসেছে।—হুকুম দিয়েছে, যেমন কোরে হোক, মেয়ে দুটীকে আজ সাহেবের তাম্বুতে পাঠাইতেই হবে। কি কোরবো বলুন?—আমাদের ত আর হাত নাই, হুকুম রদ করবার ত অধিকার নাই। আমরা যখন তাঁর তাঁবেদার, তখন ভালই হোক, মন্দই হোক, হুকুম তামিল ত কোত্তেই হবে। তবে মিছে একটা হাঙ্গামা না কোরে আপনি এ কথায় স্বীকার করুন। বেশী দিন নয়, একটা রাত। কাল সকালেই আপনারা খোলসা পাবেন;—কালই চোলে যাবেন। সাহেব এমন ছাড় দেবেন যে, তা দেখালে আর কোন স্থানে কোন বিপদ ঘোটবে না। সাহেব

যখন হাতে পেয়েছে, তখন ত আর কিছুতেই ছাড়্‌বে না। শেষে পেঁজ-পয়জার দুই হবে, তার চেয়ে স্বীকার করাই আমার মতে ভাল।"

দারোগাবাবুর কথা শুনে আমার আরও ভয় হলো। এমন বিপদে কখনো পড়ি নাই। শরীরের কষ্ট—মনের কষ্ট ঢের সহ্য কোরেছি, কিন্তু এমন বিপদে আর কখনো পড়ি নাই। উপায় কিছুই নাই। এখন করি কি? মনে মনে দৃঢ়তা অবলম্বন কোল্লেম। স্থির কোল্লেম, প্রাণ দিব। জীবন থাকতে কখন কেউ ধর্ম্মনষ্ট কোত্তে পারবে না। সুশীলা ত ভয়েই আড়ষ্ট! তাকেও ইঙ্গিতে সাহস দিলেম।

সর্ব্বেশ্বরবাবু বোল্লেন, "মহাশয়! টাকা যা চান, দিতে প্রস্তুত আছি। যে টাকা চেয়েছেন, তা ছাড়া আরও পাঁচ হাজার দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ কথাটী আমি স্বীকার কোত্তে পারি না।"

দারোগাবাবু হেসে বোল্লেন, "তা আমি কি কোরবো? মনে ভাব্‌বেন না, এতে আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব আছে। আমরা কেবল হুকুমের চাকর বই ত নই। বরং চলুন, সাহেবকে বোলে যদি রাজী কোত্তে পারেন; কিন্তু এখন হোতে বোলে রাখি,—সাহেব বড় রাগী,—বড় জেদী। যা ধরে তা ছাড়ে না। কথায় কথায় অপমান করে, মার ধর করে, চাবুকে গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে ছাড়ে। আগেই সতর্ক কোরে দিচ্চি। ভদ্রলোক আপনি,—সাবধান হোন!"

সর্ব্বেশ্বরবাবু অনেকক্ষণ নীরবে থেকে বোল্লেন, "না মহাশয়! তা হবে না। প্রাণ যায় সেও স্বীকার,—আমি এ কথায় নাই। তবে ওরা যদি স্বীকার করে, সে কথা স্বতন্ত্র। একজনের ধর্ম্ম নষ্ট কোত্তে আমি বোল্‌তে পারি না।"

দারোগাবাবু আমাদের দিকে চোক তাকিয়ে—কটমট চাউনিতে চেয়ে বোল্লেন, "কেমন গা! মত আছে?—না অপমান হবে? আমাদের কি? এখনি সাহেবের সাম্‌নে হাজির কোরে দিব। সাহেব তখন বুঝে নেবে। তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বোল্‌চি, স্বীকার কর।" আমি যে কি উত্তর দিব, তা ভেবেই পেলেম না। শেষে স্থির কোল্লেম, সাহেব ত মানুষ বটে। তার হৃদয়ে কি দয়া নাই?—আমাদের চোকের জল দেখ্‌লে সাহেবের কি দয়া হবে না? এরা ত সাহেবের সাম্‌নে নিয়ে যাবেই। এদের ত কোন হাতই নাই।—তবে সাহেবের কাছেই যাওয়া ভাল।

দারোগাবাবু মুহুরীকে যখন উপদেশ দেন, তখন তাঁর কথার ভাবে বোধ হয়েছে, সাহেব যেন এর কিছুই জানে না। যাই হোক, সাহেবের কাছে গেলেই তখন বোঝা যাবে। সাহসে ভর কোরে বোল্লেম, "আমরা প্রাণ দিব, তবু ধর্ম্ম দিব না। আমরা বেশ্যা নই,—কুলে কাঁটা দিতে আসি নাই। চলুন,—নিয়ে চলুন। সাহেবের কাছেই যাব।"

আমার দৃঢ়তা দেখে দারোগাবাবু যেন ম্লান হয়ে গেলেন;—বোল্লেন, "ছেলেমানুষ,—মেয়েমানুষ—বুঝ্‌তে পাল্লে না। শেষে মজাটা জান্‌তে পারবে। আচ্ছা, চলো!" দারোগাবাবু অনিচ্ছা সত্বেও যেন উঠ্‌লেন। মুহুরী দারোগাবাবুকে বাধা দিয়ে বোল্লেন, "আপনি করেন কি? ওরা না বুঝে এক কথা বোলেছে বোলে কি তখনি সেটা কোত্তে আছে? হিত যখন কোরবো বোলেছেন, তখন হিতই করুন।—বুঝে দেখ্‌তে সময় দিন। সাহেব রাত্রে নিয়ে যেতে বোলেছে,—তখন যাবেন। সমস্ত দিনটা এখনো পোড়ে রোয়েছে। সময় দিন, বুঝে দেখুক। শেষে যা হয় করা যাবে।" দারোগাবাবু উঠেছিলেন, আবার বোস্‌লেন। মুহুরীর সঙ্গে ফিস্ ফিস্ কোরে পরামর্শ কোরে বোল্লেন, "সেই ভাল। সর্ব্বেশ্বর-বাবু! আপনার কথাই থাক। টাকা আনুন। আপনি মহৎ লোক, আপনার উপকার কোল্লে সে উপকার বিফলে যাবে না। আনুন, দশ হাজার টাকাই আনুন। আপনি খালাস পাবেন।" রহস্যটা বোঝা গেল। চিন্তাও অনেকটা কমে গেল।

সর্ব্বেশ্বরবাবু টাকা দিলেন, দারোগাবাবু টাকাগুলি গোণে নিয়ে বোল্লেন, "সকাল সকাল আহারাদি করুন। সন্ধ্যার সময় খালাস পাবেন।" এই বোলে একজন সিপাহীকে আহারাদির আয়োজন কোরে দিতে হুকুম দিলেন। গুড়, চিড়া আর দৈ দিয়ে সকলে ফলার কোল্লেম। খেতে খেতেই সন্ধ্যা হলো।

সন্ধ্যার পর দারোগাবাবু আমাদের তাঁর নিজ বাসায় নিয়ে গেলেন। বিশেষ সাবধান কোরে বোল্লেন, "কথা কইবেন না। চুপ কোরে থাকবেন।" এই বোলে দারোগাবাবু ফাঁড়ীতে গেলেন। ঝনাৎ ঝনাৎ দুম্ দাম্ একটা শব্দ হলো। সিপাহীরা চীৎকার কোরে উঠ্‌লো, "ডাকু ভাগ্ গিয়া,—ডাকু ভাগ্ গিয়া।" দারোগাবাবু চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন। সাহেব ছুটে এলেন। তিনি তম্বি গম্বি কোরে বোল্লেন, "বড়জাট শালা,

কেওয়াড়ী টোরা? কেস্‌টর্‌সে টোরা?—পাহাড় লোগ কাঁহা গিয়া? আদ্‌মী লোগ বহুত বডজাট, সব শালে কো এক কাট্রা জেল ডেটা। ইন্‌স্পেক্টর! তোম্‌ বি শালা বোড়ো না লায়েক আছে, জল্‌দি ডাকু কো কিনারা করে, বেগ্‌ড় টোম্‌কো ভি সিধা করে গা। ড্যাম নিগার নেটিভ। টোম্‌ বডজাট্‌ হুঁসিয়ার কাহে না হইলো?” সাহেব এই রকম তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে চোলে গেলেন। তখন চারিদিকে সিপাহীরা ডাকাত পাকড়ো কোত্তে ছুটলো। মহা রৈ রৈ কাণ্ড পোড়ে গেল।

গোল একটু থেমে গেলে দারোগাবাবু বাসায় এলেন। বোল্লেন, “এখন আপনারা যেতে পারেন। আর কোন ভয় নাই। সব দিক ঠিক হয়ে গেছে।” দারোগাবাবুকে সেলাম কোরে আমরা তখন শুভযাত্রা কোল্লেম। ফাঁড়ীর সীমানা ছাড়ালে তবে দুর্ভাবনা গেল। একটু দূরে গিয়ে ডুলী ভাড়া কোরে আমরা রওনা হোলেম।

নূতন শাসনে শান্তিরক্ষার যে নিয়ম চোলেছে, তাতে যে ফল হোচ্চে, তা ত চোকের সাম্‌নেই দেখ্‌তে পেলেম। আগে জান্‌তেম, শান্তিরক্ষকেরা প্রকৃতই আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। প্রবলের অত্যাচার হোতে দুর্ব্বলের মান, ধন, ধর্ম্ম রক্ষা কোত্তেই শান্তিরক্ষকেরা প্রাণপণ করেন। শান্তিরক্ষকের আশ্রয় নিলে তার কোন ভয় থাকে না; কিন্তু এখন বুঝ্‌লেম, শান্তিরক্ষা কেবল নাম মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই শান্তিরক্ষকের দ্বারাই কত অশান্তি ঘোটচে। এঁদের জ্বালাতে দেশের লোক আরও হাড়ে হাড়ে জ্বল্‌চে। সতীর সতীত্বনাশ চেষ্টা,—অর্থলোভে দোষীকে মুক্তি দেওয়া,—নির্দ্দোষীকে শাস্তি দেওয়া, মিথ্যা মকর্দ্দমা সাজিয়ে—সাক্ষী জুটিয়ে নির্দ্দোষীর সর্ব্বনাশ করাই শান্তিরক্ষকদের ব্রত। উপরের সাহেবের নাম কোরে এরা না করে এমন কার্য্যই নাই। যে সকল সত্যবাদী পরদুঃখকাতর শান্তিরক্ষকেরা সদত দুর্ব্বলের হিত চেষ্টা করেন, যাঁরা প্রকৃতই বিপন্নের বন্ধু, এই দলে পোড়ে তাঁদেরও কলঙ্কিত হোতে হয়েছে। আজ যে ঘটনা দেখ্‌লেম,—এরই নাম বুঝি শান্তিরক্ষা?

দ্বাত্রিংশ চক্র।

বুকিংবাবু।

আমরা সাহারণপুরে এলেম। যখন এখানে এসে পৌঁছিলেম, বেলা তখন ১টা। এখনো গাড়ীর অনেক সময় আছে। সন্ধ্যা ৬টার সময় গাড়ী ছাড়্‌বে। সমস্ত দিন অনাহার, এখানকার দোকানে বাসা নিয়ে রাঁধাবাড়া হলো। আহারাদি কোরে বেলা প্রায় ৫টার সময় ষ্টেসনে এলেম।

গাড়ীর তখনো সময় আছে। এই জন্যে মাষ্টারবাবু আমাকে আর সুশীলাকে একটী ঘরের ভিতর বোসতে বোল্লেন। ঘরের ভিতরে প্রবেশ কোত্তে দেখি, দরজার উপরে কি লেখা আছে। পোড়ে দেখ্‌লেম, কাঠের উপর বাংলায় লেখা আছে,—**ওপীক্ষা করিবার ঘর।** মনে মনে লেখকের যথেষ্ট প্রশংসা কোরে আমরা ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। এখন কোথায় যাব, তার স্থিরতা নাই। মশুরীর বাসায় মাষ্টারবাবুর মুখে শুনেছিলেম, এখন সকলে কলিকাতায় যাবেন। জান্‌বার মধ্যে জেনে রেখেছি, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কোথায় যাব, তার সঠিক সংবাদ কিছুই জানি না। সুশীলা আর আমি দুজনে গল্প কোচ্চি, এমন সময় মাষ্টারবাবু এলেন। বোল্লেন, "গাড়ী এসেছে। বেরিয়ে এসো।" মাষ্টারবাবুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এখন আমরা কোথায় যাব?" মাষ্টারবাবু উত্তরে বোল্লেন, "কলিকাতায়।"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ী এলো। আমরা সকলে গাড়ীতে উঠ্‌লেম। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়ার সঙ্কেতে ঘণ্টাধ্বনি হলো। কলগাড়ীর সাহেবেরা পোঁ বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমরা কলিকাতায় রওনা হোলেম।

তিনদিন ডাকগাড়ীতে আমরা ঘুরে ফিরে এলাহাবাদে এসে পৌঁছিলেম। এই তিন দিনের মধ্যে কেবল দুটী স্থানে আমরা নেমেছিলেম। তিন

দিনের মধ্যে ভাতের মুখ দেখ্‌তে পাই নাই, খাবারের উপর নির্ভর কোরেই এ তিন দিন কাটিয়েছি। মাষ্টারবাবু এখানে একবেলা অপেক্ষা কোরবেন স্থির কোল্লেন। কাজেও হলো তাই। পরমবিশ্বাসী হরকন্ বরাবর সঙ্গীদের কলিকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে রওনা হলো। থাক্‌লেম কেবল আমি, সুশীলা আর মাষ্টারবাবু।

আজ আমি রাঁধুনী। মাষ্টারবাবু নিজেই রাধ্‌তে যাচ্ছিলেন। আমাকে বোল্লেন, "তুমি কখনো এ সব কর নাই,—কিসে কি মস্‌লা লাগে, কখন্ কোন্ তরকারীতে কি দিতে হয়, কিছুই জান না। তুমি থাক, আমিই রাঁধ্‌চি।" আমি মাষ্টারবাবুকে নিবারণ কোরে বোল্লেম, "আগে জান্‌তেম না, এখন বেশ শিখেছি। মোটামুটী রান্না এক রকম শিখেছি।" এই বোলে আমি রাধ্‌তে গেলেম। সুশীলা সমস্ত যোগাড় কোরে দিতে লাগ্‌লো। ভাত, মুগের দাল, আর মাছের ঝোল রাঁধা হলো। মাষ্টারবাবু খেয়ে ধন্য ধন্য কোল্লেন; আনন্দিত হয়ে বোল্লেন, "এমন রান্না আর কখনো খাই নাই।" মাষ্টারবাবুর আহার হলো, আমরাও আহার কোল্লেম। আহারাদি শেষ হতে বেলা ১টা বাজলো। একটু বিশ্রাম কোরে আবার আমরা ৫টার গাড়ীতে কলিকাতার দিকে রওনা হোলেম।

সমস্ত রাত গাড়ীতেই কেটে গেল। সকলে আমরা নওয়াডী ষ্টেসনে এসে পৌছিতে না পৌছিতে চাপরাশীরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, "নওয়াডী,—ন—ও—য়া—ডী,—নওয়াডী, বিশ মিনিট ঠারেগা।" মাষ্টার-বাবু হাত মুখ ধুতে নাম্‌লেন। আমরা অনাবশ্যক বিবেচনায় গাড়ীতেই বোসে রইলেম। মাষ্টারবাবু একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। তার দরজাতেও লেখা আছে। ঘরটী প্রায় আমাদের সাম্‌নেই। তাতে লেখা বেশ পোড়্‌তে পাল্লেম। দেখ্‌লাম লেখা আছে,—

মনুষ্যদিগের মল ও প্রস্রাব করিবার ঘর।

মাষ্টারবাবু সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। অনেকক্ষণ বিলম্ব হলো। গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা পর্য্যন্ত পোড়ে গেল। মাষ্টার বাবু তখনো এলেন না। বড়ই চিন্তিত হোলেম। দরজায় মুখ বাড়িয়ে ব্যগ্র ভাবে মাষ্টার বাবুর আগমন প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম।—গাড়ী অল্প অল্প

চোল্‌তে সুরু হলো, মাষ্টারবাবু তখন ছুটতে ছুট্‌তে গাড়ীর কাছে এলেন! একজন খালাসী তাঁকে ধোরে' রাখ্‌লে। তিনি তখনো অনায়াসে গাড়ীতে উঠ্‌তে পাত্তেন, খালাসী উঠ্‌তে দিলে না। আমরা চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম, গাড়ীর হুস্ হুস্ শব্দে আমাদের ক্ষীণ আওয়াজ ডুবে গেল।

এখন করি কি? মাষ্টারবাবু নাই, এখন আমরা মুক্ত, কিন্তু অভি-ভাবকশূন্য! দুটীতে যুক্তি কোরে সাবধান হয়ে বোসলেম। মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, এখন করি কি?

দেখ্‌তে দেখ্‌তে—ভাব্‌তে ভাব্‌তে দু-তিনটে ছোট ছোট ষ্টেসন পেরিয়ে এলেম। গাড়ী মধুপুরে এসে থাম্‌লো। একজন ফিট্ ছোক্‌রা-বাবু আমাদের গাড়ীর কাছে এসে বোল্লেন, "এ গাড়ীতে হরিদাসী কার নাম?" আমি যেন থতমত খেয়ে বোল্লেম, "আমার নাম।" ছোকরাবাবু বোল্লেন, "নওয়াডীতে তোমাদের সর্ব্বেশ্বরবাবু গাড়ীতে উঠ্‌তে পারেন নাই। তিনি তোমাদের এখানে নেমে অপেক্ষা কর্‌বার জন্যে তারে সংবাদ দিয়েছেন। তোমরা নামো।" আমরা অগত্যা জিনিসপত্র নিয়ে নাম্‌লেম। নাম্‌তে নাম্‌তে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সর্ব্বেশ্বর বাবু কখন্ আস্‌বেন?" তিনি বোল্লেন, "আমি এখানকার ছোটবাবু। টিকিট বাবু!—বুকিং বাবু। আমি সর্ব্বেশরকে জানি। চলো, আমার বাসায় চলো। সেখানে আজ রাত্রে থাক্‌বে।" আমরা ছোট বাবুর সঙ্গে তাঁর বাসায় গেলেম। ষ্টেসনের সীমানার মধ্যেই ছোটবাবুর ঘর। দুখানা কুঠরী, শ্বেতখানা, রান্নার চালা, এক রকম ছোট খাট পরিবার নিয়ে থাকার উপযুক্ত। আমরা সেই বাড়ীতে চোল্লেম। ছোটবাবু এক-জন লোকের উপর আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে চোলে গেলেন। আমরা দুজনে হাত মুখ ধুয়ে বোসে রইলেম।

বেলা ১১টার সময় ছোটবাবু বাসায় এলেন। বেশ ভদ্রতা জানিয়ে বোল্লেন, "তোমরা যদি রাঁধ্‌তে জান, রাঁধ। আমিও ব্রাহ্মণ, এক পাকেই হবে। আর যদি না জান, তা হোলে আমার রসুয়ে মহারাজই রাঁধ্‌বে এখন।" আমি বোল্লেম, "চাকরকে যোগাড় কোরে দিতে বলুন, আমরা নিজেই রাঁধ্‌বো।" ছোট বাবু সেই রকম বন্দোবস্ত কোল্লেন। আমিই রাঁধলেম। যথানিয়মে আহারাদিও শেষ হলো।

ছোটবাবু বোল্লেন, "ঘরে বিছানা আছে শুয়ে থাক। আমি এখন ষ্টেসনে চোল্লেম।" আমরা দুজনে শুয়ে সুখ-দুঃখের ভাবনা ভাবতে লাগ্লেম। ছোটবাবু ষ্টেসনে গেলেন।

সন্ধ্যার সময় খাবার এলো। আমরা জল খেলেম। ছোটবাবুর ভদ্রতায় আমরা যার পর নাই বাধিত হোলেম। বিদেশে এমন সদাশয় ব্যক্তির আশ্রয় সকলেরই প্রার্থনীয়। সুশীলা বোল্লে, "দিদি! ছোটবাবু বেশ লোক! এত যত্ন পরকে কি কেউ কখন করে? যেমন গুণ, তেমনি রূপ!—চমৎকার চেহারা! এমন চেহারাটী প্রায় দেখ্তে পাওয়া যায় না। কি বলো দিদি?—তুমি কোথাও কি দেখেছ?" সুশীলার বর্ণনাটা আমার তেমন ভাল লাগ্লো না। রূপের পক্ষপাতী হওয়া—রূপের প্রশংসা করা বড় ভাল নয়। হয় বটে এমন, কোন অজ্ঞাত পুরুষকে দেখে কোন স্ত্রীলোকের,—কি কোন অপরিচিত স্ত্রীলোক দেখে কোন কোন পুরুষের মনের দর্পণে মাঝে মাঝে সেই দৃষ্ট-লোকের প্রতিবিম্ব পড়ে বটে, কিন্তু সে প্রতিবিম্বের কি উপাসনা করা উচিত? সেই অসার—ক্ষণস্থায়ী দর্পণের প্রতিবিম্ব দেখে কি বিচলিত হওয়া উচিত? অনেকে এই রূপের আগুনে পোড়ে প্রাণ হারায়—অনেকে এই রূপের কুহকে পোড়ে ত্রাহি ত্রাহি করে,—রূপের ফাঁদে পোড়ে অনেক সরল প্রাণ ব্যথা পায়, কিন্তু তাতেও সকলের চৈতন্য হয় না। যারা সংচারশিক্ষা পায় নাই, সংসার চিনে নাই,—তাহারাই রূপের মোহে পড়ে, কিন্তু আমরা এত দেখে শুনে—এমনতর কত সুখ দুঃখ ভোগ কোরেও যদি এই প্রলোভনের হাতে নিস্তার না পেলেম, তবে বহুদর্শনের গুণ রইল কোথা? সুশীলার কথার ভাবে বেশ বুঝ্লেম, সুশীলার হৃদয়দর্পণে ছোটবাবু প্রতিবিম্ব পোড়েছে। তাতেই সুশীলার উপর রাগ দেখিয়ে সাবধান করার ইচ্ছায় বোল্লেম, "সুশীলা! পর-পুরুষের গুণের বরং প্রশংসা কোত্তে পার,—কৃতজ্ঞতা দেখাতে পার, তাঁর রূপের প্রশংসা কেন সুশীলা?" সুশীলা উত্তর কোল্লে, "না, তা বোল্চি না। তবে ছোটবাবুর চেহারাটী দিব্য, তাই বোল্ছিলেম। সত্য কথা বলায় আর দোষ কি? তাতে যদি দোষ হয়,—তাতে যদি রাগ কর, তবে আর না হয় নাই বোল্লেম।" সুশীলা কথাটা চাপা দিলে বটে, কিন্তু এখন থেকে তার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখলেম, মনের ভিতর একটা খট্কা থাক্লো।

সন্ধ্যার পর ছোটবাবু এলেন। বেশ কোরে চেয়ে দেখ্‌লেম, ছোটবাবুর নজরও সুশীলার উপর পোড়েছে। এতদিন বাহ্যিক বিপদে পোড়ে কষ্ট পেয়ে আস্‌চি, শারীরিক কষ্টের একশেষ হচ্চে, আজ আবার যে নূতন ধরণের বিপদ! যে বিপদের বাড়া আর বিপদ নাই, সেই চিত্তবিকার-ঘটিত বিপদ! এ মহা মোহ যাবে কিসে, সেই ভাবনাই এখন প্রবল হলো। সুশীলা আমার ভয়ে মুখ ফুটে বোল্‌তে পাচ্চে না, ভাল কোরে চাইতে পাচ্চে না, কিন্তু তার চেষ্টা আছে, অবসর খুঁজে—অবসর পেলে ছোটবাবুকে দেখে নিচ্চে। মহা বিপদেই পোড়্‌লেম।

রাত্রে লুচি-পুরি খেয়ে কাটান গেল। আমরা দুজনে ছোটবাবুর ঘরে দরজা দিয়ে সাবধানে থাক্‌লেম, ছোটবাবু ষ্টেসনে গেলেন। সে রাত কেটে গেল। সকাল বেলা ৮।৯টা পর্য্যন্ত মাষ্টারবাবুর প্রতীক্ষা কোল্লেম। ৪।৫ খানা পশ্চিমের গাড়ী চোলে গেল। মাষ্টারবাবুর দেখা নাই। ছোটবাবু বেলায় এলেন। ইদারা আছে, আমাদের নাইতে বোল্লেন, নিজেও নাইলেন। আহারাদির আয়োজন হলো। আমি মাষ্টারবাবুর খবর জিজ্ঞাসা কোল্লেম। ছোটবাবু উত্তরে বোল্লেন, "কি জানি! কেন যে এলেন না, তার ত সন্ধান পেলেম না। বৈকালে একবার সন্ধান কোরে দেখ্‌বো।" সে বেলাও কথায় কথায় কেটে গেল।

সন্ধ্যাকালে এক্‌টী নূতন বাবুকে সঙ্গে কোরে ছোটবাবু বাসায় এলেন। নূতনবাবুর চেহারা দেখে বড় ভয় হলো!—তার চোক লাল,—পা টোল্‌চে,—চোলে যেতে ঘন ঘন টাল খাচ্চে, প্রলাপ বোক্‌চে! ছোটবাবু তাকে এক রকম ধোরেই আন্‌চে।

ছোটবাবু এসে বোল্লেন, "ইনি নওয়াডীর টিকিট বাবু। ইনি আমার বন্ধু লোক। এঁর মুখে শুন্‌লেম, মোশনের (গতি বা বেগ) সময় গাড়ীতে উঠ্‌তে চেষ্টা করায় তিনি রেলওয়ে কোম্পানির লাইবেল (আইন) মতে ফৌজদারী সোপরদ্দ হয়েছেন। তিন দিন পরে মকর্দ্দমা। মকর্দ্দমা শেষ না হোলে তিনি আস্‌তে পার্‌বেন না।" আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। মুখখানি শুকিয়ে গেল। কি যে করি, তা আর ভেবে চিন্তে স্থির কোরে উঠ্‌তে পাল্লেম না।

নূতনবাবু আমাকে ভাব্‌তে দেখে জড়ানে জড়ানে—ভাঙা ভাঙা,

ছোড়ভঙ্গ কথায় বোল্লে, "তাতে তোমাদের ভাবনা কি? ডিয়ারেষ্ট! (প্রিয়তম) রাজন থাক্‌তে ভয় কি তোমাদের? তোমাদের চেহারাই যে চমৎকার আশ্রয়। তোমরা আশ্রয় চইলে কোন্ শ্যালার ব্যাটা শালা আশ্রয় না দিয়ে থাক্‌তে পারে? আমি ত মাথায় কোরে রাখি। বিশ্বাস না হয়, এসো, আমি তোমাকে মাথায় কোরে নিতে রেডি (প্রস্তুত) আছি।" ইংরেজী বুক্‌নি দিয়ে কথা কওয়া রেলের বাবুদের রোগ। সুখের বিষয়, তারা যে সব ইংরেজী বলে, তা বুঝ্‌তে বড় কষ্ট হয় না। বিদ্যায় সকলে বৃহস্পতি কি না!

লোকটার কথা শুনে গা যেন জ্বলে গেল। মেয়েমানুষের সঙ্গে ইংরেজী বুক্‌নি দিয়ে কথা হোচ্ছে। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী কথাটার এরাই জ্বলন্ত উদাহরণ দিচ্চে। এর কাণ্ডজ্ঞান নাই। বেজায় মদের নেশায় একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। দাঁড়াতে পাচ্চে না, টোলে টোলে পোড়্‌চে। এর অবস্থা দেখে দুঃখও হলো। ছোটবাবুকে বোল্লেম, "ছোটবাবু, আপনার ভদ্রতায় আমরা বড়ই বাধিত হয়েছি, কিন্তু এমনতর লোক দিয়ে আপনি কেন যে আমাদের অপমান করাচ্চেন, তা বুঝ্‌তে পাচ্চি না। আমরা আশ্রয়হীনা বোলে এত তাচ্ছিল্যের পাত্রী নই, এটুকু বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে। আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপনার সঙ্গে এমনতর লোকের সংস্রবও দুঃখের বিষয়।" যে যেমন লোকই কেন হোক না, তার সাম্‌নে যদি তেমনি প্রশংসার মন্ত্র ফুঁকতে পারা যায়, তা হোলে তাকে নরম হোতেই হবে। আমার এই প্রশংসায় ছোটবাবু যেন গোলে গেলেন। আনন্দে অধীর হোলেন। আমার কথার কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। ঘাড়টী নীচু কোরে "না না, তা কিছু নয়। আপনারা কোন কিছু মনে কোর্‌বেন না।" এই রকম কথায় বুঝিয়ে নূতন লোকটীকে টেনে বাইরে নিয়ে গেলেন। সে কি যেতে চায়?—অনেক টানাটানি—হেঁচড়া-হেঁচড়ি কোরে তবে তাকে বাইরে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় মাতালটী শাসিয়ে শাসিয়ে বোলে গেল, "আচ্ছা!—থাকো। যদি আবার কখন আমার নওয়াডিষ্টেসনে পাই, তা হোলে এর শোধ তুল্‌বো! আমি রেলওয়ের একজন রেসপেক্টবল (মাননীয়) সারভেণ্ট (কর্ম্মচারী), আমাকে পাবার জন্যে কত লোক তপস্যা করে, কত মেয়েমানুষ আমার বাসার দরজায় গড়াগড়ি দেয়, আর তোরা দুজন বাঁদী,

আমার অপমান কোল্লি? এও কি প্রাণে সয়?—প্রাণ!—যাও—বেরিয়ে যাও বাবা! কোন দরকার নাই। বন্ধু!—রাজেন!—রাজেন! এই কি বন্ধুর কাজ? আমি দিলাম জুটিয়ে, একা একা মজা লুটতে লাগ্‌লি। আমি যদি শালাকে পুলিসে না ধোরিয়ে দিতেম, যদি তোকে নামিয়ে নিতে টেলিগ্রাফ (তারের খবর) না কোত্তেম, তুমি শালা কি কোরে এ রত্ন পেতে বাবা? এই কি ধর্ম্ম?—এই কি উচিত?" মাতালটা ভেউ ভেউ কোরে ভেব্‌ড়ী ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌লো।

মাতালের কথায় একটু উপকার হলো। মনে মনে জান্‌তে পাল্লেম, সর্ব্বেশ্বরবাবুকে ফৌজদারীতে দেওয়ার মূলাধারই এই মাতাল। এদের কর্ত্তব্যকার্য্য ভেবে তাঁকে পুলিসে দেয় নাই, মনে মনে খারাপ মৎলব ছিল, নিজেই তা প্রকাশ কোল্লে। ছোটবাবু আর মাতালে তলে তলে একটা কুমৎলব এঁচেছিল। মাতালটা যে বদ লোক, তা ত সাম্‌নেই দেখলেম, কিন্তু ছোটবাবুর কোন কুমৎলবের পরিচয় এখন পর্য্যন্ত পাই নাই। তা না পাই, কিন্তু আর বিশ্বাসও নাই। শত্রুর সহস্র সদ্ব্যবহারেও বিশ্বাস কোত্তে নাই। মাষ্টারবাবুর অদৃষ্টে যা থাকে থাকুক, আমরা দুজনে কলিকাতায় গিয়ে পোড়লে একটা না একটা উপায় হবেই। যেখানে ইংরেজের রাজধানী, সেখানে সহসা কেউ অত্যাচার কোত্তে সাহসী হবে না। এই যুক্তি স্থির কোরে সুশীলাকে জানালেম। সুশীলার কোনমতেই মত হলো না। সে সমানই বোল্‌তে লাগ্‌লো। মাষ্টারবাবুকে ফেলে যাওয়া ভাল হয় না। তিনি যেমনই হোন, আমাদের উপর তিনি ত কোন অত্যাচার করেন নাই. ফৌজদারীতে গেলেও তাঁর কিছু হবে না। দু এক দিনেই ফিরে আস্‌বেন। এ দু-এক দিন এখানেই অপেক্ষা করা যাক। মাতালটা যেমন লোকই হোক, ছোটবাবু বড় ভদ্র লোক—বড় ভালমানুষ। তাঁর আশ্রয়ে থাকলে আমাদের কোন অনিষ্ট হবে না। তুমি মিথ্যা মিথ্যা কেবল বিপদ ডেকে আন্‌চো। এক জন অভিভাবক না হোলে কি কলিকাতায় যাওয়া যায়? কত বড় বড় পুরুষ মানুষ একা যেতে সাহস করে না, তা তুমি আমি ত মেয়েমানুষ!" সুশীলা আমাকে বুঝালে ভাল। তবে যাই বোঝাক, কাজের গতিকে কিন্তু থাকতে হলো। সুশীলা মনের বাসনা পূর্ণ হলো দেখে বড়ই আনন্দিত হলো। ছেলেমানুষ,

পেটের কথা পেটের মধ্যে চেপে রাখা ত অভ্যাস নাই। প্রকাশ্য-ভাবেই বোল্লে, "দিদি! তুমি যে আমার মতে এই কাজটা কোল্লে, তাতে আমি বড়ই সুখী হোলেম।"

তিন দিন কাটালেম। সুশীলার নিত্য নূতন ভাবান্তর।—প্রাণ ত আমার শুকিয়ে গেল। এত দেশ ঘুরে এসে সুশীলা শেষে পরের প্রেমে উন্মাদিনী হলো। এত বাধা ব্যতিক্রম কোরে এসে, শেষে একজন বুকিংবাবুর প্রেমে মোজলো? হতভাগিনী সুশীলার প্রেমের পাত্র এখন একজন সামান্য বুকিংবাবু!

ত্রয়স্ত্রিংশ চক্র

গোষ্পদে জাহাজ ডুবি!

মাষ্টারবাবুর অপেক্ষায় আমরা মধুপুরের টিকিট-বাবুর বাসাতেই রইলেম। এক দুই কোরে প্রায় একপক্ষ গত হলো, তবুও মাষ্টারবাবু আর ফিরলেন না। তবে এখন করি কি? সুশীলা যে কুহকে পড়েছে, যে মহামোহে সে মুগ্ধ হয়েছে, সে মোহজাল ভেদ কোরে তাকে উদ্ধার করা নিতান্তই কঠিন কথা! সুশীলার ভাবান্তর দেখে আমি বড়ই ব্যথিত হয়েছি! যে হাস্যমুখী সুশীলা সরলতার প্রতিমা ছিল,—সেই সুশীলা এখন কপটতা শিখেছে। আগে ভাল হোক মন্দ হোক, মনের মধ্যে যখন যে কথাটী উঠ্‌তো, সুশীলা অকপটে তখনি তা না বোলে থাকতে পাত্তো না, কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা কোরেও কোন কথার উত্তর পাই না। সুশীলা এখন কেবলই ভাবে। কি যে ভাবে,—কি যে তার মনের গতি, তা আভাসেই বুঝ্‌তে পেরেছি। তবে এখন উপায় কি?

একদিন দুপর বেলা আহারাদি কোরে শুয়ে আছি। ছোটবাবু ষ্টেশনে গেছেন। আমরা দুজনে শুয়ে শুয়ে কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে পোড়েছি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি, তা জানি না, হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বোসে সুশীলাকে ডাকতে যাব, দেখি

সুশীলা নাই। দরজার দিকে চেয়ে দেখি, ঘরের দরজা বাইরের দিক থেকে বন্ধ আছে! ব্যাপার দেখে মনে বড় সন্দেহ হলো। আবার শুয়ে ভাব্‌তে লাগলেম,-সুশীলা গেল কোথা? অনেকক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দ পেলেম। আমিও অমনি কপটনিদ্রায় চোক বুজে পোড়ে থাকলেম। সুশীলা ঘরে ঢুকেই আবার দরজা বন্ধ কোল্লে। শুয়ে ছোট ছোট কোরে দুবার ডাক্‌লে, "দিদি!" আমি কোন উত্তর কোল্লেম না। কপট নিদ্রাতেই থাকলেম। দেখি ব্যাপারটা কি!

অনেকক্ষণ পোড়ে থেকে উঠলেম। সুশীলাকে ডাকলেম। সুশীলা যেন কতই ঘুমিয়েছে, এমনিতর ভাব দেখিয়ে উঠলো। আপনা হতেই বোল্লে, "আঃ—বড় ঘুমিয়েছি,—অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। এমন ঘুম, কিছুই জান্‌তে পারি নাই।" প্রথমে মনে ভেবেছিলেম, সুশীলা হয় ত পাইখানায় কি অন্য কোথাও গিয়েছিল। সে যদি তার দরজা খোলার কারণ বোল্‌তো, তা হোলে কোন মন্দ কথা মনে স্থান পেত না, কিন্তু যখন সব কথা গোপন কোল্লে, তখন মনের মধ্যে সন্দেহ হবারই কথা।

বিষয়টী বড় আশ্চর্য্যজনক! এত পরিবর্ত্তন যে একজনের স্বভাবে হয়, তা আগে জান্‌তেম না। অবৈধপ্রেমে উন্মত্ত হোলে মানবের স্বভাব কি এতই পরিবর্ত্তিত হয়? যে স্বভাবতই সরলা, সেই সরলতার এত কাপট্য—এত প্রবঞ্চনা এসে জুটে যায়? বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! মনে মনে তত্ত্ব জান্‌বার সঙ্কল্প স্থির কোরে সুশীলাকে আর তখন অন্য কোন কথা বোল্লেম না,—দেখি, আরও কতদূর কি হয়। কিন্তু মনে বড় দুঃখ হলো। সুশীলা কোল্লে কি? বড় বড় বিপদের সমুদ্র পার হয়ে শেষে গোষ্পদে জাহাজ ডুবালে? বড় বড় প্রলোভনের পর্ব্বত অনায়াসে অতিক্রম কোরে ক্ষুদ্র বল্মীকের আঘাতে কাতর হয়ে পোড়লো? মোহ! ধন্য তোমার আকর্ষণ!—ধন্য তোমার খেলা! সুশীলা যে এমন হবে, তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না। মনে মনে বেশ জান্‌তেম, জগতের তাবৎ বাধা,—তাবৎ প্রলোভন,—অত্যাচার আমাদের উপর চেপে পোড়লেও আমাদের মনকে বিচলিত কোত্তে পারবে না।—কিন্তু এখন এ কি দেখি! সুশীলার মনে এতও ছিল? সে অহঙ্কার এখন কোথায়?

লোকের মনের ভাব দুরকম। একরকম লোক আছে, যাদের মনের বন্ধন বড় দৃঢ়। তাদের মনের বন্ধন সহজে শিথিল হয় না। বিশেষ

চেষ্টা কোল্লেও তাদের মন বিচলিত হয় না। কর্ত্তব্যকে তারা দৃঢ় রাখ্‌তে পারে। শত চেষ্টা কোল্লেও তাদের মনের দর্পণে ছায়া পড়ে না;—মনের উপর একটী দাগও দিতে পারা যায় না। আর এক রকম লোক আছে, তাদের হৃদয়ের বন্ধন নাই। যখন যেটী দেখে, মনের মধ্যে সেইটীকেই দৃঢ় করে। যা শোনে, সেইটীকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তাদের হৃদয় বিচলিত করা বড়ই সহজ। এই রকম প্রকৃতির লোক যারা, তারাই সংসারে বড় দুঃখ পায়, বারম্বার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হৃদয়কে চালিত কোরে মনের স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তিটীকে নষ্ট করে, কোন স্থায়ী বিষয়ে তারা মন দিতে পারে না। সুশীলার মনের গতিও এই রকম। তাতেই অতি সহজে ছোটবাবুর রূপে সে মোহিত হয়েছে। হতভাগিনী সংসার চিনে নাই; চিন্‌তে চেষ্টাও করে নাই, তাই এত সহজে বাহ্যদৃশ্যে মোহিত হয়ে ছোটবাবুকে প্রাণ দিয়েছে। হৃদয়ে ছোটবাবুকে এনে বসিয়েছে। যে রকম ভাব দেখ্‌ছি, তাহাতে সহজে সে যে মনের এ প্রবৃত্তি দমন কোত্তে পারবে, তাও বিশ্বাস হোচ্চে না। এখন উপায় কি!—করি কি?

আরও তিনদিন গত হলো। রোজ রোজই দুজনে দুপর বেলা শুয়ে থাকি। মিছামিছি ঠাট কোরে ঘুমিয়ে পড়ি, কিন্তু কোন কিছুই সন্ধান পাই না। এই রকম ভাবেই তিনদিন গত। চারি দিনের দিন সন্ধান পেলেম। আমি যেন ঘুমিয়ে আছি,—অকাতরেই যেন ঘুমুচ্চি, এই রকম ভাব দেখিয়ে শুয়ে আছি। ধীরে ধীরে সুশীলা উঠ্‌লো। ধীরে ধীরে বোল্লে, "দিদি! ও দিদি! ঘুমিয়েছ কি?" আমি আরও এঁটে সেঁটে শুয়ে রইলেম, কথা কইলেম না। আবার আর একবার ডেকে দেখ্‌লে। কোন সাড়া দিলেম না। শেষে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বা'র দিক থেকে দরজা টেনে দিলে।

আমিও উঠলেম। প্রথমটা দরজা খুল্‌তে সাহস হলো না। শেষে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে এলেম। দেখি, রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনে কি কথাবার্ত্তা হোচ্ছে। আমি দরজা খুল্‌তেই ছোটবাবু ভোঁ কোরে বেরিয়ে গেলেন। সুশীলা থতমত খেয়ে ঘাড়টী নীচু কোরে দাঁড়িয়ে রইল। সুশীলাকে ডাকলেম, কোন উত্তর পেলেম না;—শেষে নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে সুশীলার হাতখানি ধোরে নিয়ে এলেম। বিছানায় বসালেম। সুশীলা কেঁদে আমার পা দুখানি ধোরে বোল্লে, "দিদি!

আমার ঘাট হয়েছে। আমাকে এবার রক্ষা কর। না বুঝ্‌তে পেরে একটা কাজ কোরে ফেলেছি, মনে কিছু কোরো না।”

সুশীলাকে বুঝিয়ে—মুখ মুছিয়ে দিয়ে বোল্লেম, “কান্না কেন সুশীলা? যে কাজ কোরে বোসেছ, তাতে আর কথা কি? এমন কি আর কেউ করে না? তবে আর কান্না কেন? চুপ কর।” এই রকম প্রবোধের কথায় সুশীলাকে তখন থামালেম।

সন্ধ্যার সময় যথানিয়মে খাওয়া হলো। যথানিয়মে আমরা দুজনে শয়ন কোল্লেম। ছোটবাবু লজ্জায় কোন কথা বোল্‌তে পাল্লেন না, আমিও কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। তখন প্রয়োজন ও বিবেচনা হলো না।

বৈকালে যে ধরণের কথায় সুশীলাকে বুঝিয়েছি, সে সব কাজের কথা নয়।—মন বুঝানো কথা। তখন কোন উপদেশের কথা বোল্লে কোন ফলও হতো না। সময় বুঝে উপদেশ দিলে, সে উপদেশে যেমন কাজ হয়, ঘটনার পরেই উপদেশ দিতে গেলে সে উপদেশ তেমন বিফল হয়। এটী জানা ছিল বোলে তখন কোন কথা বলি নাই। যাতে সুশীলা আর না ভাবে, আর না কাঁদে, তখন সেই ভাবের কথাই বোলেছিলেম। এখন সময় বুঝে কাজের কথা বোল্‌তে সুরু কোল্লেম। আমি বোল্লেম, “সুশীলা! আমি তোমার দিদি, দিদি বোলেই তুমি আমাকে ডাকো; কিন্তু দিদির মত কি ভালবাস? দিদির মত কি মান্য কর?” সুশীলা বোল্লে, “এ কথা কেন দিদি জিজ্ঞাসা কোচ্চো? যদি ভালই না বাস্‌বো, মান্যই না কোরবো, তবে তোমার সঙ্গে দেশে দেশে বেড়াচ্চি কেন?” আমি বোল্লেম, “বেশ! আচ্ছা, দিদির কাছে মিথ্যা কথা বোল্‌তে নাই, তা জান?” সুশীলা অকপটে বোল্লে, “জানি।” আমি তখন গোড়া বেঁধে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “সুশীলা! সত্য বল, আমার কাছে মিথ্যা বোল্‌তে নাই। ছোটবাবুকে তুমি কি ভাবে দেখ্‌চো? এখান থেকে যেতেই বা তোমার অমত কেন?” সুশীলা অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে—একটা নিশ্বাস ফেলে বোল্লে, “তা আমি জানি না। কেন যে এখান থেকে যেতে মন সরে না, তা জানি না। তবে এখান থেকে অন্য কোন জায়গায় যেতে আমার ইচ্ছা নাই। অন্য কোথাও গেলে আমি হয় ত সেখানে থাকতে পারবো না!—হয় ত বড় কষ্ট

পাবো! দিদি! তুমি যাই মনে করো, আমি কিন্তু যাব না। তোমাকেও বলি দিদি, তুমিও আর যেও না। ছোটবাবু বোলেছেন, চিরকাল তিনি আমাদের খেতে পোরতে দিয়ে কাছে রাখবেন, তবে আর ভাবনা কি দিদি? পথে পথে বিপদের সঙ্গে ছুটাছুটি না কোরে এক জায়গায় দুজনে কেন মনের সুখে থাকি না?—সে কি ভাল নয়?”

সুশীলার মনের কথা জান্‌তে আর বাকী রইল না। বড়ই দুঃখ হলো। সুশীলাকে বোল্লেম, “সুশীলা! সংসারের কিছুই ত তুমি জান না। ছোটবাবুর ক্ষমতা কি যে তিনি আজীবন আমাদের প্রতিপালন কোত্তে পারেন? তাঁর বাড়ী কোথা,—আয় কি,—কি কোরে তিনি আমাদের খরচ যোগাবেন, এ সংবাদ কি কিছু জান তুমি? মুখের কথায় বিশ্বাস কি? যদি কাল তোমাকে তাড়িয়ে দেন, তখন তোমার কি গতি হবে? পরের ভাসা ভালবাসার দশাই এক রকম। প্রথমটা বড় জম্‌কালো বোধ হয়। পরের মেয়েকে যারা ঘরের বাহির কোত্তে চায়, তাদের কথা—তাদের মন-ভুলানো কথায় বিশ্বাস যে করে, তার মত মূর্খ সংসারে আর কে আছে? যারা পরের মেয়েকে খারাপ চোকে দেখে, তাদের সঙ্গে কুকুর-শিয়ালেরও তুলনা হয় না। তারা মানুষ নয়—পশুর অধম। তুমি সেই কথায় বিশ্বাস কোরেছ? এখন ত তোমাকে আকাশের চাঁদ হাতে দেবেই,—বড় বড় লম্বা লম্বা সুখের ছবি দেখাবেই, কত মনভুলানো—প্রাণজুড়ানো কথা শোনাবেই; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হোলে তখন একবার ফিরেও চাইবে না। এখন আমরা যে যেখানে ইচ্ছা যাই, সে কেবল আমাদের সতীত্বের বলে। স্ত্রীলোকের সাহস, বল, বিক্রম সবই সতীত্ব। এই বল যে দিন হারাবে, সে দিন তোমার কষ্টের সীমা থাকবে না। কোন স্থানে যেতে তোমার সাহস হবে না। কেবল কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে দেশে দেশে কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে। সাধু লোক দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দিবে, কোন ভদ্রপরিবারের মধ্যে দাসীভাবেও স্থান পাবে না। ইন্দ্রিয়সেবকগণ দুই একদিন কু-ইচ্ছা পরিপূর্ণ করবার জন্য স্থান দিলেও বেশী দিন রাখ্‌বে না। কেন পরের জন্যে কষ্ট পাবে? এরা এনেছে কু-ভাবে। নওয়াডীর টিকিটবাবু এখানকার ছোটবাবুকে তারে খবর দেয়, এখানকার ছোটবাবু আমাদের রূপ দেখে মন্দ অভিপ্রায়েই নামিয়ে নেয়। এসব

কথা ত জান? ছোটবাবু সদভিপ্রায়ে অনাথা আশ্রয়হীনা দেখে আমাদের আশ্রয় দেন নাই, স্ত্রীলোক বোলে খাতির যত্ন কোচ্চেন, আদর অপেক্ষা কোচ্চেন—আমাদের রূপে। তুমি কি তাদের সেই কু-মৎলবকে বাড়তে দেবে? বিনা বাধায় পাপীদের পাপকাজে লিপ্ত হবে? নিজে পাপকাজ কোরবে? যাদের গোড়ার মৎলবই কু, যারা প্রথম হতে কু-মৎলবেই আমাদের রেখেছে, তাদের ভদ্রতা একবার ভেবে দেখ না কেন? তাদের কাছে কতদূর ভাল ব্যবহারের প্রত্যাশা করা যেতে পারে, তা ভেবেই কেন দেখ না? কেন পরের প্রেমে নিজের সর্ব্বস্ব খোয়াতে বোসেছ? তুমি বিধবা নও, শুনেছি রাজার মত স্বামী আছেন। আমি প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্‌চি, আমার ভাগ্যে যা হয় হবে, তোমাকে আমি এ মাসের মধ্যেই তোমার স্বামীর হাতে সঁপে দিব। স্বামীর প্রেমে পরম সুখেই থাকবে। কেন তুচ্ছ প্রেমের জন্যে পরকাল নষ্ট কোরবে? চলো, কালই আমরা চোলে যাই।”

আমার সমস্ত কথাগুলি সুশীলা বেশ মনোযোগ দিয়েই শুন্‌লে। অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে—শেষে বোল্লে, “দিদি! তুমি যা বোল্লে, সব সত্য, কিন্তু আমার যে মন বুঝ্‌চে না। আমি নিজে নিজে অনেক চেষ্টা কোরেছি, কিন্তু কিছুতেই আমার মনের এ বেগ সাম্য হোচ্চে না। আমি অনেক ভেবে চিন্তে স্থির কোরেছি, পরকালে, কি দুদিন পরে অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে, আমি এ আশা ত্যাগ কোরবো না। তুমি যদি না থাকতে চাও, যাও, আমি কিন্তু যাব না। সত্য কথা বোল্‌তে বোলেছ বোলেই বোল্‌চি, এ সুখের পরিবর্ত্তে তোমার ভালবাসাও আমি ভুল্‌তে প্রস্তুত আছি। এতেই তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ, আমার মনের গতি কেমন। আমি জানি না,—প্রকাশ কোরে বোল্‌তে পারি না, আমার মন কেন এমন হয়েছে। আমি পরকালের ভাবনা—ইহকালের ভাবনা—সকল ভাবনাই ভেবে দেখেছি। এ সুখের কাছে সে সব বাধা দাঁড়াইতে পারে না। দিদি! তোমার পায়ে ধরি, আমাকে আর নিবারণ কোরো না। আমাতে আর আমি নাই। তোমার উপদেশ সবই বিফল হবে। কেন তবে মিছামিছি আর উপদেশ দাও? আমি প্রাণ দিতে পারি, তবুও এ আশা ত্যাগ কোত্তে পারি না। আমাকে ছেড়ে দাও। আর বাধা দিও না।”

মনে বড় রাগ হলো। মনের একটা প্রবৃত্তিকে যে দমন কোত্তে না পারে, এমনতর লোক সঙ্গে রেখে ভাল কাজ করি নাই। বিধাতাই কেবল রক্ষা কোরেছেন। আগে অনেকে অনেক চেষ্টা কোরেছে, অনেক প্রকার প্রলোভন দেখিয়েছে,—অনেক যাতনা দিয়েছে, তবুও সুশীলার মন বিচলিত হয় নাই। আর আজ সামান্য ঘটনায় সুশীলার মন এমন বিগ্‌ড়ে গেল? গোষ্পদে আজ জাহাজ ডুবলো?

সুশীলাকে রাগে রাগেই বোল্লেম, "সুশীলা! তোমাকে সঙ্গে এনে ভাল কাজ করি নাই। তুমি তোমার নিজের সর্ব্বনাশ কোল্লে, আমাকেও পতাকগ্রস্ত করালে। তোমাকে সঙ্গে না আন্‌লে পাষণ্ড ছোটবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হতো না, এমন কোরে তোমার পোড়া কপালও পুড়্‌তো না। ধোরতে গেলে, আমিই এই পাপের মূল। আমাকেই নরকে যেতে হবে যাক, সে কথায় আর কাজ নাই। আমি তোমাকে এইবার শেষ জিজ্ঞাসা কোচ্চি, তুমি আমার সঙ্গে কাল এখান থেকে যেতে প্রস্তুত আছ কি না?" সুশীলা কোন উত্তর দিতে পাল্লে না, চুপ কোরে রইলো। আমি আবার সেই সময় চড়া কথায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আর লজ্জা কেন?—ভয়ই বা কারে? যে কাজ কোত্তে বোসেছ, তাতে লজ্জা, ভয়, মান, ঘৃণা সব ত্যাগ কোত্তে হবে। জগতের সাম্‌নে মাথার কাপড় ফেলে দাঁড়াতে হবে। আমাকে তবে আর লজ্জা কেন? স্পষ্ট বল। আমি সেই রকম কাজ করি।" রাগেই যে চড়া চড়া বোল্‌চি, তাও নয়। এতে আমার একটা অভি-সন্ধিও আছে। উপদেশে ত কিছু ফল হলো না, দেখি, ভয় দেখিয়ে. চড়া-কথায় কিছু ফল হয় কি না। এই আশাতেই চড়া-কথায় সুশীলাকে প্রশ্ন কোল্লেম।

সুশীলা এবারও নীরব। কেবল কাঁদচে।—মুখে কথা নাই। অনেক জিদাজিদির পর বোল্লে, "দিদি! আর আমাকে কোন কথা বোলো না। আমি—আমি—আর যাব না।"

"বাঁচ্‌লেম। স্পষ্ট জবাব পেয়ে বাঁচ্‌লেম।" তখনি উঠে সুশীলার সমস্ত টাকাগুলি বুঝিয়ে দিলেম। জিনিসপত্র সবই থাকলো, টাকা থেকে কেবল পাঁচটী টাকা নিয়ে বোল্লেন, "এই টাকা পাঁচটী আমি ধার নিলেম। যদি এখানে থাক, তবে পাঠিয়ে দিব, না থাক; তাও

পাবে। আমি তোমার সন্ধান রাখ্‌তে ত্রুটি কোর্‌বো না। তুমি কিন্তু আমাকে বেশ শিক্ষা দিলে। আমি তবে বিদায় হই।" সুশীলা আরও কেঁদে উঠ্‌লো। কেঁদে কেঁদে পেট ফুলিয়ে ফেল্লে;—বোল্লে, "দিদি! আজ থাকো;—আজ যেও না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।" আমি কোন কথা গ্রাহ্য না কোরে বেরুলেম। সুশীলা প্রণাম কোল্লে। আমি রাগে কেমনতর হয়ে গেছি, চেঁচিয়েই আশীর্ব্বাদ কোল্লেম;—বোল্লেম, "আশীর্ব্বাদ করি, এই বৎসরের মধ্যেই যেন তোমার মরণ হয়।"

আমি ষ্টেশনে এলেম। সুশীলা সজলনয়নে কাতর হয়ে আমার দিকে চেয়ে জোড়হাতে ক্ষমা চাইতে লাগ্‌লো, ফিরে আস্‌তে অনুরোধ কোত্তে লাগ্‌লো, আমি ফিরেও চাইলেম না। একেবারে ষ্টেশনে এলেম। ছোটবাবুও অনেক অনুরোধ কোল্লেন। আমি সে কথাও গ্রাহ্য কোল্লেম না। কলিকাতার টিকিট নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লেম। যেতে যেতে কেবলই মনে হতে লাগ্‌লো, সুশীলা কোল্লে কি? বিধাতার মনে এতও ছিল? সুশীলা বড় বড় বিপদ অতিক্রম কোরে শেষে এই কোল্লে? প্রবাদবাক্য আজ প্রত্যক্ষ জান্‌লেম। এরই নাম, গোষ্পদে জাহাজ ডুবি!

চতুস্ত্রিংশ চক্র।

চাঁদরাণী।

গাড়ীতে উঠেছি।—টিকিট কিনেছি।—গাড়ীও চোলেছে। এখন ভেবে দেখ্‌লেম, যাই কোথা? প্রথমে রাগে রাগেই বেরিয়ে এসেছি, রাগে রাগেই গাড়ীতে উঠেছি, গাড়ীতে উঠে মনে হলো, এখন আমি যাই কোথা? মাষ্টারবাবু কলিকাতায় যাচ্ছিলেন, সেখানে অবশ্যই তাঁর জানা-শুনা ছিল,—আমাদের নিয়ে তিনি সেইখানেই যেতেন; কিন্তু এখন আমি যাই কোথা? কলিকাতায় কখনো যাই নাই,—কেমন

স্থান, কথনো চোকেও দেখি নাই, কারও সঙ্গে জানা-শুনা নাই, আলাপ-পরিচয় নাই, তবে আমি এখন যাই কোথা? গাড়ী সমান-বেগেই চোলেছে, ষ্টেশনে ষ্টেশনে নিয়মিতই থাম্‌ছে, আবার যাচ্চে, আমি কেবল বোসে বোসেই ভাব্‌ছি। গাড়ীর সকলে গল্প-গুজোব কোচ্চে,—কেউ বা ঘুমুচ্চে, আমিই কেবল নীরবে বোসে ভাব্‌ছি। আমি এখন যে ভাবনা ভাব্‌ছি, অন্য ভাবনা তার কাছে অতি সামান্য। এই ভাবনাই এখন গুরুতর হয়েছে। এখন উপায় কি? যাই কোথা?

সমস্ত রাত গেল। হুগলি ষ্টেশনে ভোর হয়ে গেল। শুন্‌লেম, কলিকাতা আর অধিক দূরে নয়। যত নিকটে যাচ্চি,—ততই ভাবনা চিন্তা যেন চেপে এসে পোড়্‌চে। দুটা চোকের জলে বুক ভেসে যাচ্চে, আপনার ভাবনায় আপনি যেন ডুবে রয়েছি। আমি যে গাড়ীতে আছি, শ্রীরামপুরে একটী স্ত্রীলোক সেই গাড়ীতে উঠ্‌লেন। স্ত্রীলোকটীর বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। রং ফর্সা, ভয়ানক মোটা। চেহারাটা আছে যেন ভালই ছিল, বয়স ভারী বোলে এখন আর তেমন লাবণ্য নাই। চুলও জায়গায় জায়গায় পাক ধোরেছে। তবুও সেই আধপাকা চুলে দিব্য খোপাবাঁধা আছে। কানে আটটা সার-করা মাকড়ী, হাতে টক্‌টোকে গিনীসোনার বালা আর অনন্ত। পরণে একখানি চওড়া শান্তিপুরে সাড়ী। মাথায় কিন্তু সিঁদুর নাই,—সঙ্গেও লোক নাই।

স্ত্রীলোকটি গাড়ীতে উঠেই আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন, "তুমি কোথা যাবে বাছা?" আমি কোন কথা কইলেম না, কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। স্ত্রীলোকটীর যেন দয়া হলো। সোরে এসে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কাঁদ্‌চো? সে কি গো?—কাঁদ্‌চো কেন?—কোথা যাবে তুমি?" আমি ভাব্‌লেম, এঁকে সব কথা খুলে বোল্লে হয় ত কোন উপায় হোলেও হোতে পারে। এই ভেবে আমি বোল্লেম, "আমার যাবার স্থান নাই। কোথায় যে যাব, তাহারও ঠিক নাই, আমার আর কেউ নাই।" স্ত্রীলোকটী আমার প্রাণের কথা ভালরকম বুঝ্‌তে পল্লেন না। ভাসা ভাসা মন্দভাবে, বুঝে বোল্লেন, "তা মা, পরের প্রেমে মোজ্‌তে গেলে শেষে ত এই রকমই কাঁদতে হয়!

তা তখন বুঝে দেখো নাই কেন? যার সঙ্গে তুমি এসেছিলে, সে কোথায়?" হা কপাল! যাকে বলি, সেই এই রকম মন্দ ভাবে? এই কি সংসারের রীতি? আমি বোল্লেম, "মন্দ ভাব ভেবো না। আমি পশ্চিমে ছিলেম। আমাদের বাড়ী উত্তরদেশে। দাদার সঙ্গে দেশে যাচ্ছিলেম। দেশের নাম শুনেছি, নাম জানি, কিন্তু কখনো দেশে যাই নাই। পশ্চিম দেশেই আমার জন্ম, এতদিন ছিলেমও পশ্চিম দেশে। আস্‌তে রাস্তার মধ্যে দাদা গাড়ী থেকে নেমে পাইখানায় গেলেন, আর উঠ্‌তে পাল্লেন না। আমিও কোথায় নাম্‌বো, না জান্‌তে পেরে বরাবরই গাড়ীতে বোসে আছি।" স্ত্রীলোকটীর যেন দয়া হলো—বোল্লেন, "তার জন্যে আর ভাবনা কি? কলিকাতায় চলো। আমার বাড়ীতে থাক্‌বে। শেষে তোমার দাদাকে খবর দিয়ে আমার বাড়ীতে আনাবো। আর কেঁদো না!—চুপ করো! হাবড়া ষ্টেশনে গিয়েই তোমার দাদাকে তারে খবর দিব। কোন ভাবনা নাই তোমার। আর কেঁদো না।" স্ত্রীলোকটী যথার্থই দয়াময়ী! আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বোল্লেম, "মনেও ছিল না যে, কোন স্থানে আশ্রয় পাব। তুমি আমার মায়ের মত কাজ কোল্লে। আজ থেকে তুমি আমার মা।" স্ত্রীলোকটীও এর উপযুক্ত উত্তর দিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট কোত্তে ত্রুটি কোল্লেন না।

গাড়ী হাবড়া ষ্টেশনে এসে লাগ্‌লো। বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা দুইজনে নাম্‌লেম। একখানা গাড়ী কালীঘাট পর্য্যন্ত ভাড়া কোরে—আমাকে তার ভিতর বোস্‌তে বোলে—আমার আশ্রয়দাত্রী আবার ষ্টেশনে গেলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে বোল্লেন, "হয়েছে। তারে খবর দেওয়া হয়েছে। সর্ব্বেশ্বরবাবু নিশ্চয়ই দুই তিন দিনের মধ্যে আমার বাড়ী যাবেন।" এই বোলে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। গাড়ী কালীঘাটের দিকে চোল্লো। সর্ব্বেশ্বরবাবুর নাম আমিই বোলে দিয়েছিলেম।

বেলা একটার সময় গাড়ী কালীঘাটে এসে থাম্‌লো। আমার আশ্রয়দাত্রী আমাকে সঙ্গে কোরে এক্‌টা দোতালা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। বাড়ীটী তেমন বড় নয়। উপরে নীচে সাতখানি ঘর। বাড়ীতে আরও চারি পাঁচটী মেয়ে দেখ্‌লেম। প্রথমে

ভাব্লেম, এরা এই বাড়ীরই মেয়ে। শেষে তাদের চেহারা দেখে, ভাব-ভঙ্গী দেখে, এ কথা মনে দাঁড়ালো না। মেয়েদের উপরে বড়ই সন্দেহ হইল।

আমরা বাড়ীর ভিতর যেতেই সকলে এসে ঘিরে দাঁড়ালো—সকলেই এক সময়ে অসংখ্য প্রশ্নরাশি বর্ষণ কোত্তে লাগ্লো! শেষে আমার আশ্রয়দাত্রীর ইঙ্গিতে অগত্যা তারা চুপ কোল্লে। তখন সকলেরই আহারাদি হয়ে গেছে, কাজেই বাড়ীর বেহারা আড্ডা থেকে ভাত আনিয়ে দিলে। আড্ডা যে কি রকম জিনিস, তা তখন বুঝ্লেম না, শেষে জান্তে পাল্লেম, এক একজন ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যস্থানে ভাতের দোকান করে। লোকে নগদ পয়সা দিয়ে খেয়ে যায়। কেউ বা নিয়মিত খায়, মাস মাস টাকা দেয়। আরও শুন্লেম, এখানকার অল্প বেতনের চাকরেরা প্রায়ই আড্ডায় খান। আড্ডার ভাত খেতে বড় ঘৃণা হলো, কিন্তু করি কি, পেটের দায়ে তখন তাই খেলেম। আহারাদি শেষ হোতে সন্ধ্যা হলো।

আমার আশ্রয়দাত্রীর নামটী এখনো জান্তে পারি নাই। সন্ধ্যার সময় বেহারার মুখে শুন্লেম, তাঁর নাম চাঁদরাণী। নাম্টা জেনে রাখ্লেম।

সন্ধ্যার সময় সব মেয়েরা গা ধুয়ে—ভাল ভাল কাপড় পোরে—গয়না পোরে—মুখে সাদা সাদা কি গুঁড়ো দিয়ে রং ফর্সা কোরে—রাস্তার বারান্দায় দাঁড়ালো, তামাক টান্তে লাগ্লো, গান গাইতে লাগ্লো, রকম রকম অকথ্য অশ্লীল কথায় থেকে থেকে চীৎকার আরম্ভ কোল্লে। এদের কাণ্ড-কারখানা দেখে আমি ত আর নাই।

একটু রাত হোতেই দু-একটী ফর্সা কাপড়পরা মানুষ এই বাড়ীতে দেখা দিলেন। ক্রমে গান বাজ্না আরম্ভ হলো—মদের খেয়ালে চীৎকার আরম্ভ কোল্লে। আমি রাত্রে খাবার খেয়ে শুয়েছি, কিন্তু ঘুম আস্ছে না,—একবার তন্দ্রা আস্চে,—আবার এদের চীৎকারে তখনি ঘুম ভেঙে যাচ্চে। বাবুর দল সমস্ত রাতই প্রায় এই রকম কোরে কাটালেন।

এদের শাসন কর্‌বার কি কেউ নাই? এদের কাণ্ড দেখে, কথাবার্ত্তা শুনে—এরা যে ভদ্রবংশে জোন্মেছে, এমনটী ত বোধ হয় না।

যারা মানের ভয় রাখে,—মাথার উপর যাদের মুরুব্বী আছে,—সমাজকে যারা ভয় কোরে চলে,—ঘৃণা-লজ্জা যাদের মনে একটুকুও স্থান পেয়েছে, তারা কখনই এতদূর ঘৃণিত কাজ কোত্তে পারে না। এরা যা, তা বুঝ্‌তেই পেরেছি। চাঁদরাণী যা, তাও বুঝ্‌তে বাকী নাই। প্রাণের ভিতর বড় আতঙ্ক হয়েছে। তবে মনে বেশ জানি, এ দেহে প্রাণ থাক্‌তে আমার কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ কোত্তে পারবে না।

সে রাত কেটে গেল। সকালে উঠে দেখ্‌লেম, মেয়েরা অকাতরে ঘুমুচ্চে। সমস্ত রাত জেগে এখন এরা তাই শোধ তুল্‌চে। চাঁদরাণী উঠেছে। আমাকে ডেকে বোল্লেন, "হাত মুখ ধুয়ে, চলো গঙ্গায় নাইতে যাই। সকাল সকাল কালীদর্শন কোরে আসি। বেলায় বড় ভিড় হয়।"

অনেক দিন থেকে কালীদর্শনের বাসনা ছিল। কালীঘাটের মা কালীকে দর্শন কোত্তে কত দেশদেশান্তরের লোক আসে। শুনতে পাই, এমন জাগ্রত দেবতা কলিতে আর নাই। এঁর কাছে প্রার্থনা কোল্লে, সে প্রার্থনা বিফলে যায় না। এই শোনাকথায় বিশ্বাস কোরে মনে মনে স্থির কোল্লেম, মায়ের কাছে একবার মনের কথা—প্রাণের ব্যথা জানাবো। দেখি, হতভাগীর প্রতি তাঁর দয়া হয় কি না। সন্তানের এ দুঃখ কষ্ট নিবারণ করেন কি না।" এই রকম ভেবে—তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে চাঁদরাণীর সঙ্গে বেরুলেম, বাড়ীর মেয়েরা তখনো কেউ উঠে নাই।

কালীঘাটের নীচে যে গঙ্গা তাই আদিগঙ্গা। গঙ্গা তেমন প্রশস্ত নয়, যেন একটী খাল। জলও অপরিষ্কার। কত রকম আবর্জ্জনা ভেসে বেড়াচ্চে,—ফুল-বিল্বপত্র-পচা একটা দুর্গন্ধও আছে। তবে জোয়ার-ভাটা হয় বোলে সকল সময় ততটা দুর্গন্ধ থাকে না। আমরা গঙ্গা নাইতে যাচ্চি, পথের মধ্যে দেখি, একটা একতালা বাড়ীর উঠানে বোসে ৭।৮ জন লোক ৩।৪টী স্ত্রীলোকের সঙ্গে একত্রে বোসে মদ খাচ্চে,—গান গাইছে, নেশায় মাতোয়ারা হয়ে কেলেঙ্কারী কোচ্চে। তীর্থস্থানের এ কলঙ্ক আর যাবার নয়। লোকে তীর্থস্থানে যায় ধর্ম্মের জন্যে,—প্রাণের দায়ে;—আর কতকগুলো পাষণ্ড মাতাল যায়, মদ খেয়ে ইয়ারকী দিতে। তীর্থস্থানের এ কলঙ্ক কি নিবারণ হয় না?

দেখ্‌তে দেখ্‌তে গঙ্গায় নাম্‌লেম। বহুদিন পরে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার জলে ডুব দিতে প্রাণের ভিতর যেন শান্তি পেলেম। গঙ্গায় নেয়ে উঠলেম। ঘাট থেকে মন্দির পর্য্যন্ত রাস্তা কোন ভক্ত পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। আমরা স্নান কোরে সেই রাস্তা দিয়ে মন্দিরের দিকে চোল্লেম। দেখলেম, চারিদিকেই ডালার দোকান। এক একজন দোকানদার গোটা পোনেরো বড় বড় খালি হাঁড়ি সাজিয়ে—দেড়সের চিনি,—একসের চিনির ডেলা, আধখানা পেঁপে কাটা, কি ছড়াখানেক কলা নিয়ে দোকান আগলে বোসে আছে। দোকানে এই সামান্য জিনিস বেচে তিনি প্রতিদিন চারপাঁচ টাকা, কখন বা দশ পোনেরো টাকাও উপার্জ্জন করেন, অথচ জিনিসের একটুকুও কমে না। এ কথা চাঁদরাণীই বোল্লেন। দোকানদারের প্রতি মায়ের অপার কৃপা মনে কোরে অগ্রসর হোলেম।

সুশীলার কাছে পাঁচটী টাকা ধার কোরে নিয়েছিলেম, এখনো তার দুটী আমার কাছে আছে। মনে কোল্লেম, সুধুহাতে দেবদর্শন নিষেধ। চাঁদরাণীকে বোল্লেম, "মা! আমিও পূজা দিব।" চাঁদরাণী সন্তুষ্ট হোলেন। পাঁচসিকায় ডালা নেওয়া হলো। ডালার উপকরণের দাম বেশী কোরে ধোল্লেও দু-আনার বেশী হবে না। ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, এখানকার ডালার উপকরণই এই রকম। পাঁচ টাকার ডালা, আর পাঁচসিকার ডালায় কোন প্রভেদই নাই। দোকানদারেরা কি কোরে সামান্য উপকরণে অধিক উপার্জ্জন করে, এতক্ষণে তার গোড়ার খবর জান্‌লেম। ডালা নিয়ে—একজন পুরোহিত ঠিক কোরে তাঁর সঙ্গে কালীগহ্বরে নেমে গেলেম। মায়ের মুখখানি কেবল পাথরের, বাকী শরীর ঢাকা। হাত-দুখানি সোণা দিয়ে মোড়া। দেখ্‌লেই ভক্তি হয়। আমি প্রণাম কোরে করযোড়ে মনের ব্যথা জানালেম। পূজা শেষ হোলে ফিরে এলেম। এখানে ভাল পুরোহিত মেলা ভার। কত দেশের কত পাকা পাকা বদ্‌মায়েস এখানে এসে জাত ভাঁড়িয়ে পৈতে গলায় দিয়ে বামন সেজেছে। মায়ের পুরোহিত হয়ে সেই সব নিরক্ষর লোকেরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে।

গহ্বর থেকে বেরিয়ে আস্‌তেই একজন ব্রাহ্মণ আমার গলায় এক-গাছা গাঁদাফুলের মালা দিয়ে হাত পাতলে। তাকে দুইটী পয়সা

দিলেম। কোন খানে এক বিন্দু মিষ্টির সন্ধান একটী মাত্র পিঁপড়ে জানতে পেলে তখনি যেমন সেখানে রাশি রাশি পিঁপড়ের সার লেগে যায়, আমি একটী পয়সা দিতেই তেমনি রাশি রাশি লোক আমার উপর চেপে পোড়লো। গলায় এত মালা জমলো যে, তার ভরে যাই আর কি? এদিকে পুরুষ মানুষের মধ্যে দিব্য টুকটুকে দশ এগারো বৎসরের মেয়েরা কাপড় ধোরে টানাটানি কোত্তে লাগলো। ষোল সতেরো থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের এয়োস্ত্রীরা সেই পুরুষের মধ্যে ঢুকে মেয়েপুরুষে এক রকম জড়াজড়ি কোরে আমার নাকে, কপালে, চোকে সর্ব্বাঙ্গে সিঁদূর লেপে দিলে। কম-বেশী ষাট সত্তরখানা চিৎ হাত দেখে আমি চোমকে গেলেম। গরমে ত্রাহি মধুসূদন!—যাই আর কি! চাঁদরাণী পয়সার পুঁটুলীটী আমার হাত থেকে নিয়ে চোলে গেলেন। লোকগুলিও হতাশ হয়ে অগত্যা মহা-রণে ভঙ্গ দিলে। এ সব যুবতী মেয়েদের একটী পয়সার লোভে জাত মান খুইয়ে—লজ্জা-সরম ত্যাগ কোরে—পুরুষদের ভিতরে ঢুকতে দেখে আমি ত অবাক হয়ে গেলেম! যারা এক একটী পয়সার জন্যে লালায়িত, তাদেরও হাতে অনন্ত—বালা,—কানে সারকরা মাকড়ী। অবাক কাণ্ড!

কালীদর্শন কোরে বাড়ী ফিরে আসতে বেলা বারোটা বেজে গেল। এসে দেখি, মেয়েরা সব নেয়ে খেয়ে শুয়েছে, আমাদের ভাত ঢাকা আছে। একটু জিরিয়ে আহারাদি হলো। শেষে শুয়ে শুয়ে চাঁদরাণী আমাকে পশ্চিমের কথা অনেক জিজ্ঞাসা কোল্লেন। বিবাহের কথাও জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি কতক বা সত্য কতক বা মনগড়া কথায় চাঁদরাণীর প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিলেম। চাঁদরাণীর কথার ধাঁজে বুঝলেম, চাদরাণী এক রকম ফেরে ঘোরেই বোল্লে, "তা মা! এ পথে কি আর কেউ আসে না?—কত লোক আসচে।—সুখেও আছে। তবে যদি স্বোয়ামী থাকতেন, কি শ্বশুর-বাড়ীর সুখ থাকতো, সে আলাদা কথা। যখন যে সময়, যে বয়সের যা, তা না হোলে কি চলে?—কোত্তেই হয়। না করে কে?—কত বড় বড় রাজা-রাজাড়া, আমীর-ওমরার ঘরের বৌ-ঝি: কত কাণ্ড কোচ্চে,—তুমি আমি ত কোথায় লাগি। তবে তেমন ভাবে না থাকলেই হলো। কোথা দিয়ে

কে আস্‌বে—কে যাবে,—তা পরে দূরে থাক, বাড়ীর এরাও জান্‌তে পারবে না। বড় বড় লোকের ছেলেরা—রাজ-পুত্তুর—কার্ত্তিকের মত সব চেহারা;—বয়স কম। তারা তেমন নেশাভাঙ করে না। গোপনে গোপনে—চুপি চুপি আস্‌বে,—যাবে। এখন অবশ্যি মনের মধ্যে "কিন্তু" হোতে পারে, এর পর আর ততটা থাক্‌বে না। এ সব আমাকে দিয়েই ত জানি। তোমাকে যে জোর কোরে বল্‌চি, তা মনে কোরো না। তবে তুমি এমন বয়সকালে শুকনো-মুকনো থাক, মুখখানি শুকিয়ে যেন কতই বিপদে পোড়েছি এমনিতর দেখায়, তাতেই আমার মনের ভিতর বড় কষ্ট হয়। সেই জন্যেই বলি।" কথাগুলো শুনে শুনে বড়ই বিরক্তি বোধ হয়েছে। মোটের উপর এক কথা বোলে দিয়েছি, আমাকে আবার ও কথা বোল্লে আমি আত্মহত্যা কোরবো। চাঁদরাণী সেই পর্য্যন্ত চেপে গেছে। বড় একটা কিছু বলে না।

মাষ্টার বাবু এলেন না। এক দুই কোরে প্রায় একপক্ষ কেটে গেল, তবুও মাষ্টারবাবু এলেন না। হাতে পয়সা নাই, মাষ্টারবাবুর আশায় যা ছিল, সব পূজা দিয়ে ফেলেছি, এখন করি কি? চাঁদরাণী তাঁরে সংবাদ দিয়াছেন কি না, তাতেও সন্দেহ আছে। মাষ্টার বাবু হয় ত আমাকে কতই খুঁজে বেড়াচ্চেন। এখন তাঁর দেখা পাই কিসে?

একদিন চাঁদরাণীর ঘরে একটী বাবু দেখ্‌লেম। বাবুটীর মাথায় টাক,—মোটা, মেটে মেটে রং,—বেঁটে,—বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। নাম শুনলেম,—সুধাশেখর ভট্টাচার্য্য। সুধাশেখর জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ মেয়েটী তুমি কোথায় পেলে? কি কোরে হাত কোল্লে?" চাঁদরাণী হেসে—একটা সেকেলে ধরণের মাথা-নাড়া দিয়ে—একটা চোকে চেয়ে বোল্লেন, "কেন? অত খোঁজ-খবর কেন? বুড়োবয়সে অত কেন গা?" সুধাশেখর বোল্লেন, "না না, তা নয়। মেয়েটী কে তাই জিজ্ঞাসা কোচ্ছি।" চাঁদরাণী সত্য পরিচয় দিলে। সুধাশেখর যেন বড়ই দুঃখিত হোলেন। মুখেও দুঃখ প্রকাশ কোল্লেন; বোল্লেন, "সর্ব্বেশ্বর নিশ্চয়ই কলিকাতায় এসেছে, খুঁজেও বেড়াচ্চে। তা তোমার এ এঁদো জায়গায় কি সন্ধান পাবে? আহা! ভদ্রলোকের মেয়ে, ছেলেমানুষ, বড় কষ্টই পাচ্চে। আমার সঙ্গে বরং দাও, বেশ থাকবে। আমার

বাসাও সকলের জানা-শুনা আছে, আমারাও পাঁচ জায়গায় যাওয়া আসা আছে, খুঁজে কোরে সন্ধান পাওয়া যাবে। আমার হাতেও অনেক লোক; তাদের বোলে দিলে সন্ধান কোরে আন্‌তেও পারবে। আহা! মেয়েটীকে দেখে আমার বড়ই কষ্ট হোচ্চে।—এমন বিপদ আর কি কারো হয়?" ভদ্রলোকটীর সদাশয়তায় আমি মুগ্ধ হয়ে আমি কেঁদে ফেল্লেম। সুধাশেখর প্রবোধ দিয়ে বোল্লেন, "ভয় কি?—কেঁদো না। ভগবান আছেন। তিনিই তোমার সহায় হবেন। ভয় কি? চলো, আমার সঙ্গে চলো। চাঁদমণি! তুমি কি বল?" চাঁদরাণীকে বাবু আদর কোরে চাঁদমণি বোলে ডাক্‌লেন।

চাঁদরাণী বোল্লেন, "এতে কি আর কথা আছে? যেমন কোরে হোক, একটা উপায় হয়ে গেলেই হলো। তাতে সকলেরই ভাল। তুমি অনায়াসে নিয়ে যাও। আমাকে আবার এতে জিজ্ঞাসা করবার কি দরকার আছে? যখন ইচ্ছা নিয়ে যেও।"

আমারও সুধাশেখরের সঙ্গে যেতে ইচ্ছা হলো! ইনি যে ভাবে কথা কইলেন, যে ভাবে দুঃখ প্রকাশ কোল্লেন, তাতে এঁর দ্বারা উপকার হোলেও হোতে পারে। এই ভেবে আমি আর কোন আপত্তি কোল্লেম না। সে দিন আর যাওয়া হলো না। কথা ঠিক থাক্‌লো, সুধাশেখর বোলে গেলেন, আগামী রবিবারে নিয়ে যাবেন। আমি রবিবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরে রইলেম। এই কটা দিন যেন ভয়ে ভয়েই কাটালেম। যে বাড়ীতে আছি, এতে বিনা বাধায় চোলে যাওয়া বড় শক্তকথা। সন্ধ্যার পরেই ঘরে দরজা দি, সমস্ত রাত একটীবারও খুলি না।

আজ রবিবার। বেলা ১টার সময় সুধাশেখর এলেন। একটু বোসে—ঠাণ্ডা হয়ে বোল্লেন, "তবে চলো।" আমি চাঁদরাণীর কাছে বিদায় নিয়ে সুধাশেখরের সঙ্গে গাড়ীতে উঠ্‌লেম। গাড়ী গড় গড় কোরে উত্তর দিকে ছুটলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কলিকাতা সহরের সীমানায় এসে পোড়্‌লেম। কালীঘাট অনেকটা পাড়াগাঁয়ের মত। পশ্চিমে এর চেয়েও বড় বড় সহর দেখেছি, কিন্তু কলিকাতার মত এমন সহর আর কোথাও দেখি নাই। যে দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই দোতালা, তেতালা, চৌতালা, সাদা সাদা, রাঙা, কটা, নানা রকম রং দেওয়া বাড়ী।

রাস্তার দুপাশে কত কল-কারখানা, কত রকম রকম জিনিসের দোকান, কথায় সে সব বলা যায় না। রাস্তাতেও লোকের অসম্ভব ভিড়। আমরা গাড়ীতে যাচ্ছি,—তাতেই তত কষ্ট বোধ হোচ্চে না, কিন্তু হেঁটে যেতে হোলে এত লোক ঠেলে যাওয়া বড়ই কষ্টকর হতো। কত বড় বড় ঘোড়া-যোতা জুড়িগাড়ী আমাদের গাড়ীর পাশ কাটিয়ে সাঁ সাঁ কোরে বেরিয়ে গেল, কত ছোট বড় গরু-যোতা গরুর গাড়ী অসম্ভব বোঝাই নিয়ে—ক্যাঁ কোঁ শব্দে ধীরে ধীরে চোলেছে, কত ঝাঁকা ঝাঁকা জিনিস নিয়ে ঝাঁকা-মুটেরা গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটেছে, তার আর সীমা সংখ্যা নাই। যে দিকে চেয়ে দেখ্‌চি, সেই দিকেই যেন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড!—চমৎকার চমৎকার দৃশ্য! মনে ভাব্‌লেম, স্বর্গে যেমন অমরাবতী, মর্ত্ত্যে তেমনি কলিকাতা। বোধ হলো, বাঙ্‌লায় এমন সহর আর দ্বিতীয় নাই।

আমরা সন্ধ্যার আগেই—বেলা প্রায় চারিটার সময় সুধাশেখরের বাড়ী এলেম। বড় রাস্তার উপরেই বড় বাড়ী। সুধাশেখর মস্ত লোক। তাঁর ছোটখাট বাড়ী নয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামওয়ালা দোতালা বাড়ী। আমি সুধাশেখরের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। সুধাশেখরের বাড়ী যেমন, লোকজন কিন্তু তেমন নাই।

এখানে এলেম। চাঁদরাণীর বাড়ী ত্যাগ কোরে এখানে এলেম। চাঁদরাণী যদিও কুকাজের কাজী, তথাপি কিন্তু মনে থাকলো, আমার দারুণ দুর্দ্দশার সময়—অসহায় অবস্থার আশ্রয় দিয়েছিল,—বিপদে রক্ষা কোরেছিল,—বিষাদে সান্ত্বনা কোরেছিল, সেই দয়াময়ী স্নেহময়ী—চাঁদরাণী!

পঞ্চত্রিংশ চক্র।

সুধাশেখর দালাল।

সুধাশেখরের যেমন বাড়ী, তেমন লোক জন নাই। থাকার মধ্যে কেবল একমাত্র স্ত্রী—শ্রীমতী। বাহিরের লোকের মধ্যে দুইজন চাকরাণী, একজন সরকার আর একজন বেহারা। শ্রীমতীর সঙ্গে বেশ

আলাপ-পরিচয় হলো। পরিচয়ে জান্‌লেম,—বাহুলক্ষণে জান্‌লেম, তিনি বেশ মিষ্টভাষী। তবে বড় চাপা,—পেটে ডুবুরী নামিয়ে দিলেও পেটের কথা তোলা যায় না। কিন্তু বাহিরে বেশ সরলস্বভাব দেখানো আছে। মিছামিছি হাসি,—এক কথা একুশ-বার বলা, শ্রীমতীর অভ্যাস। আমি যেতেই বেশ যত্ন কোল্লেন। আত্ম-পরিচয় আমাকে কিছুই দিতে হলো না। আমার আসার আগেই সুধাশেখর সে পরিচয় দিয়ে রেখেছেন।

শ্রীমতীর বয়স বড় জোর পঁয়ত্রিশ। ছেলেপুলে হয় নাই। শ্রীমতীর চেহারা বড় মন্দ নয়। কেবল দাঁতগুলি উঁচু, আর কপালটা বেমানান চওড়া, এই যা দোষ। রং উজ্জ্বল শ্যাম,—দোহারা।

বাড়ীর বাহিরের দিকের দালানটী বেশ সাজানো গোজানো। এটি সুধাশেখরের বৈঠকখানা ও গদীঘর। দিনে এখানে কারকারবারের লোকজন আসে,—রাত্রে এক আধটী ইয়ার এসে টুম-টাম গান-বাজনা করেন। আড়াল থেকে দেখেছি,—এক আধ দিন মদও চলে। এই ঘরের সাত আটখানা ঘর পরে ঠিক কোণের ঘরটী আমি পেয়েছি। এই ঘরই আমার থাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। আমি সেই ঘরেই থাকি।

কলিকাতায় নূতন এসেছি. যা দেখ্‌ছি, তাই যেন আশ্চর্য্য বোলে বোধ হোচ্ছে। আমার ঘরে বোস্‌লে রাস্তার অনেকদূর পর্য্যন্ত নজর পড়ে। রাস্তার লোকের কথাও বেশ শোনা যায়। আমি একখানা চৌকী পেতে সারাদিন সেইখানে বোসে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকি। চেয়ে দেখি, কত রকম রকম লোক,—কত রকম রকম জিনিস। দেখে তাজ্জব জ্ঞান করি। যেটা না বুঝতে পারি, শ্রীমতীর কাছে সেটা জিজ্ঞাসা কোরে মনের সন্দেহ দূর করি। শ্রীমতী বোলে দেন,—আবার এই কথা নিয়ে কত ঠাট্টা-তামাসা করেন, আমোদ কোরে বলেন, "হরিদাসি! তুই এমন বদ্ধ বাঙাল?"

রোজ রোজই বোসে থাকি। কত লোক—কত রকম ছাঁদে—কত বোল বোলে জিনিস বিক্রী করে, তা শুনে হেসেই বেদম হয়ে পড়ি। একজন ডাকে, "ধ—ফু—কল্ম।" একজন গায়ে কাদা মেখে হাঁকছে, "চা—ই ঘোটতোলা।" কেহ বা ডাকছে—"চাই বাবু, বিশ্বনাথ মুকুজ্জে", "চাই গোপালে ধোপা।" এ দুটী নাকি আমের নাম! রাত হোলে কত চানা-চুর, সকের জলপান বিক্রী কোত্তে আসে। শ্রীমতী বোলে

দিয়েছেন, "তোমার যদি কিছু খেতে ইচ্ছা হয়, ডেকো, লজ্জা করো না। আমি দাম দিব।" প্রথম প্রথম লজ্জা কোরেছিল, এখন আর করে না। যা ডেকে যায়, ইচ্ছা হোলে ডেকে—কিনে তুজনেই খাই। একদিন রাতে বড় লজ্জায় পোড়ে গিয়েছিলেম। রাতে একদিন ডেকে যাচ্চে, "ইয়াপা—র মোলা মুস্কিল আসান।" আমি অম্নি মুস্কিল আসান ডাকলেম। মনে করলেম, এক পয়সার "মুস্কিল আসান" খেতে হবে। ব্যাপারটা দেখে শেষে আর হেসে বাঁচি না। পয়সাটী ফকিরজীকে দিয়ে বিদায় কোল্লেম।

বেশ আছি। শুন্তে পাই, সুধাশেখর মাষ্টারবাবুর যথেষ্ট অনুসন্ধান কোচ্চেন, কিন্তু কোন ফল হোচ্চে না। একদিন তুপর বেলা নীচে রান্নাঘর থেকে খেয়ে উপরে আস্‌চি, সুধাশেখর বেরিয়ে গেছেন ভেবে, সেদিন সোজাপথে বৈঠকখানার কাছ দিয়েই আস্‌চি। দেখি, একখানা ছেঁড়া কাগজ বৈঠকখানার দরজায় পোড়ে আছে! কাগজখানি ঠিক কোণাকুণি ছেড়া। একদিক কোথায় গেছে, একদিক পোড়ে বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে। আস্‌চি,—অন্যমনস্কভাবে কাগজখানা কুড়িয়ে নিলেম, হাতে কোরে কুচি কুচি কোত্তে কোত্তে ঘরে এলেম। কাগজখানি ফেলে দিয়ে চৌকীতে এসে বোসে জিরুলেম। আবার রাস্তার দিকে নজর রেখে বোস্‌লেম। কাগজখানা দলা বেঁধে আমার চৌকীর সামনেই পোড়ে রইল। কেমন ইচ্ছা হলো, কাগজখানি কুড়িয়ে নিয়ে পরিষ্কার কোরে পোড়ে দেখলেম। অন্যমনস্কভাবে কি পোড়্‌লেম, মনে হলো না। কিন্তু আর একবার পোড়ে দেখ্‌বার আবশ্যকতা হলো। আবার পোড়্‌লেম। পোড়েই ত অবাক! হাত-পা যেন পেটের ভিতর ঢুকে গেল! গা কেঁপে উঠ্‌লো! যেখানে যাই, সেইখানেই চক্র! আমার শক্র কি পদে পদে? একতিলও কি কোথাও সুখ নাই?

পত্রখানির অর্দ্ধেক নাই। সে অর্দ্ধেকে যে কি লেখা ছিল, তা কি কোরে জান্‌তে পারবো? তবে এই আধখানাতেই বেশ বুঝলেম, সুধাশেখর দ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বর। পাটনার রায় মহাশয়ের ইনি প্রাণের ইয়ার, এক ওজনের লোক। আমাকে ইনি হাতে পেয়ে তাঁকে সংবাদ দিচ্চেন। কিছু দাঁও করবার ইচ্ছাও আছে। তাতেই ঘোরে ফেরে কথাটা লেখা আছে। চিঠিখানির জায়গায় জায়গায় কালিপড়া; ভাবে

বোধ হলো, এখনি নষ্ট হওয়ায় ছিঁড়ে ফেলে অন্য একখানি ভাল কোরে লেখা হয়েছে। সুধাশেখর বিদ্যায় বীণাপাণির বরপুত্র।—অতি কষ্টে সেই আধখানি পত্র পড়া গেল। অতি কষ্টে সেই আধখানি পত্রের অর্থ গ্রহণ কোল্লে ম সেই আধখানি পত্রে লেখা আছে :—

শ্রীশ্রীদুর্গা—

সহায়

শ্রীসুধাসিখর বর্ম্মণং

নমস্কারান্তে নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ বহুদিবসাবধি তোমার
ওথাকার কোন সংবাদ না পাইবাতে বড়ই ভাবিতা
আমীহ অনেক দিন তোমার কুশল অপ্রাপ্তে চিন্ত্র
তুমিহ কেমন আছো লিখিবা। তোমার ভ্রাতার
তি হোরিদাসীর সোন্ধান পাইয়াচি। তুমিহ ও
যদিস্যাৎ তুমি তাহার নিঠ সোন্ধান চাহ তবে এ
সাকুর্ল্য কোং পাঁচ হাজার টাকা সাৎ পত্রপাট
করিবা না তবে এখানে আসিবাতে বাজে
হাম জরুর পাওা ও দেশের ধার্ণ গুলিন গরুপ
সেথায় যাইবাতে সিতে ঔদ্বাস্তি করিবা
বোদ হঁয় ওদিক এথাকার কাজ্জতা না
সুবিদা নহে জানিবা। তথা শ্রীমাণ
এ বাটীতে আইসন কালীন বাবাজীন
যার কেমন চলিতেছে লিখিবা এথাকার
অস্রিমে আছী সময় বুঝিয়া আচর্জ্জ
হইলাম। তবে কেমন করিয়া
ইতি সন ১২ ৪৫। তারিখ

পত্রখানি পেয়ে পর্য্যন্ত আমার ভাবনার সীমা নাই। এতদিন বেশ ছিলেম। ভাবনা প্রায় ছিল না। আজ আবার নূতন ভাবনার সূত্র-পাত। ভাবনা-চিন্তার হাতে এ জীবনে আর বুঝি আমার অব্যাহতি নাই।

এখন থেকে জান্‌তে পাল্লেম, সুধাশেখরকে আর বিশ্বাস নাই। আজ হতে তার চালচলোন ভাল কোরে দেখ্‌তে হবে। আড়ি পেতে লুকিয়ে লুকিয়ে এই দ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বরের কাণ্ডটা জান্‌তে হবে। এই যুক্তি

মনে মনে স্থির কোরে এখন থেকে প্রায়ই বৈঠকখানার পাশে গিয়ে ঘন ঘন দাঁড়াই। অন্যান্য বিষয়কর্ম্মের কথা হয়। রোজ রোজ নূতন নূতন চেহারার—নূতন নূতন লোক—নূতন নূতন কথা নিয়ে আসে। আমি তার আগাগোড়া জানি না,—বুঝতেও পারি না। ভাবে এইটুকু বুঝেছি যে, এরাও একদল পাকা বদমায়েস। এই যে সব নূতন নূতন লোক, এরা সব এক একজন এক একভাবের টেক্কা-জালীয়াৎ, প্রধান প্রধান ফেরেব্বাজ। সুধাশেখর এদের ওস্তাদ।—সুধাশেখর এদের গোঁড়া। এই সব বুঝে পর্য্যন্ত এদের কথাবার্ত্তা ভাল কোরে শুনি। বুঝ্তে পারি আর না পারি—কথাগুলি শুনি, মনে কোরে রাখি। আশা থাকে, এক সময় না এক সময় এ সব কথার মীমাংসা হবেই হবে।

রোজ যেমন যাই, আজও তেমনি সময় বৈঠকখানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ঘরে বেশী লোক নাই। চারজন মাত্র। চারজনেই কথা-বার্ত্তা হোচ্চে। একজন লোক তেড়ে উঠে বিছানায় একটা ফুলো চড় মেরে বোল্লে, "আমি শৈলধর মিত্তির, আমি জানি না? এ সব প্ল্যান জানে কে? পাঁচ টাকার সরকার ছিলেম বাবা, কেবল বুদ্ধির জোরে এই কোরেছি। আমার বুদ্ধি নাও। ওটা রকমসই কোরেই ঝাড়। আমরা ত আর এর মধ্যে নাই। জাত নিয়ে কি ধুয়ে থাবে? টাকাটা আছে বেশ। বড়লোকে ফাঁকি দিবার জন্য কেষ্টবাবুর খড় জিদ হয়েছে। একটু ফিট্‌ফাটগোচ মেয়ে চোকে ধোরিয়ে দিতে পাল্লে, আর যায় কোথা? আপাততঃ দালালীটে কদিক থেকে আসচে ধর। বিয়ে দেওয়ার জন্যে কেষ্টবাবু দেবেন চার হাজার। ফুলীর মা মেয়ের গায়নাগুলো সাৎ কোরে কাশী পালাবে। বুড়ো বয়সে আর সে লোক হাসাবে না। সে স্বীকার কোরেছে, গহনা হতে এক হাজার দেবে। তার পর ধর, মেয়ের বাপকে কেষ্টবাবু যা দেবে, সেটা ত আছেই। তবে একজনকে বাপ খাড়া কোরে দেওয়া বৈ ত নয়,—তা পারা যাবে। তার পর যদি ছেলে না হয়, তখন ত * * * *।" আর একজন বোল্লে, "তা সব হবে, কিন্তু যদি কেষ্টবাবু যদি ঘুণাক্ষরে জান্‌তে পারে, তা হোলে সবগুলোকে যে গাঙ-দাখিল কোরবে? অত বড় মানী লোকের জাত মারা—বড় সোজা কথা কি?"

প্রথম লোকটীর নাম আর একবার মাষ্টার বাবুর মুখে শুনেছি।

এখন সেই লোকটাকে চোকের সাম্‌নে দেখে আমার প্রাণ ত শুকিয়ে গেল! লোকটা যেমন বদ্‌, কথা কোচ্চেও তেমনি; বুঝ্‌লেম, এরা এই সব কাজেরই দালাল।

শৈলধর তেজী মেজাজে দিব্যি কাঁসাগলায় বোল্লে, "সে ভাবনা তোর ভাব্‌তে হবে না,—তুই থাম্‌! ব্যাটার সর্ব্বাঙ্গেই ভয়। এ সব কথায় তুই কেন রে পাজী ব্যাটা?" লোকটা থেমে গেল। শৈলধর কাঁড়াসুর বোদ্‌লে নরমে বোল্লে, "ভশ্চাজ! আর শুনেছ, সর্ব্বেশ্বর আস্‌চে। দিন কতক খুব আমোদই হবে। কি বলো?" সুধাশেখর বোল্লেন,—"আসার ত কথা, কিন্তু মেয়েটা তবে একা এলো কি কোরে? বোধ হয়, কোন দুর্ঘটনা ঘোটেছে। লোক পাঠিয়েছি আজ চারদিন, আজও খবর পাই নাই। মনে বড় সন্দেহ হয়েছে।" সুধাশেখর কথাগুলি যেন বিস্ময়ের সঙ্গে ভয় মিশিয়ে—সেই সুরে বোল্লেন। শৈলধর আশ্চর্য্যজ্ঞান কোরে বোল্লে, "বটে! বলো কি? না,—তা হবে না। সর্ব্বেশ্বরকে ঘাঁত বুঝে কাপে ফেলে, এমন ছেলে বিশ্ব-বাঙ্‌লায় নাই। ভাল, মেয়েটাকেই কেন জিজ্ঞাসা কোরে দেখ না?"

"না, তা হয় না।"—সুধাশেখর বোল্লেন, "না, তা হয় না। তার কাছে এখন প্রকাশ করা হবে না। দোষ আছে।" শৈলধর লাফিয়ে উঠে বজ্রস্বরে আবার বুক কাঁপিয়া—ঘরটার ভিতর একবার গুম্‌ গুম্‌ শব্দ তুলে সদর্প বোল্লে, "ডিম আছে। তুমি দাদা, যেমন ছেলেমানুষ। জিজ্ঞাসা কর, একজন যণ্ডার জিম্মা কোরে দাও, আপনি বোল্‌তে পথ পাবে না। প্রকাশের ভয় কি? এক্‌টা ঘরে পূরে চাবী দিয়ে রাখ, পালাবে কোথা?"

নৃশংস শৈলধরের কথায় প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো! যদি এই কথাই কাজের কথা হয়,—যদি শৈলধরের যুক্তিমতই কাজ হয়, তবেই ত দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ! হা মধুসূদন! তোমার মনে এতও ছিল!

দাঁড়িয়েছিলেম,—দাড়িয়ে দাড়িয়েই শুনছিলেম, আর দাঁড়াতে পাল্লেম না। বোসে পোড়্‌লেম। কথা হোচ্চে, এমন সময় একটা লোক গুম্‌ গুম্‌ কোরে আমার পাশ দিয়ে বৈঠকখানায় দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। যখন কাছ দিয়ে যায়, অন্ধকারে তখন দেখি নাই, লোকটার মুখে প্রদীপের আলো পোড়্‌তেই চেহারাটা দেখে আঁৎকে উঠলেম। এ

আবার কে? লোকটার সমস্ত শরীর কম্বল ঢাকা। মুখে কালো রং মাখানো। মস্ত লম্বা হাতে একখানা ছোরা। ছোরাখানায় এখনো কাঁচা রক্তের দাগ! হাঁপাচ্চে,—ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপ্‌চে—টস্ টস্ কোরে ঘাম্ পোড়্‌চে, তারই মধ্যে আবার ফিক্ ফিক্ কোরে হাস্‌চে! কালো রং মাখা, মুখে সাদা দাঁত বা'র কোরে হাসি, দেখ্‌তে আরও যেন বিকট বোধ হোচ্চে। লোকটা আমার কাছ দিয়ে গেছে, কিন্তু আমাকে দেখ্‌তে পায় নাই। দেখ্‌তে পেলে হয় ত হাতের সেই ছোরা দিয়ে তখনি কাজ গুছিয়ে দিত! মনে বড় ভয় হলো। পাশ বোদ্‌লে অন্য পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম। যে সময় তাতে পালানই উচিত, কিন্তু লোকটার মৎলব জান্‌তে বড় ইচ্ছা হলো, তাই এত ভয় পেয়েও তত্ত্ব জান্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেম।

লোকটা দাঁড়াতেই সুধাশেখর জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি খবর? সফল ত?" লোকটা ঘাড় নেড়ে বোল্লে, "হাঁ, তবে এক্‌টা বড়দরের ফাঁড়া কাণের কাছ দিয়ে গেছে।" সুধাশেখর, শৈলধর, দুজনেই উঁচু হয়ে বোসে—বিস্ময়ে চোকদুটী বিস্ফারিত কোরে—দুজনেই সমস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি রকম?" লোকটা বোল্লে, "আজ রামবাবু ওপারে গিয়ে ছিল, আমি ঝোনরে ট্যাকে টেঁকে ছিলেম। গাড়ীখানা আস্‌তেই টপ কোরে উঠে পড়্‌লেম।—ছাতখোলা গাড়ী, দুজন বরকন্দাজ ছিল। বাবুর নাকটায় যেই পেঁচ দিয়েছি, কেটে হাতের মধ্যেও এসেছে, এমন সময় বরকন্দাজের এক্‌টা লাঠি আমার পিঠে পোড়্‌লো। সাম্‌লাতে পাল্লেম না। কাৎ হয়ে পোড়ে গেলেম। উঠ্‌তে উঠ্‌তে দেখি, গাড়ীও কাৎ হয়, ঘোড়া দুটো আমাব পেটে পা দেয়, চারদিকে লোকও জোমে এলো! তখন করি কি, এক্‌টা ঘোড়া পাছ্‌ড়ে দিয়ে তবে সোরে এলেম।" সুধাশেখর বোল্লেন, "এই ত? তা বেশ হয়েছে। যাও, তুমি একটু ঠাণ্ডা হও গে যাও। আমার নাম কোরে একটা বড় বোতল চেয়ে নিয়ে যাও।" লোকটা ধাঁ কোরে বেরিয়ে গেল।

শৈলধরও উঠ্‌লো দেখে, আমি সাঁ কোরে আপন ঘরে এলেম। সমস্ত রাত ভেবে ভেবেই কাটালেম। জেনে রাখ্‌লেম,—বুঝে রাখ্‌লেম, ইনিই বদ্‌মায়েসীর গুরুঠাকুর,—চুরিবাটপাড়ীর ওস্তাদ,—সুধাশেখর দালাল!

ষট্‌ত্রিংশ চক্র।

বিষম বাটপাড়ী।

সাত আট দিন কেটে গেল। সর্ব্বেশ্বর বাবু কি রায় মহাশয়ের কোন খবর পেলেম না। বৈঠকখানায় গিয়ে রাত্রে এদের মৎলব-ফন্দি জান্‌তে ইচ্ছা আছে, কিন্তু সেদিন ভয় পেয়েছি, তাতেই আর সাহস হয় না। ইচ্ছা সত্বেও সাত আট দিন আর যাই নাই! আজ আবার সাহস কোরে আস্তে আস্তে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেম। দেখ্‌লেম, আর কেহ ঘরে নাই। কেবল দালালরাজ সুধাশেখর কাৎ হয়ে শুয়ে আপন মনে তামাক টান্‌চেন,—আর আফিঙের ঝোঁকে ঢুল্‌চেন।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধোরে এলো।--ফিরে এলেম। ফিরে আস্‌ছি, এমন সময় একসঙ্গে জনকতক লোকের পায়ের শব্দ পেলেম। ফিরে দেখ্‌লেম, তিন চারি জন লোক ঘরে ঢুকলো। ফিরে যাচ্ছিলেম, আবার এসে দাঁড়ালেম। দেখ্‌লেম, শৈলধর আর তিনজন অপরিচিত লোক। শৈলধর বোল্লে, "ভশ্চাজ! আজ একা চুপ কোরে যে?" সুধাশেখর একটু হেসে—শৈলধরের দিকে চেয়ে বোল্লেন, "আর ভাই! বড়ই ভাবনা হয়েছে। একটী পয়সা উপায়ের পথ নাই, খরচ-পত্র চলা ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাত আটটা বাড়ীর ভাড়া যোগানো কি সহজ কথা? করি কি, আর ত চুপ কোরে থাকা যায় না। আগেকার গোল ত এখন একরকম মিটমাট হয়ে গেছে। সন্দেহটাও কোমে এসেছে। লোকের মুখে আগেকার কথা আর বড় শোনা যায় না। এখন আবার দিন কতক না লাগ্‌লে ত আর চলে না। তবিল শূন্য হয়ে এসেছে। এতগুলো লোকের খরচ যোগানো ত সোজা কথা নয়!"

"এরই জন্যে তোমার এত ভাবনা? আমি বলি আরও কিছু। লোক-গুলোকে আর বোসিয়ে রেখে কি হবে? কাজে লাগিয়ে দাও। আর ভয় কাকে? শৈলধর এই পর্য্যন্ত বোলে চুপ কোল্লে। সুধাশেখর বল্লেন,

"তাই আমিও ঠিক কোরেছি। কাল থেকেই কাজ আরম্ভ হোক। লোকজন যারা আছে, সকলকে বলে যাও। আমার বড় অসুখ আছে। কেবল সংবাদটা দেবার জন্যেই অপেক্ষা। তোমরা যোগাড় কর। আমি বাড়ীর ভিতর যাই।" এই বোলে সুধাশেখর উঠ্‌লেন। মনে মনে ভাব্‌লেম, কি কাজ আরম্ভ কোরবে? মিছামিছি ভাড়া দিয়ে সাত আটটা বাড়ী রাখ্‌বারই দরকার কি? ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘরে এলেম।

আরও দুদিন গত হলো। আমি রাস্তার দিকে চেয়ে আছি। রাত প্রায় তখন ৮টা। দেখ্‌লেম, ব্যস্ত হয়ে একজন লোক একখানি কাগজ হাতে কোরে রাস্তার এদিক ওদিক ঘুরছে। অনেকক্ষণ লোকটা সেই রকম ঘুরে ঘুরে কাটালে। এমন সময় একজন বড়দরের বাবুগোচের লোক রাস্তায় দেখতে পেয়ে লোকটী তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাপুসনয়নে কেঁদে কেঁদে বোল্লে, "মহাশয়! আমাকে রক্ষা করুন। আপনি ভদ্র-লোক, আপনি যদি রক্ষা না করেন, তা হোলে আর কে রক্ষা কোরবে? আপনি—"

ভদ্রলোকটী বাধা দিয়ে বোল্লেন, "কি?—হয়েছে কি?" লোকটী বোল্লে, "আমার বড় বিপদ! আমার এক ছেলে পশ্চিমে থাকে। অনেক দিন খবর পাই নাই, এখনি এই টেলিগ্রাম এসেছে। আমার পরিবার ত কেঁদেই সারা হয়ে গেছে। বাড়ীশুদ্ধ লোক ভেবেছে, ছেলেটী মারা গেছে,—না হয় বড় ব্যারাম হয়েছে। টেলিগ্রাম পড়াতে লোক পাচ্চি না। আপনি রক্ষা করুন,—পোড়ে দিন,—তা না হোলে পরি-বারটী পাগল হয়ে যায়।" এই বোলেই লোকটী কেঁদে আকুল হলো। ভদ্রবাবুটী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কৈ?—দেখি তোমার টেলিগ্রাম? লোকটী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হাতের সেই কাগজখানি দেখালে। বাবু রাস্তার আলোতে পোড়ে বোল্লেন, "কোন ভাবনা নাই, ভাল আছে। অনেক দিন খবর পায় নাই, তাড়াতাড়ি খবর লিখতে বোলেছে। টেলিগ্রাফে খবর পাঠাতে বোলেছে। এতে এত কাঁদাকাটা কেন? লোকটী বোল্লে, "তবে আপনি একখানা টেলিগ্রাম লিখে দিবেন, চলুন। আমার কথা কি তারা বিশ্বাস কোরবে? ভাববে, আমি তাদের বুঝিয়ে রাখবার জন্যে মনগড়া কথা বোল্‌ছি, চলুন আপনি, আপনি তাদের সাম্‌নে পোড়ে—আর একখানা টেলিগ্রাম লিখে দিবেন।" ভদ্রলোকটী অপেক্ষা কোত্তে পারেন না,

আর কোন লোক দিয়ে লিখিয়ে নিতে বোল্লেন। লোকটী তা শুন্‌লে না। পায়ে ধোরে জিদ আরম্ভ কোল্লে। ভদ্রলোকটী অগত্যা তার সঙ্গে আমাদের বাড়ীর পাশে দুখানা বাড়ার পরের বাড়ীতে ঢুকলেন।

আমি বোসে আছি। প্রায় একঘণ্টা বোসে আছি, এমন সময় রাস্তায় একটা গোল উঠলো। অন্যমনস্ক ছিলেম, তাড়াতাড়ি মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লেম, সেই ভদ্রলোকটী একখানা গামছা পোরে দাঁড়িয়ে, চীৎকার কোরে বোল্‌ছেন, "কলিকাতা সহরে এমন দিনে ডাকাতী? টেলিগ্রাম পড়াতে নিয়ে গিয়ে টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে—শেষে একখানা গামছা পোরিয়ে মেরে ধোরে তাড়িয়ে দিলে?" চারিদিকে লোক দাঁড়িয়ে গেল। পুলিস এলো, বাড়ীর ভিতর ঢুকলো। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে বোল্লে, "তা কি কোরবে বাবা! তারা ত সব সোরে পোড়েছে। ধোত্তে না পাল্লে ত আর কিছু হয় না।" পুলিস চোলে গেল, ভদ্রলোকটী ভাল কোত্তে গিয়ে,—বাটপাড়ের হাতে যথাসর্ব্বস্ব খোয়ালেম। জুয়াচুরীর এই এক নূতন কাণ্ড দেখলেম। জানা আছে, আমাদের পাশে সাত আটখানা বাড়ী সুধাশেখরের ভাড়া। এ কীর্ত্তিও তাঁরই। আজ আরম্ভ কোরেছে ভাল!

আবার দুদিন পরে আর এক কাণ্ড! সে রাত ৯টার সময় ৯টার সময় একখানা ভাল গাড়ী এসে আমাদের বাড়ীর উত্তরদিকের বাড়ীর দরজায় লাগ্‌লো। একটী লোক ধাঁ কোরে নেমে বোল্লে, "ডাক্তারবাবু! শীগ্‌গির নেমে আসুন। ছেলে আমার এখন তখন দেখে আস্‌ছি। গিয়ে দেখ্‌তে পেলে হয়।" লোকটী ডাক্তার। চেন, ঘড়ী, আংটী বেশ জমকালো রকম। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি নেমে বাড়ীর ভিতর ঢুকলেন। গাড়ী দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো। বাড়ীতে লোক-জন নাই, তবে কার ব্যারাম হলো? ব্যাপারটা দেখ্‌বার জন্যে আমিও বোসে রইলেম।

আধঘণ্টা পরেই ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন। রাস্তার আলোতে বেশ দেখ্‌তে পেলেম, ডাক্তারবাবুর বেশও সেই রকম। একখানা গামছাপরা। ডাক্তারবাবু মানের খাতিরে আর উচ্চবাচ্য কোল্লেন না। গাড়ীতে উঠেই প্রস্থান কোল্লেন। যাবার সময় বোলে গেলেন, "আর

কিছু দিন পরে টের পাবে। আমার টাকা যমেও হজম কোত্তে পারে না। তোমরা ত তোমরা।”

প্রায় একপক্ষ কেটে গেল। রোজ রোজই অনেক রাত পর্য্যন্ত রাস্তার দিকে চেয়ে বোসে থাকি, নূতন কোন কাণ্ড আর, বড় নজরে পড়ে না। একদিন রাত প্রায় ১টা, রাস্তায় জনমানবের গতিবিধি নাই, বড় গরম বোধ হতেই বারান্দায় বোসেছি। রাস্তায় একটী লোক বড় একখানা লাঠিতে ভর দিয়ে—লাঠি ঠক্ ঠক্ কোরে—তোলা তোলা পা ফেলে আস্তে আস্তে যাচ্চে। সর্ব্বাঙ্গ কাগড় দিয়ে ঢাকা। মুখে চীৎকার কোরে কোরে বোল্‌ছে, “কাণারে একটী পয়সা দাও না বাবা!” সুর কোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌তে বোল্‌তে কাণা চোলেছে। রাস্তায় ক্বচিৎ এক আধজন লোক যাচ্চে,—কেউ ফিরেও দেখ্‌ছে না। মনে বড় কষ্ট হলো। সংসার কাতরের কাতরতা শোনে না। কাণা সমস্ত দিন ভিক্ষা কোরেও হয় ত অন্নের সংস্থান কোত্তে পারে নাই, তা না হোলে এত রাতে পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে কেন ?

একজন বাবু এলেন। টাকাকড়ি আছে,—চেন অঙ্গুরী আছে, মাথায় সিথি আছে, গায়ে ভাল কাপড় আছে। দয়ার শরীর কি না, কাণার কাতরতায় বাবুর হৃদয়ে দয়া হলো। কাণার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কিছু ব'র কোত্তে পকেটে হাত দিলেন্। কাণার দিকে মুখ কোরে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে পয়সা বা'র কোত্তে লাগ্‌লেন। কাণা সহসা দিব্য চোক পেলে! হাতের লাঠি বাগিয়ে ধোরে ধাঁ কোরে বাবুর মাথায় লাঠি মারলে! বাবু “মা” বোলে পোড়ে গেলেন। আমার প্রাণের ভিতর যেন কেঁপে উঠ্‌লো। গা কাঁপতে লাগ্‌লো। কাণা লাঠি ফেলে ভদ্রলোকটীর সঙ্গে যা কিছু ছিল, নিয়ে ভোঁ কোরে সোরে পোড়্‌লো। বেশী দূরেও গেল না, আমাদের দুখানা বাড়ীর পরের বাড়ীতেই ঢুকে পোড়্‌লো। কি সর্ব্বনাশ! এমন ভয়ানক ভয়ানক রাহাজানি—ভয়ানক ভয়ানক বাটপাড়ী এই কলিকাতা সহরেও হয় ?

অনেকক্ষণ ভদ্রলোকটী পোড়ে রইলেন। জনমানবেরও দেখা নাই। শেষে দুজন পুলিসের লোক এসে একখানা খাটীয়ায় শুইয়ে বাবুকে নিয়ে গেল। এত বড় একটা ডাকাতী হয়ে গেল, তখনি তখনি সেই কথার আর উচ্চবাচ্য নাই। চমৎকার সহর !

দিন যতই যাচ্ছে, ততই আরও নূতন নূতন কাণ্ড দেখ্‌তে পাচ্চি। এক্‌টা দেশ নয়, যত দেশ দেখ্‌লেম, সব দেশই জুয়াচোরে—বাটপাড়ে পরিপূর্ণ। যত দেখি, ততই নূতন নূতন জুয়াচুরী দেখে অবাক হয়ে যাচ্চি। দেখে দেখে জ্ঞানের সীমা হারিয়ে যাচ্চে! আজ যা দেখ্‌লেম, এও এক বিষম বাটপাড়ী।

সপ্তত্রিংশ চক্র।

মামার পরিণাম।

আছি।—আরও এক মাস আছি। এই এক মাসের মধ্যে আর কোন রকম ঘটনা—যে ঘটনা প্রাণের সঙ্গে গেঁথে রাখ্‌তে হয়—যে ঘটনার সঙ্গে ভব-সংসারের বাঁধাবাঁধি সংস্রব,—যে ঘটনার সঙ্গে লোকের অদৃষ্টের নিকট সম্বন্ধ, এমন কোন ঘটনা এই এক মাসের মধ্যে আমি দেখি নাই। আছি,—থাকি,—এই পর্য্যন্ত।

একদিন সন্ধ্যায় সময় ঝুণু ঝুণু ঝুণু ঝুণু শব্দে একখানা ভাড়াটে ছক্কড়গাড়ী আমাদের দরজায় এসে রণবাদ্য বন্ধ কোল্লে। এমন সময় কে এলেন, দেখ্‌বার জন্যে জানালায় মুখ বাড়ালেম। তখন অন্ধকার হয়েছে, রাস্তায় আলো জ্বালা হয় নাই,—ভাল দেখ্‌তে পেলেম না। দেখ্‌বার মধ্যে দেখ্‌লাম,—একটী বাবু গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌লেন। কে ইনি,—কি জন্য এলেন,—জান্‌বার জন্যে মন বড় ব্যাকুল হলো। গা ঢাকা হয়ে বৈঠকখানার পাশে এসে দাঁড়ালেম। দেখ্‌লেম, ঘরে কেবল সুধাশেখর আর শৈলধর। আমিও গিয়ে দাঁড়িয়েছি, অভ্যাগত বাবুটীও প্রবেশ কোল্লেন। মুখ ঢাকা ছিল, সতর্কতার সঙ্গে সতর্কদৃষ্টি, চেয়েই চিনে ফেল্লেম। বুকের ভিতর কেঁপে উঠ্‌লো। এই কম্প সম্পূর্ণ ভয়ে নয়,—কতক ভয়ে, কতক বিস্ময়ে। লোকটী অন্য কেউ নয়, সুশীলার মামাত ভাই, বৃন্দাবনের সেই ত্রিপুরারিচরণ।

ত্রিপুরারি এসেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সুধাশেখর বাবু কোথা?" কর্ত্তা নিজে প্রশ্নের কোন উত্তর কোল্লেন না। শৈলধর জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি প্রয়োজন?—কোথা থেকে আসা হোচ্চে?" ত্রিপুরারি বোল্লেন, "এলাহাবাদ থেকে। ইতিপূর্ব্বে একখানি পত্রও লেখা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলেই তিনি বুঝ্‌তে পারবেন।"

সুধাশেখর ঘাড় নেড়ে বোল্লেন, "ওঃ!—তুমি? তোমারি নাম ত্রিপুরারিচরণ? অনেক দিনের দেখা,—তুমি যখন পাঁচ বছরের, তখনকার দেখা, চিন্‌তে পারবো কেন? এখন চিন্‌লেম। বোসো!—আমার কাছেই বোসো! মকর্দ্দমার খবর কি, আগে তাই বলো। অন্যান্য কথা হবে পরে।"

ত্রিপুরারি বিষণ্ণ হয়ে—নিতান্ত কাতরতার স্বরে বোল্লেন, "আর সে কথা জিজ্ঞাসা কোরবেন না। সে কথা জিজ্ঞাসা কোরে আর আমায় কাঁদাবেন না। আমার সকল দিক্ ফর্সা হয়েছে, এখন ভরসার মধ্যে কেবল আপনি। পিতার বন্ধু,—আমার মুরুব্বী আপনি; আপনিই আমাকে রাখুন। আমি নিরুপায়,—সর্ব্বস্ব গেছে,—সকল সুখে ছাই পোড়েছে, আমার আর কেহই নাই।" এই বোলে হতভাগ্য যুবক সজলনয়নে সুধাশেখরের পা-দুখানি ধোল্লে। পায়ের হাত সোরিয়ে দিয়ে—যেন কতই বিস্ময়ে—কতই সহানুভূতি জানিয়ে—সহৃদয় সুধাশেখর বোল্লেন, "ভয় কি তোমার? আমরা আছি।—তোমার পিতার জীবনবন্ধু আমরা। কেঁদো না,—ভয় পেও না, সব কথা খোলসা বলো। অত কাতর হয়ো না,—সব দিন কিছু সমান যায় না,—তাতে অধৈর্য্য হও কেন? বল,—সব কথা বেশ কোরে খুলেই বলো।"

ত্রিপুরারিচরণ মনের বেগ সম্বরণ কোরে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "মকর্দ্দমা চুকে গেছে। পিতার ১২ বৎসর মিয়াদ।—কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড! আহা! বৃদ্ধ পিতা আমার,—কখনই ফিরবেন না।" পিতৃশোকাতুর যুবার কণ্ঠরোধ হলো। অপরিসমাপ্ত কথা আর বোল্‌তে পাল্লেন না।

সুধাশেখর একটা স্নেহের ধমক দিয়ে বোল্লেন, "কাঁদো কেন? ও কি ছেলেমি তোমার? যা হবার, তা ত হয়েই গেছে!—কাঁদ্‌লে কি ফিরে পাবে? তবে কেন কাঁদো? স্থির হও। সব কথা বলো।

আমি আছি,—ভঞ্চাজ মশায় আছেন,—বিবেচনা কোরে দেখি আমরা। বলো তোমার কথা।"

ত্রিপুরারি নেত্রজল সম্বরণ কোরে আবার বোল্লেন, "যাবার সময় বোলে গেলেন,—বৎস! যাও, কলিকাতায় যাও। সুধাশেখর আমাকে কনিষ্ঠের ন্যায় স্নেহ করেন, তিনিই আমার সব, তাঁকে আমার দুঃখের কথা জানাও, তিনিই তোমাকে আশ্রয় দিবেন, যত্ন কোর্‌বেন। বেশ থাক্‌বে।"

সুধাশেখর বোল্লেন, "মকর্দ্দমা যখন প্রমাণ হয়েছে,—তখন আপীলে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কেবল বৃথা অর্থব্যয় মাত্র। আমি তাতে-নারাজ!—বড়ই নারাজ! যেটা বেশ জান্‌তে পাচ্ছি, চোকের সাম্‌নে যেন স্পষ্ট স্পষ্ট লেখা আছে নিষ্ফল,—তাঁর জন্য অনর্থক অপব্যয় কোত্তে আমি বড়ই নারাজ। সে টাকা বরং তোমাকে দিলে, তোমার পরিবারদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যয় কোল্লে, আমারও সার্থক, তোমারও উপকার, কি বলো?" এই কথা বোলে সুধাশেখর উৎসুকদৃষ্টিতে একবার শৈলধরের দিকে চাইলেন। তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি! শৈলধরের ওষ্ঠে তখনি তখনি উচ্চারিত হলো, "এ কথা বড়ই সত্য। এই যুক্তিই সার যুক্তি। আমার মত এর একটুও এদিক্ ওদিক নয়।"

শৈলধরের বক্তৃতা শেষ হোলে সুধাশেখর বোল্লেন, "বাল্যকাল হ'তেই আমার স্বভাব এই রকম। অন্যায় ব্যয় আমার বড়ই অসহ্য! তোমার পিতাকে এ সম্বন্ধে আমি অনেকবার অনেক রকম উপদেশ দিয়েছি, তখন সে কথা খেয়ালেই আনে নাই। আর ধর না কেন, কথার কথাটাই বোল্‌চি, মাঝে মাঝে দু-পাঁচ হাজার যদি আমার কাছেও ফেলে রাখ্‌তো, তা হোলেও ত এখন এই সব অনাথদের উপায় হতো? মনে কর যেন, আমি সে প্রত্যাশী নই, তবুও কথার কথাটা বোল্লেম।" এই প্রকারে ভূমিকা কোরে শেষে সুধাশেখর বোল্লেন, "তবে তুমি পরিবারদের নিয়ে এস। এই বাড়ীতেই থাক্‌বে। আমারই কাজ কর্ম্ম সব দেখ্‌বে শুন্‌বে। আমার সন্তান নাই, সন্তান হয়ে থাক্‌বে?—এই ত মত তোমার?"

"পরিবার নাই। সুধাশেখরের প্রশ্নে ত্রিপুরারির কেবল এই উত্তর। উত্তরটী শুনে আমরা সকলেই বিস্মিত হোলেম। সে কি? পরিবার

নাই? এ কি কথা? সুধাশেখরও তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে কি কথা? পরিবার নাই?" ত্রিপুরারি বোল্লেন, "সে লজ্জার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন মহাশয়! আমার চারিদিকেই ফর্সা! আমার স্ত্রীকে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে রেখেছিলেম। মকর্দ্দমার সময় কোথায় রাখি? বিশ্বাসী বন্ধু কি না, বিশ্বাস কোরে তাঁর কাছেই রেখেছিলেম। আমার স্ত্রী—আমারই বা এখন বলি কেন, সেই পাপীয়সী এখন আর আসতে চায় না। আমি শৈশবেই মাতৃহীন! পিতা সেই পর্য্যন্ত আর বিবাহ করেন নাই। অন্য একটী স্ত্রীলোক ছিলেন। আদর যত্ন কোত্তেন, তাঁর হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল। তিনিও আপন পথ দেখেছেন। বৃদ্ধা পিসীমা কাশীবাসিনী হয়েছেন। সব দিকই ফর্সা, বাকী কেবল আমিই আছি।"

অনেক সংবাদ পেলেম। ত্রিপুরারির সংসারের অনেক রহস্য প্রকাশ হলো। অনেক কথা জান্‌তে পেলেম।

সুধাশেখর বোল্লেন, "বিশ্বেশ্বর তেওয়ারীর জামাই যে খুন হয়েছিল, সে মকর্দ্দমার কি জান? কোন কিনারা হয়েছে কি?"

আমিও এ সংবাদ জান্‌তে বড় ব্যাকুল ছিলেম। মনের ভিতর এই কথাটাই এতক্ষণ তোলাপাড়া কোচ্ছিলেম। ঈশ্বরের ইচ্ছায়—কথার প্রসঙ্গে খোদ সুধাশেখরই সে কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। হলো ভাল।

ত্রিপুরারি বোল্লেন, "সে সংবাদও জানি। সে দিকেও সমান বিভ্রাট! প্রথমে অপ্রকাশই ছিল,—কর্ত্তার ছোটছেলে রুদ্রেশ্বরই বাদী হয়ে মকর্দ্দমা চালিয়েছিল। খুনের কোন কিনারাই হলো না। একরকম চুকেই গেল। শেষে ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে গেল, সব কথাই প্রকাশ হয়ে পোড়লো। লজ্জার কথা শেষে প্রকাশ হলো, কর্ত্তার সেজ মেয়ে কিরণবালা বাড়ীর রামসরকারের সঙ্গে যোগ কোরেই বিপ্রদাসকে খুন কোরেছে। পতিঘাতিনী খুনের দিনেই পালিয়ে গিয়ে মজঃফরপুরে থাকে। শেষে যখন প্রকাশ হয়ে গেল, তখন পুলিসের পোক্ত অনুসন্ধানে সবই বেরিয়ে গেল। আহা! হতভাগিনী যখন পালিয়ে যায়, তখন আর একটী দশ মাসের মেয়ে ছিল। পাপিনী সেই মেয়েটীকে পর্য্যন্ত ফেলে পালিয়ে ছিল। মকর্দ্দমা প্রমাণ হয়ে কিরণবালা আর রাম সরকার দুজনকেই জিঞ্জির যেতে হয়েছে। এ

জীবনে আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নাই। বিশ্বেশ্বর তেওয়ারীর পুরী একেবারে ছারখার হয়ে গেছে। বড় মেয়েটী মারা গেছে, সেজ মেয়ের এই দশা, ন-মেয়েও কাশীবাসী, আর ছোট মেয়েটী পলাতক! তাদের আর কিছুই নাই। আমি সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেম। যে লোকটীকে মথুরায় পাঠিয়েছিলেম, তার মুখে তাদের দুর্দ্দশা শুনে চোক্ ফেটে জল এলো। কোন কথা জিজ্ঞাসাই কোত্তে পাল্লেম না।”

অনেক তত্ত্ব পেলেম। মনের অন্ধকারও অনেকটা কোমে গেল। সুধাশেখর বোল্লেন, “যাক। যা হবার তা হয়েই গেছে। তবে এখন তুমি আমার এখানেই থাক। আমার কাজকর্ম্মই দেখ শোন।” ত্রিপুরারি সম্মতি জানালেন। আজ থেকে তিনিও এ বাড়ীর একজন হলেন!

মামার যে দুর্দ্দশা হবে, কা যে দিন আমরা পালিয়ে আসি, মামার বাড়ী যে দিন পুলিসে ঘেরাও করে, মামার কীর্ত্তিকাহিনী পথে যেতে যেতে যখন সব জান্‌তে পেরেছিলেম, তখনি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেম, এতদিনে মামার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হলো। আহা! মামার পরিণাম কি শোচনীয়! ত্রিপুরারি যখন আপন ঘরে বন্ধু আন্‌তো, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস কোরে তিনজনে এক বিছানায় শুতো, একপাতে খেতো, তখন ত্রিপুরারির পরিণামও যে ভাল হবে না, তাও জান্‌তে পেরেছিলেম। ত্রিপুরারি বন্ধুর নাম করেন নাই, আমি কথার ভাবে নিশ্চিত বুঝ্‌তে পাল্লেম, যে বন্ধুর সঙ্গে একত্রে শয়ন, একত্রে সেই অজ্ঞাত আড্ডায় মদমাংস খেয়ে আমোদ-প্রমোদ, এই গুণের সাগর বন্ধুটী সেই তিনিই।

মামার শাস্তিতে আমার বড়ই কষ্ট হয়েছে। মামার অন্তরে অন্তরে যাই থাক, বাইরে কিন্তু তিনি বড় ভালমানুষ ছিলেন। আমাকে তিনি বড়ই ভালবাসতেন। তাতেই আমার যত কষ্ট। মনের ভিতর মামার সম্বন্ধে যে ধাঁধা ছিল, তা ত কেটে গেল। তাঁর পুত্রের মুখেই শুন্‌লেম মামার পরিণাম।

ষট্‌ত্রিংশ চক্র।

এ দেশে কি আইন নাই?

এখানে আজ প্রায় এক মাস আছি। শ্রীমতী আমাকে বেশ ভালবাসে। প্রায়ই দিনের বেলা আমি তার কাছেই থাকি। একদিন আমি যেমন যাই, তেমনি শ্রীমতীর ঘরে যাচ্চি,—দেখি, সুধাশেখর ঘরে; আর যাওয়া হলো না, দাঁড়ালেম। দেখ্‌লেম, দুজনে খুব ঝগড়া বেধে গেছে। সুধাশেখর রেগে রেগে বোল্‌চেন, "কেন তোমার অত লম্বা লম্বা কথা শুন্‌বো?—এখানে তোমার কি কষ্ট?—রাজরাণী হয়ে আছ, টাকার কাঁড়ির উপর বোসে আছ, যা ইচ্ছা তাই কোচ্চো, কষ্টটা কি তোমার? যখন তোমাকে প্রথম আনি, তখন তুমি কি বোলেছিলে? সে সব কথা কি মনে নাই? আমি তোমার কি ধর্ম্মনষ্ট কোরেছি? ধর্ম্মনষ্ট কোরেছে আর একজন, আমি শেষে তোমাকে আনি। এখানে তুমি আমার পরিবারের মত আছ, তোমার কষ্টটা কি?" শ্রীমতী বোল্লে, "কষ্ট নয়! আমি কি টাকা চাই,—টাকার জন্যে কি আমি দেশ ছেড়ে এসেছি? আমার বাপ ভায়ের টাকার অভাব কি? পাঁচ ভায়ের আমি এক আদরের বোন্। টাকার ভাবনা কি আমার? আমি এসেছি—তোমার জন্যে! তা তুমিও এখন তেমনি গা ঢাকা হচ্চো। এখন আর দেখা পাই না কেন? তুমি যদি আমার হয়ে দিনরাত আমার কাছে থাক, তা হোলে আমি সেই সুখই স্বর্গসুখ মনে করি। টাকা আমার দরকার কি?"

বিবাদ-ঝগড়া হোক, আজ একটা রহস্য জান্‌তে পাল্লেম। জেনে রাখ্‌লেম, শ্রীমতী সুধাশেখরের বিবাহিতা স্ত্রী নয়, রক্ষিতা স্ত্রী। মনের এক্‌টা ধোঁকা গেল। শ্রীমতীকে কিন্তু আমি কোন কথা বোল্লেম না। তার সঙ্গে আগে যে ভাব ছিল, এখনো ঠিক সেই ভাবই রইলো।

শ্রীমতী মাঝে মাঝে গঙ্গা নাইতে যান। আমিও দু-একদিন সঙ্গে

যাই। পাছে পালাই বোলে আগে যাওয়া নিষেধ ছিল, শ্রীমতীর কৃপায় এখন সে হুকুম পেয়েছি। খুব ভোরেই নাইতে যাই। এখানকার মেয়েরা গঙ্গায় নাইতে যায়, রাত ৮টার সময়। আমরাও সেই সময়ে যাই। গঙ্গার ধারে উড়ে ব্রাহ্মণেরা ছোট ছোট এক একখানি কুঁড়ে বেঁধে রেখেছে। ভদ্রঘরের মেয়েরা এক আধটা পয়সা দিয়ে সেই ঘরের ভিতর গিয়ে কাপড় ছাড়েন। ভদ্রঘরের মেয়েদের আব্রু রক্ষার জন্যে উড়েরা এই ঘর তৈয়ার কোরে রেখেছে।

একদিন আমরা নাইতে গেছি। দু-জনে নেয়ে উঠে উপরে আস্‌তেই একজন উড়ে আগ্রহ জানিয়ে বোল্লে, "মা! ঘরো মাঝে অসি কাপড় ছাড়ো।" সে দিন ঘাটে অনেক লোক। কাজেই আমরা সম্মত হয়ে ঘরের ভিতর ঢুকেই ত থতমত খেয়ে গেলেম! আমি আগে ছিলেম, আগেই ঘরে ঢুকেছিলেম, ঢুক্‌তেই থতমত খেয়ে বেরিয়ে এলেম। অবাক্ কাণ্ড! ঘরের ভিতর একখানি মাজুরীতে বোসে একটী যুবতী একটী নব যুবকের সঙ্গে প্রেমালাপ কোচ্চেন! দেখে বড় লজ্জা পেলেম। ভাবে বুঝ্‌লেম, উড়ে না জেনে আমাদের ঢুকতে বোলেছিল! এ সব কাণ্ড কি? গঙ্গা নাইতে এসে—গঙ্গার ধারে উড়ের ঘরে কুলের মেয়েদের এ কি? যুবকটী যে এর স্বামী নন, তা অনায়াসেই বুঝ্‌লেম। স্বামী হোলে ঠাকুরের ঘরে এ কাণ্ড কোরবে কেন? যাই হোক, ব্যাপারটা দেখ্‌তে হলো। আমরা আর একটী ঘরের ভিতর তাড়াতাড়ি ঢুকে কাপড় ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেম। অনেকক্ষণ পরে যুবা বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই যুবতীও বেরিয়ে এলেন। ঘেটেল ঠাকুরের হাতে একটী টাকা দিয়ে—চুপি চুপি কি বোলে স্নান কোত্তে নাম্‌লেন। স্নান হলো, আবার সেই ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়া হলো। সঙ্গে দাসী ছিল, সে কাপড় কেচে নিলে, গাড়ী ডাক্‌লে। দাসী সঙ্গে কোরে যুবতী গাড়ীতে উঠ্‌লেন। বড় বড় ঘোড়া-যোতা—আরদালীওলা গাড়ী গড়্‌গড় কোরে চোলে গেল।

বড়লোকের মেয়ে!—সুন্দরী! দাসী সঙ্গে কোরে গঙ্গাতীরে আজ যে কাণ্ডটা কোরে গেলেন, তা দেখে ত আমার পেটের ভাত চাল হয়ে গেছে। পাপিষ্ঠাদের দুষ্কার্য্য করিতে—তাদের এই সব পাপকাজের সহায়তা কোত্তে কতজন কত রকম যোগাড়-যন্ত্র যে কোরে রেখেছে,—তা

ভাব্‌তেও ভয় হয়। শ্রীমতী বোল্লে, "হরিদাসী! তুমি ত এই দেখ্‌লে, ও ঘরে রোজরোজই ঐ রকম হয়। ঘেটেল বামুনেরা ঐ ঘরটুকুর দৌলতে মাসে মাসে ৩০।৪০ টাকা উপার্জ্জন করে। তোমাকে আর এক যায়গায় আর এক কাণ্ড দেখাব, তা দেখে তুমি অবাক্‌ হয়ে যাবে।"

এ সব শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। সংসার-সর্ব্বরীর আর কত চক্রে যে ঘুত্তে হবে,—আর যে কত ভয়ানক ভয়ানক কাণ্ড দেখ্‌তে হবে, তা কেবল বিধাতাই জানেন।

ঘরে এলেম। সময় মত আহারাদি হলো। শ্রীমতী আর এক কাণ্ড দেখাবেন বোলেছেন, সেটী দেখ্‌বার জন্যে মন বড় চঞ্চল হয়েছে। শ্রীমতীকে বোল্লেম, "হাঁ গা! ঘাটে যে কাণ্ড দেখাবে বোলেছিলে, তা কবে দেখাবে?" শ্রীমতী বোল্লে, "আজই দেখাব। সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে যেও। কর্ত্তা আজ বাড়ীতে নাই, তিনি থাক্‌লে দেখ্‌বার সুবিধা হবে না। আজই ভাল।"

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরে রইলেম, সন্ধ্যা হলো। একখানা গাড়ী ডেকে দুজনে ভাল কাপড় পোরে বেরুলেম। অনেক দূর এসে একটা বড় বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ী দাঁড়ালো। আমরা নেমে গলির মধ্যে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেম। রাস্তায় দুজন লোক ছিল, তারা খাতির কোরে বোল্লে, "৮ নম্বর খালি আছে।" শ্রীমতী সম্মতি জানিয়ে উপরে উঠে গেল। আমিও গেলেম। একটী ঘরের মধ্যে ঢুকলেম। ঘরে লোক নাই। দিব্যি পরিষ্কার বিছানা পাতা, মশারী খাটানো। আমরা সেই বিছানায় গিয়ে বোস্‌লেম। একটা থপ্‌থপে বুড়ী এসে বোল্লে, "তোমরা কি লোক চাও?" শ্রীমতী বোল্লে, "না। আমাদের লোক আস্‌বে।" বুড়ী চোলে গেল।

এই বাড়ীর ওস্তাদ এই বুড়ী। শ্রীমতী তাকে দেখিয়ে দিলেন। বুড়ীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। রং কাল মিস, ভয়ানক মোটা—যেন কুন্‌কী হাতী, মাথায় টাক, ঘাড়ের দিকে ছোট ছোট চুল,—নাক বসা, চোকের কোণে কালি পড়া, দাঁত ফাঁক ফাঁক। বড় ধড়ীবাজ,—কথায় যেন হীরের ধার। ভদ্রপাড়ায় এর বড় পসার। দিনে পাড়ায় পাড়ায় গল্প কোরে বেড়ায়। পাঁচ কথায় বিশ্বাস জন্মিয়ে ঘরের বৌ-ঝিকে গাড়ী কোরে নাচ তামাসা, হরির কথা, থিয়েটার দেখাতে আনে। শেষে সে সব যায়গায় না নিয়ে গিয়ে এই বাড়ীতে আনে। বড় বড়

লম্পটের দল এখানে এসে পাপ কাজের ঢেউ তোলে। এই পসারে ছেলে-মহলে আর মেয়ে-মহলে তার বড় খাতির। ভদ্রলোকে বিশ্বাস কোরে আপন আপন মেয়েছেলে এর হাতে দেন, এ যে এদিকে কি সর্ব্বনাশ করে, তা ভেবেও দেখেন না। কতক্ষণ এখানে রেখে বুড়ী আবার সকলকে বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দেয়। যে যে বিষয় দেখার নাম কোরে মেয়েরা বাড়ী থেকে এসেছিল, বুড়ী সে সব লিখিয়ে দেয়। লুকিয়ে গোপন-ভাবে দুষ্কার্য্য করবার একমাত্র সহজপথ এরই আশ্রয় গ্রহণ। বুড়ী এই উপলক্ষে বেশ দশটাকা উপার্জ্জন করে। মেয়েরা ত আর পয়সার প্রত্যাশী নয়,—বাবুর দলের পূজা কেবল বুড়ীই গ্রহণ করে। এ সব কথা শুনে আমি ত অবাক হয়ে গেছি! ভয় হচ্ছে, পাছে কোন বদ্‌মায়েস আমাদের ঘরে আসে। শ্রীমতী বোল্লেন, "তাতে খুব কড়াকড়, কোন্ ঘরে কখন কে আস্‌বে যাবে, তা আর কেউ টের পাবে না।

আছি। কানে ঝম্‌ঝম্ মলের শব্দ গেল। বুঝ্‌লেম, শ্রীমতী যা বোলেছে, সে সবই সত্য। ভদ্রঘরের মেয়েদের কাণ্ড দেখে বড়ই কষ্ট হলো। শ্রীমতীর সঙ্গে চোলে এলেম। শ্রীমতী বুড়ীকে দুটী টাকা দিলে, বুড়ী খাতির কোরে বিদায় করলে। আসার সময় দেখ্‌লেম, ২।৩ খানা গাড়ীতে ভাল ভাল সুন্দরী যুবতী বোঝাই। দুই একজন মুখঢাকা বাবু ত সাঁ সাঁ কোরে বেরিয়ে গেলেন। আর এ পাপ দেখা যায় না। দুজনে তাড়াতাড়ি বাড়ী এলেম। রাত প্রায় ১১টা। মনে এখন এই একটা ধোঁকা, শ্রীমতী এ" খবর পেলে কোথা? এমন ঠিকঠাক, চেনা পরিচয়, আসা যাওয়া না থাক্‌লে কি হয়?

যত দেখছি, ততই অবাক কাণ্ড! আর একমাস কাটালেম। চার-দিকে আমার অপার ভাবনা। সর্ব্বেশ্বর কোথা গেলেন, রায় মহাশয়কে এরা পত্র লিখেছে—তারই বা কি হলো, এ ভাবনা ফুরাবার নয়। একটা বিপদ শীঘ্রই ঘোটবে, তা আমার মন যেন ডেকে ডেকে বোল্‌চে। এখন করি কি? তিনি কি আর এদেশে আস্‌বেন? আজ এক বৎসরেরও বেশী হলো, তাঁকে মশানে ছেড়ে এসেছি। তিনি আজও হয় ত সেই দেশেই আছেন। আত্মহারা—পত্নীহারা হয়ে—মর্ম্মব্যথায় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার ভার বুকে নিয়ে অতি কষ্টে কষ্টের বোঝা বইছেন। যখন এ সব ভাবি, তখন আমাতে আমি থাকি না।

একদিন একলা বোসে ভাব্‌ছি, হঠাৎ চারিজন বিকটাকার লোক আমার ঘরের ভিতর এসে উপস্থিত। অন্যমনস্ক ছিলেম, চোম্‌কে উঠ্‌লেম। ভয়ে ভয়েই চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম। লোক চারি জনের সমস্ত শরীর মোটা কম্বলে ঢাকা, মুখে কাল রং দেওয়া, হাতে ছোরা। আমি এদের ভাবভঙ্গী দেখেই—ভয়ে ভয়েই চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম। মনের ভিতর কেমন যে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হলো, তা প্রকাশ কোরে বলা যায় না।

একজন লোক ছুটে একখানা কাগজ নিয়ে এলো। কাগজখানার উপরে কতকটা চিত্র করা। একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বোল্লে, "ভাল চাও ত এখানে লেখো—আমি যা বলি, তাই লেখো। তা না হোলে তোমার প্রাণ যাবে।" করি কি? আমার চারিদিকে চারিখানা ছোরা আমার ঘাড়ের রক্ত খাবার জন্যে উঁচু হয়ে রইল। ভয়ে ভয়ে কলম ধোল্লেম। লোকটা বোল্লে, "লেখ।—আমার পিতার সমস্ত বিষয়ে উইলসূত্রে দখলীকার হইয়া আমার তীর্থভ্রমণের ইচ্ছায় টাকার আবশ্যক হইবাতে সমস্ত সম্পত্তি আমার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত গদাধর রায় মহাশয়ের নিকটে নগদ বার হাজার টাকায় বন্ধক রাখিলাম। মেয়াদ অত্র সনের চৈত্র তক। মেয়াদ মধ্যে দেনা পরিশোধ না হইলে সমস্ত বিষয় বাজেহাম বাজেয়াপ্ত হইয়া উত্তমর্ণের দখলে আসিবে। আমি সুস্থশরীরে সজ্ঞানমতে টাকা বুঝিয়া পাইলাম।" লেখা হ'লো, নীচে নাম সই কোল্লেম। লোকগুলো চোলে গেল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে বোসে রইলেম। বেশ বুঝ্‌লেম, এই চারি জন লোক আমার সমস্ত বিষয়ের বন্ধক-নামা লিখিয়ে নিলে।

লিখিয়ে নিলে, তাতে আমার দুঃখ নাই। যদি তাঁকে পাই, তবে ভিক্ষা কোরেও দিন চোল্‌বে, কিন্তু এই কথায় আর এক কথার প্রকৃত তত্ত্ব জান্‌লেম। রায় মহাশয় আমার অন্য কেহ নন, খুড়া মহাশয়। সরোজবাসিনী আমার বোন, গিন্নী—খুড়ী মা। খুড়া মহাশয় কেবল টাকার লোভেই আমার দেশান্তর কোরেছেন। খুড়া মহাশয় যদি বোল্‌তেন, তা হোলে তখনিই ত আমি সমস্ত বিষয় ছেড়ে দিতেম, তা হোলে ত আর এত কষ্ট পেতে হতো না, তাঁকেও হারাতেম না!

যাই হোক, কিন্তু এদেশে কি আইন নাই? গঙ্গা ঘাটের কাণ্ড, বুড়ীর

কাণ্ড, আর এই এখনকার জোর জুলুমের ব্যাপার দেখে, কেমন সন্দেহ হয়। মনে মনেই উদয় হয়,—এদেশে কি আইন নাই?

উনচত্বারিংশ চক্র।

দুই বউই সমান।

আর এক মাস গত।—সুধাশেখর, শৈলধর, পরিবারবর্গ, সকলেই বিষম জুয়াচোর! নিত্যই নূতন নূতন জুয়াচুরীর খবর পাই। এ সব কাণ্ড দেখে দেখে বড় বিরক্তি বোধ হয়েছে। আর সে সব জান্‌তে তত ইচ্ছা হয় না। আপনার ভাবনাতেই বিব্রত, সে সব সন্ধানে আর মন নাই।

একদিন দুপুর বেলা একলা ঘরে বোসে ভাব্‌চি। অন্য ভাবনা নয়, চিঠির বিষয়। যে আধখানা চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছি, সেই চিঠির ভাবনা ভাব্‌চি। চিঠিখানি আমার সাম্‌নেই পোড়ে আছে। আপন মনে ভাব্‌চি, এমন সময় সুধাশেখর ঘরের ভিতর এলেন। আমি তাড়াতাড়ি চিঠিখানি লুকুতে যাব, পাল্লেম না। সুধাশেখর খাঁ কোরে চিঠিখানা নিয়ে, আমাকে কিছু না বোলে সাঁ কোরে বেরিয়ে গেলেন। আমি হতবুদ্ধি হয়ে বোসে রইলেম। কাজটা বড় ভাল হলো না। আমি এখানে গোপন ভাবেই আছি। এদের কাণ্ড-কারখানা আমি যেন কিছু জানি না, এই ভাবেই আছি। চিঠিখানা ধরা পড়ায় আমার সেই গুপ্তভাব আর রইল না। আবার একটা নূতন ভাবনা এসে জুটলো।

সেদিন ভাবনাতেই কেটে গেল। তার পরদিন সকালে সুধাশেখর এসে বোল্লেন, "হরিদাসি! আমরা কাশী যাব। সেখানে প্রায় তিন চার মাস হবে। এতদিন তুমি কোথায় থাকবে? তোমার যদি কোন জানাশুনা স্থান থাকে বলো, তোমাকে সেইখানে পাঠিয়ে দি; আর যদি তা না থাকে, তবে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে চলো, তোমার

রেখে আসি।” এখান হতে আমাকে তাড়াবার কোন কারণই ভেবে পেলেম না। মনের কথা গোপন কোরে বোল্লেম, “আমি ত আগেই বোলেছি, কোথাও আমার জানাশুনা নাই। আপনি যেখানে রেখে যাবেন, সেইখানেই থাকবো।” সুধাশেখর বোল্লেন, “তবে এখনি চলো। বেশী বিলম্ব কোরো না।”

তখনি বেরুলেম। গাড়ীতে উঠে তখনি সুধাশেখরের বন্ধুর বাড়ী এলেম। বন্ধুর বাড়ী নিসেনতলা। বন্ধুটী বেশ বড়লোক! নাম হরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়। কনিষ্ঠের নাম প্রাণহরি। মস্ত কারবার, কর্ত্তা নিজে খাজনাখানার খাজাঞ্চী, লাখ্‌পতি লোক। মস্ত বাড়ী, গাড়ীজুড়ী, বাবুদেরও মস্ত মস্ত ভুঁড়ী।—আমীর লোক। সুধাশেখরের অনুরোধে হরহরিবাবু সাদরে আমাকে স্থান দিলেন।

পরিবারের মধ্যে দুই ভায়ের দুই পরিবার। আর বড়বাবুর প্রথম-পক্ষের একটী মেয়ে। বড়বাবুর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর বয়স কুড়ি বাইশ, চেহারাটীও বেশ। বড়লোক, সুন্দরী দেখেই বিবাহ কোরেছেন, নাম প্রেমময়ী।—ইনি নূতন বউ নামেই পরিচিত। ছোট বউ বয়সে বড়-বউয়ের চেয়ে ২।৩ বৎসরের বড়, এঁর নাম মেঘাঙ্করেখা। বড় বড় ঘরে আজ কাল নাম নিয়ে বড়ই গোল বেধে উঠেছে। নূতন নূতন নাম রাখ্‌তে গিয়ে বাবুরা অভিধানের বাজার গরম কোরে তুলেছেন। সেকালে ক্ষেমী, বামী, রামী, শ্যামীর কোন বালাই ছিল না। মেয়েটীর নাম লাবণ্য-কুমারী, বয়স ষোল সতের। বিবাহ হয়েছে, কিন্তু স্বামী নিরুদ্দেশ। বড়-মানুষের মেয়ে—কোন কষ্ট নাই; আমিও এই পরিবারের একজন হোলেম। এ পর্য্যন্ত কত পরিবারেই যে মিশ্‌লেম, তার আর সংখ্যা নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়,—কোথাও সুখ পেলেম না।

আমি আমার তিন মাস পরেই বড়বাবুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর এক মাস পরেই নূতন বউ এক কীর্ত্তি জাহির কোল্লেন। বাড়ীর দরোয়ান হনুমান-সিং তাঁর ঘরে ধরা পোড়্‌লো। নূতন বউ প্রকাশ্যভাবেই সে কথা স্বীকার কোল্লেন;—বুক ফুলিয়ে বোল্লেন, “আমার খুসী। আমি কারো এলেকা রাখি না।” নূতন বউয়ের তেজে আর কেউ কথা বোল্‌তে সাহস কোল্লে না। আমি বড় বড় ঘরের কাণ্ড ঢের জেনেছি, এ রকম দেখা আমার নূতন নয়, সুতরাং এতে আর বেশী আশ্চর্য্যজ্ঞান কোল্লেম না।

একদিন সকালে বাড়ীময় এক্‌টা গোল উঠ্‌লো—ছোটবউ কথা গেছে! আমিও বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে গেলেম। লাবণ্য আমার কাছে এসে বোল্লে, "হরিদাসি! সর্ব্বনাশ হয়েছে। খুড়ীমাকে পাওয়া যাচ্ছে না।" লাবণ্যকে বুঝিয়ে ছোট খুড়ীমায়ের ঘরে গেলেম চারদিকে অনুসন্ধান কোরে দেখ্‌লেম, কোথাও তিনি নাই। সমস্ত দিন কেটে গেল। সন্ধ্যা বেলা একজন ঝি একখানা চিঠি এনে নূতন বউয়ের হাতে দিলে। নূতন-বউ পোড়্‌তে জানে না, লাবণ্যও না, কাজেই আমাকে ডাক পোড়্‌লো। আমি গিয়ে চিঠীখানি পোড়্‌লেম্। এ চিঠী ছোট খুড়ীমা লিখেছেন। পত্রে লেখা আছে,—চারটী ছত্র।

"স্বামী যাহার মাতাল, বেশ্যাসক্ত, তাঁহার মুখ এই-রূপেই উজ্জ্বল হয়। স্বামীকে বলিও, আমি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি।—আমার এ কার্য্য তাহারই আদেশে।"

পত্র এই চারটী ছত্র। পত্রখানি পোড়ে লোকটীকে খোঁজ কোল্লেম। ছোটখুড়ীমা কোথায় আছেন, কি ভাবে আছেন, জিজ্ঞাসা কোরবো মনে কোল্লেম। খুঁজ্‌লেম, সে লোকটী আর নাই। ছোটখুড়ীমা যা কোল্লেন, তা ভালই কোল্লেন।

এক মাস পরে ছোট খুড়ীমা একজন উকীল দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা চেয়ে পাঠান। ছোটবাবু তাতে অস্বীকার করেন। না কোরবেনই বা কেন? পবিবার কুলের ধ্বজা উড়িয়ে—বারান্দায় দাঁড়িয়ে লোক হাসাবে, আর ছোটবাবু টাকা দেবেন, এও কি এক্‌টা কথা? ছোটবাবু অস্বীকার কোল্লেন। উকীলের পরামর্শে ছোট খুড়ীমা আদালত কোল্লেন। মাস-হারা পাবার জন্যে এক দিগ্‌গজ মকর্দ্দমা খাড়া হলো। আদালতের একজন বড়দরের উকীলের সঙ্গে ছোটখুড়ীর আন্তরিক আলাপ ছিল, সে প্রাণপণে লোড়ে—অনেক কাণ্ড-কারখানা কোরে শেষে ডিক্রী নিয়ে দিলে। ছোট খুড়ীর মকর্দ্দমায় জিত হলো, মাসিক, পাঁচশ টাকা হিসাবে মাসহারা পেলেন।

আশ্চর্য্য কাণ্ড! হিন্দুরমণী কুলত্যাগিনী হোলে পিতা বা স্বামীর বিষয়ে তার তিল পরিমাণেও অধিকাব থাকে না। কুলটার—সন্তান

পিতৃবিষয়ে অধিকার পায় না। পূর্ব্ব পিতা বা সত্য পিতা, কোন পিতাকেই সে পিতা বোলে সাব্যস্ত কোত্তে পার্‌বে না;—এই হিন্দুধর্ম্মে, হিন্দু আইনে আছে, শুনতে পাই। পিতৃধনে বা স্বামীধনে অধিকার পাবে না বোলেই অনেক কুলটা ইচ্ছা সত্ত্বেও মাথার কাপড় ফেলে রাস্তায় দাঁড়াতে সাহস করে না। আর আজ কি আইনবলে এই কাণ্ডটা হোলো, তা ভেবেও পেলেম না। ধর্ম্মের উপরে হাত দিয়ে কোন নূতন বিধি প্রচলিত কর্‌বার অধিকার অন্য কাহারও আছে কি না, সেটা জিজ্ঞাস্য বটে।

ছোট খুড়ীমাকে আর কে পায়? তিনি মনের সুখে নিত্য নূতন প্রেমের আস্বাদ গ্রহণ কোচ্চেন। এদিকে নূতনবউ দরোয়ান নিয়ে তেতালার উপরে সুখে রাজত্ব কোচ্চেন। দুইজনেরই সুখের সীমা নাই।—দুই বউই সমান।

চত্বারিংশ চক্র।

ভাঁড়ু দত্ত।

এখানেও প্রায় তিন মাস কাটালেম। একদিন একটা বিবাহে আমাদের সপরিবারের নিমন্ত্রণ হলো মস্ত জাঁকের বিবাহ।—বিবাহ-বাড়ী বেশী দূরে নয়। যাঁদের বাড়ী বিবাহ, তাঁরা দত্ত। তবে অনেক দিনের ভালবাসা থাকায় এঁদের সঙ্গে তাঁদের ব্রাহ্মণশূদ্রের ভেদাভেদ নাই। কর্ত্তার নাম শুন্‌লেম, ভাঁড়ু দত্ত। ভাঁড়ু দত্তের অনেক বিষয়। মস্ত আড়ৎদার, বাংলা দেশের বড় বড় সহরে কারবার আছে।—ধনও বিস্তর। সমাজে—কারবারস্থানে—সাহেবমহলে চারিদিকেই ভাঁড়ু দত্তের সম্ভ্রম আছে। এঁর তিন ছেলে, পাঁচ মেয়ে, মস্ত সংসার! ছোট ছেলের বিবাহ। আমরা সপরিবারে সন্ধ্যার সময় ভাঁড়ুদত্তের বাড়ীতে গেলেম। ততদিন সেইখানেই থাক্‌লেম। ফুলশয্যার দিন রাত্রে বৈঠকখানায় কেদারা টেবিলের রাশ পোড়্‌লো। সন্ধ্যার পর বড় বড়

জুড়ীতে রাশ রাশ সাহেব-বিবি এসে বৈঠকখানা পূরে ফেল্লে। বাইনাচ হলো, রাত্রে সাহেবভোজ হলো। ধূম ব্যাপার! ভাঁড়ুদত্ত নিজে ইংরেজী জানেন না, কিন্তু তাতে ভোজের কোন অন্যথা হলো না। একজন ইংরেজি-জানা লোক সঙ্গে কোরে কুষ্মাণ্ডাকার ভাঁড়ু বাবু যেন যাত্রার দলের নকীব সেজে দোরে দাঁড়িয়ে সাহেব-সুবোদের অভ্যর্থনা কোল্লেন।

ভাঁড়ু বৈষ্ণবের শিরোমণি। মাথায় দেড় হাত বরাদ্দ চৈতন্য, নাকে রসকলি, গলায় তুলসী মালা। ত্রিসন্ধ্যা হরিনাম না কোরে ভাঁড়ু জল খান না! আজ কিন্তু ভাঁড়ুর বেশ ভিন্ন প্রকার। নাকের রসকলি মুছে সেখানে চস্‌মা লাগিয়েছেন, কলারে তুলসীমালা চাপা আছে, মাথার কাল টুপী চৈতনটীকে সযত্নে কুক্‌ড়ে নিয়ে আপন গর্ভে ধারণ কোরেছে। পরমবৈষ্ণব ভাঁড়ু দত্ত হাল আইনমতে এখন একজন ঘোরতর সাহেব! গৌরাঙ্গ নবদ্বীপচন্দ্রের পরমভক্ত ভাঁড়ু দত্ত এখন সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গদেবের আরাধনায় মন দিয়েছেন। চারিদিকে ধুম পোড়ে গেছে।

ভাঁড়ুর চরিত্র বড়ই নূতন। প্রকাশ্যে পরম ভাগবত; আমিষ তৈল স্পর্শও করেন না, কিন্তু এদিকে ত ব্যাপার এই শুনতে পাই। মাঝে মাঝে নূতন নূতন বারনারীর সঙ্গে ভূঁড়ি নেড়ে বাগান যাওয়াও আছে। যখন বাগানে যান, বাগানে থান, তখন যে মদমাংস চোলবে, সেটা ত এক রকম ধরা কথা। এমন আটপিটে লোক খুব কমই মেলে। এই সব দেখে শুনে আমরা তিন দিন পরে বাড়ী এলেম। বাড়ীর মধ্যে যে সব কাণ্ড, তা আজও সেই রকমই চোলেছে।

পোনের দিন পরে আর এক যায়গায় আবার নিমন্ত্রণ।—বাসন্তী পূজার নিমন্ত্রণ!—শুনলেম, যাঁদের বাড়ী পূজা, তিনি স্বর্গীয় হরহরিবাবুর বন্ধু। বড় বড় লোকদের বড় বড় বড় ঘরে এই রকম প্রণয়ই থাকে। পূজা কায়স্থবাড়ী।—নাম তাঁর যশস্বীচন্দ্র মিত্র। মিত্রজ সম্বন্ধে অনেক কথা—অনেক গুপ্তরহস্য নূতন বউ বোল্লেন। লোকে নিজের ছিদ্র দেখ্‌তে পায় না। যে যত দোষী, সে পরের দোষ তত অনুসন্ধান করে। সংসারের এইটেই বিচিত্র! নূতন বউ বোল্লেন, "কর্ত্তা প্রকৃতই কায়স্থ নন! তাঁর মাতা গোপকন্যা, পিতা উড়িষ্যা দেশের কায়স্থ।"

নিজের অদৃষ্টগুণে—টাকার জোরে—ভাল ভাল করণ-কারণ কোরে ইনি এখন কুলীনচূড়ামণি হয়েছেন।—কায়স্থসমাজের সমাজপতি হয়েছেন। এখন সে সব প্রাচীন প্রবাদ ঢেকে আছে। পূজার সময় বড় বড় কুলীনব্রাহ্মণের পদধূলি পড়ে।" শুনে ত আশ্চর্য্যজ্ঞান কোল্লেম। কলিকাতা আজব সহর। এখানে যে যা করে, যে যা বলে, তাই শোভা পায়। আজ কাল কলির মহিমায় ঐ সব লোকেরই মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি বেশী। তা না হোলে কলির নাম থাক্‌বে কেন?

পূজায় আমরা গেলেম। তিন দিন থেকে আবার বাড়ী ফিরে এলেম। পূজা বেশ জাঁকজমকেই সমাধা হলো। অনেক লোক ক'দিন ধোরে চর্ব্য চূষ্য আহার কোল্লে। অন্ন বিতরণে বাবুর কীর্ত্তি অক্ষয় রইল।

এই রকম পাঁচ রকম কাজ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও তিনটে মাস মাথার উপর দিয়ে চোলে গেল। ছোটবাবু দিন দিন আরও খারাপ হয়ে যাচ্চেন। ঘরে স্ত্রী নাই, যা খুসী তাই কোচ্চেন। এই সব দেখে ভাঁড়ুদত্ত বড়বাবুর উইলের বলে নিজে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক হোলেন। ভাঁড়ুদত্ত আমাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা হোলেন, ছোটবাবুর মাসহরা বন্দোবস্ত হলো। তিনি অগত্যা বাড়ী ছেড়ে উপপত্নীর মন্দিরেই চিরস্থায়ী বসস্থান স্থির কোল্লেন।

লোকের মনের গতি ত চিরদিন সমান যায় না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দরোওয়ানের কপাল ভাঙ্‌লো। সে এতদিন ঘৃতপক্ক দাল রুটীর আদ্য-শ্রাদ্ধ কোরে যে মনসুখে ছিল, সেটুকু তার আর থাক্‌লো না। নূতন বউ পূর্ব্ব প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ হাজার কতক টাকা উপহার দিয়ে দরো-য়ানজীকে দেশে পাঠালেন। শ্রীমান্ ভাঁড়ুরাম এখন সর্ব্বময় কর্ত্তা হোলেন। চারদিকে সাড়া পোড়ে গেল, হরিহর বাবুর ত্যজ্য স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তির দেল-দুনীয়ার মালিক—শ্রীমৎ ভাঁড়ুরাম দত্ত।

একচত্বারিংশ চক্র।

আমার বিপদ পদে পদে।

ভাঁড়ুদত্তের কর্তৃত্বে ছোটবাবু সন্তুষ্ট নন। তাঁর দরকার মত টাকা চেয়ে পান না। মোসাহেবেরা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে, "তোমার টাকা, তোমার ধন, সে ব্যাটা পর বৈ ত নয়! তার ক্ষমতা কি? রাখ্‌তে হয় তুমি রাখ্‌বে, উড়িয়ে দিতে হয় তুমি উড়াবে। তার তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?" বাবুও এই রকম বুঝেছেন। তিনি বারম্বার ভাঁড়ুদত্তের নিকাশ চেয়েছেন,—কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে বোলেছেন, ভাঁড়ু সে কথা আমলেই আনে নাই। ছোটবাবুও আর কোন কথা তুলেন নাই।

একদিন অনেক রাত্রে—রাত যখন প্রায় একটা, এমন সময় আমাদের ঘরের বারান্দা দিয়ে দুপ্ দুপ্ কোরে দুজন লোক ছুটে পালালো। তাদের পায়ের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল! আমি আর একজন ঝি একঘরে থাকতেম, আমার পাশের ঘরেই লাবণ্য থাকে। লোক দুজন সেইদিক থেকে দৌড়ে গেল। তারা যেতেই লাবণ্যের ঘরের দিকে একটা ভয়ানক চীৎকার শব্দ হলো। শব্দটা যেন সম্পূর্ণ হলো না। তার পরেই লাবণ্য চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুল্লেম, ঝিও আমার পাছু পাছু গেল। অন্ধকারে কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না, ঘরের ভিতর কেবল গোঙানী শব্দ শুন্‌তে পেলেম! তাড়াতাড়ি লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি?—হয়েছে কি?" লাবণ্য চীৎকার কোরে বোল্লে, "সর্ব্বনাশ হয়েছে। ঠাকুর খুন হয়েছেন।"

শুনে ত আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো। এর মধ্যে আলো নিয়ে ভাড়রাম এলেন। আলোতে দেখি,—ঘরের মেঝেতে রক্তের ঢেউ খেল্‌চে, গুরুঠাকুর প্রেমানন্দ গোস্বামী গলাকাটা অবস্থায় পোড়ে ছট ফট কোচ্চেন। ভাঁড়ুরাম বোল্লেন, "লাবণ্য! চুপ্, চুপ্, চেঁচিও না! ভয় কি? ব্যাপারটা কি বলো দেখি। লাবণ্য বোল্লে, "ঠাকুর ঘরে শুয়েছিলেন,—আমি ঘুমিয়ে

পোড়েছিলেম; কিছুই জানি না। ঠাকুরের গোঙানী শুনে উঠে দেখি, এই।" ভাড়ু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেন? ঠাকুর মহাশয়ের ত আলাদা বিছানা আছে, তিনি তোমার ঘরে এলেন কেন?" লাবণ্য কোন উত্তর কোল্লে না। ভাঁড়ুদত্ত একটু চিন্তা কোরে বোল্লেন, "থাক, যা হবার তা ত হয়ে গেছে। কোন ভয় নাই। সকলে চুপ চাপ থাক, আমি আস্‌চি।" ভাঁড়ুদত্ত কোথায় চোলে গেলেন।

আমি আর এখানে দাঁড়াতে পাল্লেম না। নূতন বৌয়ের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জান্‌বো ভেবে তাঁর ঘরের দিকেই চোল্লেম।

যাচ্চি।—প্রাণে বড় ভয় হয়েছে কি না, মড়ার মতই যাচ্চি। সিঁড়ির ঘরের পাশে দুজন লোক ফিস্ ফিস্ কোরে কি বলাবলি কোচ্চে শুন্‌তে পেলেম। আরও ভয় হলো!—ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার কৌতূহল হলো, ব্যাপারটা কি জান্‌বার জন্যে সেইখানেই আড়ি পেতে রইলেম।

লোক দুজনের একজন চেনা।—আমাদের ছোটবাবু। ছোটবাবু বোল্লেন, "সর্ব্বনাশ কোরেছে। মানুষ চিন্‌তে পাল্লে না? শেষে গুরুহত্যা হলো? হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ কোল্লে?"—আর একজন বোল্‌চে, "আরে, তা কি জানি? উনি যখন ঐ ঘরে ঢোকেন, তখন আমরা ভাব্‌লেম, ভাঁড়ু দত্ত। তা না হোলে ভূত রাত্রে পা মেরে মেরে মেয়েলোকের কাছে যায় কে? এই দেখেই ত আমরা এ কাজটা কোরেছি। এখন ত আর উপায় নাই! তুমি এত ভেবো না। ভয় কি?" ছোটবাবু ভেউ ভেউ কোরে কেঁদে বোল্লেন, "আর উপায়! একেবারেই আমি গেলেম! ভেঁড়োর মাথা খেতে গিয়ে শেষে এই কাজটা কোল্লেম! ছুঁড়ীর পেটে পেটে যে এত ছিল, তা একদিনের তরেও জান্‌তে পারি নাই। গুরুপুত্র ঘন ঘন আস্‌তেন, আমরা ত জান্‌তেম, এ তাঁর অনুগ্রহ। তিনি যে এমন সর্ব্বনাশ কোরবেন, তা কি আগে জান্‌তেম? থাক, যা হবার—তা ত হলো, এখন উপায়?" লোকে ভেবে চিন্তে বোল্লে, "তাতে আর ভয় কি? একটা তালিম কোত্তে পাল্লেই হলো। তোমাদের বাড়ীতে একটা ছুঁড়ী আছে না? যত দোষ সব তার ঘাড়ে চাপাও। তোমরা সকলেই বোল্‌বে, ছুঁড়ীর স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না। বোধ হয়, দুই উপপতিতে বিবাদ কোরে কাটাকাটি কোরে মোরেছে।"—ছোটবাবু বোল্লেন, "সে নির্দ্দোষী,

আদালতে এমন বজনিস্ মিথ্যাকথা কি টিকবে?” লোকটী বোল্লে, “কেন টিকবে না? সত্য মিথ্যা ত হাকিমেরা দেখ্‌বে না। সাক্ষীর মুখে মকর্দ্দমা। হাকিম যদি জান্‌তেও পারে, এটা সাজানো মকর্দ্দমা, তা হোলেও বিনা প্রমাণে কিছু করবার যো নাই। ভাঁড়ুর সঙ্গে প্রণয় কোরে এই যুক্তিই করগে যাও।” আমি ত আর নাই! এরা আমার সর্ব্বনাশ কোত্তে যে ফন্দি খাটালে, তাতেই ত আমি গেছি! আমি এখন করি কি?—আমার বিপদ কি পদে পদে? হা ভগবান! আর কতবার কতরকম বিপদে ফেল্‌বে? আর কত কষ্ট দেবে?

এখন আমি করি কি? রাত পোহালেই ত আমাকে ধোরে চালান দেবে। বাড়ী শুদ্ধ লোকের জবানবন্দীতে আমি যদি দোষী হই, তা হোলে আমার কথা কে শুন্‌বে? এখন আমি করি কি? বেশী বেশী ভয় হয়েছে; বুদ্ধি যোগাচ্চে না। এদিকে রাতও প্রভাত হবার বেশী বিলম্ব নাই। যা থাকে অদৃষ্টে ভেবে খিড়্‌কী দরজা দিয়ে পালালেম। ছুটে ছুটেই চোল্লেম। এক একবার ফিরে ফিরে চাই,—আবার ছুটি। পড়ি ত মরি, দৌড় দৌড়!—একেবারে ভোঁ দৌড়!

অনেকদূর এলেম। এখন মনে হলো, যাই কোথা! অনেকদূর এসেছি। একটা বড় বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্চি, দেখি, রাস্তার ধারের একটী ছোট দোর খুলে একটী মেয়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকচে। খুব চাপা গলায় বোল্‌চে, “শীগ্‌গির এসো। এত দেরী কেন? আমি ভাব্‌লেম, আবার হয় ত বিপদ!—আবার ভাব্‌লেম, দয়াময়ী বুঝি দয়া কোরে ডাকচেন। আহা! দয়ালুর প্রাণ পরের কষ্ট দেখ্‌লেই কাতর হয়।

তাড়াতাড়ি ছোট দরজার কাছে গেলেম। মেয়েটী বোল্লে, “দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এসো।” আমি বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেম। মেয়েটী দোর বন্ধ কোরে আগে আগে চল্লো। এক এক রহস্য! রাস্তায় চুপি চুপি অনেক কথা মেয়েটী জিজ্ঞাসা কোল্লে। আমিও ছোট ছোট কোরে দুএকটী উত্তর দিতে দিতে চোল্লেম। মেয়েটীর সঙ্গে বরাবোর উপরে উঠে এলেম। একটা ঘরের মধ্যে আমাকে নিয়ে গিয়ে প্রদীপ জাল্‌লে। প্রদীপের আলোয় আমার মুখের দিকে চেয়ে, যেন আঁৎকে উঠ্‌লো। ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে বোল্লে, “ওমা! তুমি কে?”—আমি কিছুই

বুঝ্‌তে পাল্লেম না। আমি কেবল বোল্লেম, "আমি অনাথা।" মেয়েটী ঝি। আমার সমস্ত কথা শুনে বোল্লে, "কোন কথা প্রকাশ কোরো না। বাড়ীর কারো কাছে কিছু বোলো না। কেবল বোল্‌বে, তুমি আমার বোন্‌ঝি।" আমি সম্মত হোলেম—রাত প্রভাত হলো। সকালে সকলেই আমাকে দেখে পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি ঝিয়ের কথামত আত্ম-পরিচয় দিলেম।

এ বাড়ীর কর্ত্তার নাম শিবনাথ মুখোপাধ্যায়। দু-চার দিন থেকেই এ বাড়ীর অনেক রহস্য জান্‌তে পাল্লেম। হায় হায়! সংসারের সকলেই এই রকম? আমি এত বাড়ী ঘুরলেম,—সব জায়গাতেই এই গতিক? ভাল কি কোথাও নাই? সাধ্বী কি জগতে নাই? বড় ঘরের কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক হয়েছি! দরিদ্র লোক যারা, তাদের সতীত্ব তাদের ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।—তাদের জন্যই সংসার আছে!

কর্ত্তার পুত্রবধুর সঙ্গে প্রবাদ। ছেলেটী মাতাল, গুলিখোর। পথে পথে, আড্ডায় আড্ডায় বেড়ায়। টাকার দরকার হোলে আপন ঘরে বন্ধুবান্ধব আনে। গোপনে আনে—আবার গোপনে বার কোরে দেয়! কর্ত্তা বুড়োবয়সে ধেড়ে রোগে অবসন্ন। মেয়ে তিনটী ত এক একজন এক এক সরেস। রাত্রে কারও টিকি দেখ্‌বার যো নাই। সে দিন মেয়েদের আস্‌বার সময় ঝি দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে চিনতে না পেরে মেয়েদেরই কেউ ভেবে ঢুকতে বোলেছিল। এদের বাড়ীর ব্যাপার দেখে আমি আর নাই! যে সব কথা শুন্‌লে কানে হাত দিতে হয়, যে সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা ছাড়া, সমাজে থেকে সেই সব কাজ এরা অনায়াসে কোচ্চে।—সমাজের বুকে বোসে এরা না কোচ্চে এমন কাজই নাই। সমাজ জানেন সব,—দেখ্‌চেন সব,—তবে এরা বড় বুনেদী লোক, কাজেই মুখ ফুটে কিছু বল্‌বার উপায় নাই।

ঝি একদিন সন্ধ্যার সময় বোল্লে, "হরিদাসি! এক তামাসা দেখ্‌তে যাবি? আমার সবাই যাব। আমার বোনপো যাবে, জামাই যাবে, আমিও যাব। তুই যাবি? বড় তামাসা!—আজ রাত্রে যাব, আবার কাল সকালেই চোলে আস্‌বো। একা থাকবি কোথায়?" আমি বোল্লেম, "কোথায়? কি তামাসা?" ঝি তামাসার ভূমিকায় এক ঘণ্টা কাটিয়ে

শেষে বোল্লে, "ঘোষপাড়ার মেলা! কত ভাল সং, কত নাচ তামাসা, যাত্রা,—নানা রকম কাণ্ড। কালই আস্‌বো। সন্ধ্যার সময় রেলের গাড়ীতে উঠলে রাত ১১টার সময় নামিয়ে দিবে। নেমেই মেলা। বেশী দূরও নয়।" এখানে একা থেকে আর লাভ কি? স্বীকার কোল্লেম। সন্ধ্যার সময় দুজনে বেরুলেম। রাস্তায় দুজন কালো কালো ঝাঁকড়া-চুলো ষণ্ডাগোচের লোক গাড়ীতে উঠলো। ভাবে বুঝলেম, একজন ঝিয়ের বোনপো, আর একজন জামাই।

গাড়ী এসে ঘুঘুডাঙ্গায় লাগলো। গাড়ী ছেড়ে এবার রেলের গাড়ীতে উঠলেম। ঝি একখানা বেঞ্চির উপর আঁচল পেতে শুয়ে পোড়লো। আমাকেও বোল্লে, "একটু ঘুমিয়ে নাও। রাত জাগতে হবে।" আমিও অগত্যা বেঞ্চির একপাশে শুলেম। একটু পরেই গাড়ীর ঝেকুনিতে ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম।

ঘুম ভেঙে গেল। উঠেই দেখি, ভোর হতে আর বিলম্ব নাই। ঝি বোলেছিল, রাত ১১টার সময় গাড়ী থেকে নাম্‌তে হবে। এখন বোধ হয় রাত চারটে। তবে কি ষ্টেশন ছেড়ে এলেম নাকি? কারণ জিজ্ঞাসা করবার জন্যে ঝিকে খুঁজলেম, ঝি নাই, কেবল সেই লোক দুজন বোসে আছে। সন্দেহে সন্দেহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম। উত্তরে শুন্‌লেম, তিনি আগে নেমেছেন। তুমি নাম। আমি বড় ভয় পেলেম! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ কোন্ ষ্টেশন?" উত্তর হলো,—"গোয়ালন্দ।"

আমাকে সেইখানে নামালে।—আমি বাধ্য হয়ে সেইখানেই নাম্‌লেম। গাড়ীও এর বেশী দূরে আর যায় না। আমি যে আবার একটা নূতন বিপদে পোড়েছি. তা তখন বুঝে নিলেম। আমার বিপদ ত পদে পদে!

ঝিয়ের সন্ধান করা বৃথা। লোকগুলি আমাকে একটা বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। সেখানে দেখি, ৬০।৭০ জন বুনো কুলি, ধাঙড়, ছেলে মেয়ে, পরিবার নিয়ে ঘোট কোচ্চে। আলাদা ঘরে ২।৩ জন বাবু আছেন। আমাকে নিয়ে লোক দুটী বাবুদের কাছে গেল। একজন বাবু বোল্লেন, "পূরা দাম পাবে না। এ লোক খাটতে পারবে কেন? লোক দুটী জেদাজিদি কোরে শেষে একটা রফা কোল্লে। আমাকে সেই ধাঙড়ের দলের মধ্যে বোসিয়ে রেখে লোক দুটী চোলে গেল।

ধাঙড়ের দল হেসে হেসে কত কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে, আমি কোন উত্তর দিলেম না। কেবল কাঁদতে লাগ্‌লেম। এ পোড়া অদৃষ্টে শেষে এতও ছিল?

দুপর বেলা একজন খুব মোটাগোচের বাবু এলেন। তখনি কেদারা, টেবিল পোড়ে গেল। এক মোট কাগজ নিয়ে একজন আরদালী হাজির হলো। সঙ্গে ৪।৫ জন সিপাহী। বাবু একে একে সব ধাঙড়-দের ডেকে কি কি জিজ্ঞাসা কোল্লেন। শেষে আমার ডাক হলো। আমি বাবুর সাম্‌নে হাজির হোলেম। বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম কি?" আমি নাম বোল্লেম। বাবু একখানা বড় কাগজ দেখিয়ে বোল্লেন, "এ কাগজ তুমি লিখেছ?" আমি বোল্লেম, "না।" বাবু এখানকার বাবুর দিকে চাইলেন। তিনি একবার চোক মুখ লাল কোরে বোল্লেন, "দেখ ভাল কোরে দেখ,—পড়ি, শোন।" বাবু পোড়্‌লেন, "আমি এতদ্দারা স্বীকার করিতেছি যে, স্বেচ্ছানুসারে ডাহারামুখ চা-বাগানের কুলীগিরি কর্ম্ম করিতে যাইতেছি। আমি পাঁচ বৎসর ছুটি লইব না। প্রথম তিন বৎসর পাঁচ টাকা ও শেষ দুই বৎসর মাসিক চারি টাকা হিসাবে বেতন লইব। কোন গতিকে কার্য্যে গাফিলতী করিলে বেতন কাটা যাইবে।" বাবু এইটুকু পোড়েই বোল্লেন, "কেমন, এই গিরিমেণ্ট ত তুমি লিখেছ?" বিষম বিপদ! প্রাণ একেবারে উড়ে গেল! বাবুর পায়ে ধোরে কেঁদে সমস্ত কথা জানালেম। আমি এর কিছুই জানি না বোল্লেম। বাবু যেন নরম হোলেন। এখানকার বাবুর সঙ্গে কি বলাবলি কোরে বোল্লেন, "আচ্ছা! তুমি এখন চালান যাবে না। বিবেচনা কোরে দেখবো।" আমি বোল্লেম, "আমি হেথা এক তিলও থাকতে চাই না। আমাকে বেরিয়ে যেতে আজ্ঞা দিন।—আমি অনাথিনী, আমার উপর আর অত্যাচার কোরবেন না।" বাবু বোল্লেন, "আচ্ছা, তুমি মকুফ পেলে।" বাবু উঠে গেলেন। আমিও তাঁর পেছু পেছু বেরুলেম। বাবু দরজা পেরুলেন, আমিও পেরিয়েছি, একজন লোক ডাকলে। একটা কথা শুনে যেতে বোল্লে। আমি যেমন দাঁড়িয়েছি, অমনি একজন ছুটে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ফেলে দরজা বন্ধ কোরে দিলে। আমি কত কাঁদলেম, কত করুণা ভিক্ষা কোল্লেম, এ সব নরপশু পাষণ্ড নরাধমের মনে

তার একটী দাগও পোড়্লো না। নিরুপায় হোলেম! হতভাগিনী আমি,—আমার বিপদ পদে পদে!

দ্বিচত্বারিংশ চক্র।

আমি বামাচারী।

বাড়ীর ভিতরেই সেদিন থাক্‌লেম। কত কষ্ট পেলেম, কত অকথা শুন্‌লেম, তা আর মুখে প্রকাশ করা যায় না। আমার প্রাণ যাই নিতান্ত পাষাণ, তাই এখনো আছে।

সকালেই আকাশে মেঘ উঠেছে। দুজন যমদূতের মত লোক আমাকে সঙ্গে কোরে বাড়ী হতে বেরুলো। লোক দুজনের চেহারার ভাব একই রকম, তবে প্রভেদ এই যে, একজন এক্‌টু ভাল কাপড় পরা, আর একজনের লেঠেলের পোষাক। আমাকে সঙ্গে করে বেরুলো। প্রায় এক ক্রোশ রাস্তা এসে সম্মুখে নদী দেখ্‌লেম। নদীর তোড় দেকে—ডাক শুনে—ঢেউ দেখে—প্রাণ ত শুকিয়ে গেল! এ নদী কি সমুদ্র, তা অনুমানেও আনতে পাল্লেম না। শ্রাবণ মাস,—ঘোলা জল, রাঙা রাঙা বর্ণ, তাতে আরও যেন ভয়ানক দেখাচ্চে। নদীর কুলে গিয়ে শুনলেম,—এরই নাম পদ্মা। পদ্মার নাম অনেক দিন হতে শোনা ছিল, আজ চাক্ষুস দেখ্‌লেম। প্রবাদ আছে, পদ্মা এক এক রাত্রে বিশ ক্রোশ ভাঙে। চেহারাতে তা বেশ বুঝ্‌লেম।

আকাশে মেঘ আছে। এলো মেলো বাতাস বইচে। খেয়া দেওয়া বন্ধ। বড় নৌকা পাড়ী জমাতে পার্ব্বে না ভেবে, খেয়া বন্ধ কোরেছে। ঘাটে প্রায় ৪০।৫০ জন লোক পারের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এই সময় মনে মনে এক্‌টা যুক্তি স্থির কোরে রাখ্‌লেম।

লোক সাহস কোরে কেউ পার হচ্চে না, এদের কিন্তু প্রাণে ভয় নাই। একজন ছুটে গিয়ে একখানা ডিঙি ভাড়া কোরে এলো! আমাকে বোল্লে, "এসো, ডিঙিতে উঠ।" আমি কথাও কইলেম না, উঠ্‌লেমও না। একজন এসে আমার হাত ধোল্লে।—টান্‌তেই আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম।

চারিদিকে লোক জমা হলো। আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "ওগো! তোমরা আমায় রক্ষা কর। এরা ডাকাত, আমাকে কোথায় ধোরে নিয়ে যাচ্চে। হয় ত কেটে ফেল্‌বে, না হয় ধর্ম্ম নষ্ট কোর্ব্বে। তোমরা আমায় রক্ষা কর!" যে লোকটীর ভাল কাপড় পরা, সে রেগে যেন তিনটে হয়ে বোল্লে, "বটে! ধর্ম্ম নষ্ট কোর্ব্বে?—কেটে ফেল্‌বে?—তাই ত উচিত। তুই আমার মুখ হাসিয়ে—বাড়ীর বার হয়ে কোথা গেছিলি?—আমি বুঝি তোকে খেতে দিতে পারি না?—আমার ঘরে বুঝি মন ধরে না?" অবাক কাণ্ড! সঙ্গের লোকটী বোল্লে, "আপনারা মশায় গোড়ার কথা জানো না। মেয়েটা বড় নচ্ছার। এঁরই পরিজন। না বোলে—না কোয়ে পালিয়ে যাচ্চিলো, তাই আমরা ধোরে নিয়ে যাচ্চি। কিছুতেই যেতে চায় না।" কথাটা লোকে বিশ্বাস কোল্লে। আমি যে কৌশল খাটালেম, তা ভেসে গেল। লোকগুলো উল্টে আমাকেই উপহাস কোর্‌তে লাগ্‌লো। আমি ত একেবারে মরে গেলেম। তখন আর করি কি? লজ্জায় ঘৃণায় মনে কোল্লেম, আজ পদ্মার গর্ভেই জীবন শেষ কোর্ব্বো। আর দ্বিরুক্তি না কোরে ডিঙিতে উঠ্‌লেম, ডিঙি ভাসিয়ে দিলে। ডুব্‌তে ডুব্‌তে—ভাস্‌তে ভাস্‌তে ডিঙি চোল্লো। এক এক্‌টা ঢেউ আসে, আর মনে হয়, এইবারই বুঝি গেলেম! আবার তখনি নিপুণ মাজীদের কৌশলে ঢেউ কেটে যায়।—আবার আশা হয়। এই রকম কোরে প্রায় পদ্মার মাঝামাঝি এলেম। মাজী হেঁকে বোল্লে, "কর্‌তা, না আর কুল পালে না। বরো ঝোরো ডাহিছে, চিক্‌রীর ঘায় চোহি ধাদি লাগ্‌দিছে, আর বুঝি পারি না।" মাজীর কথায় দেখি, সর্ব্বনাশ! বায়ুকোণে মেঘের চাপ বেঁধে গেছে। বাতাস একদম্ বন্ধ! ঝড় উঠতে আর বিলম্ব নাই। চেয়ে দেখলেম, কোন দিকে একখানি নৌকাও নাই, কেবল এই অনন্ত জলের ঢেউয়ের মধ্যে মোচার খোলার মত আমাদের ডিঙিখানা ভাস্‌চে। প্রাণের আশা নাই!

ডিঙি তখনো চোল্‌চে। হঠাৎ সাঁ সাঁ কোরে এক্‌টা শব্দ উঠে জোর বাতাস এসে ডিঙিতে লাগ্‌লো। সেটা সাম্‌লাতে না সাম্‌লাতে আবার এক্‌টা, আবার—আবার ক্রমান্বয়ে উপরি উপরি অসংখ্য আঘাত, ডিঙির ক্ষুদ্রপ্রাণে আর সয় কত? চাল উড়ে গেল, হাইল ভেঙে গেল, দাঁড়িরা দাঁড় ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে বোস্‌লো। নৌকা

যায়, আর থাকে না। আমি ধাঁ কোরে কাপড়খানা ভাল কোরে পোবে নিয়ে নৌকা ডোবার আগেই "মা ব্রহ্মময়ি! পতিতোদ্ধারিণি! স্থান দিও মা—" বোলে ঝাঁপ দিলেম। তার পর কি হলো, কিছুই জানি না!

যখন জ্ঞান হলো, তখন আমি জলে নয়,—কূলে। কোথায় উঠেছি, কি কোরে উঠেছি, কিছুই জানি না! শরীর বড়ই অবসন্ন—শীতে কাঁপচি, বুকের মধ্যে থেকে থেকে গুর্ গুর্ কোচ্চে। উঠতে ইচ্ছা কোচ্চে না, ক্ষমতাও নাই। চোক বুঁজেই শুয়ে আছি। মনে হচ্চে, যেন সুকোমল সুখশয্যায় শুয়ে আছি। ক্রমে জ্ঞানের সঞ্চার হতে মনে হলো, যেন কার উরুতে আমার মাথা রয়েছে। গায়ে যেন আগুনের তাপ লাগ্চে। তবে নিশ্চয়ই কোন দয়ালু ব্যক্তি আমাকে রক্ষা কোরেছেন। মনে মনে ভাবচি, দু ফোঁটা গরম জল আমার গায়ে পোড়্লো। সন্দেহ হলো চেয়ে দেখ্লেম, আর চাইতে পাল্লেম না!—মাথা ঘুরে গেল! কি যে দেখ্লেম, তা ভুলে গেলেম। আবার দেখ্লেম—আবার

ভাল কোরে দেখ্‌লেম,—প্রাণের নিভৃতে যেন একটু আনন্দসঞ্চার হলো। কিন্তু এর কারণ বুঝ্‌তে পাল্লেম না। এ মুখ যেন চেনা, এ মুখ একদিন যেন বড় ভাল লেগেছিল, কিন্তু কোথায়, তা ভেবে পেলেম না। একবার মনে হলো, আমি কি লজ্জাহীনা? একজন পুরুষের উরুতে মাথা রেখে—চেতন হয়েও মাথা রেখে শুয়ে আছি? বড় ঘৃণা হলো, উঠতে ইচ্ছা কোল্লেম, পাল্লেম না। গায়েও ক্ষমতা নাই,—মনেও বল নাই, তবে উঠি কি কোরে? পোড়েই রইলেম।

আর একবার ভাল কোরে চাইতে ইচ্ছা হলো, চাইলেম।—মনে হলো। হৃদয়ে বিষাদময় হর্ষের তুফান উঠলো,—যাতনা কষ্ট সব ভুলে গেলেম। আনন্দে কেমনতর হয়ে গেলেম!—যেন অচৈতন্য আত্মহারা!

কানে বজ্রগম্ভীর স্বর ধ্বনিত হলো। কে যেন চীৎকার কোরে বোল্লে, "কে তুই? দূর হ পাষণ্ড!—আমার এখানে অত্যাচার?" আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম! যা একটু জ্ঞান ছিল, সেটুকুও গেল।

আবার চৈতন্য হলো। তখনো আমি সেইভাবে, কিন্তু এবার যেন ততটা সুখ বোধ হলো না। অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি কে?" সেই রকম গম্ভীরস্বরে উত্তর হলো,—"আমি-বামাচারী।"

ত্রয়শ্চত্বারিংশ চক্র।

সুখের সংসার।

চেতন হলেম। শরীরে একটু বল পেলেম। উঠে বোস্‌লেম। চেয়ে দেখি, সম্মুখে একজন ভস্মমাখা—দীর্ঘজটাধারী—সন্ন্যাসী; গলায় রুদ্রাক্ষমালা, কপালে রক্তচন্দন-রেখা, হাতে বাঁশের লাঠি—কমণ্ডলু, জটাজাল মাথায় চূড়াকারে বাঁধা, চেহারা দেখ্‌লে ভয় হয়!

আমি উঠ্‌তেই সন্ন্যাসী বোল্লেন, "আমি তোমাকে রক্ষা কোরেছি, তোমার এখন কর্ত্তব্য আমার অনুবর্ত্তন করা—আমার আশ্রমে এসো, সেইখানেই বিশ্রাম কোর্‌বে।" আমি প্রণাম কোরে বোল্লেম, "আপনার অনুগ্রহেই

যখন আমার জীবন তখন আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। চলুন।" সন্ন্যাসী অগ্রসর হইলেন, আমি সঙ্গে চোল্লেম,—কিন্তু মনের ভিতর একটা ধাঁধাঁ লেগে থাক্‌লো।

পাহাড়ের উপরেই বন। সেই বনের মধ্যে সন্ন্যাসীর আশ্রম। পূর্ব্বে শুনেছিলেম সন্ন্যাসীর আশ্রম কুটীরমাত্র। কাশীতে অনেক সন্ন্যাসী একত্রে আছেন, তাঁদেরও প্রত্যেকের এক একখানি চালা, কিন্তু এ সন্ন্যাসীর আশ্রম কুটীর নয়, ছোটখাট প্রাচীর-আঁটা একখানি বাড়ী। বাড়ীর ভিতর পৃথকঘরে কালীপ্রতিমা আছেন। ছুখানি ঘর, তাতে অনেক তৈজসপত্র আছে। সন্ন্যাসী গৃহস্থ অথচ সন্ন্যাসী! একটী ভৈরবীও আছেন। ভৈরবীর পরিধানে রক্তবস্ত্র হাতে তাগা ও বালার পরিবর্ত্তে রুদ্রাক্ষের মালা বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ। সন্ন্যাসীর আজ্ঞামতে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। ভৈরবী বোস্‌তে আসন দিলেন, বোস্‌লেম। ঘরের ভিতর চেয়ে বড় ভয় হলো! চারিদিকেই মড়ার মাথার খুলী, কোন কোনটীতে আবার সিঁদূর লেপা, আধপোড়া আধপোড়া কাঠ, লম্বা লম্বা কিসের হাড়, রাশ রাশ নখচুল, ২।৩ খানা খাঁড়া, দেওয়ালের গায়ে নানা ধরণের ঝুলি টাঙানো। ঘরের এই সব সজ্জা দেখে বড় ভয় হলো!

ভৈরবী জল খেতে দিলেন। জলখাবার ছোলাভিজা আর গুড়। ছুদিন অনাহারে—তাই অমৃত বলে খেলেম। রাত্রে এঁরা কেউ কিছু খান না, আমার জন্যেই ভাত রাঁধা হলো, আহার কোরে শুলেম। শরীর বড় অবসন্ন ছিল, কোথা দিয়ে রাত কেটে গেল,—জান্‌তেও পাল্লেম না।

এইখানেই আছি।—আজ আট দিন এই সন্ন্যাসীর আশ্রমেই আছি। সন্ন্যাসীকে দেখে—সন্ন্যাসীর গৃহসজ্জা দেখে প্রথমে যতটা ভয় পেয়েছিলেম, এখন আর ততটা ভয় নাই। ভৈরবী বেশ ভালবাসেন, আদর যত্ন করেন, পরিণামে আমার ভাল কোর্‌বেন বোলে আশ্বাস দেন। ছুই এক্‌টা প্রমাণ পেয়ে এ কথায় আমার বিশ্বাসও হয়েছে। ইচ্ছা কোল্লে, দেববলে, আমার মনস্কামনা পূর্ণ কোত্তে পার্‌বেন ভেবেই আমি আশায় আশায় ঘুরে বেড়াচ্চি।

আমি একা এক ঘরে থাকি। সন্ন্যাসী ও ভৈরবী ছুইজনেই সমস্ত রাত জেগে কালী প্রতিমার সম্মুখে আরাধনা করেন। সেখানে যেতে বিশেষ নিষেধ আছে—আর প্রবৃত্তিও হয় না। আজ শুতে শুতেই ইচ্ছা

হলো, আরাধনার ব্যাপারটা একবার দেখ্‌তে হবে। তখনি উঠ্‌লেম। আড়ি পেতে থাকা, কি চুপি চুপি কোথাও যাওয়া, আমার বেশ অভ্যাস আছে। পা টিপে টিপে খুব সাবধানে সাবধানে আরাধনাঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম। দেখেই ত অবাক! সন্ন্যাসী উলঙ্গ!—ভৈরবীও উলঙ্গ। সন্ন্যাসী ঘোরতর তান্ত্রিক! ভৈরবীকে কোলে বোসিয়ে, অতি জঘন্য ভাব প্রকাশ করে—চোক বুজে আছেন। এ কি সাধনার প্রণালী? মনে যেন ঘৃণা হলো, সেই সঙ্গে সঙ্গে কৌতুহলও বাড়লো। অবাক, স্তম্ভিত! দাঁড়িয়ে রইলেম।

অনেকক্ষণই দাঁড়িয়ে রইলেম। এদের সাধনা আর ফুরায় না। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌লেন। ফুল বিল্বপত্র নিয়ে ভৈরবীর চরণে অঞ্জলি দিলেন: প্রণাম কোল্লেন,—দেহের পাঁচটী স্থানে ফুলবিল্বপত্র স্পর্শ কোরিয়ে মাথায় দিলেন।—সাধনা সমাধা হলো। শেষে পূজার উপকরণ নৈবেদ্য দুজনে একত্রে বোসে আহার কোল্লেন। শেষে গল্প আরম্ভ হলো। সন্ন্যাসী বোল্লেন, "ভৈরবি! তুমি আমার উত্তরসাধক আছ বোলেই আমি এতদূর অগ্রসর হয়েছি। মহামায়াকে মহামাংস উপচারে মহাপূজা দিয়ে মহা ফল লাভ কোর্‌বো। দুজনেই সিদ্ধ হবো। একদিনে দুজনের বাসনাই পূর্ণ হবে।" আমার ত প্রাণ উড়ে গেল!— মহামাংস উপচারে মহামায়ার পূজা!

ভৈরবী উত্তর কোল্লে, "আমার কিন্তু এতে অমত আছে। তুমি বোলেছিলে, সতীত্বনাশ আর নরবলি, এই সাধনার শেষ উপকরণ। নারী-বলির ত কোন নিয়ম নাই। মেয়েটী বেশ!—তুমি বরং আর এক্‌টী দেখ। এ মেয়েটী থাক!" সন্ন্যাসী তীব্র হাসি হেসে বোল্লেন, "আবার মায়া কেন? আবার মেয়ে কোথা পাব? আর দিন নাই। তিনটী মাত্র দিন অবশিষ্ট আছে। তিন দিন পরে আমাবস্যা,—সেই দিনই প্রশস্ত। আর বাধা দিও না। সাবধানে চোকের উপর রেখো! না পালায়।"

এদের কথাবার্ত্তা শুনে আমি ত আর নাই! মাথা ঘুরতে লাগ্‌লো, চোক দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুতে লাগ্‌লো, সেইখানেই বোসে পোড়্‌লেম। অনেকক্ষণ ধোরে ভেবে—একটু সাম্‌লে—মনে কোল্লেম, পালাই। তখনি উঠ্‌লেম দরজার দিকে চোল্লেম, পা আর উঠে না।

অজ্ঞানে দিশাহারা হয়ে দ্রুতপদেই চোল্লেম। কোথায় পা দিচ্চি, কিছুই ঠিক নাই। দ্রুতপদে পালাতে—পথ ভুলে হুড়মুড় কোরে একটা খানায় পোড়ে গেলেম। সন্ন্যাসী সজাগ ছিলেন। আলো নিয়ে ছুটে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে বোল্লেন, "কোথায় পালাচ্ছিস্? যমের হাতে নিস্তার আছে,—কিন্তু আমার হাতে নাই।" সন্ন্যাসী বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত ধোরে,—টেনে নিয়ে গিয়ে,—একটা ঘরের ভিতর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে দোরে চাবী লাগালেন। আমি আবার বন্দিনী!

তিন দিন সন্ন্যাসীর এই কারাগারে কাটালেম। রোজ দু-বেলা ভাত পাই, না খেলে নয়—তাই দুটী দুটী খাই। যার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, মৃত্যুর করাল ছায়া যার সাম্‌নে নেচে নেচে বিভীষিকা দেখাচ্চে, আহারে তার কি কখন রুচি থাকে?

আজ সেই কাল অমাবস্যা। সমস্ত দিন আজ অনাহার! সন্ধ্যার সময় ভৈরবী এসে স্নান কোরিয়ে দিলে পাটের কাপড় পোর্‌তে দিলে, গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে দিলে, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা কেটে দিলে। শেষে মনে মনে দুর্গানাম জপ কোত্তে কোত্তে ভৈরবীর সঙ্গে কালীমন্দিরে প্রবেশ কোল্লেম। সন্ন্যাসী তখন পূজায় বোসেছেন। বাঁ দিকে সাতখানি মড়ার খুলীতে উপকরণ নৈবেদ্য আছে। তার পাশেই একখানি সিঁদুর মাখান খাঁড়া! দেখেই বুঝ্‌লেম, ঐ খাঁড়াই আমার কাল! জীবনদীপ নির্ব্বাণ হবার আর বড় বিলম্ব নাই। একদৃষ্টে প্রতিমার দিকে চেয়ে মনে মনে বোল্লেম, "মা ব্রহ্মময়ি!—নরশোণিত পান কোরে আজও কি তৃষ্ণা নিবারণ হয় নাই মা? রণচণ্ডি! সেই শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধে কত কত মহাবীরের শোণিত পান কোরেছ,—কুরুক্ষেত্র সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের শোণিত পান কোরেছ,—দেবাসুরের যুদ্ধে শত শত অসুরের শোণিত পান কোরেছ,—সেই সৃষ্টির প্রথম হতে এ পর্য্যন্ত শোণিতপানে ত তোমার নিবৃত্তি নাই! এত শোণিত পানেও কি তোমার মহাতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় নাই মা?—শেষে অনাথা—অরক্ষিতা—মর্ম্মাহতা দুঃখিনী আত্মহারা—কন্যার শোণিত-পানে বাসনা কোরেছ? মা! তনয়ার শোণিত পান কোরে শেষে কি এই মহাতৃষ্ণা নিবারণ কোত্তে বোসেছ?—আচ্ছা, ব্রহ্মাণ্ডোদরি! তাই কর।"

সজলনয়নে মহামায়ার দিকে চেয়ে কেবল এই কথাই বোলিচি। বাইরে হঠাৎ নজর পোড়্‌লো। দেখি, হাড়কাঠ পোঁতা হয়েছে। বুঝলেম, আর অধিক বিলম্ব নাই।

পূজা শেষ হলো। সন্ন্যাসী একটী কলা, দুটী আতপ চাল, একটী বিল্বপত্র—আমার হাতে দিয়ে বোল্লেন, "ভাগ্যবতি! এই নির্ম্মাল্য চর্ব্বণ কর। তোমার জীবন ধন্য।—আজ মহামায়া তোমাকে গ্রহণ কোর্‌বেন। ভয় কি?—সার্থক জীবন তোমার! আমারও সাধনায় সিদ্ধি। আমার ভৈরবী আর তুমি, দুজনেই ধন্যা। ভৈরবীর সতীত্বনাশ—আর তোমাকে বলি, এতেই আমার সিদ্ধি।" এই বোলে সন্ন্যাসী হাড়কাঠ পরীক্ষা কোরে এলেন;—খাঁড়ার ধার পরীক্ষা কোল্লেন। ভৈরবী চোলে গেল।

সন্ন্যাসী বোল্লেন, "এসো। আর বিলম্ব কোরো না। লগ্ন আসন্ন।" আমি আর কি কোর্‌বো. "মা ব্রহ্মাণ্ডময়ি! তোর মনে কি এই ছিল মা?" বোলে উঠে এলেম। প্রাণের ভয় গেল! কেমনতর মনের গতি হলো। ভয় গেল,—সাহস বাড়্‌লো। জীবনপাত কোর্‌বো,' ইহাই সংকল্প কোল্লেম। আপনা হোতেই হাঁড়কাঠে গলা বাড়িয়ে দিলেম। সন্ন্যাসী খিল এঁটে দিয়ে ঘরের ভিতর গেলেন। আমি একদৃষ্টে কালী প্রতিমার দিকে চেয়ে রইলেন। চাইতে চাইতে আত্মজ্ঞান হারালেম। সম্মুখে যেন দেখ্‌লেম, মা মহামায়া অভয়-হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বোল্‌চেন, "ভয় নাই মা, ভয় নাই!" দেবী যেন হাস্‌চেন! কটাক্ষে যেন ত্রিভুবন কাঁপ্‌চে।—সম্মুখে যেন শত শত প্রতিমা!—শত শত কালী-প্রতিমা!—শত শত হস্তে অভয় দিচ্চেন, শত শত কণ্ঠে বোল্‌চেন, "কালীনাম উচ্চারণ করো!—ভয় নাই, ভয় নাই!" আমি যেন উচ্চকণ্ঠে বোল্‌চি, "কালী! কপালিনি!—কৌশিকি!—করালি! রক্ষা কর মা, রক্ষা কর।" দেবীর অপূর্ব্ব বেশ! শবাসনা শবের উঁপর নৃত্য কোচ্চেন। জিহ্বাগ্রে রুধিরধারা!—পদভরে ধরণী টল্ মল কোচ্চে।—দেবীর চার দিকে প্রমথগণ অট্টহাস্য কোরে নেচে বেড়াচ্চে! কারও সর্ব্বাঙ্গে পেট, কারও লম্বা লম্বা হাত, ছোট ছোট পা, কারও প্রকাণ্ড মাথা,—সমস্ত শরীরটে যেন মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে।—কারও পেটের নাড়ীভুঁড়ীগুলো বেরিয়ে পোড়েছে, সে তার আপন নাড়ী নখরে বিদীর্ণ কোরে—বিকট মুখভঙ্গী কোরে খাচ্চে! সর্ব্বাঙ্গে নাড়ী

ঝুল্‌চে—কীটে দংশন কোচ্চে, জোঁক, কৃমি, কেন্নো, পোকা, সর্ব্বাঙ্গে ঝুল্‌চে। মহামারার সঙ্গে তালে তালে নৃত্য কোচ্চে! এমন শত শত প্রমথ—শত শত দেবী!—আমি জ্ঞানশূন্য।—চোকের সাম্‌নে কেবল এই দেখ্‌চি,—মুখে কেবল কালীনামই উচ্চারণ কোচ্চি।

সন্ন্যাসী একপাত সিঁদূর আমার মাথায় ঢেলে দিলেন। প্রদীপটে আরও উজ্জ্বল কোরে দিয়ে খাঁড়া ধোল্লেন! খাঁড়া তুল্‌লেন,—আমি সকাতরে ডাক্‌লেম, "মা——" সন্ন্যাসী সদর্পে ডাক্‌লেন, "মা—" উজ্জ্বল প্রদীপ ঝুপ করে নিবে গেল! সন্ন্যাসী খাঁড়া নামালেন। আবার প্রদীপ জ্বাল্‌লেন। আবার খাঁড়া ধোল্লেন।—আবার খাঁড়া তুল্‌লেন। আমি ভাব্‌লেম, এই—খাঁড়া পোড়লো!

খাঁড়া পোড়্‌লো না। খাঁড়া পড়ার পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসীর গোঙানী শুন্‌লেম, ভয়ে আমি অজ্ঞান হোলেম।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলেম, জানি না। চৈতন্য হোলে দেখ্‌লেম, আমি সন্ন্যাসীর ঘরের বারান্দায় শুয়ে আছি।—দূরে সন্ন্যাসী আর ভৈরবী বাঁধা আছে। একটী যুবা আমার কাছে বোসে শুশ্রূষা কোচ্চেন।

দূরে আরও চারি জন লোক বোসে আছে। এরা তবে কে? যে কেহ হোন, এঁরাই আমাকে বাঁচিয়েছেন। যিনি আমার জীবনদাতা, তাঁর দিকে চাইলেম। অবাক কাণ্ড! আবার সেই রূপ! হৃদয়ের মধ্যে ঘোর আন্দোলন। এবার বড় লজ্জা হলো। উঠে বোসে মাথায় কাপড় দিলেম। যুবা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখন বোধ হয় সুস্থ হয়েছেন?" আর কি চিন্‌তে বাকী থাকে। প্রাণের কথা—প্রাণই বুঝ্‌তে পারে! প্রাণের কাছে কি গোপন চলে? আজ আমার মত ভাগ্যবতী কে? যে সুধাস্বর সেই অনাথ-আশ্রমে শুনেছিলেম, যাঁকে মর্শানে ফেলে এসেছিলেম, ইনি তিনিই! বিধাতা! ধন্য তোমার লীলা! কালীনামের ফল আজ আমি হাতে হাতে পেলেম।

প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেম না। এখন একটা কথা:—যাঁরা যাঁরা আগ্রহ কোরে আমার জীবনের এই ইতিহাস শুন্‌চেন, যাঁরা যাঁরা দয়া কোরে আমার জীবনের এই তুচ্ছ ইতিহাস শুন্‌চেন, তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার জীবন-সহচর, জীবনদাতা * * বাবুকে কি নামে আপনাদের কাছে পরিচিত কোরবো? হাল আইনমতে নবীনা-পাঠিকা উপদেশ দিবেন, "নাম ধোরেই পরিচয় দাও;—আগে অজানা অবস্থায় যেমন জগদ্বন্ধুবাবু বোলে পরিচয় দিয়েছ, এখনও তাই বলো।" কিন্তু বৃদ্ধ পাঠক-পাঠিকা চোটে যাবেন। স্বামীর নাম ধোরে ডাকবার অধিকার স্ত্রীর নাই। এখন তবে বলি কি? আমি স্থির কোরেছি, হাল আর সেকেলে, দুপক্ষের মানই রাখবো। নাম কোরবো না, তা হোলে সেকেলেরা সন্তুষ্ট হবেন; শুধু বাবু বোলে ডাকবো। তা হোলে একালের পাঠক-পাঠিকা আমার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি কোরবেন। তবে এই যুক্তিই স্থির। আপনারা ছেলে বুড়ো সকলেই বলুন, "তথাস্তু!"

বাবু বোল্লেন, "আপনার পরিচয় দিতে হবে। আমি বোল্লেম, "স্ত্রীলোকের পরিচয় জিজ্ঞাসা কোত্তে পুরুষের অধিকার নাই। আমি আত্মপরিচয় দিতে বাধ্য নই। আপনি জীবন রেখেছেন বোলে কি আমার উপর জোর জুলুম কোরবেন?" একটা হাসি পোড়ে গেল। বাবু হেসে আমার হাতখানি ধোরে অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। পদ্মায় তিনিই আমায় রক্ষা করেন। আমি ভেসে এসে কূলে লাগ্‌লে তিনিই

আমাকে দেখ্‌তে পান। অনুভবে—প্রাণের টানে চিন্‌তে পারেন। আমি এদিকে এসেছি, এটা লোকমুখে শুনে এদিকে এসেছিলেন।—শুন্‌লেম, পদ্মার ধারে অজ্ঞান অবস্থায় আমার নামও বোলেছিলেন। সন্ন্যাসীর তাড়নায় বাবু পেছিয়ে যান, তখন একা ছিলেন। এখন লোকজন জোগাড় কোরে—আমাকে উদ্ধার কোত্তে এসে এই কাণ্ড!

মনে ভাবলেম, আর একটু বিলম্ব হোলেই সর্ব্বনাশ হতো। বাবুকে অনাথ-আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তিনি সে সব কথা বাড়ী গিয়ে বোল্‌বেন বোল্লেন। সন্ন্যাসী আর ভৈরবীকে আমার অনুরোধে ছেড়ে দিয়ে আমরা আবার পদ্মা পার হোলেম। মনের আনন্দ রাখ্‌বার স্থান হোচ্ছে না। আনন্দ যেন উথ্‌লে উথ্‌লে উঠ্‌চে। এতদিনে বিধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন। আগে কতবার বোলেছি, কতবার ভেবেছি, সংসার দুঃখের আগার, কিন্তু আজ আমার চক্ষে সবই সুখের। চারিদিকে সুখের লহরী ছুটেছে। আজ মনে মনে বোল্লেম,—সুখের সংসার!

চতুশ্চত্বারিংশ চক্র।

খাস বিচার।

আবার পদ্মা পার। ওপার নয়—এপার। পেরিয়ে গিয়েছিলেম, পেরিয়ে এলেম। বাবু গোয়ালন্দ এসে কুলীর ডিপোর বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন। সমস্ত কথা খোলসা বোল্লেন। তাঁরা অস্বীকার কোল্লেন। বোল্লেন, "হরিদাসী নামে কোন স্ত্রীলোক কলিকাতা হোতে চালান হয়ে আসে নাই।" তার পর অনেক ধুমধামে—বিশেষ ভয় দেখিয়ে—গুরুতর অভিযোগের মূলসূত্রগুলির আভাস দিতে—ডিপোর বাবু স্বীকার কোল্লেন, "হাঁ মহাশয়! হরিদাসী নামে একটী স্ত্রীলোক এসেছিলেন। কলিকাতার রামতারণ ঘোষ নামক আড়কাটী তাঁকে আনে। রামতারণ এখন দেশে নাই। কুলীর সন্ধানে কোন্ দেশে চোলে গেছে।" এই সব সন্ধান বাবুর মুখে শুনলেম। ধোত্তে গেলে রামতারণই আমার ভাগ্যপথ পরিষ্কার করে।

সে যদি চালান না দিত, তা হোলে আমার এখানে আসা ঘোটতো না। পদ্মায় ডুব্‌তে হতো না,—বাবুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হতো না। একপক্ষে রামতারণ ভালই কোরেছে। এই ভেবে তার অনুসন্ধানে বিরত হোলেম। দেশ ভ্রমণের আর বাকী নাই, তাড়াতাড়ি এখন দেশে যেতে পাল্লে বাঁচি। দেশে যাবার আয়োজন কোরে আমরা ষ্টেশনে এলেম। তথনো গাড়ীর অনেক বিলম্ব আছে। আমাকে একটী ঘরে বোসিয়ে রেখে ষ্টেশনের মধ্যে গেলেন।

বোসে আছি। অনেকক্ষণই বোসে আছি। বাবু আর আসেন না। মনে বড় উদ্বেগ হলো। হতভাগিনী আমি, সদাই কুচিন্তা। কত রকম ভাবনাই আসে। বড় উদ্বিগ্ন হোলেম। বোসে ছিলেম, উঠে দাঁড়িয়ে জানালায় মুখ দিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেম। অনেকক্ষণ পরে বাবু এলেন। মনে কি ভাব হলো, কেঁদে ফেল্লেম। বাবু যেন থতমত খেয়ে বোল্লেন, "ও কি! কাঁদ্‌চো কেন?" আমি বোল্লেম, "না, কাঁদি নাই। অত বিলম্ব কি কোরতে হয়?" বাবু অপ্রস্তত হোলেন। আমি হাস্‌লেম। মনে হলো, এতদিনের অদর্শন সহ্য হয়েছে, আর আজ এই মুহূর্ত্তের অদর্শনে রোদন!

গাড়ী যথাসময়েই প্রস্তত। আমরা গাড়ীতে উঠলেম। বরাবর রাণাঘাটে এসে নাম্‌লেম। দেখ্‌লেম, একটী গাছতলায় লোকারণ্য। একজন কালো বিকট চেহারার লোক—হাতে হাতকড়ি, দুজন পুলিসের লোক ধোরে আছে। অনেক দূরে তারা দাঁড়িয়ে, তবুও লোকটীকে চিনলেম। প্রাণ কেঁপে উঠলো! যেন ভয়ে আঁৎকে উঠলেম। বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি! কি হলো!" আমি যেন কলের পুতুল, কলের বলেই যেন উত্তর কোল্লেম, "ঐ—ঐ পাষণ্ড আমায় পদ্মায় ডুবিয়েছিল। ঐ—ঐ দুরাত্মাই—আমার সর্ব্বনা—" বাবু আর শুন্‌লেন না। নক্ষত্রবেগে ছুটে—সেই ভিড়ের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। আমি তখন ষ্টেশনের একটা নির্জ্জন ঘরে।

অনেকক্ষণ পরে বাবু ফিরে এলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বোল্লেন, "ঠিক তাই। পুলিসের লোক তোমার আমার সন্ধানে এখানে এসেছে। আমাদের সঙ্গে নিয়ে তারা এলাহাবাদ যেতে চায়। সেইখানে সঙিন মকর্দ্দমা উঠেছে। একেবারে বদমায়েসের দল ধরা পোড়েছে। চল,

যাওয়াই কর্ত্তব্য। তোমার সন্ধান যে দিতে পারবে, সে পুরস্কার পর্য্যন্ত পাবে। চল, আদালতে তোমায় দাখিল কোরে পুরস্কার গ্রহণ করি গে।” বাবু রহস্যের হাসি হাস্‌লেন। যে যে পাপাত্মা আমার প্রতি ঘোরতর অত্যাচার কোরেছে, যে সব দুর্দ্দান্ত নরপশুরা অগণ্য নির্য্যাতনে আমার হৃদয়কে দগ্ধ কোরেছে, তাদের উপর বাবুর জাতক্রোধ। সেই সমস্ত পাপীর উপযুক্ত শাস্তি হবে, সেই সব পাপাত্মারা কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করবে, তাই দেখ্‌বার জন্যে বাবুর আনন্দ। আমার কিন্তু যেতে মন সরে না। যা হবার হয়েছে, তা ত হয়েই গেছে, পাপের শাস্তি অবশ্যই ত হবে, তাতে আর যোগদান কোত্তে ইচ্ছা হয় না—পাপীর দণ্ড ঈশ্বর দিবেন, আমি এখন বাড়ী যেতে পেলেই বাঁচি।—বাস্তবিক ইচ্ছাও আমার তাই। কিন্তু তা হলো না। বাবুর মতে অগত্যা মত দিতে হলো। আমরা সকলে রওনা হলেম।

যথাসময়েই আমরা এলাহাবাদে পৌঁছিলেম। উপযুক্ত বাসা নিয়ে এক সপ্তাহকাল আমাদের অপেক্ষা কোত্তে হলো। এক সপ্তাহ পরে মকর্দ্দামা।

দেখ্‌তে দেখ্‌তেই এক সপ্তাহ কেটে গেল। আজ মকর্দ্দামার দিন। অন্যান্য আবশ্যক-তদ্বির আমরা আর কি কোরবো? আমাদের কেবল জবানবন্দী। আদালতের ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারী দ্বারা আমাদের জবানবন্দী দেওয়াতে বাবু অনেক চেষ্টা কোল্লেন, সেটী হলো না। আদালতের হুকুম, অনেক চাক্ষুষ নিসানদিহি কোত্তে হবে, অনেক কথা জেরার জোরে প্রকাশ পাবে, গোপন জবানবন্দীতে ততটা হয় না। কাজে কাজেই আমি পাল্কী কোরে আদালতে গেলেম। আদালত-গৃহের এক পাশেই আমার পাল্কী রাখা হলো। পাল্কীর মধ্যেই আমি থাকলেম। বিচারকের হুকুমে বাজে লোক বার কোরে দেওয়া হলো। বিচার আরম্ভ হলো। আসামীর দল পাহারা ঘেরাও হয়ে আসামীমঞ্চে উপস্থিত হলো। পাল্কীর ফাঁক দিয়ে সবই দেখ্‌তে লাগ্‌লেম।

আসামী দেখে ত অবাক! আগে ভেবেছিলেম, কেবল মাষ্টার বাবু আসামী, এখন দেখি, অনেকগুলি। বিধাতার চক্রে—ধর্ম্মের কৌশলে আজ সবগুলিকে একত্র দেখ্‌লেম! মস্ত ব্যাপার!

মাষ্টারবাবু, হরকন, শৈলধর, সুরাশেখর, অনাথ আশ্রমের বাবু, আরও

পাঁচজন অজ্ঞাত লোক;—একটী স্ত্রীলোক।—মোট অসামীর সংখ্যা অঙ্গুলী গণনায় এগারজন। স্ত্রীলোকটী কে—চিন্‌তে পাল্লেম না।

আসামীরা এসে উপস্থিত হোলেই কার্য্যারম্ভসূচক ঢং ঢং শব্দে পেটা ঘড়ীর ঘোষণা হলো।—সকলেই তটস্থ হলেন। বিচার অরম্ভ হলো।

বিচারকের আদেশে পার্শ্ববর্ত্তী এক ব্যক্তি বোল্লেন, "আসামীগণের প্রতি যে যে অভিযোগ, তাতে যদি আসামীর পক্ষের কোন বক্তব্য থাকে, সেই জন্য অভিযোগগুলি তাদের সম্মুখে পাঠ করা আবশ্যক। সকলে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

"প্রথম আসামী সর্ব্বেশ্বরের প্রতি গুরুতর অভিযোগ। সরকারী ডাক মারা, ভদ্রঘরের লজ্জাশীলতাযুক্ত বালিকাকে অবরোধে রাখা, জাল নামে পরিচিত হওয়া, হরিশঙ্কর বাবুর গদী হইতে জাল নামে পরিচিত হওয়া, টাকা লওয়া—মুঙ্গের দোকানে ঘনশ্যাম বাবুর জল-জামাতা নামে পরিচিত হওয়া—তাঁহার কন্যাকে লইয়া পলায়ন করা,—কতকগুলি বালিকাকে গুপ্তভাবে রাখা ও বয়স্থা হইলে তাহাদিগকে কস্‌বীদিগের নিকটে বিক্রয় করা—কাহাকেও স্বীয় ব্যবহারে রাখা—শম্ভুবাবুর গুপ্তহত্যার সহায়তা করা ইত্যাদি ইত্যাদি।" অভিযোগলিপি পাঠ শেষ কোরে সেই বাবুটী বোল্লেন, "সর্ব্বেশ্বরের যে যে অভিযোগ, নিয়মিতরূপে ধারা খাটালে দণ্ডবিধি আইনের ধারা বৃদ্ধির আবশ্যক হয়ে উঠে। এতগুলি গুরুতর অভিযোগে যে লিপ্ত; তাকেও আমরা দয়া কোত্তে চাই। বল তুমি, তোমার এতে কিছু কি বল্‌বার আছে? অকপটে বল,—হাকিম বাহাদুর অবশ্যই সে সব কথা শুন্‌বেন।" এই বোলে তিনি উপবেশন কোল্লেন।

মাষ্টারবাবু রাগে যেন তিনটে হয়ে বোল্লেন, "সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমি এ সব অভিযোগের বিন্দুবিসর্গও জানি না। তবে আদালতের ক্ষমতা আছে বোলেই আমার প্রতি এই অন্যায় জুলুম। আপনারা যে শাস্তি ইচ্ছা দিতে পারেন, আমি এখন সম্পূর্ণ আপনাদের অধীন।" অভিমানে মাষ্টার বাবুর চক্ষে জল এলো। নীরবে অশ্রুমার্জ্জন কোল্লেন। অভিমানে যেন কণ্ঠরোধ হলো। মাষ্টারবাবুর এটাও ঠাট!

বিচারক বোল্লেন, "যে বালিকা এই বদ্‌মায়েসের দলের চূড়ান্ত সাক্ষী, যে এই দস্যুদলের দ্বারা পীড়িত, তারই সাক্ষী সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ কর্ত্তব্য।" সকলেই সম্মত হোলেন। আমি বুঝলেম, আমার কথাই হচ্চে। বাবু

আমাকে হাত ধোরে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গেলেন। বিচারক নিজেই বোল্লেন, "তোমার কোন শঙ্কা নাই। ভয় কি তোমার? সত্য কথা বল।—যে যে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে, যেখানে যেখানে যে সব ভয়ানক ভয়ানক অত্যাচার দেখেচ, আমার কাছে সমস্তই প্রকাশ কর। ভয় কি তোমার?"

আমি একবার আসামীদের দিকে চাইলেম। সকলেই যেন মহা শঙ্কিত হলো। মাষ্টারবাবু আমার দিকে চাইলেন। সে চাউনির অর্থ আমি বুঝ্‌লেম। তিনি যেন বোল্লেন, "আমি ত তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করি নাই? তবে আমার সর্ব্বনাশ কেন কর?" আমি এইটুকু বুঝ্‌লেম। বাবু বোলেছেন, মিথ্যা বলো না। বিচারক বোল্লেন, মিথ্যা বলো না। আমি জানি, ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা বলায় যে পাপ, সে পাপের মোচন নাই। তবে কি মিথ্যা বোল্‌বো? আমার প্রতি কোন অত্যাচার না করুক, লোকটা ত পাপী।—পাপীর দমনই বিশ্বরাজ্যের হিতজনক। মাষ্টারবাবুর সেই অব্যক্ত বাক্য আমি শুন্‌লেম না। আগাগোড়া সত্য কথাগুলি বোল্লেম—গোপন কোল্লেম, কেবল বামাচারীর কথা। আমিই তাদের অভয় দিয়েছি, সেই জন্যই তাদের আর জড়ালেম না।

আমার জবানবন্দী শেষ হোলেই বিচারক বোল্লেন, "সর্ব্বেশ্বর! তোমার তবে আর সাফাই কি? তুমি যে একজন নামজাদা বদ্‌মায়েস, তা আমি বুঝেছি।—তবুও বলি, তোমার কি কোন সাফাই আছে?"

সর্ব্বেশ্বরবাবু অনেকক্ষণ নীরবে থেকে বোল্লেন, "না হুজুর! সাফাই আমার নাই। সাফাই ছিল, এই সমস্ত দণ্ড আমি তৃণজ্ঞান কোরে উড়িয়ে দিতে পাত্তেম, সে ক্ষমতা আমার ছিল। তা না থাক্‌লে আমি কথনই এমন কাজ কোত্তেম না। আমি আদালতে পরিত্রাণ পেলেও সুখী হব না। আমার প্রাণের যাতনা অপরিসীম, বুঝিতেছি—শাস্তি গ্রহণনই আমার আবশ্যক।"

হাকিম বোল্লেন, "বড়ই সন্তুষ্ট হোলেম। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাল তোমার উপস্থিত। তবে এই একটী কথার সত্য উত্তর দাও। হরিদাসীকে তুমি কি জন্য পাটনা হতে নিয়ে যাও?—তার প্রতি কেন তোমার এ অত্যাচার?" তেজস্বী মাষ্টারবাবু তেজে তেজেই উত্তর কোল্লেন, "তা আমি প্রকাশ কোর্‌বো না।—কখনই না। যখন একবার স্বীকার কোরেছি,

অপ্রকাশ রাখ্‌বো, তখন সে কথা কখনই কেউ জানতে পার্‌বে না। আমি ডাকাত, জুয়াচোর, লম্পট, ধূর্ত্ত, বদ্‌মায়েসের অভিধানে যতগুলি পাপকাজ আছে, সকলই আমার আয়ত্ত, কিন্তু জেনে রাখ্‌বেন, আমি বিশ্বাসঘাতক নই।"

হাকিম একটু বিরক্ত হয়ে—ঘৃণার হাসি হেসে বোল্লেন, "সর্ব্বেশ্বর! এইটুকু গুণ বস্তুতই অসামান্য। কেম তুমি এ পাপ পথে পদার্পণ কোল্লে?" হাকিমটী বড়ই দয়ালু।

আর একটী কথা শুন্‌লেম। প্রবল পরাক্রান্ত মাষ্টার বাবুর হাত থেকে বলপূর্ব্বক কুসুমের উদ্ধার করা অসম্ভব জেনে, তাঁর স্বামীই গোপনে কুসুমকে হরণ কোরে নিয়ে যান। আগে জেনেছিলেম, কুসুমকে চোরেই ধোরে নিয়ে গেছে, এখন জান্‌লেব, সে চোর অন্য কেউ নয়, তার স্বামীই লোক দিয়ে তার উদ্ধার কোরেছেন।

তার পর সুধাশেখর দালালের কথা,—সুধাশেখর মাষ্টারবাবুর রায়েই রায় দিলে। পট্‌ পট্‌ কোরে সবই স্বীকার। সুধাশেখর বোল্লে, "আমি সর্ব্বেশ্বর, শৈলধর আর হরিদাসীর কাকা, আমরা চারজনেই এক শ্রেণীর ছাত্র। হরিদাসীর পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, সেই সব ফাঁকি দিতে তার কাকার এত যত্ন। সর্ব্বেশ্বরের হাতে হরিদাসীকে সমর্পণ করার মূলই তার কাকা। হরিদাসী যখন কলকাতায় আসে, তখনি আমি সংবাদ পাই যে, সর্ব্বেশ্বর ফৌজদারী সোপর্দ্দ হয়েছে। সেই সংবাদ পেয়েই পরমবন্ধুর উপকারের জন্য হরিদাসীকে আপন বাড়ীতে আনি। যখন চোক মুখ ফুটেছে,—তখন ওকে গোপনে রাখা সহজ নয় ভেবে, তার দ্বারায় এই হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিই। আমার এই-ই অপরাধ। অন্য অপরাধ আমার নাই। আমি নির্দ্দোষী।"

আদালতে একটা হাসি পোড়ে গেল। পাপী নিজের দোষ—গুরুতর পাপের কথা স্বীকার কোরে বোল্লে, "আমি নির্দ্দোষী।"

অনাথ-আশ্রমের বাবুর নাম এতদিনে, শুন্‌লেম, সদানন্দ ঘোষ এই নিত্য নূতন-নামধারীর অনেক নাম, সে সব কথা অনাবশ্যক। ইনিও সমস্ত দোষ স্বীকার কোল্লেন। আরও বোল্লেন, "সর্ব্বেশ্বর আমার আত্মীয়। তিনিই আমার এই উপায়ের পথ কোরে দিয়েছিলেন। তাঁর কৃপাতেই আমার সব। যে মেয়েটী বাবুকে খুন কোত্তে এসেছিল,

এতক্ষণে চিন্‌লেম, সেই এই। রাগে সর্ব্বাঙ্গটা জ্বোলেই গেল! করি কি? মনের বেগ দমন কোল্লেম।

নাম শুন্‌লেম, ভুজঙ্গিনী। ভুজঙ্গিনী ত ভুজঙ্গিনী! যেমন নাম, তেমনি গুণ! নামের সঙ্গে স্বভাবের বড় চমৎকার মিল। ভুজঙ্গিনী বোল্লে, "আমি মেয়েমানুষ! কিছুই জানি না। বাড়ী আমার পাবনা জেলায়। আমি যখন ১৩।১৪ বছরের, তখন একটা বড় পোড়া হয়। আমাদের ঘর বাড়ী সব ভেসে যায়। আমি তখন দাঁড়াই কোথা? চারিদিকেই জ—অল! তখন কি করি, আমার মাসীর বাড়ী এলেম। মাসীর—মাসী নয়—পিসী বুঝি,—আমি সেই পোড়ার সময়—ঠিক সেই পোড়ার সময়েই আমি আমার সেই দিদির বাপের বাড়ী—নয়—মামার বাড়ী এসে থাকলেম। তখন আমার স্বামী ছিল। স্বামীর বয়স তখন প্রায় তিন কুড়ি পাঁচ কি ছয়। আমি থাকলেম। আছি।—কতদিনই আছি। একদিন একজন—না, তা নয়, আমাদের বাড়ীতে একজন গোয়ালা চাকর ছিল। সে আমাকে একটা মস্ত মন্দ কথা বলে। তা আমাদেরই চাকর ত, তাবে আর কিছু বোল্লেম না। দিন কতক, এই দিন—সাত আট কি বড় জোর মাসেক কারণ, আমার—আমি অন্তঃসত্ত্বা হোলেম। স্বামীর বয়স তখন দেড় কুড়ি তিন। আছি, ক্রমেই গোল উঠলো।—আমি তখন বিধবা কি না, বয়স প্রায় দেড় কুড়ি কি দুই এক বেশ কম, আমি বিধবা হোলেম। তখন করি কি? পালিয়ে গেলেম। মামাবাই আমাকে তাড়িয়ে দিলে। তাই ঐ সদানন্দের কাছেই থাকলেম। আমার একটী ছেলে আছে। কোথায় আছে, লুকিয়ে আছে। জানি না—কোথায়। এই বাবু জগদ্বন্ধু, একে আমি খুন করি নাই। কোত্তেও যাই নাই। আমার বড়ই ভয়!—সত্য সত্যই ভয়ে আমি মারা যাই। বড়ই ভয় আমার। আমি কি তা পারি? আমার দ্বারায় কি তা হয়?"

বিচারক বড়ই বিরক্ত হোলেন। বিরক্তি জানিয়ে বোল্লেন, "অত কথা আমি শুনতে চাই না। বল, তুমি খুন কোত্তে গিয়েছিলে কি না?"

"কে?—আমি?" থতমত খেয়ে ভুজঙ্গিনী বোল্লে, "কে?—আমি? আমি খুন?—কখন না, কখন না! মিথ্যা কথা! সাজানো কথা! আমি একেবারেই কিছু জানি না।"

একজন উকীল বোল্লেন, "ভাল, তুমি নির্দ্দোষী; আচ্ছা, তুমি একবার তোমার নাক টান দেখি ?"

ভুজঙ্গিনীর মুখ শুকিয়ে গেল। নাকে হাত দিতে তার সাহস হলো না। অনেক পীড়াপীড়িতে—টানাটানিতে নাকের আবরণ খোসে গেল। কাটা নাক বেরিয়ে পোড়্লো! বাবুর চাকর কর্ত্তৃক এই সূর্পনখার নাসাচ্ছেদ। আর কোন কথা বোল্তে হলো না। খাঁদা নাকই মকর্দ্দামার যথেষ্ট প্রমাণ!

শম্ভুবাবুকে যে খুন কোরেছিল, সেও একবার কোল্লে। একটু এদিক ওদিক হলেও কোন আসামীই নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন কোত্তে সমর্থ হলো না। সে দিনকার বিচার এই পর্য্যন্ত ;—মুল বইল।

পরদিন আবার বিচার। সে দিন আমার যাওয়া অনাবশ্যক, আমি ঘরেই থাকলেম। আহারাদি সমাপ্ত হলে বাবু আদালতে গেলেন, আমি উৎকণ্ঠিত চিত্তে মকর্দ্দামার বিশেষ বিবরণ শুন্বার জন্য ব্যস্ত রইলেম।

সন্ধ্যার পর বাবু এলেন। হাস্তে হাস্তে আমার হাতে হ্যাণ্ডনোট-খানি দিয়ে বোল্লেন, "এই নাও তোমার নোট। সুধাশেখর যে দলীল তোমার নিকটে জোর কোরে লিখিয়ে নিয়েছিল, এই সেই দলীল! দলীলখানি আমার হাতে দিয়ে আবার বোল্তে লাগ্লেন, "মকর্দ্দামা দিব্যি প্রমাণ হয়ে গেছে, রায় প্রকাশ হয়েছে। সুধাশেখর, শৈলধর আর তিনজন আসামীর দশ বৎসর, শম্ভুবাবুকে যে খুন কোরেছিল, সে আর মাষ্টারবাবুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ভুজঙ্গিনীর চৌদ্দ বৎসর ও আর আর সকলের পাঁচ পাঁচ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ডের আদেশ। তুমি যদি ইচ্ছা কর, রায় মহাশয়ের নামেও মকর্দ্দামা চলে, তোমার মত কি ?"

যতই দোষী হউন, পিতৃতুল্য পিতৃব্য, তাঁকে বিপদগ্রস্ত করা কখনই উচিত নয়। আমি অসম্মত হোলেম। বোল্লেম, "তাতে আর কাজ কি ? তবে বরং যাতে তিনি আমার প্রাপ্য অংশ বিনা আপত্তিতে দেন, তারই উপায় করা ছিল ভাল।" বাবু বোল্লেন, "আমারও সেই মত। আমিও তাই কোরেছি। হুকুম পেয়েছি।—ছাড় চিঠি পেয়েছি। যদি তিনি সহজে অংশ দিতে সম্মত না হন, এই হুকুম দেখালে সেখানকার

আদালত দখল দিয়ে দিবেন। এটী আমি ঠিক কোরেই নিয়েছি। আর এখানে নয়। সন্ধ্যাও হয়েছে, চল, আজ রাত্রেই রওনা হই।”

আমার মতও তাই। তখনি আহারাদি সেরে রাত ৯টার গাড়ীতে রওনা হলেম।

অতি সুবিচারই হয়েছে। যে যেমন বদমায়েস, দণ্ডও তার উপযুক্ত হয়েছে। চমৎকার বিচার! এরই নাম ধর্ম্মের বিচার! এই হলো—খাস বিচার।

পঞ্চচত্বারিংশ চক্র।

আজ বড় আনন্দের দিন।

বাড়ী এসেছি। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজ আমার অপার আনন্দ! বাড়ীতে লোকজন ছিল না। খুড়া মহাশয়ের অংশে লোকজন ছিল, আমাদের অংশে চাবি দেওয়া। আমরা বাড়ী আস্‌তেই গাঁয়ে একটা সাড়া পোড়ে গেল।—তখনি বাড়ী-ঘর পরিষ্কার হলো,—চাকর-চাকরাণী নিযুক্ত হলো। আমাকে দেখ্‌তে পাড়ার লোক ভেঙে পোড়্‌লো। তিন দিনেই আমি সকলের কাছে পরিচিত হোলেম।

চারিদিনের দিন বাবু—গ্রামের ভদ্রলোক,—মণ্ডল মাতব্বর ডেকে পিতার উইল দেখালেন। সকলের মতে খুড়া মহাশয়কে খবর দেওয়া হলো! একমাস পরে তিনি সপরিবারে বাড়ী এলেন। আমাদের হাঁকাইয়া দিবার চেষ্টা কোল্লেন, আমাদের ঘরের অংশ কেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বোলে ধম্‌কালেন। গাঁয়ের লোকের কথাও শুনলেন না। শেষে আদালতের আশ্রয় নিয়ে, চুল চিরে বিষয় ভাগ কোরে নিলেম। আমার অপ্রাপ্তবয়সে খুড়া মহাশয়ই বিষয়ের অছি ছিলেন, এই কুড়ি বৎসরের হিসাব দিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দেনা হোলেন। বাবু সেই টাকার জন্যে নালিশ কোল্লেন, ডিক্রী হোলো, অপমানে খুড়া মহাশয় আত্মহত্যা কোল্লেন। বাবুকে বোলে কোয়ে সে টাকার দাবী ছেড়ে দিলেম!

সরোজবাসিনীর বিবাহ হয়েছে, একটী ছেলেও হয়েছে। পিতৃশোকাতুরাকে সান্ত্বনা কোরে—তার ছেলেকে যৌতুক দিয়ে—শ্বশুরবাড়ী পাঠালেন। গিন্নি বিষয় সম্পত্তি বেচে কিনে কাশীবাসিনী হোলেন।

শ্বশুরবাড়ী নিকটেই। বাবু সেখানকার কর্ত্তা, আমায় বিষয় দেখ্‌তে গেলে তাঁর বিষয় দেখা হয় না। কাজেই স্থির কোল্লেন, শ্বশুর-বাড়ীতে থাকলে সব দিকই দেখা হবে। এই ভেবে সেখানে নূতন বাড়ী তৈয়ার করার বন্দোবস্ত হলো। ৪।৫ মাসের মধ্যে প্রচুর অর্থব্যয় কোরে বাড়ী প্রস্তুত হলো। শুভদিনে আমরা নূতন বাড়ীতে এলেম।

আজ আমার বড় আনন্দ। আজ এক বৎসর আমরা নূতন বাড়ীতে এসেছি। শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ের এক প্রান্তভাগে আমাদের বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত হয়েছে। মশুরীর বাগানের গল্প শুনে বাবু আমার সন্তোষের জন্যে সেই অনুকরণে একটা বাগান তৈয়ার কোরে দিয়েছেন। দেশের অনেক লোক আমাদের বাড়ী, বাগান দেখতে আসেন। আমার প্রতি স্বামীর অগাধ প্রেম—অসীম যত্ন, অনন্ত—অভ্রান্ত ভালবাসা। স্ত্রীলোকের এর চেয়ে আর সুখ কি আছে? আমরা বড় আনন্দ ভোগ কোচ্চি। বাবু সেইজন্য আদর কোরে আমাদের বাড়ীর নাম রেখেছেন—"শান্তিনিকেতন।" আমাদের পক্ষে শান্তিনিকেতন প্রকৃতই এখন—শান্তিনিকেতন।

একদিন আমি বাগানে বোসে আছি, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমার কাছে এলো। স্ত্রীলোকটীর বয়স কুড়ি বাইশ, কিন্তু চেহারা বড় রুগ্ন। সকল গায়ে ঘা, সর্ব্বাঙ্গে খড়ি উড়্‌চে, রুক্ষ মাথা, বদহালের একশেষ। চিনতে পাল্লেম না। স্ত্রীলোকটী ছুটে এসে আমার পা জোড়িয়ে ধোরে বোল্লে, "দিদি! তুমি যা বোলেছিলে, তাই হয়েছে। পাষণ্ড ছোটবাবু আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।" আমি চোমকে উঠ্‌লেম! হায় হায়! সুশীলার এই দশা! প্রাণে বড় ব্যথা পেলেম। বুঝিয়ে তখনি ঘরে নিয়ে গেলেম। তখনি ডাক্তার দেখালেম, চিকিৎসা আরম্ভ হলো। সুশীলা আমার নিকটেই থাকলো। আহা! তার চোকের জল আর থামে না।

বিধাতার অনুগ্রহ আমার প্রতি অসীম। আমাকে একটী পুত্ররত্ন দান কোরেছেন। সুখের উপর সুখ—আনন্দের উপর আনন্দ। আগে

যেমন দুঃখের উপর দুঃখ, দুঃখের একটানা সাগরে ভেসেছি;—এখন তেমি সুখের উপর সুখ, সুখের সাগরে সাঁতার দিচ্চি। সংসার-সর্ব্বরীর এ চক্র বড়ই মনোরম,—বড়ই আশ্চর্য্য! মানুষ ই সংসারচক্রে ঘুরে ঘুরে এই রকম সুখ-দুঃখ ভোগ কোচ্চে।

আজ আমি সংসারী। ছেলের নাম রেখেছি, প্রকৃতিপ্রসন্ন। পতি-পুত্র নিয়ে সংসারে সংসারী সেজে সংসারচক্রের নূতন আবর্ত্তনে ঘুর্ত্তে যাচ্ছি। সংসারের সে কিচ্ কিচ্ সকলের হয় ত ভাল লাগ্‌বে না। এইজন্যে আজ আমি পতিপুত্র নিয়ে বিদায় প্রার্থনা করি। যাঁরা যাঁরা আমার ঘটনাচক্রের অদ্ভূত অদ্ভূত কাণ্ড দেখে হেসেছেন,—যাঁরা যাঁরা আমার সুখদুঃখ হৃদয়ের সঙ্গে গেঁথে রেখেছেন, আজ আনন্দের সহিত তাঁদের কাছে বিদায় চাচ্চি। আর যাঁরা আমার অদৃষ্টের এই কিচ্ কিচ্—এই হাড়জ্বালানো কথা শুনে হাড়ে হাড়ে চোটেছেন, তাঁদের কাছেও বিদায় প্রার্থনা কোচ্চি। আর বিরক্ত হোতে হবে না। এ সব কথা আর শুন্‌তে হবে না। তবে বিদায় হলেম, আজ বড় আনন্দের দিন।

শেষ কথা।

হরিদাসীর জীবন অতি প্রাচীন! নদীয়া জেলার সুপ্রসিদ্ধ রাণা-ঘাটের অন্যূন তিন ক্রোশ পূর্ব্বে মাঠের মধ্যে বনজঙ্গলে ঢাকা এক প্রকাণ্ড পাহাড় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের কাছে এই পাহাড় "দেবগ্রামের ডাঙ্গা" বোলে প্রসিদ্ধি লাভ কোরেছে। এখানে সাহস কোরে কেউ যায় না। কারণ ভূতের ভয়, টাকা ঠকানে গদার ভয়! পাঠক-পাঠিকা জেনে রাখ্‌বেন, সেই বড় বড় উঁচু উঁচু ঢিবি,—সেই পাহাড়, হরিদাসীর সাধের শান্তি-নিকেতন। সংসার-সর্ব্বরীর চক্রে পোড়ে সেই শান্তি-নিকেতনও আজ এই দশা প্রাপ্ত হয়েছে। সংসারের গতিই এই। তাই অনেক দেখে শুনে—অনেক ভেবে চিন্তে বুঝে সুঝে, এই পুস্তকের নাম হয়েছে,—**সংসার-সর্ব্বরী**!!!

সম্পূর্ণ।